রবীন্দ্র রচনাবলী

ত্রিংশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বিংশ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

সূচী

চিত্রসূচী

কবিতা ও গান

কল্যাণীয় শ্রীমান কৃষ্ণ কৃপালানি ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী নন্দিতার

শুভপরিণয় উপলক্ষে আশীর্বাদ

নবজীবনের ক্ষেত্রে দুজনে মিলিয়া একমনা
যে নব সংসার তব প্রেমমন্ত্রে করিছ রচনা
দুঃখ সেথা দিক বীর্য, সুখ দিক সৌন্দর্যের সুধা,
মৈত্রীর আসনে সেথা নিক স্থান প্রসন্ন বসুধা,
হৃদয়ের তারে তারে অসংশয় বিশ্বাসের বীণা
নিয়ত সত্যের সুরে মধুময় করুক আঙিনা।
সমুদার আমন্ত্রণে মুক্তদ্বার গৃহের ভিতরে
চিত্ত তব নিখিলেরে নিত্য যেন আতিথ্য বিতরে।
প্রত্যহের আলিম্পনে দ্বারপথে থাকে যেন লেখা
সুকল্যাণী দেবতার অদৃশ্য চরণচিহ্নরেখা।
শুচি যাহা, পুণ্য যাহা, সুন্দর যা, যাহা-কিছু শ্রেয়,
নিরলস সমাদরে পায় যেন তাহাদের দেয়।
তোমার সংসার ঘেরি, নন্দিতা, নন্দিত তব মন
সরল মাধুর্যরসে নিজেরে করুক সমর্পণ।
তোমাদের আকাশেতে নির্মল আলোর শঙ্খনাদ,
তার সাথে মিলে থাক্ দাদামশায়ের আশীর্বাদ।

শান্তিনিকেতন
১২ বৈশাখ ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রপুট

পত্রপুট

এক

জীবনে নানা সুখদুঃখের
এলোমেলো ভিড়ের মধ্যে
হঠাৎ কখনো কাছে এসেছে
সুসম্পূর্ণ সময়ের ছোটো একটু টুকরো।
গিরিপথের নানা পাথর-নুড়ির মধ্যে
যেন আচমকা কুড়িয়ে-পাওয়া একটি হীরে।
কতবার ভেবেছি গেঁথে রাখব
ভারতীর গলার হারে;
সাহস করি নি,
ভয় হয়েছে কুলোবে না ভাষায়।
ভয় হয়েছে প্রকাশের ব্যগ্রতায়
পাছে সহজের সীমা যায় ছাড়িয়ে।

ছিলেম দার্জিলিঙে,
সদর রাস্তার নীচে এক প্রচ্ছন্ন বাসায়।
সঙ্গীদের উৎসাহ হল
রাত কাটাবে সিঞ্চল পাহাড়ে।
ভরসা ছিল না সন্ন্যাসী গিরিরাজের নির্জন সভার 'পরে—
কুলির পিঠের উপরে চাপিয়েছি নিজেদের সম্বল থেকেই
অবকাশ-সম্ভোগের উপকরণ।
সঙ্গে ছিল একখানা এস্রাজ, ছিল ভোজ্যের পেটিকা,
ছিল হো হা করবার অদম্য উৎসাহী যুবক,

রাশিয়ার চিঠি]　　　　রবীন্দ্রনাথ　　　　[১৯৩০
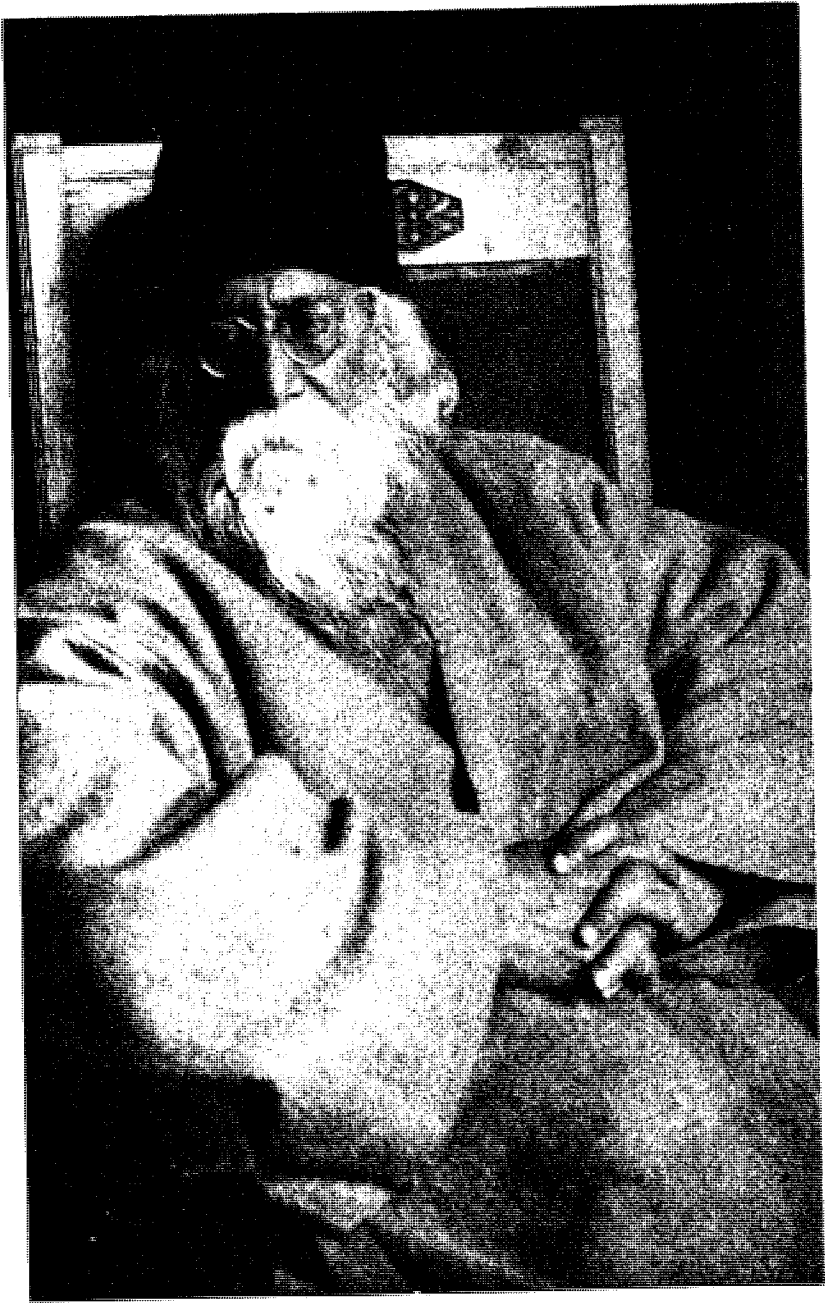
টাট্টুর উপর চেপেছিল আনাড়ি নবগোপাল,
তাকে বিপদে ফেলবার জন্যে ছিল ছেলেদের কৌতুক।
সমস্ত আঁকাবাঁকা পথে
বেঁকে বেঁকে ধ্বনিত হল অট্টহাস্য।
শৈলশৃঙ্গবাসের শূন্যতা পূরণ করব কজনে মিলে,
সেই রস জোগান দেবার অধিকারী আমরাই
এমন ছিল আমাদের আত্মবিশ্বাস।
অবশেষে চড়াই-পথ যখন শেষ হল
তখন অপরাহ্ণের হয়েছে অবসান।
ভেবেছিলেম আমোদ হবে প্রচুর,
অসংযত কোলাহল উচ্ছ্বসিত মদিরার মতো
রাত্রিকে দেবে ফেনিল করে।

শিখরে গিয়ে পৌঁছলেম অবারিত আকাশে,
সূর্য নেমেছে অস্তদিগন্তে
নদীজালের রেখাঙ্কিত
বহুদূরবিস্তীর্ণ উপত্যকায়।
পশ্চিমের দিগ্‌বলয়ে,
সুরবালকের খেলার অঙ্গনে
স্বর্ণসুধার পাত্রখানা বিপর্যস্ত,
বিহ্বল তার প্লাবনে।

প্রমোদমুখর সঙ্গীরা হল নিস্তব্ধ।
দাঁড়িয়ে রইলেম স্থির হয়ে।
এস্রাজটা নিঃশব্দ পড়ে রইল মাটিতে,
পৃথিবী যেমন উন্মুখ হয়ে আছে
তার সকল কথা থামিয়ে দিয়ে।
মন্ত্ররচনার যুগে জন্ম হয় নি,
মন্ত্রিত হয়ে উঠল না মন্ত্র
উদাত্তে অনুদাত্তে।

এমন সময় পিছন ফিরে দেখি
সামনে পূর্ণচন্দ্র,
বন্ধুর অকস্মাৎ হাস্যধ্বনির মতো।
যেন সুরলোকের সভাকবির
সদ্যোবিরচিত কাব্যপ্রহেলিকা
রহস্যে রসময়।

গুণী বীণায় আলাপ করে প্রতিদিন।
একদিন যখন কেউ কোথাও নেই
এমন সময় সোনার তারে রুপোর তারে
হঠাৎ সুরে সুরে এমন একটা মিল হল
যা আর কোনোদিন হয় নি।
সেদিন বেজে উঠল যে রাগিণী
সেদিনের সঙ্গেই সে মগ্ন হল
অসীম নীরবে।
গুণী বুঝি বীণা ফেললেন ভেঙে।

অপূর্ব সুর যেদিন বেজেছিল
ঠিক সেইদিন আমি ছিলেম জগতে,
বলতে পেরেছিলেম—
আশ্চর্য!

শান্তিনিকেতন
৪ মে ১৯৩৫

দুই

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ
কল্যাণীয়েষু

আমার ছুটি চার দিকে ধু ধু করছে
ধান-কেটে-নেওয়া খেতের মতো।

আশ্বিনে সবাই গেছে বাড়ি,
তাদের সকলের ছুটির পলাতকা ধারা মিলেছে
আমার একলা ছুটির বিস্তৃত মোহানায় এসে
এই রাঙামাটির দীর্ঘ পথপ্রান্তে।
আমার ছুটি ব্যাপ্ত হয়ে গেল
দিগন্তপ্রসারী বিরহের জনহীনতায়;
তার তেপান্তর মাঠে কল্পলোকের রাজপুত্র
ছুটিয়েছে পবনবাহন ঘোড়া
মরণসাগরের নীলিমায় ঘেরা
স্মৃতিদ্বীপের পথে।
সেখানে রাজকন্যা চিরবিরহিণী
ছায়াভবনের নিভৃত মন্দিরে।
এমনি করে আমার ঠাঁইবদল হল
এই লোক থেকে লোকাতীতে।

আমার মনের মধ্যে ছুটি নেমেছে
যেন পদ্মার উপর শেষ শরতের প্রশান্তি
বাইরে তরঙ্গ গেছে থেমে,
গতিবেগ রয়েছে ভিতরে।
সাঙ্গ হল দুই তীর নিয়ে
ভাঙন-গড়নের উৎসাহ।
ছোটো ছোটো আবর্ত চলেছে ঘুরে ঘুরে
আনমনা চিত্তপ্রবাহে ভেসে-যাওয়া
অসংলগ্ন ভাবনা।
সমস্ত আকাশের তারার ছায়াগুলিকে
আঁচলে ভরে নেবার অবকাশ তার বক্ষতলে
রাত্রের অন্ধকারে।

মনে পড়ে অল্প বয়সের ছুটি;
তখন হাওয়া-বদল ঘর থেকে ছাদে;

লুকিয়ে আসত ছুটি, কাজের বেড়া ডিঙিয়ে,
নীল আকাশে বিছিয়ে দিত
বিরহের সুনিবিড় শূন্যতা,
শিরায় শিরায় মিড় দিত তীব্র টানে
না-পাওয়ার না-বোঝার বেদনায়
এড়িয়ে-যাওয়ার ব্যর্থতার সুরে।
সেই বিরহগীতগুঞ্জরিত পথের মাঝখান দিয়ে
কখনো বা চমকে চলে গেছে
শ্যামলবরন মাধুরী
চকিত কটাক্ষের অব্যক্ত বাণী বিক্ষেপ ক'রে,
বসন্তবনের হরিণী যেমন দীর্ঘনিশ্বাসে ছুটে যায়
দিগন্তপারের নিরুদ্দেশে।

এমনি ক'রে চিরদিন জেনে এসেছি
মোহনকে লুকিয়ে দেখার অবকাশ এই ছুটি
অকারণ বিরহের নিঃসীম নির্জনতায়।

হাওয়া-বদল চাই—
এই কথাটা আজ হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল
ঘরে ঘরে হাজার লোকের মনে।
টাইম-টেবিলের গহনে গহনে
ওদের খোঁজ হল সারা,
সাঙ্গ হল গাঁঠরি-বাঁধা,
বিরল হল গাঁঠের কড়ি।
এ দিকে, উনপঞ্চাশ পবনের লাগাম যাঁর হাতে
তিনি আকাশে আকাশে উঠেছেন হেসে
ওদের ব্যাপার দেখে।
আমার নজরে পড়েছে সেই হাসি,
তাই চুপচাপ বসে আছি এই চাতালে
কেদারাটা টেনে নিয়ে।

দেখলেম বর্ষা গেল চলে,
কালো ফরাশটা নিল গুটিয়ে।
ভাদ্রশেষের নিরেট গুমটের উপরে
থেকে থেকে ধাক্কা লাগল
সংশয়িত উত্তরে হাওয়ার।
সাঁওতাল ছেলেরা শেষ করেছে কেয়াফুল বেচা,
মাঠের দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে গোরুর পাল,
শ্রাবণভাদ্রের ভূরিভোজের অবসানে
তাদের ভাবখানা অতি মন্থর;
কী জানি, মুখ-ডোবানো রসালো ঘাসেই তাদের তৃপ্তি
না পিঠে কাঁচা রৌদ্র লাগানো আলস্যে।

হাওয়া-বদলের দায় আমার নয়;
তার জন্যে আছেন স্বয়ং দিক্‌পালেরা
রেলোয়ে স্টেশনের বাইরে,
তাঁরাই বিশ্বের ছুটিবিভাগে রসসৃষ্টির কারিগর।
অস্ত-আকাশে লাগল তাঁদের নতুন তুলির টান
অপূর্ব আলোকের বর্ণচ্ছটায়।
প্রজাপতির দল নামালেন
রৌদ্রে ঝলমল ফুলভরা টগরের ডালে,
পাতায় পাতায় যেন বাহবাধ্বনি উঠেছে
ওদের হালকা ডানার এলোমেলো তালের রঙিন নৃত্যে।
আমার আঙিনার ধারে ধারে এতদিন চলেছিল
এক-সার জুঁই-বেলের ফোটা-ঝরার ছন্দ,
সংকেত এল, তারা সরে পড়ল নেপথ্যে;
শিউলি এল ব্যতিব্যস্ত হয়ে;
এখনো বিদায় মিলল না মালতীর।
কাশের বনে লুটিয়ে পড়েছে শুক্লাসপ্তমীর জ্যোৎস্না—
পূজার পার্বণে চাঁদের নূতন উত্তরী
বর্ষাজলে ধোপ-দেওয়া।

আজ নি-খরচার হাওয়া-বদল জলে স্থলে।
খরিদদারের দল তাকে এড়িয়ে চলে গেল
দোকানে বাজারে।
বিধাতার দামী দান থাকে লুকোনো
বিনা দামের প্রশ্রয়ে,
সুলভ ঘোমটার নীচে থাকে
দুর্লভের পরিচয়।
আজ এই নি-কড়িয়া ছুটির অজস্রতা
সরিয়েছেন তিনি ভিড়ের থেকে
জনকয়েক অপরাজেয় কুঁড়ে মানুষের প্রাঙ্গণে।
তাদের জন্যেই পেতেছেন খাস-দরবারের আসর
তাঁর আম-দরবারের মাঝখানেই—
কোনো সীমানা নেই আঁকা।
এই ক'জনের দিকে তাকিয়ে
উৎসবের বীনকারকে তিনি বায়না দিয়ে এসেছেন
অসংখ্য যুগ থেকে।

বাঁশি বাজল।
আমার দুই চক্ষু যোগ দিল
কয়খানা হালকা মেঘের দলে।
ওরা ভেসে পড়েছে নিঃশেষে মিলিয়ে যাবার খেয়ায়।
আমার মন বেরোল নির্জনে-আসন-পাতা
শান্ত অভিসারে,
যা-কিছু আছে সমস্ত পেরিয়ে যাবার যাত্রায়।

আমার এই স্তব্ধ ভ্রমণ হবে সারা,
ছুটি হবে শেষ,
হাওয়া-বদলের দল ফিরে আসবে ভিড় ক'রে,
আসন্ন হবে বাকি-পড়া কাজের তাগিদ।

ফুরোবে আমার ফিরতি-টিকিটের মেয়াদ,
ফিরতে হবে এইখান থেকে এইখানেই,
মাঝখানে পার হব অসীম সমুদ্র।

শান্তিনিকেতন
শুক্লাসপ্তমী আশ্বিন ১৩৪২
সংশোধন ১৫. ১০. ৩৫

তিন

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদিতলে।

মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে;
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।
ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,
তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে;
দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে মহৎজীবনে যার অধিকার।
শ্রেয়কে কর দুর্মূল্য,
কৃপা কর না কৃপাপাত্রকে।
তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।
তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে।

তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়,
সে পরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।

তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল, কলাকৌশলবর্জিত ;
গদা-হাতে মুষল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত ;
অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে।
জড়রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,
প্রাণের 'পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা।

দেবতা এলেন পরযুগে—
মন্ত্র পড়লেন দানবদমনের,
জড়ের ঔদ্ধত্য হল অভিভূত ;
জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।
উষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখরচূড়ায়,
পশ্চিমসাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট।

নম্র হল শিকলে-বাঁধা দানব,
তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস।
ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলতা,
তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকেবেঁকে।
তোমার নাড়ীতে লেগে আছে তার পাগলামি।
দেবতার মন্ত্র উঠছে আকাশে বাতাসে অরণ্যে
দিনে রাত্রে
উদাত্ত অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে।
তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগদানব
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে,
তার তাড়নায় তোমার আপন জীবকে করছ আঘাত,
ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে।

শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।

বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে।
অগণিত যুগযুগান্তরের
অসংখ্য মানুষের লুপ্ত দেহ পুঞ্জিত তার ধুলায়।
আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি
আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম—
রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল-পরিচয়-গ্রাসী
নিঃশব্দ মহাধূলিরাশির মধ্যে।

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
এক দিকে আপক্বধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র,
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী—
'আমি আনন্দিত'।
অন্য দিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।
বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ,
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে।
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকল-ছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।
আবার ফাল্গুনে দেখেছি তোমার আতপ্ত দক্ষিনে হাওয়া
ছড়িয়ে দিয়েছে বিরহমিলনের স্বগতপ্রলাপ
আম্রমুকুলের গন্ধে।

চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে
স্বর্গীয় মদের ফেনা।
বনের মর্মরধ্বনি বাতাসের স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে
অকস্মাৎ কল্লোলোচ্ছ্বাসে।

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষে,
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শতশত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ—
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে।

জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোটো ছোটো পিঞ্জরে।
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা,
সব কীর্তির অবসান।

আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসি নি তোমার সম্মুখে,
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।
তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

শান্তিনিকেতন
১৬ অক্টোবর ১৯৩৫

চার

একদিন আষাঢ়ে নামল
বাঁশবনের মর্মর-ঝরা ডালে
জলভারে অভিভূত নীলমেঘের নিবিড় ছায়া।
শুরু হল ফসল-খেতের জীবনীরচনা
মাঠে মাঠে কচি ধানের চিকন অঙ্কুরে।
এমন সে প্রচুর, এমন পরিপূর্ণ, এমন প্রোৎফুল্ল,
দ্যুলোকে ভূলোকে বাতাসে আলোকে
তার পরিচয় এমন উদার-প্রসারিত—
মনে হয় না সময়ের ছোটো বেড়ার মধ্যে তাকে কুলাতে পারে;
তার অপরিমেয় শ্যামলতায়
আছে যেন অসীমের চির-উৎসাহ,
যেমন আছে তরঙ্গ-উল্লোল সমুদ্রে।

মাস যায়।
শ্রাবণের স্নেহ নামে আঘাতের ছল ক'রে,
সবুজ মঞ্জরি এগিয়ে চলে দিনে দিনে
শিষগুলি কাঁধে তুলে নিয়ে
অন্তহীন স্পর্ধিত জয়যাত্রায়।
তার আত্মাভিমানী যৌবনের প্রগল্‌ভতার 'পরে
সূর্যের আলো বিস্তার করে হাস্যোজ্জ্বল কৌতুক,
নিশীথের তারা নিবিষ্ট করে নিস্তব্ধ বিস্ময়।

মাস যায়।

বাতাসে থেমে গেল মত্ততার আন্দোলন,
শরতের শান্তনির্মল আকাশ থেকে
অমন্দ্র শঙ্খধ্বনিতে বাণী এল—
প্রস্তুত হও।
সারা হল শিশিরজলে স্নানব্রত।

মাস যায়।

নির্মম শীতের হাওয়া এসে পৌঁছল হিমাচল থেকে,
সবুজের গায়ে গায়ে এঁকে দিল হলদের ইশারা,
পৃথিবীর দেওয়া রঙ বদল হল আলোর দেওয়া রঙে।
উড়ে এল হাঁসের পাঁতি নদীর চরে,
কাশের গুচ্ছ ঝরে পড়ল তটের পথে পথে।

মাস যায়।

বিকালবেলার রৌদ্রকে যেমন উজাড় করে দিনান্ত
শেষ-গোধূলির ধূসরতায়
তেমনি সোনার ফসল চলে গেল
অন্ধকারের অবরোধে।
তার পরে শূন্যমাঠে অতীতের চিহ্নগুলো
কিছুদিন রইল মৃত শিকড় আঁকড়ে ধরে—
শেষে কালো হয়ে ছাই হল আগুনের লেহনে।

মাস গেল।

তার পরে মাঠের পথ দিয়ে
গোরু নিয়ে চলে রাখাল—
কোনো ব্যথা নেই তাতে, কোনো ক্ষতি নেই কারো।
প্রান্তরে আপন ছায়ায় মগ্ন একলা অশথ গাছ,
সূর্য-মন্ত্র-জপ-করা ঋষির মতো।
তারই তলায় দুপুরবেলায় ছেলেটা বাজায় বাঁশি
আদিকালের গ্রামের সুরে।

সেই স্বরে তাম্রবরন তপ্ত আকাশে
বাতাস হুহু করে ওঠে,
সে যে বিদায়ের নিত্যভাঁটায় ভেসে-চলা
মহাকালের দীর্ঘনিশ্বাস,
যে কাল, যে পথিক, পিছনের পান্থশালাগুলির দিকে
আর ফেরার পথ পায় না
এক দিনেরও জন্যে।

শান্তিনিকেতন
১৯ অক্টোবর ১৯৩৫

পাঁচ

সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে
অস্তসমুদ্রে সদ্য স্নান করে।
মনে হল, স্বপ্নের ধূপ উঠছে
নক্ষত্রলোকের দিকে।
মায়াবিষ্ট নিবিড় সেই স্তব্ধ ক্ষণে—
তার নাম করব না—
সবে সে চুল বেঁধেছে, পরেছে আসমানি রঙের শাড়ি,
খোলা ছাদে গান গাইছে একা।
আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম পিছনে
ও হয়তো জানে না, কিম্বা হয়তো জানে।

ওর গানে বলছে সিন্ধু কাফির সুরে—
চলে যাবি এই যদি তোর মনে থাকে
ডাকব না ফিরে ডাকব না,
ডাকি নে তো সকালবেলার শুকতারাকে।

শুনতে শুনতে সরে গেল সংসারের ব্যবহারিক আচ্ছাদনটা,
যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরোল

অগোচরের অপরূপ প্রকাশ ;
তার লঘু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে ;
অপ্রাপণীয়ের সে দীর্ঘনিশ্বাস,
দুরূহ দুরাশার সে অনুচ্চারিত ভাষা।

একদা মৃত্যুশোকের বেদমন্ত্র
তুলে ধরেছে বিশ্বের আবরণ, বলেছে—
পৃথিবীর ধূলি মধুময়।
সেই সুরে আমার মন বললে—
সংগীতময় ধরার ধূলি।
আমার মন বললে—
মৃত্যু, ওগো মধুময় মৃত্যু,
তুমি আমায় নিয়ে চলেছ লোকান্তরে
গানের পাখায়।

আমি ওকে দেখলেম,
যেন নিকষবরন ঘাটে সন্ধ্যার কালো জলে
অরুণবরন পা-দুখানি ডুবিয়ে বসে আছে অপ্সরী,
অকূল সরোবরে সুরের ঢেউ উঠেছে মৃদুমৃদু,
আমার বুকের কাঁপনে কাঁপন-লাগা হাওয়া
ওকে স্পর্শ করছে ঘিরে ঘিরে।

আমি ওকে দেখলেম,
যেন আলো-নেবা বাসরঘরে নববধূ,
আসন্ন প্রত্যাশার নিবিড়তায়
দেহের সমস্ত শিরা স্পন্দিত।
আকাশে ধ্রুবতারার অনিমেষ দৃষ্টি,
বাতাসে সাহানা রাগিণীর করুণা।

আমি ওকে দেখলেম,
ও যেন ফিরে গিয়েছে পূর্বজন্মে
চেনা-অচেনার অস্পষ্টতায়।

সে যুগের পালানো বাণী ধরবে বলে
ঘুরিয়ে ফেলছে গানের জাল,
সুরের ছোঁওয়া দিয়ে খুঁজে খুঁজে ফিরছে
হারানো পরিচয়কে।

সমুখে ছাদ ছাড়িয়ে উঠেছে বাদামগাছের মাথা,
উপরে উঠল কৃষ্ণচতুর্থীর চাঁদ।
ডাকলেম নাম ধরে।
তীক্ষ্ণবেগে উঠে দাঁড়ালো সে,
ভ্রূকুটি করে বললে, আমার দিকে ফিরে—
"এ কী অন্যায়, কেন এলে লুকিয়ে।"
কোনো উত্তর করলেম না।
বললেম না, প্রয়োজন ছিল না এই তুচ্ছ ছলনার।
বললেম না, আজ সহজে বলতে পারতে 'এসো',
বলতে পারতে 'খুশি হয়েছি'।
মধুময়ের উপর পড়ল ধূলার আবরণ।

পরদিন ছিল হাটবার
জানলায় বসে দেখছি চেয়ে।
রৌদ্র ধূ ধূ করছে পাশের সেই খোলা ছাদে।
তার স্পষ্ট আলোয় বিগত বসন্তরাত্রের বিহ্বলতা
সে দিয়েছে ঘুচিয়ে।
নির্বিশেষে ছড়িয়ে পড়ল আলো মাঠে বাটে,
মহাজনের টিনের ছাদে,
শাক-সবজির ঝুড়ি-চুপড়িতে,
আঁটিবাঁধা খড়ে,
হাঁড়ি-মালসার স্তূপে,
নতুন গুড়ের কলসীর গায়ে।
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল
মহানিম গাছের ফুলের মঞ্জরিতে।

পথের ধারে তালের গুঁড়ি আঁকড়ে উঠেছে অশথ,
অন্ধ বৈরাগী তারই ছায়ায় গান গাইছে হাঁড়ি বাজিয়ে—
কাল আসব বলে চলে গেল,
আমি যে সেই কালের দিকে তাকিয়ে আছি।

কেনাবেচার বিচিত্র গোলমালের জমিনে
ঐ সুরের শিল্পে বুনে উঠছে
যেন সমস্ত বিশ্বের একটা উৎকণ্ঠার মন্ত্র— 'তাকিয়ে আছি'।

একজোড়া মোষ উদাস চোখ মেলে
বয়ে চলেছে বোঝাই গাড়ি,
গলায় বাজছে ঘণ্টা,
চাকার পাকে পাকে টেনে তুলছে কাতর ধ্বনি।
আকাশের আলোয় আজ যেন মেঠো বাঁশির সুর মেলে দেওয়া।
সব জড়িয়ে মন ভুলেছে।

বেদমন্ত্রের ছন্দে আবার মন বললে—
মধুময় এই পার্থিব ধূলি।

কেরোসিনের দোকানের সামনে
চোখে পড়ল একজন একেলে বাউল।
তালিদেওয়া আলখাল্লার উপরে
কোমরে-বাঁধা একটা বাঁয়া।
লোক জমেছে চারি দিকে।
হাসলেম, দেখলেম অদ্ভুতেরও সংগতি আছে এইখানে,
এও এসেছে হাটের ছবি ভর্তি করতে।
ওকে ডেকে নিলেম জানলার কাছে,
ও গাইতে লাগল—
হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে,
সবাই ধরে টানে আমায়, এই যে গো এইখানে।

শান্তিনিকেতন
২৫ অক্টোবর ১৯৩৫

ছয়

অতিথিবৎসল,
ডেকে নাও পথের পথিককে
তোমার আপন ঘরে,
দাও ওর ভয় ভাঙিয়ে।
ও থাকে প্রদোষের বস্‌তিতে,
নিজের কালো ছায়া ওর সঙ্গে চলে
কখনো সমুখে কখনো পিছনে,
তাকেই সত্য ভেবে ওর যত দুঃখ যত ভয়।
দ্বারে দাঁড়িয়ে তোমার আলো তুলে ধরো,
ছায়া যাক মিলিয়ে,
থেমে যাক ওর বুকের কাঁপন।

বছরে বছরে ও গেছে চলে
তোমার আঙিনার সামনে দিয়ে,
সাহস পায় নি ভিতরে যেতে,
ভয় হয়েছে পাছে ওর বাইরের ধন
হারায় সেখানে।
দেখিয়ে দাও ওর আপন বিশ্ব
তোমার মন্দিরে,
সেখানে মুছে গেছে কাছের পরিচয়ের কালিমা,
ঘুচে গেছে নিত্যব্যবহারের জীর্ণতা,
তার চিরলাবণ্য হয়েছে পরিস্ফুট।

পান্থশালায় ছিল ওর বাসা,
বুকে আঁকড়ে ছিল তারই আসন, তারই শয্যা,
পলে পলে যার ভাড়া জুগিয়ে দিন কাটালো
কোন্ মুহূর্তে তাকে ছাড়বে ভয়ে
আড়াল তুলেছে উপকরণের।

একবার ঘরের অভয় স্বাদ পেতে দাও তাকে
বেড়ার বাইরে।

আপনাকে চেনার সময় পায় নি সে,
ঢাকা ছিল মোটা মাটির পর্দায় ;
পর্দা খুলে দেখিয়ে দাও যে, সে আলো, সে আনন্দ,
তোমারই সঙ্গে তার রূপের মিল।
তোমার যজ্ঞের হোমাগ্নিতে
তার জীবনের সুখদুঃখ আহুতি দাও,
জ্বলে উঠুক তেজের শিখায়,
ছাই হোক যা ছাই হবার।

হে অতিথিবৎসল,
পথের মানুষকে ডেকে নাও ঘরে,
আপনি যে ছিল আপনার পর হয়ে
সে পাক্ আপনাকে।

শান্তিনিকেতন
২৪ অক্টোবর ১৯৩৫

সাত

চোখ ঘুমে ভরে আসে,
মাঝে-মাঝে উঠছি জেগে।
যেমন নববর্ষার প্রথম পসলা বৃষ্টির জল
মাটি চুঁইয়ে পৌঁছয় গাছের শিকড়ে এসে,
তেমনি তরুণ হেমন্তের আলো ঘুমের ভিতর দিয়ে
লেগেছে আমার অচেতন প্রাণের মূলে।
বেলা এগোল তিন প্রহরের কাছে।
পাৎলা সাদা মেঘের টুকরো
স্থির হয়ে ভাসছে কার্তিকের রোদ্দুরে—
দেবশিশুদের কাগজের নৌকো।

পশ্চিম থেকে হাওয়া দিয়েছে বেগে,
দোলাদুলি লেগেছে তেঁতুলগাছের ডালে।
উত্তরে গোয়ালপাড়ার রাস্তা,
গোরুর গাড়ি বিছিয়ে দিল গেরুয়া ধুলো
ফিকে নীল আকাশে।

মধ্যদিনের নিঃশব্দ প্রহরে
অকাজে ভেসে যায় আমার মন
ভাবনাহীন দিনের ভেলায়।
সংসারের ঘাটের থেকে রশি-ছেঁড়া এই দিন
বাঁধা নেই কোনো প্রয়োজনে।
রঙের নদী পেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় অদৃশ্য হবে
নিস্তরঙ্গ ঘুমের কালো সমুদ্রে।

ফিকে কালিতে এই দিনটার চিহ্ন পড়ল কালের পাতায়,
দেখতে দেখতে যাবে সে মিলিয়ে।
ঘন অক্ষরে যে-সব দিন আঁকা পড়ে
মানুষের ভাগ্যলিপিতে,
তার মাঝখানে এ রইল ফাঁকা।
গাছের শুকনো পাতা মাটিতে ঝরে—
সেও শোধ করে যায় মাটির দেনা,
আমার এই অলস দিনের ঝরা পাতা
লোকারণ্যকে কিছুই দেয় নি ফিরিয়ে।

তবু মন বলে,
গ্রহণ করাও ফিরিয়ে-দেওয়ার রূপান্তর।
সৃষ্টির ঝর্না বেয়ে যে রস নামছে আকাশে আকাশে
তাকে মেনে নিয়েছি আমার দেহে মনে।
সেই রঙিন ধারায় আমার জীবনে রঙ লেগেছে—
যেমন লেগেছে ধানের খেতে,

যেমন লেগেছে বনের পাতায়,
যেমন লেগেছে শরতে বিবাগী মেঘের উত্তরীয়ে।
এরা সবাই মিলে পূর্ণ করেছে আজকে-দিনের বিশ্বছবি।
আমার মনের মধ্যে চিকিয়ে উঠল আলোর ঝলক,
হেমন্তের আতপ্ত নিশ্বাস শিহর লাগালো
ঘুম-জাগরণের গঙ্গাযমুনায়—
এও কি মেলে নি এই নিখিল ছবির পটে।
জল-স্থল-আকাশের রসসত্রে
অশথের চঞ্চল পাতার সঙ্গে
ঝলমল করছে আমার যে অকারণ খুশি
বিশ্বের ইতিবৃত্তের মধ্যে রইল না তার রেখা,
তবু বিশ্বের প্রকাশের মধ্যে রইল তার শিল্প।
এই রসনিমগ্ন মুহূর্তগুলি
আমার হৃদয়ের রক্তপদ্মের বীজ,
এই নিয়ে ঋতুর দরবারে গাঁথা চলেছে একটি মালা—
আমার চিরজীবনের খুশির মালা।
আজ অকর্মণ্যের এই অখ্যাত দিন
ফাঁক রাখে নি ঐ মালাটিতে—
আজও একটি বীজ পড়েছে গাঁথা।

কাল রাত্রি একা কেটেছে এই জানালার ধারে।
বনের ললাটে লগ্ন ছিল শুক্লপঞ্চমীর চাঁদের রেখা।
এও সেই একই জগৎ,
কিন্তু গুণী তার রাগিণী দিলেন বদল ক'রে
ঝাপসা আলোর মূর্ছনায়।
রাস্তায়-চলা ব্যস্ত যে পৃথিবী
এখন আঙিনায়-আঁচল-মেলা তার স্তব্ধ রূপ।
লক্ষ নেই কাছের সংসারে,
শুনছে তারার আলোয় গুঞ্জরিত পুরাণকথা।

মনে পড়ছে দূর বাষ্পযুগের শৈশবস্মৃতি।
গাছগুলো স্তম্ভিত,
রাত্রির নিঃশব্দতা পুঞ্জিত যেন দেহ নিয়ে।
ঘাসের অস্পষ্ট সবুজে সারি সারি পড়েছে ছায়া।
দিনের বেলায় জীবনযাত্রার পথের ধারে
সেই ছায়াগুলি ছিল সেবাসহচরী ;
তখন রাখালকে দিয়েছে আশ্রয়,
মধ্যাহ্নের তীব্রতায় দিয়েছে শান্তি।
এখন তাদের কোনো দায় নেই জ্যোৎস্নারাতে ;
রাত্রের আলোর গায়ে গায়ে বসেছে ওরা,
ভাইবোনে মিলে বুলিয়েছে তুলি
খামখেয়ালি রচনার কাজে।
আমার দিনের বেলাকার মন
আপন সেতারের পর্দা দিয়েছে বদল ক'রে।
যেন চলে গেলেম পৃথিবীর কোনো প্রতিবেশী গ্রহে,
তাকে দেখা যায় দূরবীনে।
যে গভীর অনুভূতিতে নিবিড় হল চিত্ত
সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে তাকে দিয়েছি বিস্তীর্ণ ক'রে।
ঐ চাঁদ ঐ তারা ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হল, বিরাট হল, সম্পূর্ণ হল
আমার চেতনায়।
বিশ্ব আমাকে পেয়েছে,
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে
অলস কবির এই সার্থকতা।

শান্তিনিকেতন
কার্তিক শুক্লাষষ্ঠী ১৩৪২

আট

আমাকে এনে দিল এই বুনো চারাগাছটি।
পাতার রঙ হলদে-সবুজ,
ফুলগুলি যেন আলো পান করবার
শিল্প-করা পেয়ালা, বেগুনি রঙের।
প্রশ্ন করি 'নাম কী',
জবাব নেই কোনোখানে।
ও আছে বিশ্বের অসীম অপরিচিতের মহলে
যেখানে আছে আকাশের নামহারা তারা।
আমি ওকে ধরে এনেছি একটি ডাক-নামে
আমার একলা জানার নিভৃতে।
ওর নাম পেয়ালী।
বাগানের নিমন্ত্রণে এসেছে ডালিয়া, এসেছে ফুশিয়া,
এসেছে ম্যারিগোল্ড্,
ও আছে অনাদরের অচিহ্নিত স্বাধীনতায়,
জাতে বাঁধা পড়ে নি ;
ও বাউল, ও অসামাজিক।

দেখতে দেখতে ঐ খসে পড়ল ফুল।
যে শব্দটুকু হল বাতাসে
কানে এল না।
ওর কুষ্ঠির রাশিচক্র যে নিমেষগুলির সমবায়ে
অণুপরিমাণ তার অঙ্ক,
ওর বুকের গভীরে যে মধু আছে
কণাপরিমাণ তার বিন্দু।
একটুকু কালের মধ্যে সম্পূর্ণ ওর যাত্রা,
একটি কল্পে যেমন সম্পূর্ণ
আগুনের-পাপড়ি-মেলা সূর্যের বিকাশ।
ওর ইতিহাসটুকু অতি ছোটো পাতার কোণে
বিশ্বলিপিকারের অতি ছোটো কলমে লেখা।

তবু তারই সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে বৃহৎ ইতিহাস,
দৃষ্টি চলে না এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায়।
শতাব্দীর যে নিরন্তর স্রোত বয়ে চলেছে
বিলম্বিত তালের তরঙ্গের মতো,
যে ধারায় উঠল নামল কত শৈলশ্রেণী,
সাগরে মরুতে কত হল বেশপরিবর্তন,
সেই নিরবধি কালেরই দীর্ঘ প্রবাহে এগিয়ে এসেছে
এই ছোটো ফুলটির আদিম সংকল্প
সৃষ্টির ঘাতপ্রতিঘাতে।

লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ফুলের ফোটা-ঝরার পথে
সেই পুরাতন সংকল্প রয়েছে নূতন, রয়েছে সজীব সচল,
ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দেয় নি দেখা।
এই দেহহীন সংকল্প, সেই রেখাহীন ছবি
নিত্য হয়ে আছে কোন্‌ অদৃশ্যের ধ্যানে!
যে অদৃশ্যের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি,
যে অদৃশ্যে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস
অতীতে ভবিষ্যতে।

শান্তিনিকেতন
৫ নভেম্বর ১৯৩৫

নয়

হেঁকে উঠল ঝড়,
লাগালো প্রচণ্ড তাড়া,
সূর্যাস্তসীমার রঙিন পাঁচিল ডিঙিয়ে
ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে পড়ল মেঘের ভিড়,
বুঝি ইন্দ্রলোকের আগুন-লাগা হাতিশালা থেকে
গাঁ গাঁ শব্দে ছুটছে ঐরাবতের কালো কালো শাবক
শুঁড় আছড়িয়ে।

মেঘের গায়ে গায়ে দগ্‌দগ্‌ করছে লাল আলো,
তার ছিন্ন ত্বকের রক্তরেখা।
বিদ্যুৎ লাফ মারছে মেঘের থেকে মেঘে,
চালাচ্ছে ঝক্‌ঝকে খাঁড়া ;
বজ্রশব্দে গর্জে উঠছে দিগন্ত ;
উত্তরপশ্চিমের আম-বাগানে শোনা গেল হাঁফ-ধরা একটা আওয়াজ,
এসে পড়ল পাটকিলে রঙের অন্ধকার,
শুকনো ধুলোর দম-আটকানো তুফান।
ছুঁড়ে মারে টুকরো ডাল শুকনো পাতা,
চোখে-মুখে ছিটোতে থাকে কাঁকরগুলো
আকাশটা ভূতে-পাওয়া।

পথিক উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে মাটিতে,
ঘন আঁধির ভিতর থেকে উঠছে ঘরহারা গোরুর উতরোল ডাক,
দূরে নদীর ঘাটে হৈ হৈ রব।
বোঝা গেল না কোন্‌ দিকে হুড়্‌মুড়্‌ দুড়্‌দাড়্‌ ক'রে
কিসের ওটা ভাঙচুর।
দুর্‌দুর্‌ করে বুক,
কী হল, কী হল ভাবনা।
কাকগুলো পড়ছে মুখ থুবড়িয়ে মাটিতে,
ঠোঁট দিয়ে ঘাস ধরছে কামড়িয়ে,
ধাক্কা খেয়ে যাচ্ছে সরে সরে,
ঝট্‌পট্‌ করছে পাখাদুটো।
নদীপথে ঝড়ের মুখে বাঁশঝাড়ের লুটোপুটি,
ডালগুলো ডাইনে বাঁয়ে আছাড় খায়,
দোহাই পাড়ে মরিয়া হয়ে।
তীক্ষ্ণ হাওয়া সাঁই সাঁই শান দিচ্ছে আর চালাচ্ছে ছুরি
অন্ধকারের পাঁজরের ভিতর দিয়ে।
জলে স্থলে শূন্যে উঠেছে
ঘূরপাক-খাওয়া আতঙ্ক।

হঠাৎ সোঁদা গন্ধের দীর্ঘনিশ্বাস উঠল মাটি থেকে,
মুহূর্তে এসে পড়ল বৃষ্টি প্রবল ঝাপটায়,
হাওয়ার চোটে গুঁড়োনো জলের ফোঁটা,
পাৎলা পর্দায় ঢেকে ফেললে সমস্ত বন,
আড়াল করলে মন্দিরের চুড়ো,
কাঁসর-ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দের দিল মুখ চাপা।
রাত তিন পহরে থেমে গেল ঝড়বৃষ্টি,
কালী হয়ে এল অন্ধকার নিকষ-পাথরের মতো ;
কেবলই চলল ব্যাঙের ডাক,
ঝিঁঝি পোকার শব্দ,
জোনাকির মিটিমিটি আলো,
আর যেন স্বপ্নে-আঁৎকে-ওঠা দমকা হাওয়ায়
থেকে থেকে জল-ঝরা ঝাউয়ের ঝর্‌ঝরানি।

শান্তিনিকেতন
চৈত্র ১৩৪০

দশ

এই দেহখানা বহন করে আসছে দীর্ঘকাল
বহু ক্ষুদ্র মুহূর্তের রাগদ্বেষ ভয়ভাবনা
কামনার আবর্জনারাশি।
এর আবিল আবরণে বারে বারে ঢাকা পড়ে
আত্মার মুক্তরূপ।
এ সত্যের মুখোশ প'রে সত্যকে আড়ালে রাখে ;
মৃত্যুর কাদামাটিতেই গড়ে আপনার পুতুল,
তবু তার মধ্যে মৃত্যুর আভাস পেলেই
নালিশ করে আর্তকণ্ঠে।
খেলা করে নিজেকে ভোলাতে,
কেবলই ভুলতে চায় যে সেটা খেলা।

প্রাণপণ সঞ্চয়ে রচনা করে মরণের অর্ঘ্য ;
স্তুতিনিন্দার বাষ্পবুদ্‌বুদে ফেনিল হয়ে
পাক খায় ওর হাসিকান্নার আবর্ত।
বক্ষ ভেদ ক'রে ও হাউয়ের আগুন দেয় ছুটিয়ে,
শূন্যের কাছ থেকে ফিরে পায় ছাই—
দিনে দিনে তাই করে স্তূপাকার।

প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী
প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা,
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।
অসংখ্য দণ্ড পল নিমেষের জটিল মলিন জালে বিজড়িত
দেহটাকে সরিয়ে ফেলি মনের থেকে
যেখানে সরে যায় অন্ধকার রাতের
নানা ব্যর্থ ভাবনার অত্যুক্তি,
যায় বিস্মৃত দিনের অনবধানে পুঞ্জিত লেখন যত—
সেই-সব নিমন্ত্রণলিপি নীরব যার আহ্বান,
নিঃশেষিত যার প্রত্যুত্তর।
তখন মনে পড়ে, সবিতা,
তোমার কাছে ঋষিকবির প্রার্থনামন্ত্র,
যে মন্ত্রে বলেছিলেন, হে পূষণ,
তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন,
উন্মুক্ত করো সেই আবরণ।

আমিও প্রতিদিন উদয়দিগ্‌বলয় থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায়
প্রসারিত করে দিই আমার জাগরণ ;
বলি, হে সবিতা,
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন—
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে-আমার দেহের অণুপরমাণু,

তারও অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ,
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।
আমার অন্তরতম সত্য
আদি যুগে অব্যক্ত পৃথিবীর সঙ্গে
তোমার বিরাটে ছিল বিলীন,
সেই সত্য তোমারই।
তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ
আপনার মহৎস্বরূপকে দেখেছে কালে কালে,
কখনো নীল-মহানদীর তীরে,
কখনো পারস্যসাগরের কূলে,
কখনো হিমাদ্রিগিরিতটে—
বলেছে 'জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র',
বলেছে 'দেখেছি অন্ধকারের পার হতে
আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের আবির্ভাব'।

শান্তিনিকেতন
৭ নবেম্বর ১৯৩৫

এগারো

ফাল্গুনের রঙিন আবেশ
যেমন দিনে দিনে মিলিয়ে দেয় বনভূমি
নীরস বৈশাখের রিক্ততায়,
তেমনি করেই সরিয়ে ফেলেছ হে প্রমদা, তোমার মদির মায়া
অনাদরে অবহেলায়।
একদিন আপন হাতে আমার চোখে বিছিয়েছিলে বিহ্বলতা,
রক্তে দিয়েছিলে দোল,
চিত্ত ভরেছিলে নেশায়, হে আমার সাকী,
পাত্র উজাড় ক'রে
আতুরসধারা আজ ঢেলে দিয়েছ ধুলায়।

আজ উপেক্ষা করেছ আমার স্তুতিকে,
আমার দুই চক্ষুর বিস্ময়কে ডাক দিতে ভুলে গেলে ;
আজ তোমার সাজের মধ্যে কোনো আকুতি নেই ;
নেই সেই নীরব ঝংকার
যা আমার নামকে দিয়েছিল রাগিণী।

শুনেছি একদিন চাঁদের দেহ ঘিরে
ছিল হাওয়ার আবর্ত।
তখন ছিল তার রঙের শিল্প,
ছিল সুরের মন্ত্র,
ছিল সে নিত্য নবীন।
দিনে দিনে উদাসী কেন ঘুচিয়ে দিল
আপন লীলার প্রবাহ।
কেন ক্লান্ত হল সে আপনার মাধুর্যকে নিয়ে।
আজ শুধু তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব—
ফোটে না ফুল,
বহে না কলমুখরা নির্ঝরিণী।

সেই বাণীহারা চাঁদ তুমি আজ আমার কাছে।
দুঃখ এই যে, এতে দুঃখ নেই তোমার মনে।
একদিন নিজেকে নূতন নূতন ক'রে সৃষ্টি করেছিলে মায়াবিনী,
আমারই ভালোলাগার রঙে রঙিয়ে।
আজ তারই উপর তুমি টেনে দিলে
যুগান্তের কালো যবনিকা
বর্ণহীন, ভাষাবিহীন।
ভুলে গেছ যতই দিতে এসেছিলে আপনাকে
ততই পেয়েছিলে আপনাকে বিচিত্র করে।
আজ আমাকে বঞ্চিত করে
বঞ্চিত হয়েছ আপন সার্থকতায়।

তোমার মাধুর্যযুগের ভগ্নশেষ
রইল আমার মনের স্তরে স্তরে—
সেদিনকার তোরণের স্তূপ,
প্রাসাদের ভিত্তি,
গুল্মে-ঢাকা বাগানের পথ।

আমি বাস করি
তোমার ভাঙা ঐশ্বর্যের ছড়ানো টুকরোর মধ্যে।
আমি খুঁজে বেড়াই মাটির তলার অন্ধকার,
কুড়িয়ে রাখি যা ঠেকে হাতে।
আর তুমি আছ
আপন কৃপণতার পাণ্ডুর মরুদেশে,
পিপাসিতের জন্যে জল নেই সেখানে,
পিপাসাকে ছলনা করতে পারে
নেই এমন মরীচিকারও সম্বল।

শান্তিনিকেতন
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

বারো

বসেছি অপরাহ্নে পারের খেয়াঘাটে
শেষধাপের কাছটাতে।
কালো জল নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে পা ডুবিয়ে দিয়ে।
জীবনের পরিত্যক্ত ভোজের ক্ষেত্র পড়ে আছে পিছন দিকে
অনেক দিনের ছড়ানো উচ্ছিষ্ট নিয়ে।
মনে পড়ছে ভোগের আয়োজনে
ফাঁক পড়েছে বারম্বার।
কতদিন যখন মূল্য ছিল হাতে
হাট জমে নি তখনো,
বোঝাই নৌকো লাগল যখন ডাঙায়

তখন ঘণ্টা গিয়েছে বেজে,
ফুরিয়েছে বেচাকেনার প্রহর।

অকালবসন্তে জেগেছিল ভোরের কোকিল ;
সেদিন তার চড়িয়েছি সেতারে,
গানে বসিয়েছি সুর।
যাকে শোনাব তার চুল যখন হল বাঁধা,
বুকে উঠল জাফরানি রঙের আঁচল
তখন ঝিকিমিকি বেলা,
করুণ ক্লান্তি লেগেছে মূলতানে।
ক্রমে ধূসর আলোর উপরে কালো মরচে পড়ে এল।
থেমে-যাওয়া গানখানি নিভে-যাওয়া প্রদীপের ভেলার মতো
ডুবল বুঝি কোন্ একজনের মনের তলায়,
উঠল বুঝি তার দীর্ঘনিশ্বাস,
কিন্তু জ্বালানো হল না আলো।

এ নিয়ে আজ নালিশ নেই আমার।
বিরহের কালোগুহা ক্ষুধিত গহ্বর থেকে
ঢেলে দিয়েছে ক্ষুভিত সুরের ঝর্না রাত্রিদিন।
সাত রঙের ছটা খেলেছে তার নাচের উড়নিতে
সারাদিনের সূর্যালোকে,
নিশীথরাত্রের জপমন্ত্র ছন্দ পেয়েছে
তার তিমিরপুঞ্জ কলোচ্ছল ধারায়।
আমার তপ্ত মধ্যাহ্নের শূন্যতা থেকে উচ্ছ্বসিত
গৌড়-সারঙের আলাপ।
আজ বঞ্চিত জীবনকে বলি সার্থক—
নিঃশেষ হয়ে এল তার দুঃখের সঞ্চয়
মৃত্যুর অর্ঘ্যপাত্রে,
তার দক্ষিণা রয়ে গেল কালের বেদিপ্রান্তে।

জীবনের পথে মানুষ যাত্রা করে
নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে।
গান যে মানুষ গায় দিয়েছে সে ধরা, আমার অন্তরে ;
যে মানুষ দেয় প্রাণ দেখা মেলে নি তার।

দেখেছি শুধু আপনার নিভৃত রূপ
ছায়ায় পরিকীর্ণ,
যেন পাহাড়তলিতে একখানা অনুত্তরঙ্গ সরোবর।
তীরের গাছ থেকে
সেখানে বসন্তশেষের ফুল পড়ে ঝ'রে,
ছেলেরা ভাসায় খেলার নৌকো,
কলস ভরে নেয় তরুণীরা
বুদ্‌বুদ্‌ফেনিল গর্গরধ্বনিতে।
নববর্ষার গম্ভীর বিরাট শ্যামমহিমা
তার বক্ষতলে পায় লীলাচঞ্চল দোসরটিকে।
কালবৈশাখী হঠাৎ মারে পাখার ঝাপট,
স্থির জলে আনে অশান্তির উন্মন্থন,
অধৈর্যের আঘাত হানে তটবেষ্টনের স্থাবরতায় ;
হঠাৎ বুঝি তার মনে হয়—
গিরিশিখরের পাগলা-ঝোরা পোষ মেনেছে
গিরিপদতলের বোবা জলরাশিতে—
বন্দী ভুলেছে আপনার উদ্‌বেলকে, উদ্দামকে—
পাথর ডিঙিয়ে আপন সীমানা চূর্ণ করতে করতে নিরুদ্দেশের পথে
অজানার সংঘাতে বাঁকে বাঁকে
গর্জিত করল না সে আপন অবরুদ্ধ বাণী,
আবর্তে আবর্তে উৎক্ষিপ্ত করল না
অন্তর্গূঢ়কে।

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে

সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

দুর্গম ভীষণের ওপারে
অন্ধকারে অপেক্ষা করছে জ্ঞানের বরদাত্রী ;
মানবের অভ্রভেদী বন্ধনশালা
তুলেছে কালো পাথরে গাঁথা উদ্ধত চূড়া
সূর্যোদয়ের পথে ;
বহু শতাব্দীর ব্যথিত ক্ষত মুষ্টি
রক্তলাঞ্ছিত বিদ্রোহের ছাপ
লেপে দিয়ে যায় তার দ্বারফলকে ;
ইতিহাসবিধাতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ
দৈত্যের লৌহদুর্গে প্রচ্ছন্ন ;
আকাশে দেবসেনাপতির কণ্ঠ শোনা যায়—
'এসো মৃত্যুবিজয়ী'।
বাজল ভেরি,
তবু জাগল না রণদুর্মদ
এই নিরাপদ নিশ্চেষ্ট জীবনে ,
ব্যূহ ভেদ ক'রে
স্থান নিই নি যুধ্যমান দেবলোকের সংগ্রামসহকারিতায়।
কেবল স্বপ্নে শুনেছি ডমরুর গুরুগুরু,
কেবল সমরযাত্রীর পদপাতকম্পন
মিলেছে হৃৎস্পন্দনে বাহিরের পথ থেকে।

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায় ;
শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে—

মর্তের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।

১ বৈশাখ ১৩৪৩

তেরো

হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট
গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে
আমার চার দিকে চিরকাল ধ'রে,
আমি-বনস্পতির এরা কিরণপিপাসু পল্লবস্তবক,
এরা মাধুকরী-ব্রতীর দল।
প্রতিদিন আকাশ থেকে এরা ভরে নিয়েছে
আলোকের তেজোরস,
নিহিত করেছে সেই অলক্ষ্য অপ্রজ্বলিত অগ্নিসঞ্চয়
এই জীবনের গূঢ়তম মজ্জার মধ্যে।
সুন্দরের কাছে পেয়েছে অমৃতের কণা
ফুলের থেকে, পাখির গানের থেকে,
প্রিয়ার স্পর্শ থেকে, প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে,
আত্মনিবেদনের অশ্রুগদ্‌গদ আকুতি থেকে—
মাধুর্যের কত স্মৃতরূপ কত বিস্মৃতরূপ
দিয়ে গেছে অমৃতের স্বাদ,
আমার নাড়ীতে নাড়ীতে।
নানা ঘাতে প্রতিঘাতে সংক্ষুব্ধ
সুখদুঃখের ঝোড়ো হাওয়া নাড়া দিয়েছে
আমার চিত্তের স্পর্শবেদনাবাহিনী পাতায় পাতায়।
লেগেছে নিবিড় হর্ষের অনুকম্পন,
এসেছে লজ্জার ধিক্কার, ভয়ের সংকোচ, কলঙ্কের গ্লানি,
জীবনবহনের প্রতিবাদ।
ভালোমন্দের বিচিত্র বিপরীত বেগ
দিয়ে গেছে আন্দোলন
প্রাণরসপ্রবাহে।

তার আবেগে বহে নিয়ে গেছে সর্বগৃধ্নু চেতনাকে
জগতের সর্বদানযজ্ঞের প্রাঙ্গণে।
এই চিরচঞ্চল চিন্ময় পল্লবের অশ্রুত মর্মরধ্বনি
উধাও করে দেয় আমার জাগ্রত স্বপ্নকে
চিল-উড়ে-যাওয়া দূর দিগন্তে
জনহীন মধ্যদিনে মৌমাছির-গুঞ্জন-মুখর অবকাশে।
হাত-ধরে-বসে-থাকা বাষ্পাকুল নির্বাক্ ভালোবাসায়
নেমে আসে এদেরই শ্যামল ছায়ার করুণা।
এদেরই মৃদুবীজন এসে লাগে
শয্যাপ্রান্তে নিদ্রিত দয়িতার
নিশ্বাসস্ফুরিত বক্ষের চেলাঞ্চলে।
প্রিয়প্রত্যাশিত দিনের চিরায়মান উৎকণ্ঠিত প্রহরে
শিহর লাগাতে থাকে এদেরই দোলায়িত কম্পনে।

বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সম্বেদনে।
এরা ধরেছে সূক্ষ্মকে, বস্তুর অতীতকে ;
এরা তাল দিয়েছে সেই গানের ছন্দে
যার সুর যায় না শোনা।
এরা নারীর হৃদয় থেকে এনে দিয়েছে আমার হৃদয়ে
প্রাণলীলার প্রথম ইন্দ্রজাল আদিযুগের,
অনন্ত পুরাতনের আত্মবিলাস
নব নব যুগলের মায়ারূপের মধ্যে।
এরা স্পন্দিত হয়েছে পুরুষের জয়শঙ্খধ্বনিতে
মর্তলোকে যার আবির্ভাব
মৃত্যুর আলোকে আপন অমৃতকে উদ্‌বারিত করবার জন্যে
দুর্দাম উদ্যমে,
জল-স্থল-আকাশ-পথে দুর্গমজয়ের
স্পর্ধিত যার অধ্যবসায়।

আজ আমার এই পত্রপুঞ্জের
ঝরবার দিন এল জানি।
শুধাই আজ অন্তরীক্ষের দিকে চেয়ে—
কোথায় গো সৃষ্টির আনন্দনিকেতনের প্রভু,
জীবনের অলক্ষ্য গভীরে
আমার এই পত্রদূতগুলির সম্বাহিত দিনরাত্রির যে সঞ্চয়
অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয়
যা অখণ্ড ঐক্যে মিলে গিয়েছে আমার আত্মরূপে,
যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে,
তাকে রেখে দিয়ে যাব কোন্‌ গুণীর কোন্‌ রসজ্ঞের
দৃষ্টির সম্মুখে,
কার দক্ষিণ করতলের ছায়ায়,
অগণ্যের মধ্যে কে তাকে নেবে স্বীকার করে।

শান্তিনিকেতন
১০ বৈশাখ ১৩৪৩

চোদ্দো

ওগো তরুণী,
ছিল অনেক দিনের পুরোনো বছরে
এমনি একখানি নতুন কাল,
দক্ষিণ হাওয়ায় দোলায়িত,
সেই কালেরই আমি।
মুছে-আসা ঝাপসা পথ বেয়ে
এসে পড়েছি বনগন্ধের সংকেতে
তোমাদের এই আজকে-দিনের নতুন কালে।
পারো যদি মেনে নিয়ো আমায় সখা বলে।
আর কিছু নয়, আমি গান জোগাতে পারি
তোমাদের মিলনরাতে
আমার সেই নিদ্রাহারা সুদূর রাতের গান;

তার স্বরে পাবে দূরের নতুনকে,
তোমার লাগবে ভালো,
পাবে আপনাকেই
আপনার সীমানার অতীত পারে।
সেদিনকার বসন্তের বাঁশিতে
লেগেছিল যে প্রিয়বন্দনার তান
আজ সঙ্গে এনেছি তাই,
সে নিয়ো তোমার অর্ধনিমীলিত চোখের পাতায়,
তোমার দীর্ঘনিশ্বাসে।
আমার বিস্মৃত বেদনার আভাসটুকু
ঝরা ফুলের মৃদু গন্ধের মতো
রেখে দিয়ে যাব তোমার নববসন্তের হাওয়ায়।
সেদিনকার ব্যথা
অকারণে বাজবে তোমার বুকে ;
মনে বুঝবে, সেদিন তুমি ছিলে না তবু ছিলে,
নিখিল যৌবনের রঙ্গভূমির নেপথ্যে
যবনিকার ও পারে।
ওগো চিরন্তনী,
আজ আমার বাঁশি তোমাকে বলতে এল—
যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে।
ডাকতে এলেম আমার হারিয়ে-যাওয়া পুরোনোকে
তার খুঁজে-পাওয়া নতুন নামে।
হে তরুণী,
আমাকে মেনে নিয়ো তোমার সখা বলে,
তোমার অন্যযুগের সখা।

শান্তিনিকেতন
১৯ বৈশাখ ১৩৪৩

পনেরো

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে,
নক্ষত্রখচিত আকাশে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
গহন বেদনায়।
যে দেখা বানিয়ে-দেখা বাঁধা ছাঁচে,
প্রাচীর ঘিরে, দুয়ার তুলে,
সে দেখার উপায় নেই ওদের হাতে।
কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।

কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
পূজারি হাসিমুখে মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসে,
আমাকে শুধায়, "দেখে এলে তোমার দেবতাকে?"
আমি বলি, "না।"

অবাক হয় শুনে ; বলে, "জানা নেই পথ ?"
আমি বলি, "না।"
প্রশ্ন করে, "কোনো জাত নেই বুঝি তোমার ?"
আমি বলি, "না।"

এমন করে দিন গেল ;
আজ আপন মনে ভাবি,
"কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা।"
শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব বলে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে।
কেননা, আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।
মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে—
সকল বেড়ার বাইরে,
নক্ষত্রখচিত আকাশতলে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
বেদনা-বন্ধুর পথে।

বালক ছিলেম যখন
পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি
পেয়েছি আপন পুলককম্পিত অন্তরে,
আলোর মন্ত্র।
পেয়েছি নারকেল-শাখার ঝালর ঝোলা
আমার বাগানটিতে,

ভেঙে-পড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর
একলা ব'সে।
প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে
নেমেছে তেজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।
আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন্‌ অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।
হেমন্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে
আলোর নিঃশব্দ চরণধ্বনি
শুনেছি আমার রক্ত-চাঞ্চল্যে।
সেই ধ্বনি আমার অনুসরণ করেছে
জন্মপূর্বের কোন্‌ পুরাতন কালযাত্রা থেকে।
বিস্ময়ে আমার চিত্ত প্রসারিত হয়েছে অসীম কালে
যখন ভেবেছি
সৃষ্টির আলোকতীর্থে
সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত
যে জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পূর্বে
সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যৎ।
আমার পূজা আপনিই সম্পূর্ণ হয়েছে প্রতিদিন
এই জাগরণের আনন্দে।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
রীতিবন্ধনের বাহিরে আমার আত্মবিস্মৃত পূজা
কোথায় হল উৎসৃষ্ট জানতে পারি নি।

যখন বালক ছিলেম ছিল না কেউ সাথি,
দিন কেটেছে একা একা
চেয়ে চেয়ে দূরের দিকে।

জন্মেছিলেম অনাচারের অনাদৃত সংসারে,
চিহ্ন-মোছা, প্রাচীরহারা।
প্রতিবেশীর পাড়া ছিল ঘন বেড়ায় ঘেরা,
আমি ছিলেম বাইরের ছেলে, নাম-না-জানা।
ওদের ছিল তৈরি বাসা, ভিড়ের বাসা—
ওদের বাঁধা পথের আসা-যাওয়া
দেখেছি দূরের থেকে
আমি ব্রাত্য, আমি পংক্তিহারা।
বিধান-বাঁধা মানুষ আমাকে মানুষ মানে নি,
তাই আমার বন্ধুহীন খেলা ছিল সকল পথের চৌমাথায়,
ওরা তার ও পাশ দিয়ে চলে গেছে
বসনপ্রান্ত তুলে ধরে।
ওরা তুলে নিয়ে গেল ওদের দেবতার পূজায়
শাস্ত্র মিলিয়ে বাছা-বাছা ফুল—
রেখে দিয়ে গেল আমার দেবতার জন্যে
সকল দেশের সকল ফুল—
এক সূর্যের আলোকে চিরস্বীকৃত।
দলের উপেক্ষিত আমি,
মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি।
তারা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক,
অমৃতের অধিকারী।

মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি,
মিলেছে তার দেখা
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।
তাকে বলেছি হাত জোড় করে—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের-তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে
প্রিয়ার মধুর রূপে।
এল সুর দিতে আমার গানে,
নাচ দিতে আমার ছন্দে,
সুধা দিতে আমার স্বপ্নে।
উদ্দাম একটা ঢেউ হৃদয়ের তট ছাপিয়ে
হঠাৎ হল উচ্ছলিত,
ডুবিয়ে দিল সকল ভাষা,
নাম এল না মুখে।
সে দাঁড়ালো গাছের তলায়,
ফিরে তাকালো আমার কুণ্ঠিত বেদনাকরুণ
মুখের দিকে।
ত্বরিত পদে এসে বসল আমার পাশে।
দুই হাতের মধ্যে আমার হাত তুলে নিয়ে বললে,
"তুমি চেন না আমাকে, তোমাকে চিনি নে আমি,
আজ পর্যন্ত কেমন করে এটা হল সম্ভব
আমি তাই ভাবি।"
আমি বললেম, "দুই না-চেনার মাঝখানে

চিরকাল ধরে আমরা দুজনে বাঁধব সেতু,
এই কৌতূহল সমস্ত বিশ্বের অন্তরে।"

ভালোবেসেছি তাকে।
সেই ভালোবাসার একটা ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।
অল্পবেগের সেই প্রবাহ
বহে চলেছে প্রিয়ার সামান্য প্রতিদিনের
অনুচ্চ তটচ্ছায়ায়।
অনাবৃষ্টির কার্পণ্যে কখনো সে হয়েছে ক্ষীণ,
আষাঢ়ের দাক্ষিণ্যে কখনো সে হয়েছে প্রগল্‌ভ
তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল
অতি সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপকে
কখনো করেছে লালন, কখনো করেছে পরিহাস,
আঘাত করেছে কখনো বা।

আমার ভালোবাসার আর-একটা ধারা
মহাসমুদ্রের-বিরাট-ইঙ্গিত-বাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারই অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্ব দেহে মনে—
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।
সেই আলোকে দেখেছি তাকে অসীম শ্রীলোকে,
দেখেছি তাকে বসন্তের পুষ্পপল্লবের প্লাবনে,
সিসুগাছের কাঁপন-লাগা পাতাগুলির থেকে

ঠিকরে পড়েছে যে রৌদ্রকণা

তার মধ্যে শুনেছি তার সেতারের দ্রুতঝংকৃত সুর।

দেখেছি ঋতুরঙ্গভূমিতে

নানা রঙের ওড়না-বদল-করা তার নাচ

ছায়ায় আলোয়।

ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে

ওকে দেখেছি বিধাতার বামপাশে;

দেখেছি সুন্দর যখন অবমানিত

কদর্য-কঠোরের অশুচিস্পর্শে

তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে

বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি,

ধ্বংস করেছে মহামারীর গোপন আশ্রয়।

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে

সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ—

আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত।

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,

সকল মন্দিরের বাহিরে

আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল

দেবলোক থেকে

মানবলোকে,

আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে

আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে

শান্তিনিকেতন

১৮ বৈশাখ ১৩৪৩

ষোলো

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা,
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।
সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জলস্থল-আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে
আপনাকে উগ্র করে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়
তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদে।

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।

সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে ;
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।

সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা
সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতার নামে ;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে ;
কবির সংগীতে বেজে উঠছিল
সুন্দরের আরাধনা।

আজ যখন পশ্চিমদিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্তগহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল,
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তরের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ঐ মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

শান্তিনিকেতন
২৮ মাঘ ১৩৪৩

সতেরো

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা,
কিড়্‌মিড়্‌ করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভর্তি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।
বেজে উঠল তূরী ভেরি গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠল পৃথিবী।

ধূপ জ্বলল, ঘণ্টা বাজল, প্রার্থনার রব উঠল আকাশে
'করুণাময়, সফল হয় যেন কামনা'—
কেননা, ওরা যে জাগাবে মর্মভেদী আর্তনাদ
অভ্রভেদ ক'রে,
ছিঁড়ে ফেলবে ঘরে ঘরে ভালোবাসার বাঁধনসূত্র,
ধ্বজা তুলবে লুপ্ত পল্লীর ভস্মস্তূপে,
দেবে ধুলোয় লুটিয়ে বিদ্যানিকেতন,
দেবে চুরমার করে সুন্দরের আসনপীঠ।
তাই তো চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের নিতে আশীর্বাদ।
বেজে উঠল তূরী ভেরি গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠল পৃথিবী।

ওরা হিসাব রাখবে মরে পড়ল কত মানুষ,
পঙ্গু হয়ে গেল কয়জনা।
তারি হাজার সংখ্যার তালে তালে
ঘা মারবে জয়ডঙ্কায়।
পিশাচের অট্টহাসি জাগিয়ে তুলবে
শিশু আর নারীদেহের ছেঁড়া টুকরোর ছড়াছড়িতে।

ওদের এই মাত্র নিবেদন, যেন বিশ্বজনের কানে পারে
মিথ্যামন্ত্র দিতে,
যেন বিষ পারে মিশিয়ে দিতে নিশ্বাসে।
সেই আশায় চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
নিতে তাঁর প্রসন্ন মুখের আশীর্বাদ।
বেজে উঠছে তূরী ভেরি গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠছে পৃথিবী।

শান্তিনিকেতন
পৌষ ১৩৪৪

আঠারো

কথার উপরে কথা চলেছ সাজিয়ে দিনরাতি,
এইবার থামো তুমি। বাক্যের মন্দিরচূড়া গাঁথি
যত ঊর্ধ্বে তোলো তারে তার চেয়ে আরো ঊর্ধ্বে ধায়
গাঁথুনির অন্তহীন উন্মত্ততা। থামিতে না চায়
রচনার স্পর্ধা তব ; ভুলে গেছ, থামার পূর্ণতা
রচনার পরিত্রাণ ; ভুলে গেছ নির্বাক্ দেবতা
বেদিতে বসিবে আসি যবে, কথার দেউলখানি
কথার অতীত মৌনে লভিবে চরমতম বাণী।
মহানিস্তব্ধের লাগি অবকাশ রেখে দিয়ো বাকি,
উপকরণের স্তূপে রচিয়ো না অভ্রভেদী ফাঁকি
অমৃতের স্থান রোধি। নির্মাণ-নেশায় যদি মাত
সৃষ্টি হবে গুরুভার, তার মাঝে লীলা রবে না তো।
থামিবার দিন এলে থামিতে না যদি থাকে জানা
নীড় গেঁথে গেঁথে পাখি আকাশেতে উড়িবার ডানা
ব্যর্থ করি দিবে। থামো তুমি থামো। সন্ধ্যা হয়ে আসে,
শান্তির ইঙ্গিত নামে দিবসের প্রগল্‌ভ প্রকাশে।
ছায়াহীন আলোকের সভায় দিনের যত কথা
আপনারে রিক্ত করি রাত্রির গভীর সার্থকতা

এসেছে ভরিয়া নিতে। তোমার বীণার শত তারে
মত্ততার নৃত্য ছিল এতক্ষণ ঝংকারে ঝংকারে
বিরাম বিশ্রামহীন— প্রত্যক্ষের জনতা তেয়াগি
নেপথ্যে যাক সে চলে স্মরণের নির্জনের লাগি
ল'য়ে তার গীত-অবশেষ, কথিত বাণীর ধারা
অসীমের অকথিত বাণীর সমুদ্রে হোক সারা।

শান্তিনিকেতন
৫ বৈশাখ ১৩৪৩

শ্যামলী

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া শ্রীমতী রানী মহলানবীশ

ইঁটকাঠে গড়া নীরস খাঁচার থেকে
আকাশবিলাসী চিত্তেরে মোর এনেছিলে তুমি ডেকে
শ্যামল শুশ্রূষায়,
নারিকেলবন-পবন-বীজিত নিকুঞ্জ-আঙিনায়।
শরৎ-লক্ষ্মী কনকমাল্যে জড়ায় মেঘের বেণী,
নীলাম্বরের পটে আঁকে ছবি স্থপারি গাছের শ্রেণী।
দক্ষিণ ধারে পুকুরের ঘাট বাঁকা সে কোমর-ভাঙা,
লিলি গাছ দিয়ে ঢাকা তার ঢালু ডাঙা।
জামরুল গাছে ধরে অজস্র ফুল,
হরণ করেছে স্থরবালিকার হাজার কানের দুল।
লতানে যূথীর বিতানে মৌমাছিরা
করিতেছে ঘুরা-ফিরা।
পুকুরের তটে তটে
মধুচ্ছন্দা রজনীগন্ধা স্থগন্ধ তার রটে।
ম্যাগ্‌নোলিয়ার শিথিল পাপড়ি খসে খসে পড়ে ঘাসে,
ঘরের পিছন হতে বাতাবির ফুলের খবর আসে।
একসার মোটা পায়াভারী পাম উদ্ধত মাথা-তোলা,
রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছে যেন বিলিতি পাহারা-ওলা।

বসি যবে বাতায়নে
কলমি শাকের পাড় দেখা যায় পুকুরের এক কোণে
বিকেল বেলার আলো
জলে রেখা কাটে সবুজ সোনালি কালো।

ঝিলিমিলি করে আলোছায়া চুপে চুপে
চলতি হাওয়ার পায়ের চিহ্নরূপে।
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে
আমের শাখায় আঁখি ধেয়ে যায় সোনার রসের আশে।
লিচু ভরে যায় ফলে,
বাদুড়ের সাথে দিনে আর রাতে অতিথির ভাগ চলে।
বেড়ার ওপারে মৈসুমি ফুলে রঙের স্বপ্ন বোনা,
চেয়ে দেখে দেখে জানালার নাম রেখেছি— 'নেত্রকোণা'।

ওরাওঁ জাতের মালী ও মালিনী ভোর হতে লেগে আছে-
মাটি খোঁড়াখুঁড়ি, জল ঢালাঢালি গাছে।
মাটিগড়া যেন নিটোল অঙ্গ, মাটির নাড়ীর টানে
গাছপালাদের স্বজাত বলেই জানে।
রাত পোহালেই পাড়ার গোয়ালা গাভীদুটি নিয়ে আসে,
অধীর বাছুর ছুটোছুটি করে পাশে।
সাড়ে ছ'টা বাজে, সোজা হয়ে রোদ চলে আসে মোর ঘরে,
পথে দেখা দেয় খবরওআলা বাইক-রথের 'পরে।
পাঁচিল পেরিয়ে পুরোনো দোতলা বাড়ি,
আলসের ধারে এলোকেশিনীরা ঝোলায় সিক্ত শাড়ি।
পাড়ার মেয়েরা জল নিতে আসে ঘাটে,
সবুজ গহনে দু-চোখ ডুবিয়ে সোনার সকাল কাটে।

বাংলাদেশের বনপ্রকৃতির মন
শহর এড়িয়ে রচিল এখানে ছায়া দিয়ে ঘেরা কোণ
বাংলাদেশের গৃহিণী তাহার সাথে
আপন স্নিগ্ধ হাতে
সেবার অর্ঘ্য করেছে রচনা নীরব-প্রণতি-ভরা,
তারি আনন্দ কবিতায় দিল ধরা।

শুনেছি এবার হেথায় তোমার কদিনের ঘরবাড়ি
চলে যাবে তুমি ছাড়ি।
মেঘরৌদ্রের খেলার সৃষ্টি ঐ পুকুরের ধারে
লজ্জিত হবে অকবি ধনীর দৃষ্টির অধিকারে।
কালের লীলায় দিয়ে যাব সায়, খেদ রাখিব না চিতে—
এ ছবিখানি তো মন হতে ধনী পারিবে না কেড়ে নিতে।
তোমার বাগানে দেখেছি তোমারে কাননলক্ষ্মীসম—
তাহারি স্মরণ মম
শীতের রৌদ্রে, মুখর বর্ষারাতে
কুলায়বিহীন পাখির মতন
মিলিবে মেঘের সাথে।

শান্তিনিকেতন
১ ভাদ্র ১৩৪৩

শ্যামলী

দ্বৈত

সেদিন ছিলে তুমি আলো-আঁধারের মাঝখানটিতে,
বিধাতার মানসলোকের
মর্ত্যসীমায় পা বাড়িয়ে
বিশ্বের রূপ-আঙিনার নাছদুয়ারে
যেমন ভোরবেলার একটুখানি ইশারা,
শালবনের পাতার মধ্যে উস্‌খুস্‌,
শেষরাত্রের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া
আলোর আড়-চাহনি ;
উষা যখন আপন-ভোলা—
যখন সে পায় নি আপন ডাক-নামটি পাখির ডাকে,
পাহাড়ের চূড়ায়, মেঘের লিখনপত্রে।
তার পরে সে নেমে আসে ধরাতলে,
তার মুখের উপর থেকে
অসীমের ছায়া-ঘোমটা খসে পড়ে
উদয়-সাগরের অরুণরাঙা কিনারায়।
পৃথিবী তাকে সাজিয়ে তোলে
আপন সবুজ-সোনার কাঁচলি দিয়ে ;
পরায় তাকে আপন হাওয়ার চুনরি।
তেমনি তুমি এনেছিলে তোমার ছবির তনুরেখাটুকু
আমার হৃদয়ের দিক্‌প্রান্তপটে।

আমি তোমার কারিগরের দোসর,
কথা ছিল তোমার রূপের 'পরে মনের তুলি

আমিও দেব বুলিয়ে,
পুরিয়ে তুলব তোমার গড়নটিকে।
দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।
আমার প্রাণের হাওয়া
বইয়ে দিয়েছি তোমার চারি দিকে
কখনো ঝড়ের বেগে
কখনো মৃদুমৃদু দোলনে।

একদিন আপন সহজ নিরালায় ছিলে তুমি অধরা,
ছিলে তুমি একলা বিধাতার;
একের মধ্যে একঘরে।
আমি বেঁধেছি তোমাকে দুয়ের গ্রন্থিতে,
তোমার সৃষ্টি আজ তোমাতে আর আমাতে,
তোমার বেদনায় আর আমার বেদনায়।
আজ তুমি আপনাকে চিনেছ
আমার চেনা দিয়ে।
আমার অবাক চোখ লাগিয়েছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া,
জাগিয়েছে আনন্দরূপ
তোমার আপন চৈতন্যে।

বরানগর
২৩ মে ১৯৩৬

শেষ পহরে

ভালোবাসার বদলে দয়া
যৎসামান্য সেই দান,
সেটা হেলাফেলারই স্বাদ ভোলানো

পথের পথিকও পারে তা বিলিয়ে দিতে
পথের ভিখারিকে,
শেষে ভুলে যায় বাঁক পেরোতেই।
তার বেশি আশা করি নি সেদিন।

চলে গেলে তুমি রাতের শেষ প্রহরে।
মনে ছিল, বিদায় নিয়ে যাবে,
শুধু বলে যাবে, 'তবে আসি।'
যে কথা আর-একদিন বলেছিলে,
যা আর কোনোদিন শুনব না,
তার জায়গায় ঐ দুটি কথা,
ঐটুকু দরদের সরু বুনোনিতে যেটুকু বাঁধন পড়ে
তাও কি সইত না তোমার।

প্রথম ঘুম যেমনি ভেঙেছে
বুক উঠেছে কেঁপে,
ভয় হয়েছে সময় বুঝি গেল পেরিয়ে।
ছুটে এলেম বিছানা ছেড়ে।
দূরে গির্জের ঘড়িতে বাজল সাড়ে বারোটা।
রইলেম বসে আমার ঘরের চৌকাঠে
দরজায় মাথা রেখে,—
তোমার বেরিয়ে যাবার বারান্দার সামনে।
অতি সামান্য একটুখানি সুযোগ
অভাগীর ভাগ্য তাও নিল ছিনিয়ে,
পড়লেম ঘুমে ঢলে
তুমি যাবার কিছু আগেই।
আড়চোখে বুঝি দেখলে চেয়ে
এলিয়ে-পড়া দেহটা—
ডাঙায়-তোলা ভাঙা নৌকোটা যেন।

বুঝি সাবধানেই গেছ চলে,
ঘুম ভাঙে পাছে।
চমকে জেগে উঠেই বুঝেছি
মিছে হয়েছে জাগা।
বুঝেছি, যা যাবার তা গেছে এক নিমেষেই—
যা পড়ে থাকবার তাই রইল পড়ে
যুগযুগান্তর।

চুপচাপ চারি দিক—
যেমন চুপচাপ পাখিহারা পাখির বাসা।
গানহারা গাছের ডালে।
কৃষ্ণসপ্তমীর মিইয়ে-পড়া জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশেছে
ভোরবেলাকার ফ্যাকাশে আলো,
ছড়িয়ে পড়েছে আমার পাণ্ডাশ-বরণ শূন্য জীবনে।

গেলেম তোমার শোবার ঘরের দিকে
বিনা কারণে।
দরজার বাইরে জ্বলছে
ধোঁওয়ায়-কালি-পড়া হারিকেন লণ্ঠন,
বারান্দায় নিবো-নিবো শিখার গন্ধ।
ছেড়ে-আসা বিছানায় খোলা মশারি
একটু একটু কাঁপছে বাতাসে।
জানলার বাইরের আকাশে
দেখা যায় শুকতারা,
আশা-বিদায়-করা
যত ঘুমহারাদের সাক্ষী।
হঠাৎ দেখি ফেলে গেছ ভুলে
সোনাবাঁধানো হাতির দাঁতের লাঠিগাছটা।
মনে হল, যদি সময় থাকে
তবে হয়তো স্টেশন থেকে ফিরে আসবে খোঁজ করতে—

কিন্তু ফিরবে না
আমার সঙ্গে দেখা হয় নি বলে।

বরানগর
২৩ মে ১৯৩৬

আমি

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
না, না, না—
না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ,
না-আমি, না-তুমি।
ও দিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।

সেই আমির গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ' মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

একে বোলো না তত্ত্ব ;
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব-আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ।

পণ্ডিত বলছেন—
বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।
একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্বতে ;
মর্তলোকে মহাকালের নূতন খাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,
গিলে ফেলবে দিনরাতের জমাখরচ ;
মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালি।
মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।
শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে,
বাজবে না স্বর।
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে

নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—
'তুমি সুন্দর',
'আমি ভালোবাসি'।
বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগযুগান্তর ধ'রে।
প্রলয়সন্ধ্যায় জপ করবেন—
'কথা কও, কথা কও',
বলবেন 'বলো, তুমি সুন্দর',
বলবেন 'বলো, আমি ভালোবাসি'?

শান্তিনিকেতন
২৯ মে ১৯৩৬

সম্ভাষণ

রোজই ডাকি তোমার নাম ধরে,
বলি 'চারু'।
হঠাৎ ইচ্ছা হল আর-কিছু বলি,
যাকে বলে সম্ভাষণ,
যেমন বলত সত্যযুগের ভালোবাসায়।
সব চেয়ে সহজ ডাক— প্রিয়তমে।
সেটা আবৃত্তি করেছি মনে মনে,
তার উত্তরে মনে-মনেই শুনেছি তোমার উচ্চহাসি।
বুঝেছি, মন্দমধুর হাসি এ যুগের নয়;
এ যে নয় অবন্তী, নয় উজ্জয়িনী।

আটপহুরে নামটাতে দোষ কী হল
এই তোমার প্রশ্ন।
বলি তবে।
কাজ ছিল না বেশি,
সকাল সকাল ফিরেছি বাসায়।
হাতে বিকেলের খবরের কাগজ,
বসেছি বারান্দায়, রেলিঙে পা দুটো তোলা।
হঠাৎ চোখে পড়ল পাশের ঘরে
তোমার বৈকালিকী সাজের ধারা।

বাঁধছিলে চুল আয়নার সামনে
বেণী পাকিয়ে পাকিয়ে, কাঁটা বিঁধে বিঁধে।
এমন মন দিয়ে দেখি নি তোমাকে অনেক দিন ;
দেখি নি এমন বাঁকা করে মাথা-হেলানো
চুল-বাঁধার কারিগরিতে,
এমন দুই হাতের মিতালি
চুড়িবালার ঠুনঠুনির তালে।
শেষে ঐ ধানিরঙের আঁচলখানিতে
কোথাও কিছু ঢিল দিলে,
আঁট করলে কোথাও বা,
কোথাও একটু টেনে দিলে নীচের দিকে,
কবিরা যেমন ছন্দ বদল করে
একটু আধটু বাঁকিয়ে চুরিয়ে।

আজ প্রথম আমার মনে হল
অল্প মজুরির দিন-চালানো
একটা মানুষের জন্যে
নিজেকে তো সাজিয়ে তুলছে
আমাদের ঘরের পুরোনো বউ
দিনে দিনে নতুন-দাম-দেওয়া রূপে।

এ তো নয় আমার আটপহুরে চারু।
ঠিক এমনি করেই দেখা দিত অন্যযুগের অবন্তিকা
ভালোলাগার অপরূপবেশে
ভালোবাসার চকিত চোখে।
অমরুশতকের চৌপদীতে
—শিখরিণীতে হোক, স্রগ্ধরায় হোক—
ওকে তো ঠিক মানাতো।
সাজের ঘর থেকে বসবার ঘরে
ঐ যে আসছে অভিসারিকা,
ও যেন কাছের কালে আসছে
দূরের কালের বাণী।

বাগানে গেলেম নেমে।
ঠিক করেছি আমিও আমার সোহাগকে দেব মর্যাদা
শিল্পে-সাজিয়ে-তোলা মানপত্রে।
যখন ডাকব তোমাকে ঘরে
সে হবে যেন আবাহনী।
সামনেই লতা ভরেছে সাদা ফুলে—
বিলিতি নাম, মনে থাকে না—
নাম দিয়েছি তারাঝরা ;
রাতের বেলায় গন্ধ তার
ফুলবাগানের প্রলাপের মতো।
এবার সে ফুটেছে অকালে,
সবুর সয় নি শীত ফুরোবার।
এনেছি তার একটি গুচ্ছ,
তারও একটি সই থাকবে আমার নিবেদনে।

আজ গোধূলিলগ্নে তুমি ক্লাসিক যুগের চারুপ্রভা,
আমি ক্লাসিকযুগের অজিতকুমার।
দুটি কথা আজ বলব আমি,

সাজানো কথা—
হাসতে হয় হেসো।
সে কথা মনে মনে গড়ে তুলেছি
যেমন করে তুমি জড়িয়ে তুলেছ তোমার খোঁপা।
বলব, "প্রিয়ে, এই পরদেশী ফুলের মঞ্জরী
আকাশে চেয়ে খুঁজছিল বসন্তের রাত্রি,
এনেছি আমি তাকে দয়া করে
তোমার ঐ কালো চুলে।"

শান্তিনিকেতন
৩০ মে ১৯৩৬

স্বপ্ন

ঘন অন্ধকার রাত,
বাদলের হাওয়া
এলোমেলো ঝাপট দিচ্ছে চার দিকে।
মেঘ ডাকছে গুরুগুরু,
থরথর করছে দরজা,
খড়খড় করে উঠছে জানালাগুলো।
বাইরে চেয়ে দেখি
সারবাঁধা সুপুরি-নারকেলের গাছ
অস্থির হয়ে দিচ্ছে মাথা-ঝাঁকানি
দুলে উঠছে কাঁঠাল গাছের ঘন ডালে
অন্ধকারের পিণ্ডগুলো
দল-পাকানো প্রেতের মতো।
রাস্তার থেকে পড়েছে আলোর রেখা
পুকুরের কোণে
সাপ-খেলানো আঁকাবাঁকা।

মনে পড়ছে ঐ পদটা—
'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া-গরজন…
স্বপন দেখিনু হেনকালে।'
সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন্ একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসার-কুঁড়ি-ধরা তার মন।
মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজল পরা,
ঘাটের থেকে নীলশাড়ি
'নিঙাড়ি নিঙাড়ি' চলা।

আজ এই ঝোড়ো রাতে
তাকে মনে আনতে চাই—
তার সকালে, তার সাঁঝে,
তার ভাষায়, তার ভাবনায়,
তার চোখের চাহনিতে—
তিন-শো বছর আগেকার
কবির জানা সেই বাঙালির মেয়েকে।
দেখতে পাই নে স্পষ্ট করে।
আজ পড়েছে যাদের পিছনের ছায়ায়
তারা শাড়ির আঁচল যেমন করে বাঁধে কাঁধের 'পরে,
খোপা যেমন করে ঘুরিয়ে পাকায়
পিছনে নেমে-পড়া,
মুখের দিকে যেমন করে চায় স্পষ্টচোখে,
তেমন ছবিটি ছিল না
সেই তিন-শো বছর আগেকার কবির সামনে।

তবু— 'রজনী শাঙন ঘন…
স্বপন দেখিনু হেনকালে।'

শ্রাবণের রাত্রে এমনি করেই বয়েছে সেদিন
বাদলের হাওয়া,
মিল রয়ে গেছে
সেকালের স্বপ্নে আর একালের স্বপ্নে।

শান্তিনিকেতন
৩০ মে ১৯৩৬

প্রাণের রস

আমাকে শুনতে দাও,
আমি কান পেতে আছি।
পড়ে আসছে বেলা ;
পাখিরা গেয়ে নিচ্ছে দিনের শেষে
কণ্ঠের সঞ্চয় উজাড়-করে-দেবার গান।
ওরা আমার দেহ-মনকে নিল টেনে
নানা সুরের, নানা রঙের,
নানা খেলার
প্রাণের মহলে।
ওদের ইতিহাসের আর কোনো সাড়া নেই,
কেবল এইটুকু কথা—
আছি, আমরা আছি, বেঁচে আছি,
বেঁচে আছি এই আশ্চর্য মুহূর্তে।—
এই কথাটুকু পৌঁছল আমার মর্মে।
বিকালবেলায় মেয়েরা জল ভরে নিয়ে যায় ঘটে,
তেমনি করে ভরে নিচ্ছি প্রাণের এই কাকলি
আকাশ থেকে
মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে।

আমাকে একটু সময় দাও।
আমি মন পেতে আছি।

ভাঁটা-পড়া বেলায়,
ঘাসের উপরে ছড়িয়ে-পড়া বিকেলের আলোতে
গাছেদের নিস্তব্ধ খুশি,
মজ্জায় মধ্যে লুকোনো খুশি,
পাতায় পাতায় ছড়ানো খুশি।
আমার প্রাণ নিজেকে বাতাসে মেলে দিয়ে
নিচ্ছে বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস
চেতনার মধ্যে দিয়ে ছেঁকে।
এখন আমাকে বসে থাকতে দাও,
আমি চোখ মেলে থাকি।

তোমরা এসেছ তর্ক নিয়ে।
আজ দিনান্তের এই পড়ন্ত রোদ্দুরে
সময় পেয়েছি একটুখানি ;
এর মধ্যে ভালো নেই, মন্দ নেই,
নিন্দা নেই, খ্যাতি নেই।
দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই,—
আছে বনের সবুজ,
জলের ঝিকিমিকি—
জীবনস্রোতের উপর তলে
অল্প একটু কাঁপন, একটু কল্লোল,
একটু ঢেউ।
আমার এই একটুখানি অবসর
উড়ে চলেছে
ক্ষণজীবী পতঙ্গের মতো
সূর্যাস্তবেলার আকাশে
রঙিন ডানার শেষ খেলা চুকিয়ে দিতে—
বৃথা প্রশ্ন কোরো না।
বৃথা এনেছ তোমাদের যত দাবি।
আমি বসে আছি বর্তমানের পিছন মুখে

অতীতের দিকে গড়িয়ে-পড়া ঢালুতটে।
নানান বেদনায় ধেয়ে-বেড়ানো প্রাণ
একদিন করে গেছে লীলা
ঐ বনবীথির ডাল দিয়ে বিমুনি-করা
আলোছায়ায়।
আশ্বিনে দুপুর বেলা
এই কাঁপনলাগা ঘাসের উপর,
মাঠের পারে, কাশের বনে,
হাওয়ায় হাওয়ায় স্বগত উক্তি
মিলেছে আমার জীবনবীণার ফাঁকে ফাঁকে।

যে সমস্যাজাল
সংসারের চারি দিকে পাকে-পাকে জড়ানো
তার সব গিঁঠ গেছে ঘুচে।
যাবার পথের যাত্রী পিছনে যায় নি ফেলে
কোনো উদ্‌যোগ, কোনো উদ্‌বেগ, কোনো আকাঙ্ক্ষা
কেবল গাছের পাতার কাঁপনে
এই বাণীটি রয়ে গেছে—
তারাও ছিল বেঁচে,
তারা যে নেই তার চেয়ে সত্য ঐ কথাটি।
শুধু আজ অনুভবে লাগে
তাদের কাপড়ের রঙের আভাস,
পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার হাওয়া,
চেয়ে দেখার বাণী,
ভালোবাসার ছন্দ—
প্রাণগঙ্গার পূর্বমুখী ধারায়
পশ্চিম প্রাণের যমুনার স্রোত।

শান্তিনিকেতন
১ জুন ১৯৩৬

হারানো মন

দাঁড়িয়ে আছ আড়ালে,
ঘরে আসবে কিনা ভাবছ সেই কথা।
একবার একটু শুনেছি চুড়ির শব্দ।
তোমার ফিকে পাটকিলে রঙের আঁচলের একটুখানি
দেখা যায় উড়ছে বাতাসে
দরজার বাইরে।
তোমাকে দেখতে পাচ্ছি নে,
দেখছি পশ্চিম আকাশের রোদ্দুর
চুরি করেছে তোমার ছায়া,
ফেলে রেখেছে আমার ঘরের মেঝের 'পরে।

দেখছি শাড়ির কালো পাড়ের নীচে থেকে
তোমার কনক-গৌরবর্ণ পায়ের দ্বিধা
ঘরের চৌকাঠের উপর।
আজ ডাকব না তোমাকে।
আজ ছড়িয়ে পড়েছে আমার হালকা চেতনা—
যেন কৃষ্ণপক্ষের গভীর আকাশে নীহারিকা,
যেন বর্ষণশেষে মিলিয়ে-আসা সাদা মেঘ
শরতের নীলিমায়।

আমার ভালোবাসা
যেন সেই আল-ভেঙে-যাওয়া খেতের মতো
অনেক দিন হল চাষি যাকে
ফেলে দিয়ে গেছে চলে;
আনমনা আদিপ্রকৃতি
তার উপরে বিছিয়েছে আপন স্বত্ব
নিজের অজানিতে।
তাকে ছেয়ে উঠেছে ঘাস,

উঠেছে অনামা গাছের চারা,
সে মিলে গেছে চার দিকের বনের সঙ্গে
সে যেন শেষরাত্রির শুকতারা,
প্রভাত-আলোয় ডুবিয়ে দিল
তার আপন আলোর ঘটখানি।

আজ কোনো-সীমানা-দেওয়া নয় আমার মন,
হয়তো তাই ভুল বুঝবে আমাকে।
আগেকার চিহ্নগুলো সব গেছে মুছে,
আমাকে এক করে নিতে পারবে না কোনোখানে
কোনো বাঁধনে বেঁধে।

শান্তিনিকেতন
১ জুন ১৯৩৬

চিরযাত্রী

অস্পষ্ট অতীত থেকে বেরিয়ে পড়েছে ওরা দলে দলে,
ওরা সন্ধানী, ওরা সাধক,
বেরিয়েছে পুরাপৌরাণিক কালের
সিংহদ্বার দিয়ে।
তার তোরণের রেখা
আঁচড় কেটেছে অজানা আখরে,
ভেঙে-পড়া ভাষায়।

যাত্রী ওরা, রণযাত্রী,
ওদের চিরযাত্রা অনাগতকালের দিকে।
যুদ্ধ হয় নি শেষ,
বাজছে নিত্যকালের দুন্দুভি।
বহুশত যুগের পদপতনশব্দে
থর্‌থর্‌ করে ধরিত্রী,

অর্ধেক রাত্রে দুরুদুরু করে বক্ষ,
চিত্ত হয় উদাস,
তুচ্ছ হয় ধনমান,
মৃত্যু হয় প্রিয়।
তেজ ছিল যাদের মজ্জায়,
যারা চলতে বেরিয়েছিল পথে
মৃত্যু পেরিয়ে আজও তারাই চলেছে ;
যারা বাস্তু ছিল আঁকড়িয়ে
তারা জিয়ন-মরা, তাদের নিঝুম বসতি
বোবা সমুদ্রের বালুর ডাঙায়।
তাদের জগৎজোড়া প্রেতস্থানে
অশুচি হাওয়ায়
কে তুলবে ঘর,
কে রইবে চোখ উলটিয়ে কপালে,
কে জমাবে জঞ্জাল।

কোন্ আদিকালে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে
বিশ্বপথের চৌমাথায়।
পাথেয় ছিল রক্তে, পাথেয় ছিল স্বপ্নে,
পাথেয় ছিল পথেই।
যেই এঁকেছে নক্‌শা,
ঘর বেঁধেছে পাকা গাঁথুনির,
ছাদ তুলেছে মেঘ ঘেঁষে—
পরের দিন থেকে মাটির তলায়
ভিত হয়েছে ঝাঁঝরা।
সে বাঁধ বেঁধেছে পাথরে পাথরে,
তলিয়ে গেছে বন্যার ধাক্কায়।
সারারাত হিসেব করেছে স্থাবর সম্পদের,
রাতের শেষে হিসেবে বেরোল সর্বনাশ।

সে জমা করেছে ভোগের ধন সাত হাট থেকে,
ভোগে লেগেছে আগুন,
আপন তাপে গুমরে গুমরে
গেছে ভোগের জোগান আঙার হয়ে।
তার রীতি, তার নীতি, তার শিকল, তার খাঁচা
চাপা পড়েছে মাটির নীচে
পরযুগের কবরস্থানে।

কখনো বা ঘুমিয়েছে সে
ঝিমিয়ে-পড়া নেশার আসরে বাতি-নেবা দালানে
আরামের গদি পেতে।
অন্ধকারে ঝোপের থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্কন্ধকাটা দুঃস্বপ্ন,
পাগলা জন্তুর মতো
গোঁ গোঁঃ শব্দে ধরেছে তার টুঁটি চেপে,
বুকের পাঁজরগুলোয় ঠক ঠক দিয়েছে নাড়া,
গুঙরে উঠে জেগেছে সে মৃত্যুযন্ত্রণায়।
ক্ষোভের মাতুনিতে ভেঙে ফেলেছে মদের পাত্র,
ছিঁড়ে ফেলেছে ফুলের মালা।
বারে বারে রক্তে-পিছল দুর্গমে
ছুটে এসেছে শতচ্ছিদ্র শতাব্দীর বাইরে
পথ-না-চেনা দিক্‌সীমানার অলক্ষ্যে।
তার হৃৎপিণ্ডের রক্তের ধাক্কায় ধাক্কায়
ডমরুতে বেজেছে গুরু গুরু,
"পেরিয়ে চলো, পেরিয়ে চলো।"

ওরে চিরপথিক,
করিস নে নামের মায়া,
রাখিস নে ফলের আশা,
ওরে ঘরছাড়া মানুষের সন্তান।

কালের-রথ-চলা রাস্তায়
বারে বারে কারা তুলেছিল জয়ের নিশানা,
বারে বারে পড়েছে চুরমার হয়ে
মানুষের কীর্তিনাশা সংসারে।
লড়াইয়ে-জয়-করা রাজত্বের প্রাচীর
সে পাকা করতে গেছে ভুল সীমানায়।
সীমানাভাঙার দল ছুটে আসছে
বহু যুগ থেকে
বেড়া ডিঙিয়ে, পাথর গুঁড়িয়ে,
পার হয়ে পর্বত ;
আকাশে বেজে উঠছে নিত্যকালের দুন্দুভি,
"পেরিয়ে চলো,
পেরিয়ে চলো।"

শান্তিনিকেতন
৪ জুন ১৯৩৬

বিদায়-বরণ

চার প্রহর রাতের বৃষ্টিভেজা ভারী হাওয়ায়
থমকে আছে সকাল বেলাটা,
রাত জাগার ভারে যেন মুদে এসেছে
মলিন আকাশের চোখের পাতা।
বাদলার পিছল পথে পা টিপে চলেছে প্রহরগুলো।
যত সব ভাবনার আবছায়া
উড়ছে ঝাঁক বেঁধে মনের চার দিকে
হালকা বেদনার রঙ মেলে দিয়ে।

তাদের ধরি-ধরি করে মনটা,
ভাবি বেঁধে রাখি লেখায় ;
পাশ কাটিয়ে চলে যায় কথাগুলো।

এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত-কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া—
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি
যেন ঘোমটাপরা অভিমানিনী।

মন বলছে, ডাকো ডাকো,
ঐ ভেসে-যাওয়া পারের খেয়ার আরোহিণী,
ওকে একবার ডাকো ফিরে ;
দিনান্তের সন্ধ্যাদীপটি তুলে ধরো
ওর মুখের দিকে ;
করো ওকে বিদায়-বরণ।
বলো, 'তুমি সত্য, তুমি মধুর,
তোমারই বেদনা আজ লুকিয়ে বেড়ায়
বসন্তের ফুল ফোটা আর ফুল ঝরার ফাঁকে।
তোমার ছবি-আঁকা অক্ষরের লিপিখানি
সবখানেই,
নীলে সবুজে সোনায়
রক্তের রাঙা রঙে।'

তাই আমার আজ মন ভেসেছে
পলাশবনের চিকন ঢেউয়ে,
ফাটা মেঘের কিনার দিয়ে উপচে পড়া
আচমকা রোদ্দুরের ছটায়।

শান্তিনিকেতন
৩ জুন ১৯৩৬

তেঁতুলের ফুল

জীবনের অনেক ধন পাই নি,
নাগালের বাইরে তারা ;
হারিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি
হাত পাতি নি ব'লেই।
সেই চেনা সংসারে
অসংস্কৃত পল্লীরূপসীর মতো
ছিল এই ফুল মুখঢাকা,
অকাতরে উপেক্ষা করেছে উপেক্ষাকে
এই তেঁতুলের ফুল।

বেঁটে গাছ পাঁচিলের ধারে,
বাড়তে পারে নি কৃপণ মাটিতে ;
উঠেছে ঝাঁকড়া ডাল মাটির কাছ ঘেঁষে।
ওর বয়স হয়েছে যায় নি বোঝা।

অদূরে ফুটেছে নেবু ফুল,
গাছ ভরেছে গোলকচাঁপায়,
কোণের গাছে ধরেছে কাঞ্চন,
কুড়চি-শাখা ফুলের তপস্যায় মহাশ্বেতা।
স্পষ্ট ওদের ভাষা,
ওরা আমাকে ডাক দিয়ে করেছে আলাপ।

আজ যেন হঠাৎ এল কানে
কোন্ ঘোমটার নীচে থেকে চুপিচুপি কথা।
দেখি পথের ধারে তেঁতুলশাখার কোণে
লাজুক একটি মঞ্জরী,
মৃদু বসন্তী রঙ,
মৃদু একটি গন্ধ,
চিকন লিখন তার পাপড়ির গায়ে।

শহরের বাড়িতে আছে
শিশুকাল থেকে চেনাশোনা অনেক কালের তেঁতুল গাছ,
দিক্‌পালের মতো দাঁড়িয়ে
উত্তরপশ্চিম কোণে,
পরিবারের যেন পুরোনো কালের সেবক,
প্রপিতামহের বয়সী।
এই বাড়ির অনেক জন্মমৃত্যুর পর্বের পর পর্বে
সে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে,
যেন বোবা ইতিহাসের সভাপণ্ডিত।
ঐ গাছে ছিল যাদের নিশ্চিত দখল কালে কালে
তাদের কত লোকের নাম
আজ ওর ঝরা পাতার চেয়েও ঝরা,
তাদের কত লোকের স্মৃতি
ওর ছায়ার চেয়েও ছায়া।

একদিন ঘোড়ার আস্তাবল ছিল ওর তলায়
খুরের-খট্‌খটানিতে-অস্থির
খোলার-চালা-দেওয়া ঘরে।
কবে চলে গেছে সহিসের হাঁক ডাকা।
সেই ঘোড়া-বাহনের যুগ
ইতিবৃত্তের ও পারে।
আজ চুপ হয়েছে হ্রেষাধ্বনি,
রঙ বদল করেছে কালের ছবি।
সর্দার কোচম্যানের সযত্নসজ্জিত দাড়ি,
চাবুক হাতে তার সগর্ব উদ্ধত পদক্ষেপ,
সেদিনকার শৌখিন সমারোহের সঙ্গে
গেছে সাজ-পরিবর্তনের মহানেপথ্যে।

দশটা বেলার প্রভাত-রৌদ্রে
ঐ তেঁতুলতলা থেকে এসেছে দিনের পর দিন

অবিচলিত নিয়মে ইস্কুলে যাবার গাড়ি।
বালকের নিরুপায় অনিচ্ছার বোঝাটা
টেনে নিয়ে গেছে রাস্তার ভিড়ের মাঝখান দিয়ে।

আজ আর চেনা যাবে না সেই ছেলেকে—
না দেহে, না মনে, না অবস্থায়।
কিন্তু চিরদিন দাঁড়িয়ে আছে সেই আত্মসমাহিত তেঁতুল গাছ
মানবভাগ্যের ওঠানামার প্রতি
ভ্রূক্ষেপ না ক'রে।

মনে আছে এক দিনের কথা।
রাত্রি থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি;
ভোরের বেলায় আকাশের রঙ
যেন পাগলের চোখের তারা।
দিক্‌হারানো ঝড় বইছে এলোমেলো,
বিশ্বজোড়া অদৃশ্য খাঁচায় মহাকায় পাখি
চার দিকে ঝাপট মারছে পাখা।
রাস্তায় দাঁড়ালো জল,
আঙিনা গেছে ভেসে।
বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি,
ক্রুদ্ধ মুনির মতো ঐ গাছ মাথা তুলেছে আকাশে,
তার শাখায় শাখায় ভর্ৎসনা।
গলির দুই ধারে কোঠাবাড়িগুলো হতবুদ্ধির মতো,
আকাশের অত্যাচারে
প্রতিবাদ করবার ভাষা নেই তাদের।
একমাত্র ঐ গাছটার পত্রপুঞ্জের আন্দোলনে
আছে বিদ্রোহের বাণী,
আছে স্পর্ধিত অভিসম্পাত।
অন্তহীন ইটকাঠের মূক জড়তার মধ্যে
ঐ ছিল একা মহারণ্যের প্রতিনিধি—
সেদিন দেখেছি তার বিক্ষুব্ধ মহিমা বৃষ্টিপাণ্ডুর দিগন্তে।

কিন্তু যখন বসন্তের পর বসন্ত এসেছে,
অশোক বকুল পেয়েছে সম্মান ;
ওকে জেনেছি যেন ঋতুরাজের বাহির-দেউড়ির দ্বারী,
উদাসীন, উদ্ধত।
সেদিন কে জেনেছিল—
ঐ রূঢ় বৃহতের অন্তরে সুন্দরের নম্রতা,
কে জেনেছিল বসন্তের সভায় ওর কৌলীন্য।

ফুলের পরিচয়ে আজ ওকে দেখছি।
যেন গন্ধর্ব চিত্ররথ,
যে ছিল অর্জুনবিজয়ী মহারথী
গানের সাধন করছে সে আপন মনে একা
নন্দনবনের ছায়ার আড়ালে গুন গুন সুরে।
সেদিনকার কিশোর কবির চোখে
ঐ প্রৌঢ় গাছের গোপন যৌবনমদিরতা
যদি ধরা পড়ত উপযুক্ত লগ্নে,
মনে আসছে, তবে
মৌমাছির পাখা-উতল-করা
কোন্‌-এক পরম দিনের তরুণ প্রভাতে
একটি ফুলের গুচ্ছ করতেম চুরি
পরিয়ে দিতেম কেঁপে-ওঠা আঙুল দিয়ে
কোন্‌ একজনের আনন্দে-রাঙা কর্ণমূলে।
যদি সে শুধাত, কী নাম,
হয়তো বলতেম—
ঐ যে রৌদ্রের এক টুকরো পড়েছে তোমার চিবুকে
ওর যদি কোনো নাম তোমার মুখে আসে
একেও দেব সেই নামটি।

শান্তিনিকেতন
৭ জুন ১৯৩৬

অকাল ঘুম

এসেছি অনাহূত।
কিছু কৌতুক করব ছিল মনে—
আচমকা বাধা দেব অসময়ে
কোমরে-আঁচল-জড়ানো গৃহিণীপনায়।
দুয়ারে পা বাড়াতেই চোখে পড়ল—
মেঝের 'পরে এলিয়ে পড়া
ওর অকাল ঘুমের রূপখানি।

দূর পাড়ায় বিয়ে-বাড়িতে বাজছে শানাই সারঙ সুরে।
প্রথম প্রহর পেরিয়ে গেছে
জ্যৈষ্ঠরৌদ্রে ঝাম্‌রে-পড়া সকাল বেলায়।
স্তরে স্তরে দুখানি হাত গালের নীচে,
ঘুমিয়েছে শিথিলদেহে
উৎসবরাতের অবসাদে
অসমাপ্ত ঘরকন্নার এক ধারে।
কর্মস্রোত নিস্তরঙ্গ ওর অঙ্গে অঙ্গে,
অনাবৃষ্টিতে অজয় নদের
প্রান্তশায়ী শ্রান্ত জলশেষের মতো।
ঈষৎ খোলা ঠোঁটদুটিতে মিলিয়ে আছে
মুদে-আসা ফুলের মধুর উদাসীনতা।
দুটি ঘুমন্ত চোখের কালো পক্ষ্মচ্ছায়া
পড়েছে পাণ্ডুর কপোলে।

ক্লান্ত জগৎ চলেছে পা টিপে
ওর খোলা জানলার সামনে দিয়ে
ওর শান্তনিশ্বাসের ছন্দে।
ঘড়ির ইশারা
বধির ঘরে টিক্‌টিক্‌ করছে কোণের টেবিলে,
বাতাসে দুলছে দিনপঞ্জী দেয়ালের গায়ে।

চলতি মুহূর্তগুলি গতি হারালো ওর স্তব্ধ চেতনায়,
মিলল একটি অনিমেষ মুহূর্তে ;
ছড়িয়ে দিল তার অশরীরী ডানা
ওর নিবিড় নিদ্রার 'পরে।

ওর ক্লান্ত দেহের করুণ মাধুরী মাটিতে মেলা,
যেন পূর্ণিমারাতের ঘুম-হারানো অলস চাঁদ
সকালবেলায় শূন্য মাঠের শেষ সীমানায়

পোষা বিড়াল দুধের দাবি স্মরণ করিয়ে
ডাক দিল ওর কানের কাছে।
চমকে জেগে উঠে দেখল আমাকে,
তাড়াতাড়ি বুকে কাপড় টেনে
অভিমানভরে বললে, "ছি, ছি,
কেন জাগালে না এতক্ষণ।"
কেন ! আমি তার জবাব দিই নি ঠিকমত।

যাকে খুব জানি তাকেও সব জানি নে
এই কথা ধরা পড়ে কোনো একটা আকস্মিকে।
হাসি আলাপ যখন আছে থেমে,
মনে যখন থমকে আছে প্রাণের হাওয়া,
তখন সেই অব্যক্তের গভীরে
এ কী দেখা দিল আজ।
সে কি অস্তিত্বের সেই বিষাদ
যার তল মেলে না,
সে কি সেই বোবার প্রশ্ন
যার উত্তর লুকাচুরি করে রক্তে,
সে কি সেই বিরহ
যার ইতিহাস নেই,
সে কি অজানা বাঁশির ডাকে অচেনা পথে স্বপ্নে-চলা।

ঘুমের স্বচ্ছ আকাশতলে
কোন্ নির্বাক্ রহস্যের সামনে ওকে নীরবে শুধিয়েছি,
"কে তুমি।
তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন্ লোকে।'

সেদিন সকালে গলির ও পারে পাঠশালায়
ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ছিল নামতা ;
পাট-বোঝাই মোষের গাড়ি
চাকার ক্লিষ্টশব্দে মুচড়ে দিচ্ছিল বাতাসকে ;
ছাদ পিটোচ্ছিল পাড়ার কোন্ বাড়িতে ;
জানলার নীচে বাগানে
চালতা গাছের তলায়
উচ্ছিষ্ট আমের আঁঠি নিয়ে
টানাটানি করছিল একটা কাক।

আজ এ সমস্তর উপরেই ছড়িয়ে পড়েছে
সেই দূরকালের মায়ারশ্মি।
ইতিহাসে-বিলুপ্ত
তুচ্ছ এক মধ্যাহ্নের আলস্য-আবিষ্ট রৌদ্রে
এরা অপরূপের রসে রইল ঘিরে
অকাল ঘুমের একখানি ছবি।

শান্তিনিকেতন
১০ জুন ১৯৩৬

কনি

আমরা ছিলেম প্রতিবেশী।
যখন-তখন দুই বাসার সীমা ডিঙিয়ে
যা-খুশি করে বেড়াত কনি,
খালি পা, খাটো-ফ্রক-পরা মেয়ে ;

দুষ্টু চোখদুটো
যেন কালো আগুনের ফিনকি-ছড়ানো।
ছিপ্‌ছিপে শরীর।
ঝাঁকড়া চুল চায় না শাসন মানতে,
বেণী বাঁধতে মাকে পেতে হত দুঃখ।
সঙ্গে সঙ্গে সারাক্ষণ লাফিয়ে বেড়াত
কোঁকড়া-লোম-ওআলা বেঁটে জাতের কুকুরটা।
ছন্দের মিলে বাঁধা
দুজনে যেন একটি দ্বিপদী।

আমি ছিলেম ভালো ছেলে
ক্লাসের দৃষ্টান্তস্থল।
আমার সেই শ্রেষ্ঠতার
কোনো দাম ছিল না ওর কাছে।
যে বছর প্রোমোশন পাই দু ক্লাস ডিঙিয়ে
লাফিয়ে গিয়ে ওকে জানাই,
ও বলে, "ভারি তো!
কী বলিস টেমি।"
ওর কুকুরটা ডেকে ওঠে,
"ঘেউ।"

ও ভালোবাসত হঠাৎ ভাঙতে আমার দেমাক,
রুখিয়ে তুলতে ঠাণ্ডা ছেলেটাকে ;
যেমন ভালোবাসত
দম্ করে ফাটিয়ে দিতে মাছের পটকা।
ওকে জব্দ করার চেষ্টা
ঝরনার গায়ে নুড়ি ছুঁড়ে মারা।
কলকল হাসির ধারায়
বাধা দিত না কিছুতেই।

মুখস্থ করতে বসেছি সংস্কৃত শব্দরূপ
চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ;
ও হঠাৎ কখন দুম করে
পিঠে মেরে গেল কিল
অত্যন্ত প্রাকৃত রীতিতে।
সংস্কৃতের অপভ্রংশ
মুখ থেকে ভ্রষ্ট হবার পূর্বেই
বেণীটুকুর দোলন দেখিয়ে দিল দৌড়।
মেয়ের হাতের সহাস্য অপমান
সহজে সম্ভোগ করবার বয়স
তখনো আমার ছিল অল্প দূরে।
তাই শাসনকর্তা ছুটত ওর অনুসরণে,
প্রায় পৌঁছতে পারে নি লক্ষ্যে।
ওর বিলীয়মান শব্দভেদী হাসি
শুনেছি দূর থেকে,
হাতের কাছে পাই নি
কোনো দায়িত্ববিশিষ্ট জীব—
কোনো বেদনাবিশিষ্ট সত্তা।

এমনিতরো ছিল আমাদের আদ্যযুগ,
ছোটোমেয়ের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত।
দুরন্তকে শাসনের ইচ্ছা করেছি
পুরুষোচিত অসহিষ্ণুতায় ;
শুনেছি ব্যর্থচেষ্টার জবাবে
তীব্রমধুর কণ্ঠে,
"দুয়ো দুয়ো দুয়ো।"
বাইরে থেকে হারের পরিমাণ
বেড়ে চলেছে যখন
তখন হয়তো জিত হয়েছে শুরু
ভিতর থেকে।

সেই বেতার-বার্তার কান খোলে নি তখনো,
যদিও প্রমাণ হচ্ছিল জড়ো।

ইতিমধ্যে আমাদের জীবননাট্যে
সাজ হয়েছে বদল।
ও পরেছে শাড়ি,
আঁচলে বিঁধিয়েছে ব্রোচ,
বেণী জড়িয়েছে হাল ফেশানের খোঁপায়।
আমি ধরেছি খাকি রঙের খাটো প্যাণ্ট্
আর খেলোয়াড়ের জামা
ফুটবল-বলরামের নকলে।
ভিতরের দিকে ভাবের হাওয়ারও
বদল হল শুরু,
কিছু তার পাওয়া যায় পরিচয়।

একদিন কনির বাবা পড়ছেন বসে
ইংরেজি সাপ্তাহিক।
বড়ো লোভ আমার ঐ ছবির কাগজটার 'পরে।
আমি লুকিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছি
উড়ো জাহাজের নক্শা।
জানতে পেরে তিনি উঠলেন হেসে।
তিনি ভাবতেন, ছেলেটার বিদ্যার দম্ভ বেশি।
সেটা তাঁরও ছিল ব'লেই
আর কারও পারতেন না সইতে।
কাগজখানা তুলে ধরে বললেন,
"বুঝিয়ে দাও তো বাপু, এই ক'টা লাইন,
দেখি তোমার ইংরেজি বিদ্যে।"
নিষ্ঠুর অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে
মুখ লাল করে উঠতে হল ঘেমে।
ঘরের এক কোণে বসে

একলা করছিল কড়িখেলা

আমার অপমানের সাক্ষী কনি।

দ্বিধা হল না পৃথিবী,

অবিচলিত রইল চার দিকের নির্মম জগৎ।

পরদিন সকালে উঠে দেখি,

সেই কাগজখানা আমার টেবিলে—

শিবরামবাবুর ছবির কাগজ।

এত বড়ো দুঃসাহসের গভীর রসের উৎস কোথায়,

তার মূল্য কত,

সেদিন বুঝতে পারে নি বোকা ছেলে।

ভেবেছিলেম, আমার কাছে কনির

এ শুধু স্পর্ধার বড়াই।

দিনে দিনে বয়স বাড়ছে

আমাদের দুজনের অগোচরে,

তার জন্যে দায়িক নই আমরা।

বয়স-বাড়ার মধ্যে অপরাধ আছে

এ কথা লক্ষ্য করি নি নিজে,

করেছেন শিবরামবাবু।

আমাকে স্নেহ করতেন কনির মা,

তার জবাবে ঝাঁঝিয়ে উঠত তাঁর স্বামীর প্রতিবাদ।

একদিন আমার চেহারা নিয়ে খোঁটা দিয়ে

শিবরামবাবু বলছিলেন তাঁর স্ত্রীকে,

আমার কানে গেল—

"টুক্‌টুকে আমের মতো ছেলে

পচতে করে না দেরি,

ভিতরে পোকার বাসা।"

আমার 'পরে ওঁর ভাব দেখে

বাবা প্রায় বলতেন রেগে,
"লক্ষ্মীছাড়া, কেন যাস ওদের বাড়ি।"
ধিক্কার হত মনে,
বলতেম দাঁত কামড়ে,
"যাব না আর কক্‌খনো।"
যেতে হত দুদিন বাদেই
কুলতলার গলি দিয়ে লুকিয়ে।
মুখ বাঁকিয়ে বসে রইত কনি
দুদিন না-আসার অপরাধে।
হঠাৎ বলে উঠত,
"আড়ি, আড়ি, আড়ি।"
আমি বলতুম, "ভারি তো।"
ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাতুম আকাশের দিকে।

একদিন আমাদের দুই বাড়িতেই এল
বাসা ভাঙবার পালা।
এঞ্জিনিয়র শিবরামবাবু যাবেন পশ্চিমে
কোন্‌ শহরে আলো-জ্বালার কারবারে।
আমরা চলেছি কলকাতায় ;
গ্রামের ইস্কুলটা নয় বাবার মনের মতো।

চলে যাবার দুদিন আগে
কনি এসে বললে, "এস আমাদের বাগানে।"
আমি বললাম "কেন।"
কনি বললে, "চুরি করব দুজনে মিলে ;
আর তো পাব না এমন দিন।"
বললেম, "কিন্তু তোমার বাবা—"
কনি বললে, "ভীতু।"
আমি বললেম মাথা বাঁকিয়ে,
"একটুও না।"

শিবরামবাবুর শখের বাগান ফলে আছে ভরে।
কনি শুধোল, "কোন্ ফল ভালোবাস সব চেয়ে।
আমি বললেম, "ঐ মজঃফরপুরের লিচু।"
কনি বললে, "গাছে চড়ে পাড়তে থাকো,
ধরে রইলেম ঝুড়ি।"
ঝুড়ি প্রায় ভরেছে,
হঠাৎ গর্জন উঠল "কে রে"—
স্বয়ং শিবরামবাবু।
বললেন, "আর কোনো বিদ্যা হবে না বাপু,
চুরি বিদ্যাই শেষ ভরসা।"
ঝুড়িটা নিয়ে গেলেন তিনি
পাছে ফলবান হয় পাপের চেষ্টা।
কনির দুই চোখ দিয়ে
মোটা মোটা ফোঁটায়
জল পড়তে লাগল নিঃশব্দে ;
গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে
অমন অচঞ্চল কান্না
দেখি নি ওর কোনোদিন।

তার পরে মাঝখানে অনেকখানি ফাঁক।
বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি
কনির হয়েছে বিয়ে।
মাথায় উঠেছে লালপেড়ে আঁচল,
কপালে কুঙ্কুম,
শান্তগভীর চোখের দৃষ্টি,
স্বর হয়েছে গম্ভীর।
আমি কলকাতায় রসায়নের কারখানায়
ওষুধ বানিয়ে থাকি।
আমার দিনের পর দিন চলেছে
কর্মচক্রের স্নেহহীন কর্কশধ্বনিতে।

একদিন কনির কাছ থেকে চিঠিতে এল
দেখা করতে অনুনয়।
গ্রামের বাড়িতে ভাগনির বিয়ে,
স্বামী পায় নি ছুটি,
ও একা এসেছে মায়ের কাছে।
বাবা গেছেন হুশিয়ারপুরে
বিবাহে মতবিরোধের আক্রোশে।

অনেক দিন পরে এসেছি গ্রামে,
এসেছি প্রতিবেশিনীর সেই বাড়িতে।
ঘাটের পাশে ঢালু পাড়িতে
ঝুঁকে রয়েছে সেই হিজল গাছ জলের দিকে,
পুকুর থেকে আসছে
সেই পুরোনো কালের মিষ্টি গন্ধ শ্যাওলার ;
আর সিসুগাছের ডালে দুলছে
সেই দোলনাটা আজও।
কনি প্রণাম করে বললে, "অমলদাদা,
থাকি দূর দেশে,
ভাইফোঁটার দিনে পাব তোমায় নেই সে আশা।
আজ অদিনে মেটাব আমার সাধ, তাই ডেকেছি।"
বাগানে আসন পড়েছে অশথতলার চাতালে !
অনুষ্ঠান হল সারা ;
পায়ের কাছে কনি রাখলে একটি ঝুড়ি,
সে ঝুড়ি লিচুতে ভরা
বললে, "সেই লিচু।"
আমি বললেম, "ঠিক সে লিচু নয় বুঝি।"
কনি বললে, "কী জানি।"
বলেই দ্রুত গেল চলে।

শান্তিনিকেতন
১২ জুন ১৯৩৬

বাঁশিওআলা

"ওগো বাঁশিওআলা,
বাজাও তোমার বাঁশি,
শুনি আমার নূতন নাম"
—এই বলে তোমাকে প্রথম চিঠি লিখেছি,
মনে আছে তো?

আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।
সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেন নি
আমাকে মানুষ করে গড়তে—
রেখেছেন আধাআধি করে।
অন্তরে বাহিরে মিল হয় নি
সেকালে আর আজকের কালে,
মিল হয় নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে,
মিল হয় নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়।
আমাকে তুলে দেন নি এ যুগের পারানি নৌকোয়,
চলা আটক করে ফেলে রেখেছেন
কালস্রোতের ও পারে বালুডাঙায়।
সেখান থেকে দেখি
প্রখর আলোয় ঝাপসা দূরের জগৎ—
বিনা কারণে কাঙাল মন অধীর হয়ে ওঠে,
দুই হাত বাড়িয়ে দিই,
নাগাল পাই নে কিছুই কোনো দিকে।

বেলা তো কাটে না,
বসে থাকি জোয়ার-জলের দিকে চেয়ে—
ভেসে যায় মুক্তি-পারের খেয়া,
ভেসে যায় ধনপতির ডিঙা,
ভেসে যায় চল্‌তি বেলার আলোছায়া।

এমন সময় বাজে তোমার বাঁশি
ভরা জীবনের সুরে।
মরা দিনের নাড়ীর মধ্যে
দব্‌দবিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ

কী বাজাও তুমি,
জানি নে সে সুর জাগায় কার মনে কী ব্যথা।
বুঝি বাজাও পঞ্চমরাগে
দক্ষিণ হাওয়ার নবযৌবনের ভাটিয়ারি।
শুনতে শুনতে নিজেকে মনে হয়—
যে ছিল পাহাড়তলির ঝির্‌ঝিরে নদী,
তার বুকে হঠাৎ উঠেছে ঘনিয়ে
শ্রাবণের বাদলরাত্রি।
সকালে উঠে দেখা যায় পাড়ি গেছে ভেসে,
একগুঁয়ে পাথরগুলোকে ঠেলা দিচ্ছে
অসহ্য স্রোতের ঘূর্ণি-মাতন।

আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর—
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক,
পাঁজরের উপরে আছাড়-খাওয়া
মরণ-সাগরের ডাক,
ঘরের শিকল-নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক।
যেন হাঁক দিয়ে আসে
অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে
পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি,
ছিনিয়ে নেবে, ভাসিয়ে দেবে বুঝি।
অঙ্গে অঙ্গে পাক দিয়ে ওঠে
কালবৈশাখীর ঘূর্ণি-মার-খাওয়া
অরণ্যের বকুনি।

ডানা দেয় নি বিধাতা,
তোমার গান দিয়েছে আমার স্বপ্নে
ঝোড়ো আকাশে উড়ো প্রাণের পাগলামি।
ঘরে কাজ করি শান্ত হয়ে ;
সবাই বলে 'ভালো'।
তারা দেখে আমার ইচ্ছার নেই জোর,
সাড়া নেই লোভের,
ঝাপট লাগে মাথার উপর,
ধুলোয় লুটোই মাথা।
দুরন্ত ঠেলায় নিষেধের পাহারা কাত করে ফেলি
নেই এমন বুকের পাটা ;
কঠিন করে জানি নে ভালোবাসতে,
কাঁদতে শুধু জানি,
জানি এলিয়ে পড়তে পায়ে।

বাঁশিওআলা,
বেজে ওঠে তোমার বাঁশি—
ডাক পড়ে অমর্তলোকে ;
সেখানে আপন গরিমায়
উপরে উঠেছে আমার মাথা।
সেখানে কুয়াশার পর্দা-ছেঁড়া
তরুণ-সূর্য আমার জীবন।
সেখানে আগুনের ডানা মেলে দেয়
আমার বারণ-না-মানা আগ্রহ,
উড়ে চলে অজানা শূন্যপথে
প্রথম-ক্ষুধায়-অস্থির গরুড়ের মতো।
জেগে ওঠে বিদ্রোহিণী ;
তীক্ষ্ণ চোখের আড়ে জানায় ঘৃণা
চার দিকের ভীরুর ভিড়কে,
কৃশ কুটিলের কাপুরুষতাকে।

বাঁশিওআলা,
হয়তো আমাকে দেখতে চেয়েছ তুমি।
জানি নে ঠিক জায়গাটি কোথায়,
ঠিক সময় কখন,
চিনবে কেমন করে।
দোসর-হারা আষাঢ়ের ঝিল্লিঝনক রাত্রে
সেই নারী তো ছায়ারূপে
গেছে তোমার অভিসারে চোখ-এড়ানো পথে।
সেই অজানাকে কত বসন্তে
পরিয়েছ ছন্দের মালা,
শুকোবে না তার ফুল।

তোমার ডাক শুনে একদিন
ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে
বেরিয়ে এল ঘোমটা-খসা নারী।
যেন সে হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির,
চমক লাগালো তোমাকেই।
সে নামবে না গানের আসন থেকে ;
সে লিখবে তোমাকে চিঠি
রাগিণীর আবছায়ায় বসে।
তুমি জানবে না তার ঠিকানা।

ওগো বাঁশিওআলা,
সে থাক্ তোমার বাঁশির সুরের দূরত্বে।

শান্তিনিকেতন
১৬ জুন ১৯৩৬

মিলভাঙা

এসেছিলে কাঁচা জীবনের
পেলব রূপটি নিয়ে—
এনেছিলে আমার হৃদয়ের প্রথম বিস্ময়,
রক্তে প্রথম কোটালের বান।
আধোচেনার ভালোবাসার মাধুরী
ছিল যেন ভোরবেলাকার
কালো ঘোমটার সূক্ষ্ম সোনার কাজ—
গোপন শুভদৃষ্টির আবরণ।
মনের মধ্যে তখনো
অসংশয় হয় নি পাখির কাকলী ;
বনের মর্মর একবার জাগে
একবার যায় মিলিয়ে।

বহুলোকের সংসারের মাঝখানে
চুপিচুপি তৈরি হতে লাগল
আমাদের দুজনের নিভৃত জগৎ।
পাখি যেমন প্রতিদিন
খড়কুটো কুড়িয়ে এনে বাসা বাঁধে
তেমনি সেই জগতের উপকরণ সামান্য,
চল্‌তি মুহূর্তের খসে-পড়া
উড়ে-আসা সঞ্চয় দিয়ে গাঁথা।
তার মূল্য ছিল তার রচনায়,
নয় তার বস্তুতে।

শেষে একদিন দুজনের নৌকো-বাওয়া থেকে
কখন একলা গেছ নেমে ;
আমি ভেসে চলেছি স্রোতে,
তুমি বসে রইলে ও পারের ডাঙায়।

মিলল না আর আমার হাতে তোমার হাতে
কাজে কিম্বা খেলায়।
জোড় ভেঙে ভাঙল আমাদের জীবনের গাঁথনি।
যে দ্বীপের শ্যামল ছবিখানি সদ্য আঁকা পড়েছে
সমুদ্রের লীলাচঞ্চল তরঙ্গপটে
তাকে যেমন দেয় মুছে
এক জোয়ারের তুমুল তুফানে,
তেমনি মিলিয়ে গেল আমাদের কাঁচা জগৎ
সুখদুঃখের নতুন-অঙ্কুর-মেলা
শ্যামল রূপ নিয়ে।

তার পরে অনেক দিন গেছে কেটে।
আষাঢ়ের আসন্নবর্ষণ সন্ধ্যায়
যখন তোমাকে দেখি মনে মনে,
দেখতে পাই তুমি আছ
সেইদিনকার কচি যৌবনের মায়া দিয়ে ঘেরা।
তোমার বয়স গেছে থেমে।
তোমার সেই বসন্তের আমের বোলে
আজও তেমনি গন্ধেরই ঘোষণা;
তোমার সেদিনকার মধ্যাহ্ন
আজ মধ্যাহ্নেও ঘুঘুর ডাকে তেমনি বিরহাতুর।
আমার কাছে তোমার স্মরণ রয়ে গেছে
প্রকৃতির বয়সহারা এই-সব পরিচয়ের দলে।
সুন্দর তুমি বাঁধা রেখায়,
প্রতিষ্ঠিত তুমি অচল ভূমিতে।
আমার জীবনধারা
কোথাও রইল না থেমে।
দুর্গমের মধ্যে, গভীরের মধ্যে,
মন্দভালোর দ্বন্দ্ববিরোধে,
চিন্তায় সাধনায় আকাঙ্ক্ষায়,

কখনো সফলতায়, কখনো প্রমাদে,
চলে এসেছি তোমার জানা সীমার
বহুদূর বাইরে ;
সেখানে আমি তোমার কাছে বিদেশী।
সেই তুমি আজ এই মেঘ-ডাকা সন্ধ্যায়
যদি এসে বস আমার সামনে,
দেখতে পাবে আমার চোখে
দিক-হারানো চাহনি
অজানা আকাশের সমুদ্রপারে
নীল অরণ্যের পথে।

তুমি কি পাশে বসে শোনাবে
সেদিনকার কানে-কানে কথার উদ্‌বৃত্ত।
কিন্তু ঢেউ করছে গর্জন,
শকুন করছে চীৎকার,
মেঘ ডাকছে আকাশে,
মাথা নাড়ছে নিবিড় শালের বন।
তোমার বাণী হবে খেলার ভেলা
খেপাজলের ঘূর্ণিপাকে।

সেদিন আমার সব মন
মিলেছিল তোমার সব মনে,
তাই প্রকাশ পেয়েছে নূতন গান
প্রথম সৃষ্টির আনন্দে।
মনে হয়েছে,
বহু যুগের আশ মিটল তোমাতে আমাতে।
সেদিন প্রতিদিনই বয়ে এনেছে
নূতন আলোর আগমনী
আদিকালে সদ্য-চোখ-মেলা তারার মতো।

আজ আমার যন্ত্রে
তার চড়েছে বহুশত,
কোনোটা নয় তোমার জানা।
যে সুর সেধে রেখেছ সেদিন
সে সুর লজ্জা পাবে এর তারে।
সেদিন যা ছিল ভাবের লেখা
আজ হবে তা দাগা-বুলোনো।

তবু জল আসে চোখে।
এই সেতারে নেমেছিল তোমার আঙুলের
প্রথম দরদ;
এর মধ্যে আছে তার জাদু।
এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে
কিশোর-বয়সের শ্যামল পারের থেকে;
এর মধ্যে আছে তার বেগ।
আজ মাঝনদীতে সারিগান গাইব যখন
তোমার নাম পড়বে বাঁধা
তার হঠাৎ তানে।

শান্তিনিকেতন
২০ জুন ১৯৩৬

হঠাৎ-দেখা

রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা,
ভাবি নি সম্ভব হবে কোনোদিন

আগে ওকে বারবার দেখেছি
লালরঙের শাড়িতে
দালিম ফুলের মতো রাঙা;

আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়,
আঁচল তুলেছে মাথায়
দোলনচাঁপার মতো চিকনগৌর মুখখানি ঘিরে।
মনে হল, কালো রঙে একটা গভীর দূরত্ব
ঘনিয়ে নিয়েছে নিজের চার দিকে,
যে দূরত্ব সর্ষেখেতের শেষ সীমানায়
শালবনের নীলাঞ্জনে।
থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা ;
চেনা লোককে দেখলেম অচেনার গাম্ভীর্যে।

হঠাৎ খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে
আমাকে করলে নমস্কার।
সমাজবিধির পথ গেল খুলে,
আলাপ করলেম শুরু—
কেমন আছ, কেমন চলছে সংসার
ইত্যাদি।
সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে
যেন কাছের দিনের ছোঁয়াচ-পার-হওয়া চাহনিতে।
দিলে অত্যন্ত ছোটো দুটো-একটা জবাব,
কোনোটা বা দিলেই না।
বুঝিয়ে দিলে হাতের অস্থিরতায়—
কেন এ-সব কথা,
এর চেয়ে অনেক ভালো চুপ করে থাকা।

আমি ছিলেম অন্য বেঞ্চিতে
ওর সাথিদের সঙ্গে।
এক সময়ে আঙুল নেড়ে জানালে কাছে আসতে।
মনে হল কম সাহস নয় ;
বসলুম ওর এক-বেঞ্চিতে।

গাড়ির আওয়াজের আড়ালে
বললে মৃদুস্বরে,
"কিছু মনে কোরো না,
সময় কোথা সময় নষ্ট করবার।
আমাকে নামতে হবে পরের স্টেশনেই ;
দূরে যাবে তুমি,
দেখা হবে না আর কোনোদিনই।
তাই যে প্রশ্নটার জবাব এতকাল থেমে আছে,
শুনব তোমার মুখে।
সত্য করে বলবে তো ?"

আমি বললেম, "বলব।"
বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েই শুধোল,
"আমাদের গেছে যে দিন
একেবারেই কি গেছে,
কিছুই কি নেই বাকি।"

একটুকু রইলেম চুপ করে ;
তার পর বললেম,
"রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।"

খটকা লাগল, কী জানি বানিয়ে বললেম না কি।
ও বললে, "থাক্, এখন যাও ও দিকে।"
সবাই নেমে গেল পরের স্টেশনে ;
আমি চললেম একা।

শান্তিনিকেতন
২৪ জুন ১৯৩৬

কালরাত্রে

কাল রাত্রে
বাদলের দানোয়-পাওয়া অন্ধকারে
বর্ষণের রিমঝিম প্রলাপে
চাপা দিয়েছিল
সন্ন্যাসী নিশীথের ধ্যানমন্ত্র।
জড়ত্বে ছিলেম পরাভূত,
ছিলেম উপবাসী ;
ছিল শিথিলশক্তি ধূলিশয়ান।
বুকে ভর দিয়ে বসেছিল
সমস্ত আকাশের সঙ্গহীনতা।
"চাই চাই" করে কেঁদে উঠেছিল প্রাণ
প্রহরে প্রহরে নিশাচর পাখির মতো।
নানা নাম ধরেছিল ভিক্ষা,
অন্তরের অন্ধস্তরে শিকড় চালিয়েছিল
আঁকাবাঁকা অশুচি কান্নার।
"চাই চাই" বলে
শূন্য হাৎড়ে বেড়িয়েছিল রাত-কানা
যাকে চায় তাকে না জেনে।
শেষে ক্রুদ্ধ গর্জনে হেঁকে উঠল,
"নেই সে নেই কোথাও নেই।"

সত্যহারা শূন্যতার গর্ত থেকে
কালো কামনার সাপের বংশ
বেরিয়ে এসে জড়িয়েছে কাঙালকে—
নাস্তিত্বের-সেই-শিকল-বাঁধা ভৃত্যকে—
নিরর্থের বোঝায়
বেঁকেছে যার পিঠ,
নেমেছে যার মাথা।

ভোর হল রাত্রি।
আষাঢ়ের সকালে অকস্মাৎ হাওয়ায়
ঘন মেঘের দুর্গপ্রাচীর
পড়ল ভেঙেচুরে।
ছুটে বেরিয়ে এসেছে
প্রভাতের বাঁধন-ছেঁড়া আলো।
মুক্তির আনন্দঘোষণা
বেজে উঠল আকাশে আকাশে
আগুনের ভাষায়।
পাখিদের ছোটো কোমল তনুতে
দুরন্ত হয়ে উঠল প্রাণের উৎসুক ছন্দ।
চলল তাদের সুরের তীর-খেলা
কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে, শাখা থেকে শাখায়।
সেতারের দ্রুত তালের বাজন যেন
পাতায় পাতায় আলোর চমক।
মন দাঁড়িয়ে উঠল ;
বললে, আমি পূর্ণ।
তার অভিষেক হল
আপনারই উদ্‌বেল তরঙ্গে।
তার আপন সঙ্গ
আপনাকে করলে বেষ্টন
শিলাতটকে ঝর্নার মতো ;
উপচে উঠে মিলতে চলল
চার দিকের সব-কিছুর মধ্যে।

চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।
প্রভাতসূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ ;
ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া,

পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা,
গান গাইলেম "চাই নে কিছু চাই নে"—
যেমন গাইছে রক্তপদ্মের রক্তিমা,
যেমন গাইছে সমুদ্রের ঢেউ,
সন্ধ্যাতারার শান্তি,
গিরিশিখরের নির্জনতা।

শান্তিনিকেতন
২৩ জুন ১৯৩৬

অমৃত

বিদায় নিয়ে চলে আসবার বেলা বললেম তাকে,
"ভারতের একজন নারী বলেছিলেন একদিন—
উপকরণ চান না তিনি,
তিনি চান অমৃত
এই তো নারীর পণ,
তুমি কী বল।"
অমিয়া হাসল একটু বিরস হাসি ;
বললে, "এ কি উপদেশ।"
আমি বললেম তার হাত চেপে ধরে,
"ভালোবাসাই সেই অমৃত,
উপকরণ তার কাছে তুচ্ছ,
বুঝবে একদিন।"

বিরক্ত হল অমিয়া ;
বললে, "তুমি কেন নিয়ে গেলে না আমাকে মিথ্যে থেকে।
জোর নেই কেন তোমার।"
আমি বললেম, "বাধে আত্মগৌরবে।

যতদিন না ধনে হব সমান
আসব না তোমার কাছে।
অমিয়া মাথা-ঝাঁকানি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো,
চলল ঘরের বাইরে।
আমি বললেম, "শুনে রাখো,
তোমার ভালোবাসার বদলে
দেব না তোমাকে অকিঞ্চনের অসম্মান।
এই আমার পুরুষের পণ।"

দিন যায়, রাত যায়,
মাথায় চড়ে ওঠে সোনার মদের নেশা।
সঞ্চয়ের ধাক্কা যতই বাড়ে
ততই আমাকে চলে ঠেলে।
থামতে পারি নে, থামাতে পারি নে তার তাড়না।
বিত্ত বাড়ে, খ্যাতি বাড়ে,
বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলে আত্মশ্লাঘা।
শেষে ডাক্তার বললে, বিশ্রাম চাই নিতান্তই,
দেহের কল অচল হয়ে এল বলে।

গেলেম দূরদেশে নির্জনে।
সেখানে সমুদ্রের একটা খাড়ি এসে মিলেছে
পাহাড়তলির অরণ্যে।
ভিড় জমেছে গাছে গাছে
মাছ-ধরা পাখিদের পাড়ায়।
ক্ষীণ নদীটি ঝরে পড়ছে পাহাড় থেকে
পাথরের ধাপে ধাপে।
নুড়ি ডিঙিয়ে বেঁকে চলা
তার ফটিক জলের কল্‌কলানি
ধরিয়ে রেখেছে একটি মূল সুর নির্জনতার।
নিত্য-স্নান-করা সেখানকার হাওয়া
চলেছে মন্ত্র গুন্‌গুনিয়ে বনের থেকে বনে।

দল বেঁধেছে নারকেল গাছ—
কেউ খাড়া, কেউ হেলে-পড়া,
দিনরাত ওদের ঝালর-ঝোলা অস্থিরপনা।
ফিরে ফিরে আছাড় খেয়ে ফেনিয়ে উঠছে জেদালো ঢেউ
মোটা মোটা কালো পাথরে ;
ডাঙায় ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে
ঝিনুক শামুক শ্যাওলা।
ক্লান্ত শরীর ব্যস্ত মনকে ফিরিয়েছে
শান্ত রক্তধারার স্নিগ্ধতায়।
কর্মের নেশার ঝাঁজ এল মরে।
এতকালের খাটুনি মনে হল যেন ফাঁকি,
প্রাণ উঠল দু হাত বাড়িয়ে
জীবনের সাঁচ্চা সোনার জন্যে।

সেদিন ঢেউ ছিল না জলে।
আশ্বিনের রোদ্দুর কাঁপছে
সমুদ্রের শিহর-লাগা নীলিমায়।
বাসার ধারে পুরোনো ঝাউগাছে
ধেয়ে আসছে খাপছাড়া হাওয়া,
ঝর্‌ঝর্‌ করে উঠছে তার পাতা।
বেগনি রঙের পাখি, বুকের কাছে সাদা,
টেলিগ্রাফের তারে বসে লেজ দুলিয়ে
ডাকছে মিষ্টি মৃদু চাপা স্বরে।
শরৎ-আকাশের নির্মল নীলে ছড়িয়ে আছে
কোন্‌ অনাদি নির্বাসনের গভীর বিষাদ।
মনের মধ্যে হুহু করে উঠছে—
"ফিরে যেতে হবে।"
থেকে থেকে মনে পড়ছে,
সেদিনকার সেই জল-মুছে-ফেলা চোখে
জ্বলে উঠেছিল যে আলো।

সেইদিনই চড়লুম জাহাজে।
বন্দরে নেমেই এসেছি চলে।
রাস্তার বাঁকে এসে চাইলেম বাড়ির দিকে ;
মনে হল, সেখানে বাস নেই কারও।
এলেম সদর দরজার সামনে,
দেখি তালা বন্ধ।
ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে ;
বাড়ির ভিতর থেকে শূন্যতার দীর্ঘনিশ্বাস এসে
লাগল আমার অন্তরে।

অনেক সন্ধানের পর
দেখা হল শেষে।
কোন্ বারো-ভুঁইঞাদের আমলের
একখানা তিন-কাল-পেরোনো গ্রাম—
একটি পুরোনো দিঘির ধারে—
দিঘির নামেই লোচনদিঘি তার নাম।
সেখানে ভুলে-যাওয়া তারিখের
ঝাপসা-অক্ষর-পট-ওআলা
ভাঙা দেবালয়।
পূর্বখ্যাতির কোনো সাক্ষী রাখে নি,
আছে সে অশ্বত্থের পাঁজর-ভাঙা
আলিঙ্গনে জড়িয়ে-পড়া।
পাড়ির উপরে বুড়ো বটের তলায়
একটি নূতন আটচালা ঘর,
সেইখানে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়।

দেখলুম অমিয়াকে
ছাই রঙের মোটা শাড়ি পরা,
দুই হাতে দুইগাছি শাঁখা,
পায়ে নেই জুতো,

ঢিলে খোঁপা অযত্নে পড়েছে ঝুলে।
পাড়াগাঁয়ের শ্যামল রঙ লেগেছে মুখে।
ছোটো ঝারি হাতে পাঠশালার বাগানে
জল দিচ্ছে সবজি-খেতে।
ভেবে পেলেম না কী বলি।
তারও মুখে এল না
প্রথম-দেখার কোনো সম্ভাষণ,
কোনো প্রশ্ন।

চোখের আড়ে
আমার দামি জুতোজোড়াটার দিকে তাকিয়ে
বললে অনায়াসে,
"বেশি বর্ষায় আগাছায় চাপা পড়েছে
বিলিতি বেগুনের চারা ;
এসো-না, নিড়িয়ে দেবে।"

বোঝা গেল না, ঠাট্টা কি সত্যি।
জামার আস্তিনে ছিল মুক্তোর বোতাম,
লুকিয়ে আস্তিনটা দিলেম উলটিয়ে।
অমিয়ার জন্যে একটা ব্রোচ ছিল পকেটে,
বুঝলেম দিতে গেলে
হীরেটাতে লাগবে প্রহসনের হাসি।
একটু কেসে শুধালেম,
"এখানে থাক কোথায়।"
ঝারি রেখে দিয়ে বললে, "দেখবে ?"
নিয়ে গেল স্কুলের মধ্যে
দালানের পুব দিকটাতে
শতরঞ্চের পর্দা দিয়ে ভাগ করা ঘরে।
একটা তক্তপোশের উপর
বিছানা রয়েছে গোটানো।

টুলের উপর সেলাইয়ের কল,
ছিটের খাপে ঢাকা সেতার
দেয়ালে-ঠেসান-দেওয়া।
দক্ষিণের দরজার সামনে মাদুর পাতা,
তার উপরে ছড়িয়ে আছে
ছাঁটা কাপড়, নানা রঙের ফিতে,
রেশমের মোড়ক।
উত্তর কোণের দেয়ালে
ছোটো টিপায়ে হাত-আয়না,
চিরুনি, তেলের শিশি,
বেতের ঝুড়িতে টুকিটাকি।
দক্ষিণ কোণের দেয়ালের গায়ে
ছোটো টেবিলে লেখবার সামগ্রী
আর রঙ-করা মাটির ভাঁড়ে
একটি স্থলপদ্ম।
অমিয়া বললে, "এই আমার বাসা—
একটু বোসো, আসছি আমি।"

বাইরে জটা-ঝোলা বটের ডালে
ডাকছে কোকিল।
মান-কচুর ঝোপের পাশে
বিষম খেপে উঠেছে একদল ঝগড়াটে শালিখ।
দেখা যায়, ঝিল্‌মিল্‌ করছে
ঢালু পাড়ির তলায়
দিঘির উত্তর ধারের এক টুকরো জল
কলমি-শাকের-পাড়-দেওয়া।
চোখে পড়ল, লেখবার টেবিলে একটি ছবি—
অল্প বয়সের যুবা, চিনি নে তাকে—
কয়লায় আঁকা, কাঁচকড়ার ফ্রেমে বাঁধানো—
ফলাও তার কপাল, চুল আলুথালু,

চোখে যেন দূর ভবিষ্যের আলো,
ঠোঁটে যেন কঠিন পণ তালা-আঁটা।
এমন সময় অমিয়া নিয়ে এল
থালায় করে জলখাবার—
চিঁড়ে, কলা, নারকেল-নাড়ু,
কালো পাথর-বাটিতে দুধ,
এক-গেলাস ডাবের জল।
মেঝের উপর থালা রেখে
পশমে-বোনা একটা আসন দিল পেতে।
খিদে নেই বললে মিথ্যে হত না,
রুচি নেই বললে সত্য হত,
কিন্তু খেতেই হল।

তার পরে শোনা গেল খবর।

আমার ব্যবসায়ে আমদানি যখন জমে উঠেছে ব্যাঙ্কে,
যখন হুঁশ ছিল না আর-কোনো জমাখরচে,
তখন অমিয়ার বাবা কুঞ্জকিশোরবাবু
মাঝে মাঝে লক্ষপতির ঘরের
দুর্লভ দুই-একটি ছেলেকে
এনেছিলেন চায়ের টেবিলে।
সব সুযোগই ব্যর্থ করেছে বারে বারে
তাঁর একগুঁয়ে মেয়ে।
কপাল চাপড়ে হাল ছেড়েছেন যখন তিনি
এমন সময় পারিবারিক দিগন্তে
হঠাৎ দেখা দিল কক্ষছাড়া পাগলা জ্যোতিষ্ক—
মাধপাড়ার রায়বাহাদুরের একমাত্র ছেলে মহীভূষণ।
রায়বাহাদুর জমা টাকা আর জমাট বুদ্ধিতে
দেশবিখ্যাত।

তাঁর ছেলেকে কোনো পিতা পারে না হেলা করতে
যতই সে হোক লাগাম-ছেঁড়া।
আট বছর য়ুরোপে কাটিয়ে মহীভূষণ ফিরেছেন দেশে।
বাবা বললেন, "বিষয়কর্ম দেখো।"
ছেলে বললে, "কী হবে।"
লোকে বললে, ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে
রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা।
অমিয়ার বাবা বললেন, "ভয় নেই,
নরম হয়ে এল বলে দেশের ভিজে হাওয়ায়।"
দু দিনে অমিয়া হল তার চেলা।
যখন-তখন আসত মহীভূষণ,
আশপাশের হাসাহাসি কানাকানি গায়ে লাগত না কিছুই।

দিনের পর দিন যায়।
অধীর হয়ে অমিয়ার বাবা তুললেন বিয়ের কথা।
মহী বললে, "কী হবে।"
বাবা রেগে বললেন, "তবে তুমি আস কেন রোজ।"
অনায়াসে বললে মহীভূষণ,
"অমিয়াকে নিয়ে যেতে চাই যেখানে ওর কাজ।"

অমিয়ার শেষ কথা এই,
"এসেছি তাঁরই কাজে।
উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার।"
আমি শুধালেম, "কোথায় আছেন তিনি।"
অমিয়া বললে, "জেলখানায়।"

শান্তিনিকেতন
৩ জুলাই ১৯৩৬

দুর্বোধ

অধ্যাপকমশায় বোঝাতে গেলেন নাটকটার অর্থ,
সেটা হয়ে উঠল বোধের অতীত।
আমার সেই নাটকের কথা বলি।—

বইটার নাম 'পত্রলেখা',
নায়ক তার কুশলসেন।
নবনীর কাছে বিদায় নিয়ে সে গেল বিলেতে।
চার বছর পরে ফিরে এসে হবে বিয়ে।
নবনী কাঁদল উপুড় হয়ে বিছানায়,
তার মনে হল, এ যেন চার বছরের মৃত্যুদণ্ড।

নবনীকে কুশলের প্রয়োজন ছিল না ভালোবাসার পথে,
প্রয়োজন ছিল সুগম করতে বিলাত-যাত্রার পথ।
সে কথা জানত নবনী,
সে পণ করেছিল হৃদয় জয় করবে প্রাণপণ সাধনায়।
কুশল মাঝে মাঝে
রুচিতে বুদ্ধিতে উঁচট খেয়ে ওকে হঠাৎ বলেছে রূঢ় কথা,
ও সয়েছে চুপ করে;
মেনে নিয়েছে নিজেকে অযোগ্য বলে;
ওর নালিশ নিজেরই উপরে।
ভেবেছিল দীনা বলেই একদিন হবে ওর জয়,
ঘাস যেমন দিনে দিনে নেয় ঘিরে কঠোর পাহাড়কে।
এ যেন ছিল ওর ভালোবাসার শিল্পরচনা,
নির্দয় পাথরটাকে ভেঙে ভেঙে রূপ আবাহন করা
ব্যথিত বক্ষের নিরন্তর আঘাতে।
আজ নবনীর সেই দিনরাতের আরাধনার ধন গেল দূরে।
ওর দুঃখের থালাটি ছিল অশ্রু-ভেজা অর্ঘ্যে ভরা,
আজ থেকে দুঃখ রইবে কিন্তু দুঃখের নৈবেদ্য রইবে না।

এখন ওদের সম্বন্ধের পথ রইল
শুধু এ পারে ও পারে চিঠি লেখার সাঁকো বেয়ে।
কিন্তু নবনী তো সাজিয়ে লিখতে জানে না মনের কথা,
ও কেবল যত্নের স্বাদ লাগাতে জানে সেবাতে,
অর্‌কিডের চমক দিয়ে যেতে ফুলদানির 'পরে
কুশলের চোখের আড়ালে,
গোপনে বিছিয়ে আসতে
নিজের-হাতে-কাজ-করা আসন
যেখানে কুশল পা রাখে।

কুশল ফিরল দেশে,
বিয়ের দিন করল স্থির।
আঙটি এনেছে বিলেত থেকে,
গেল সেটা পরাতে ;
গিয়ে দেখে ঠিকানা না রেখেই নবনী নিরুদ্দেশ।

তার ডায়ারিতে আছে লেখা,
"যাকে ভালোবেসেছি সে ছিল অন্য মানুষ,
চিঠিতে যার প্রকাশ, এ তো সে নয়।"
এ দিকে কুশলের বিশ্বাস
তার চিঠিগুলি গদ্যে মেঘদূত,
বিরহীদের চিরসম্পদ।
আজ সে হারিয়েছে প্রিয়াকে,
কিন্তু মন গেল না চিঠিগুলি হারাতে—
ওর মমতাজ পালালো, রইল তাজমহল।
নাম লুকিয়ে ছাপালো চিঠি 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমিক' আখ্যা দিয়ে।

নবনীর চরিত্র নিয়ে
বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা হয়েছে বিস্তর।

কেউ বলেছে, বাঙালির মেয়েকে
লেখক এগিয়ে নিয়ে চলেছে
ইবসেনের মুক্তিবাণীর দিকে—
কেউ বলেছে, রসাতলে।

অনেকে এসেছে আমার কাছে জিজ্ঞাসা নিয়ে ;
আমি বলেছি, "আমি কী জানি।"
বলেছি, "শাস্ত্রে বলে, দেবা ন জানন্তি।"
পাঠকবন্ধু বলেছে,
"নারীর প্রসঙ্গে নাহয় চুপ করলেম
হতবুদ্ধি দেবতারই মতো,
কিন্তু পুরুষ ?
তারও কি অজ্ঞাতবাস চিররহস্যে।
ও মানুষটা হঠাৎ পোষ মানলে কোন্ মন্ত্রে।"

আমি বলেছি,
"মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক, স্পষ্ট নয় কোনো পক্ষই ;
যেটুকু সুখ দেয় বা দুঃখ দেয় স্পষ্ট কেবল সেইটুকুই।
প্রশ্ন কোরো না,
পড়ে দেখো কী বলছে কুশল।"

কুশল বলে, "নবনী চার বছর ছিল দৃষ্টির বাইরে,
যেন নেমে গেল সৃষ্টির বাইরেতেই ;
ওর মাধুর্যটুকুই রইল মনে,
আর সব-কিছু হল গৌণ।
সহজ হয়েছে ওকে সুন্দর ছাঁদে চিঠি লিখতে।
অভাব হয়েছে, করেছি দাবি—
ওর ভালোবাসার উপর অবাধ ভরসা
মনকে করেছে রসসিক্ত, করেছে গর্বিত।

প্রত্যেক চিঠিতে আপন ভাষায় ভুলিয়েছি আপনারই মন
লেখার উত্তাপে ঢালাই করা অলংকার
ওর স্মৃতির মূর্তিটিকে সাজিয়ে তুলেছে দেবীর মতো।
ও হয়েছে নূতন রচনা।
এই জন্যেই খ্রীস্টান শাস্ত্রে বলে,
সৃষ্টির আদিতে ছিল বাণী।"

পাঠকবন্ধু আবার জিগেস করেছে,
"ও কি সত্যি বললে,
না, এটা নাটকের নায়কগিরি ?"
আমি বলেছি, "আমি কী জানি।"

শান্তিনিকেতন
৫ জুলাই ১৯৩৬

বঞ্চিত

ফুলিদের বাড়ি থেকে এসেই দেখি
পোস্ট্‌কার্ড্‌খানা আয়নার সামনেই,
কখন এসেছে জানি নে তো।
মনে হল, সময় নেই একটুও ;
গাড়ি ধরতে পারব না বুঝি।
বাক্স থেকে টাকা বের করতে গিয়ে
ছড়িয়ে পড়ল সিকি দুয়ানি,
কিছু কুড়োলেম, কিছু রইল বা,
গ'নে ওঠা হল না।
কাপড় ছাড়ি কখন।
নীল রঙের রেশমি রুমালখানা
দিলেম মাথার উপর তুলে কাঁটায় বিঁধে।

চুলটাকে জড়িয়ে নিলুম কোনোমতে,
টবের গাছ থেকে তুলে নিলুম
চন্দ্রমল্লিকা বাসন্তীরঙের।

স্টেশনে এসে দেখি গাড়ি আসেই না,
জানি নে কতক্ষণ গেল—
পাঁচ মিনিট, হয়তো বা পঁচিশ মিনিট।
গাড়িতে উঠে দেখি চেলি-পরা বিয়ের কনে দলে-বলে ;
আমার চোখে কিছুই পড়ে না যেন,
খানিকটা লাল রঙের কুয়াশা, একখানা ফিকে ছবি।

গাড়ি চলেছে ঘটর ঘটর, বেজে উঠছে বাঁশি,
উড়ে আসছে কয়লার গুঁড়ো,
কেবলই মুখ মুছছি রুমালে।
কোন্-এক স্টেশনে
বাঁকে করে ছানা এনেছে গয়লার দল।
গাড়িটাকে দেরি করাচ্ছে মিছিমিছি।
হুইস্‌ল্ দিলে শেষকালে ;
সাড়া পড়ল চাকাগুলোয়, চলল গাড়ি।
গাছপালা, ঘরবাড়ি, পানাপুকুর
ছুটেছে জানলার দু ধারে পিছনের দিকে—
পৃথিবী যেন কোথায় কী ফেলে এসেছে ভুলে,
ফিরে আর পায় কি না-পায়।
গাড়ি চলেছে ঘটর ঘটর।

মাঝখানে অকারণে গাড়িটা থামল অনেক ক্ষণ,
খেতে খেতে খাবার গলায় বেধে যাবার মতো।
আবার বাঁশি বাজল,
আবার চলল গাড়ি ঘটর ঘটর।
শেষে দেখা দিল হাবড়া স্টেশন।

চাইলেম না জানালার বাইরে,
মনে স্থির করে আছি—
খুঁজতে খুঁজতে আমাকে আবিষ্কার করবে একজন এসে,
তার পরে দুজনের হাসি।

বিয়ের কনে, টোপর-হাতে আত্মীয়স্বজন,
সবাই গেল চলে।
কুলি এসে চাইলে মুখের দিকে,
দেখলে গাড়ির ভিতরটাতে মুখ বাড়িয়ে,
কিছুই নেই।
যারা কনেকে নিতে এসেছিল গেল চলে।
যে জনস্রোত এ মুখে আসছিল
ফিরল গেটের দিকে।
গট গট করে চলতে চলতে
গার্ড্ আমার জানালার দিকে একটু তাকালে,
ভাবলে মেয়েটা নামে না কেন।
মেয়েটাকে নামতেই হল।

এই আগন্তুকের ভিড়ের মধ্যে
আমি একটিমাত্র খাপছাড়া।
মনে হল প্লাটফর্‌ম্‌টার
এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত প্রশ্ন করছে আমাকে ;
জবাব দিচ্ছি নীরবে,
"না এলেই হত।"
আর-একবার পড়লুম পোস্ট্‌কার্ড্‌খানা—
ভুল করি নি তো ?

এখন ফিরতি গাড়ি নেই একটাও।
যদি বা থাকত, তবু কি…

বুকের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে
কত রকমের 'হয়তো'—
সবগুলিই সাংঘাতিক।

বেরিয়ে এসে তাকিয়ে রইলুম ব্রিজটার দিকে।
রাস্তার লোক কী ভাবলে জানি নে।
সামনে ছিল বাস্‌, উঠে পড়লুম।
ফেলে দিলুম চন্দ্রমল্লিকাটা।

অপর পক্ষ

সময় একটুও নেই।
লাল মখমলের জুতোটা গেল কোথায়;
বেরোল খাটের নীচে থেকে।
গলায় বোতাম লাগাতে লাগাতে গেছি চৌকাঠ পর্যন্ত,
হঠাৎ এলেন বাবা।
আলাপ শুরু করলেন ধীরে সুস্থে;
খবর পেয়েছেন দুজন পাত্রের, মিনির জন্যে।
তাঁর মনটা একবার এর দিকে ঝুঁকছে একবার ওর দিকে
ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি আর উঠছি ঘেমে।

রাস্তায় বেরোলেম;
হাওড়ায় গাড়ি আসতে বারো মিনিট।
বুকের মধ্যে রক্তবেগ মন্দগতি সময়কে মারছে ঠেলা
ট্যাক্সি ছুটল বে-আইনি চালে।
হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড,
হাওড়া ব্রিজ, ন মিনিট বাকি।

দুর্ভাগ্য আর গোরুর গাড়ি আসে যখন
আসে ভিড় করে।
রাস্তাটা পিণ্ডি পাকিয়ে গেছে পাট-বোঝাই গাড়িতে
হাঁক ডাক আর ধাক্কা লাগালে কনিস্টবল ;
নিরেট আপদ ফাঁক দেয় না কোথাও।
নেমে পড়লুম ট্যাক্সি ছেড়ে,
হন্‌হনিয়ে চললুম পায়ে হেঁটে।
পৌঁছলুম হাওড়া স্টেশনে।
কী জানি কব্জিঘড়িটা ফাস্ট্ হয় যদি পনেরো মিনিট।
কী জানি, আজ থেকে টাইম্‌টেবিলের
সময় যদি পিছিয়ে থাকে।
ঢুকে পড়লুম ভিতরে।
দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি ট্রেন—
যেন আদিকালের প্রকাণ্ড সরীসৃপটার কঙ্কাল,
যেন একঘেয়ে অর্থের গ্রন্থিতে বাঁধা
অমরকোষের একটা লম্বা শব্দাবলী।
নির্বোধের মতো এলেম উঁকি মেরে মেয়ে-গাড়িগুলোতে।
ডাকলেম নাম ধরে,
'কী জানি' ছাড়া আর-কোনো কারণ নেই
সেই পাগলামির।
ভগ্ন আশা শূন্য প্লাট্‌ফরম্ জুড়ে ভূলুণ্ঠিত।

বেরিয়ে এলুম বাইরে—
জানি নে যাই কোন্ দিকে।
বাসের নীচে চাপা পড়ি নি নিতান্ত দৈবক্রমে।
এই দয়াটুকুর জন্যে ইচ্ছে নেই
দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

শ্যামলী

ওগো শ্যামলী,
আজ শ্রাবণে তোমার কালো কাজল চাহনি
চুপ করে থাকা বাঙালি মেয়েটির
ভিজে চোখের পাতায় মনের কথাটির মতো।
তোমার মাটি আজ সবুজ ভাষায় ছড়া কাটে ঘাসে ঘাসে
আকাশের বাদল-ভাষার জবাবে।
ঘন হয়ে উঠল তোমার জামের বন পাতার মেঘে,
বলছে তারা উড়ে-চলা মেঘগুলোকে হাত তুলে,
"থামো, থামো—
থামো তোমার পুব বাতাসের সওয়ারি।"

পথের ধারে গাছতলাতে তোমার বাসা, শ্যামলী,
তুমি দেবতাপাড়ায় বেদের মেয়ে,
বাসা ভাঙ বারে বারে, খালি হাতে বেরিয়ে পড় পথে,
এক নিমেষে তুমি নিঃশেষে গরিব, তুমি নির্ভাবনা।
তোমাকে যে ভালোবেসেছে
গাঁঠছড়ার বাঁধন দাও না তাকে;
বাসর-ঘরের দরজা যখন খোলে রাতের শেষে
তখন আর কোনোদিন চায় না সে পিছন ফিরে

মুখোমুখি বসব বলে বেঁধেছিলেম মাটির বাসা
তোমার কাঁচা-বেড়া-দেওয়া আঙিনাতে।
সেদিন গান গাইল পাখিরা,
তাদের নেই অচল খাঁচা;
তারা নীড় যেমন বাঁধে তেমনি আবার ভাঙে।
বসন্তে এ পারে তাদের পালা, শীতের দিনে ও পারের অরণ্যে

সেদিন সকালে
হাওয়ার তালে হাততালি দিলে গাছের পাতা।
আজ তাদের নাচ বনে বনে,
কাল তাদের ধুলোয় লুটিয়ে-পড়া—
তা নিয়ে নেই বিলাপ, নেই নালিশ।
বসন্ত-রাজদরবারের নকিব ওরা ;
এ বেলায় ওদের কাজ, জবাব মেলে ও বেলায়।

এই ক'টা দিন তোমায় আমায় কথা হল কানে কানে ;
আজ কানে কানে বলছ আমায়,
"আর নয়, এবার তোলো বাসা।"
আমি পাকা করে গাঁথি নি ভিত,
আমার মিনতি ফাঁদি নি পাথর দিয়ে তোমার দরজায় ;
বাসা বেঁধেছি আলগা মাটিতে—
যে চলতি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেসে,
যে মাটি পড়বে গলে শ্রাবণধারায়।

যাব আমি।
তোমার ব্যথাবিহীন বিদায়দিনে
আমার ভাঙা ভিটের 'পরে গাইবে দোয়েল লেজ দুলিয়ে
এক শাহানাই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী,
যেদিন আসি আবার যেদিন যাই চলে।

। আগস্ট ১৯৩৬

শ্যামলী

শ্রীশম্ভু সাহা গৃহীত চিত্র

নাটক ও প্রহসন

পরিত্রাণ

পরিত্রাণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ধনঞ্জয় ও প্রজাগণ

প্রজা। থাকতে পারলুম না যে ঠাকুর। তাই তোমাকে ধরে নিয়ে চলেছি।

ধনঞ্জয়। আমাকে নিয়ে তোদের কী হবে বল্ তো।

প্রজা। মাঝে মাঝে তোমাকে না দেখতে পেলে যে—

ধনঞ্জয়। তোরা ভাবছিস তোরাই আমাকে ধরে এনেছিস। তা নয় রে— আমিই তোদের খবর দিতে বেরিয়েছি—

প্রজা। কিসের খবর ঠাকুর ?

ধনঞ্জয়। দুঃখের দিন আসছে।

প্রজা। বল কী প্রভু ?

ধনঞ্জয়। হাঁ রে, আমি ধরণীর কান্না শুনতে পাই যে।

প্রজা। কোথায় পালাব ?

ধনঞ্জয়। পালাব না রে, তাকে বুঝে নেব— ভিতরে এসে দুঃখটাকে দেখব বাইরে।

গান

তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া—
তাই ভয়ে ঘোরায় দিক্-বিদিকে
শেষে অন্তরে পাই সাড়া।

আমি তোদের ডাকছি— সবাই আমার বুকের ভিতরে আয়, সেইখান থেকে নির্ভয়ে দেখবি তুফানের দাপট, মরণের চোখ-রাঙানি।

প্রজা। তুমি যেখানে ডাক দাও ঠাকুর সেখানে যাবার পথ পাই নে যে।

ধনঞ্জয়। যখন হারাই বন্ধ-ঘরের তালা,
যখন অন্ধ নয়ন, শ্রবণ কালা,
তখন অন্ধকারে লুকিয়ে দ্বারে
শিকলে দাও নাড়া।

ঘুম যখন ভাঙবে তখনই দরজা খোলবার সময় আসবে রে।

প্রজা। ঘুম যে ভাঙে না।

ধনঞ্জয়। সেইজন্যেই তাড়া লাগছে, নইলে দুঃখ আসবে কেন।

যত দুঃখ আমার দুঃস্বপনে,
সে-যে ঘুমের ঘোরেই আসে মনে,
ঠেলা দিয়ে মায়ার আবেশ
করো গো দেশছাড়া।

অজ্ঞান হয়ে থাকিস বলেই তো স্বপ্নের চোটে তোরা গুঙরে মরিস।

প্রজা। রাজার পেয়াদা এসে যখন মার লাগায়? সেটাকে তুমি স্বপ্ন বল নাকি?

ধনঞ্জয়। তা না তো কী? স্বপ্নের হাজার লক্ষ মুখোশ আছে; রাজার মুখোশ প'রেও আসে— তোদের অচৈতন্য নিয়েই তোদের সে মারে, তার হাতে আর কোনো অস্ত্র নেই।

আমি আপন মনের মারেই মরি
শেষে দশ জনারে দোষী করি—
আমি চোখ বুজে পথ পাই নে ব'লে
কেঁদে ভাসাই পাড়া।

দেখ্, আমি এই কথা তোদের বলতে এসেছি— সংসারে তোরাই দুঃখ এনেছিস।

প্রজা। সে কী কথা ঠাকুর, আমরা দুঃখ পাই, আমরা তো দুঃখ দিই নে। আমাদের সে শক্তিই নেই।

ধনঞ্জয়। ওরে বোকা, মার খাবার জন্যে যে তৈরি হয়ে আছে মারের ফসল ফলাবার মাটি সে যে চষে রেখেছে। তোদেরই অপরাধ সব চেয়ে বেশি— তোরা তোদের অন্তর্যামী ঠাকুরকে লজ্জা দিয়েছিস, তাই এত দুঃখ।

প্রজা। আমরা কী করব বলে দাও।

ধনঞ্জয়। আর কত বলব? বার বার বলছি ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই।

গান

নাই ভয়, নাই ভয় নাই রে।
থাক্ পড়ে থাক্ ভয় বাইরে।

জাগো মৃত্যুঞ্জয় চিত্তে
থৈ-থৈ-নর্তন-নৃত্যে,
ওরে মন বন্ধনছিন্ন
দাও তালি তাই তাই তাই রে।

প্রজা। ঠাকুর, ওই যেন কে আসছে?

ধনঞ্জয়। আসতে দে।

প্রজা। কী জানি, খুনে হবে কি ডাকাত হবে, এই অন্ধকার রাত্তিরে বেরিয়েছে।

ধনঞ্জয়। খুনেকে তোরাই খুনে করিস, ডাকাতকে করে তুলিস ডাকাত। খাড়া দাঁড়িয়ে থাক্।

প্রজা। প্রভু, বিপদ ঘটতে পারে। আমরা বরঞ্চ একটু সরে দাঁড়াই— একেবার সামনে এসে পড়বে— তখন—

ধনঞ্জয়। ওরে বোকারা, পিছন দিকে বিপদ যখন মারে তখন আর বাঁচোয়া নেই— বুক পেতে দিতে পারিস, বিপদ তা হলে নিজেই পিছন ফিরবে।

বসন্তরায় ও একজন পাঠানের প্রবেশ

পাঠান। কোন্ হ্যায় রে!

প্রজা। দোহাই বাবা, আমরা চাষি লোক—

পাঠান। রাত্তিরে কী করতে বেরিয়েছিস?

ধনঞ্জয়। রাত্তিরে যারা বেরোয় তাদের সঙ্গে মিলন হবে বলেই বেরিয়েছি। দিনে মিলি কাজের লোকের সঙ্গে, রাত্তিরে মিলি অকাজের লোকের সঙ্গে।

পাঠান। ভয় ডর নেই?

ধনঞ্জয়। দাদা, তোমারও তো ভয় ডর নেই দেখছি। দুই নির্ভয়ে সামনাসামনি দেখাসাক্ষাৎ হল— এ তো পরম আনন্দ। (প্রজাদের প্রতি) যাস কোথায় তোরা! চেনাশোনা করে নে-না।

বসন্ত। ভাবে বোধ হচ্ছে, তুমিই ধনঞ্জয় ঠাকুর, কেমন, ঠিক ঠাউরেছি কি না?

ধনঞ্জয়। ধরা পড়েছি। রাত-কানা নও তুমি।

বসন্ত। তেমন মানুষ অন্ধকারেও চোখে পড়ে।

ধনঞ্জয়। তুমিও তো অন্ধকারে ঢাকা পড়বার লোক নও, খুড়ো মহারাজ!

পাঠান। যাঃ চলে! সব ফেঁসে গেল!

ধনঞ্জয়। কী ফাঁসল দাদা!

পাঠান। মহারাজের সঙ্গে ঠিক যে সময়টিতে একলা আলাপ জমিয়েছিলুম, তুমি এসে বাগড়া দিলে।

ধনঞ্জয়। খাঁ-সাহেব, তুমি জান না, বাগড়া দিয়েই আলাপ জমান যিনি বড়ো আলাপী।

গান

আমার পথে পথেই পাথর ছড়ানো।
তাই তো তোমার বাণী বাজে
ঝর্না-ঝরানো।
আমার বাঁশি তোমার হাতে
ফুটোর পরে ফুটো তাকে,
তাই শুনি সুর অমন মধুর
পরান-ভরানো।
তোমার হাওয়া যখন জাগে
আমার পালে বাধা লাগে,
এমন করে গায়ে প'ড়ে
সাগর-তরানো।
ছাড়া পেলে একেবারে
রথ কি তোমার চলতে পারে?
তোমার হাতে আমার ঘোড়া
লাগাম-পরানো।

বসন্ত। খাঁ-সাহেব, এই তো জমে গেল। আজ পথে বাধা পেয়েছিলুম বলেই তো। যিনি বাগড়া দেন জয় হোক তাঁর।

ধনঞ্জয়। আজ বেরিয়েছ কোন্ ডাকে মহারাজ?

বসন্ত। যশোরে চলেছিলুম। ঠাকুর, গ্রামে ডাকাত পড়েছে খবর পেয়ে লোকজন-দের সব পাঠিয়ে দিয়েছি। তাই খাঁ-সাহেবকে নিয়ে এই রাস্তার মধ্যেই মজলিশ জমে গেল।

ধনঞ্জয়। রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ-মজলিশেই মজা মহারাজ। আমিও তোমার এই সভায় হঠাৎ-দরবারী।

গান

তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন—
তাই হঠাৎ-পাওয়ায় চমকে ওঠে মন।

বসন্ত। বেশ, বেশ ঠাকুর। যা নিত্যি জোটে তা থাক্ পড়ে— এই হঠাতের টানেই তো বাঁধন কাটে।

ধনঞ্জয়।—
গোপন পথে আপন মনে
বাহির হও যে কোন্ লগনে,
হঠাৎ-গন্ধে মাতাও সমীরণ!

বসন্ত। হায় হায় ঠাকুর— বড়ো শুভক্ষণেই বেরিয়েছিলুম— দেহমন শিউরে উঠছে।

ধনঞ্জয়।—
নিত্য যেথায় আনাগোনা
হয় না সেথায় চেনাশোনা,
উড়িয়ে ধুলো আসছে কতই জন।

বসন্ত। আহা, ভিড়ের মধ্যে হল না দেখা! দিন বৃথা গেল।

ধনঞ্জয়।—
কখন পথের বাহির থেকে
হঠাৎ বাঁশি যায় যে ডেকে
পথহারাকে করে সচেতন।

বসন্ত। এসো ঠাকুর, একবার কোলাকুলি করে নিই।

প্রজা। কোথায় চলেছ মহারাজ?

বসন্ত। প্রতাপ আমাকে ডেকেছে, তাই যশোরে চলেছি।

প্রজা। রায়গড়ে ফিরে যাও আজ রাত্তিরেই।

বসন্ত। কেন বলো দেখি?

প্রজা। নানারকম গুজব কানে আসে। ভালো লাগে না।

ধনঞ্জয়। কোথাকার অযাত্রা এরা সব? নিজেরাও চলবি নে ভয়ে, অন্যকেও চলতে দিবি নে?

প্রজা। দেখছ না ঠাকুর, পাঠানটা হঠাৎ কখন সরে গেল?

ধনঞ্জয়। তোদের সঙ্গ ওর ভালো লাগল না, তাতে আর আশ্চর্য কী রে। সবাই কি তোদের সহ্য করতে পারে?

প্রজা। তোমার সাদা মন, তুমি বুঝবে না— ওর যে কী মতলব ছিল তা বোঝাই যাচ্ছে।

ধনঞ্জয়। সাদা মনে বোঝা যায় না, ময়লা মনে বোঝা সহজ হয়, এ কথা নতুন শোনা গেল। বিশ্বাস নেই, উপর থেকে দেখিস দিঘির পানা, বিশ্বাস করে নীচে ডুব মারিস, দেখবি ডুব-জল। তোরা ডাঙা থেকেই মুখ ফিরিয়ে যাস, আমি না তলিয়ে দেখে ছাড়ি নে।

প্রজা। প্রভু, রাগ যে হয়।

ধনঞ্জয়। সেইজন্যেই সংসারে কেবল রাগীকেই দেখিস— না রাগতিস, তা হলে যে রাগে না তাকেও দেখতে পেতিস।

পাঠানের পুনঃপ্রবেশ

বসন্ত। এই-যে খাঁ-সাহেব ফিরেছে। তুমি যে ফারসি বয়েদ্‌গুলি শুনিয়েছিলে, ওগুলি আমাকে লিখে দিতে হবে।

পাঠান। দেব হুজুর, কিন্তু একটা কথা নিবেদন করি। (প্রজাদিগকে দেখাইয়া) এই এদের সরে যেতে বলো।

প্রজা। না, সে হবে না। আমরা ওঁকে ফেলে যাব না।

ধনঞ্জয়। কেন যাবি নে রে ? ভারি অহংকার তোদের দেখি। তোরা হলি রক্ষা-কর্তা, না ?

প্রজা। তুমি যদি হুকুম কর তো যাই।

ধনঞ্জয়। রক্ষা করবার যদি দরকার হয়, খাঁ-সাহেব একলা রক্ষা করতে পারবেন।

[প্রজাদের প্রস্থান

পাঠান। মহারাজ, আমাকেই রক্ষা করো।

বসন্ত। সে কী কথা ? কিছু বিপদ হয়েছে ?

পাঠান। হয়েছে। আমি যদি আজ যশোরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ থাকবে না।

বসন্ত। সর্বনাশ ! কেন, কী অপরাধ করেছ ?

পাঠান। প্রতাপাদিত্য রাজা কাল যখন আমাদের দুই ভাইকে রওনা করে দিলেন, তখন পথের মধ্যে আপনাকে খুন করবার হুকুম ছিল।

বসন্ত। কী বল খাঁ-সাহেব ?

পাঠান। হাঁ, কিন্তু গোপনে। গোপনও রইল না, তা ছাড়া আপনাকে মারা আমার দ্বারা হবে না, মনিবের হুকুমেও না। এখন আপনার মেহেরবানি চাই।

বসন্ত। এখনই চলে যাও রায়গড়ে। তোমার কোনো ভয় নেই।

[সেলাম করিয়া পাঠানের প্রস্থান

বুকে বড়ো বাজল ঠাকুর !

ধনঞ্জয়। বাজবে বইকি ভাই। ভালোবাস যে— না বাজলে কি ভালো হত ?

গান

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।

বসন্ত। আহা, সার্থক হোক কান্না আমার।

ধনঞ্জয়।— তোমার অভিসারে
যাব অগম পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে।

বসন্ত। এই ব্যথার পথেই আমাকে চালাও প্রভু! আমি আর কিছুই চাই নে।

ধনঞ্জয়।— পরানে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা—
দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।
সকলি নিবে কেড়ে
দিবে না তবু ছেড়ে—
মন সরে না যেতে ফেলিলে এ কী দায়ে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্ত্রগৃহে প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

মন্ত্রী। মহারাজ, কাজটা কি ভালো হবে?

প্রতাপ। কোন্ কাজটা?

মন্ত্রী। যেটা আদেশ করেছেন—

প্রতাপ। কী আদেশ করেছি?

মন্ত্রী। আপনার পিতৃব্য সম্বন্ধে—

প্রতাপ। আমার পিতৃব্য সম্বন্ধে কী?

মন্ত্রী। মহারাজ আদেশ করেছিলেন, যখন রাজা বসন্তরায় যশোরে আসবার পথে শিমুলতলির চটিতে আশ্রয় নেবেন, তখন—

প্রতাপ। তখন কী? কথাটা শেষ করেই ফেলো।

মন্ত্রী। তখন দুজন পাঠান গিয়ে—

প্রতাপ। হাঁ।

মন্ত্রী। তাঁকে নিহত করবে।

প্রতাপ। নিহত করবে! অমরকোষ খুঁজে বুঝি আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না? নিহত করবে! মেরে ফেলবে কথাটা মুখে আনতে বুঝি বাধছে?

মন্ত্রী। মহারাজ আমার ভাবটি ভালো বুঝতে পারেন নি।

প্রতাপ। বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি।

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ, আমি—

প্রতাপ। তুমি শিশু! খুন করাটা যেখানে ধর্ম সেখানে না-করাটাই পাপ, এটা এখনো তোমার শিখতে বাকি আছে। পিতৃব্য বসন্তরায় নিজেকে ম্লেচ্ছের দাস বলে স্বীকার করেছেন। ক্ষত হলে নিজের বাহুকে কেটে ফেলা যায়, সে কথা মনে রেখো মন্ত্রী।

মন্ত্রী। যে-আজ্ঞে।

প্রতাপ। অমন তাড়াতাড়ি 'যে-আজ্ঞে' বললে চলবে না। তুমি মনে করছ নিজের পিতৃব্যকে বধ করা সকল অবস্থাতেই পাপ। 'না' বোলো না, ঠিক এই কথাটাই তোমার মনে জাগছে। কিন্তু মনে কোরো না এর উত্তর নেই। পিতার অনুরোধে ভৃগু তাঁর মাকে বধ করেছিলেন, আর ধর্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে কেন বধ করব না?

মন্ত্রী। কিন্তু দিল্লীশ্বর যদি শোনেন, তবে—

প্রতাপ। আর যাই কর, দিল্লীশ্বরের ভয় আমাকে দেখিয়ো না!

মন্ত্রী। প্রজারা জানতে পারলে কী বলবে?

প্রতাপ। জানতে পারলে তো।

মন্ত্রী। এ কথা কখনোই চাপা থাকবে না।

প্রতাপ। দেখো মন্ত্রী, কেবল ভয় দেখিয়ে আমাকে দুর্বল করে তোলবার জন্যেই কি তোমাকে রেখেছি?

মন্ত্রী। মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য—

প্রতাপ। দিল্লীশ্বর গেল, প্রজারা গেল, শেষকালে উদয়াদিত্য! সেই স্ত্রৈণ বালকটার কথা আমার কাছে তুলো না! দেখো দেখি মন্ত্রী, সে পাঠান দুটো এখনো এল না!

মন্ত্রী। সেটা তো আমার দোষ নয় মহারাজ।

প্রতাপ। দোষের কথা হচ্ছে না। দেরি কেন হচ্ছে তুমি কী অনুমান কর তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মন্ত্রী। শিমুলতলি তো কাছে নয়। কাজ সেরে আসতে দেরি তো হবেই।

একজন পাঠানের প্রবেশ

প্রতাপ। কী হল ?

পাঠান। মহারাজ, এতক্ষণে কাজ নিকেশ হয়ে গেছে।

প্রতাপ। সে কী রকম কথা ? তবে তুমি জান না ?

পাঠান। জানি বই-কি। কাজ শেষ হয়ে গেছে ভুল নেই, তবে আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলুম না। আমার ভাই হোসেন খাঁ'র উপর ভার আছে, সে খুব হুঁশিয়ার। মহারাজের পরামর্শমতে আমি খুড়া রাজাসাহেবের লোকজনদের তফাৎ করেই চলে আসছি।

প্রতাপ। হোসেন যদি ফাঁকি দেয়।

পাঠান। তোবা। সে তেমন বেইমান নয়। মহারাজ, আমি আমার শির জামিন রাখলুম।

প্রতাপ। আচ্ছা, এইখানে হাজির থাকো, তোমার ভাই ফিরে এলে বকৃশিশ মিলবে। (পাঠানের বাহিরে গমন) এটা যাতে প্রজারা টের না পায় সে চেষ্টা করতে হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কথা গোপন থাকবে না।

প্রতাপ। কিসে তুমি জানলে ?

মন্ত্রী। আপনার পিতৃব্যের প্রতি বিদ্বেষ আপনি তো কোনোদিন লুকোতে পারেন নি। এমন-কি, আপনার কন্যার বিবাহেও আপনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন নি— তিনি বিনা নিমন্ত্রণেই এসেছিলেন। আর আজ আপনি অকারণে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন, আর পথে এই কাণ্ডটি ঘটল, এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই মূল বলে জানবে।

প্রতাপ। তা হলেই তুমি খুব খুশি হও ! না ?

মন্ত্রী। মহারাজ, এমন কথা কেন বলছেন ? আপনার ধর্ম-অধর্ম পাপ-পুণ্যের বিচার আমি করি নে, কিন্তু রাজ্যের ভালোমন্দর কথাও যদি আমাকে ভাবতে না দেবেন তবে আমি আছি কী করতে ? কেবল প্রতিবাদ করে মহারাজের জেদ বাড়িয়ে তোলবার জন্যে ?

প্রতাপ। আচ্ছা, ভালোমন্দর কথাটা কী ঠাওরালে শুনি।

মন্ত্রী। আমি এই কথাই বলছি, পদে পদে প্রজাদের মনে অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলবেন না। দেখুন, মাধবপুরের প্রজারা খুব প্রবল এবং আপনার বিশেষ বাধ্য নয়। তারা রাজ্যের সীমানার কাছে থাকে, পাছে আপনার প্রতিবেশী শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেয়, এই ভয়ে তাদের গায়ে হাত তোলা যায় না। সেইজন্য মাধবপুর-শাসনের ভার যুবরাজের উপর দেবার কথা আমিই মহারাজকে বলেছিলেম।

প্রতাপ। সে তো বলেছিলে। তার ফল কী হল দেখো-না। আজ দু বৎসরের খাজনা বাকি। সকল মহল থেকে টাকা এল, আর ওখান থেকে কী আদায় হল ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, আশীর্বাদ। তেমন সব বজ্জাত প্রজাও যুবরাজের পায়ের গোলাম হয়ে গেছে। টাকার চেয়ে কি তার কম দাম ? সেই যুবরাজের কাছ থেকে আপনি মাধবপুরের ভার কেড়ে নিলেন। সমস্তই উল্টে গেল। এর চেয়ে তাঁকে না পাঠানোই ভালো ছিল। সেখানকার প্রজারা তো হন্যে কুকুরের মতো ক্ষেপে রয়েছে— তার পরে যদি এই কথাটা প্রকাশ হয়, তা হলে কী হয় বলা যায় না। রাজকার্যে ছোটোদের অবজ্ঞা করতে নেই মহারাজ ! অসহ্য হলেই ছোটোরা জোট বাঁধে, জোট বাঁধলেই ছোটোরা বড়ো হয়ে ওঠে।

প্রতাপ। সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী তো মাধবপুরে থাকে ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ।

প্রতাপ। সেই বেটাই যত নষ্টের গোড়া। ধর্মের ভেক ধরে সেই তো যত প্রজাকে নাচিয়ে তোলে। সেই তো প্রজাদের পরামর্শ দিয়ে খাজনা বন্ধ করিয়েছে। উদয়কে বলেছিলুম যেমন করে হোক তাকে আচ্ছা করে শাসন করে দিতে। কিন্তু উদয়কে জান তো ? এ দিকে তার না আছে তেজ, না আছে পৌরুষ, কিন্তু একগুঁয়েমির অন্ত নেই। ধনঞ্জয়কে শাসন দূরে থাক্‌ তাকে আস্পর্ধা দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে। এবারে তার কণ্ঠিসুদ্ধ কণ্ঠ চেপে ধরতে হচ্ছে, তার পরে দেখা যাবে তোমার মাধবপুরের প্রজাদের কত বড়ো বুকের পাটা ! আর দেখো, লোকজন আজই সব ঠিক করে রাখো— খবরটা পাবামাত্রই রায়গড়ে গিয়ে বসতে হবে। সেইখানেই শ্রাদ্ধশান্তি করব— আমি ছাড়া উত্তরাধিকারী আর তো কাউকে দেখি নে।

বসন্তরায়ের প্রবেশ। প্রতাপাদিত্য চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান

বসন্ত। আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ ? আমি তোমার পিতৃব্য, তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় আমি বৃদ্ধ, তোমার কোনো অনিষ্ট করি এমন শক্তি নেই।

[প্রতাপ নীরব

প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো— ছেলেবেলা কতদিন সেখানে কাটিয়েছ— তার পরে বহুকাল সেখানে যাও নি।

প্রতাপ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া সগর্জনে) খবরদার! ওই পাঠানকে ছাড়িস নে! [দ্রুত প্রস্থান

বসন্তরায়ের প্রস্থান। প্রতাপ ও মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

প্রতাপ। দেখো মন্ত্রী, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখা যাচ্ছে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কোনো অপরাধ নেই।

প্রতাপ। এ বিষয়ের কথা তোমাকে কে বলছে? আমি বলছি, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখছি। সেদিন তোমাকে চিঠি রাখতে দিলেম, হারিয়ে ফেললে! আর-একদিন মনে আছে উমেশ রায়ের কাছে তোমাকে যেতে বলেছিলুম, তুমি লোক দিয়ে কাজ সেরেছিলে।

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ—

প্রতাপ। চুপ করো! দোষ কাটাবার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা কোরো না। যা হোক, তোমাকে জানিয়ে রাখছি, রাজকার্যে তুমি কিছুমাত্র মনোযোগ দিচ্ছ না। আর-একটা কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি মন্ত্রী, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে উদয় আছে। এমনি করে সে নিজের চার দিকে জাল জড়াচ্ছে—এর পরে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।

তৃতীয় দৃশ্য

উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষ

উদয়াদিত্য ও সুরমা

উদয়। যাক্, চুকল।

সুরমা। কী চুকল।

উদয়। আমার উপর মাধবপুর শাসনের ভার মহারাজ রেখেছিলেন। টাকায় আট আনা বৃদ্ধি ধরে খাজনা আদায়ের হঠাৎ হুকুম এল। বৃষ্টি নেই, এবারে সেখানে অজন্মা— তাই আমি—

সুরমা। আমি তো তোমাকে আমার গহনাগুলো দিতে চেয়েছিলুম। তার থেকে—

উদয়। তোমার গহনা কেনে এত বড়ো বুকের পাটা এ রাজ্যে আছে? আমি

মহারাজকে বললুম, মাধবপুর থেকে বৃদ্ধি খাজনা আমি কোনোমতেই আদায় করতে পারব না। শুনে তিনি মাধবপুর আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। তিনি এখন কেবলই সৈন্য বাড়াচ্ছেন, অস্ত্র কিনছেন, টাকা তাঁর নিতান্ত চাই— তা প্রজা বাঁচুক আর মরুক।

সুরমা। পরগনা তো কেড়ে নিলেন, কিন্তু তুমি চলে এলে প্রজারা যে মরবে!

উদয়। আমি ঠিক করেছি, যে করে হোক তাদের পেটের ভাতটা জোগাব। শুনতে পেলে মহারাজ খুশি হবেন না— নিশ্চয় ভাববেন, আমি তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছি। উনি মনে করেন, আমি দয়া দিয়ে নাম কিনি। কিন্তু তোমার ঘরে আজ ফুলের মালার ঘটা কেন?

সুরমা। রাজপুত্রকে রাজসভায় যখন চিনলে না, তখন যে তাকে চিনেছে সে তাকে মালা দিয়ে বরণ করবে।

উদয়। সত্যি নাকি! তোমার ঘরে রাজপুত্র আসা যাওয়া করেন? তিনি কে শুনি? এ খবরটা জানতুম না।

সুরমা। রামচন্দ্র যেমন ভুলেছিলেন তিনি অবতার, তোমারও সেই দশা। কিন্তু ভক্তকে ভোলাতে পারবে না!

উদয়। রাজপুত্র! রাজার ঘরে কোনো জন্মে পুত্র জন্মাবে না, বিধাতার এই অভিশাপ।

সুরমা। সে কী কথা?

উদয়। রাজার ঘরে উত্তরাধিকারীই জন্মায়, পুত্র জন্মায় না।

সুরমা। এ তুমি মনের ক্ষোভে বলছ।

উদয়। কথাটা কি নূতন যে ক্ষোভ হবে? যখন এতটুকু ছিলুম তখন থেকে মহারাজ এইটেই দেখছেন যে, আমি তাঁর রাজ্যভার বইবার যোগ্য কি না? কেবলই পরীক্ষা, স্নেহ নেই।

সুরমা। প্রিয়তম, দরকার কী স্নেহের। খুব কঠোর পরীক্ষাতেও তোমার জিত হবে। তোমার মতো রাজার ছেলে কোন্ রাজা পেয়েছে?

উদয়। বল কী? পরীক্ষক তোমার পরামর্শ নিয়ে বিচার করবেন না, সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

সুরমা। কারো পরামর্শ নিয়ে বিচার করতে হবে না— আগুনের পরীক্ষাতেও সীতার চুল পোড়ে নি! তুমি রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত নও, এ কথা বললেই হল? এত বড়ো অবিচার কি জগতে কখনো টিকতে পারে?

উদয়। রাজ্যভারটা নাই-বা ঘাড়ের উপর পড়ল, তাতেই বা দুঃখ কিসের ?

সুরমা। না, না, ও কথা তোমার মুখে আমার সহ্য হয় না। ভগবান তোমাকে রাজার ছেলে করে পাঠিয়েছেন, সে কথা বুঝি অমন করে উড়িয়ে দিতে আছে! নাহয় দুঃখই পেতে হবে— তা বলে—

উদয়। আমি দুঃখের পরোয়া রাখি নে। তুমি আমার ঘরে এসেছ, তোমাকে সুখী করতে পারি নে, আমার পৌরুষে সেই ধিক্‌কার !

সুরমা। যে সুখ দিয়েছ তাই যেন জন্মজন্মান্তরে পাই।

উদয়। সুখ যদি পেয়ে থাক তো নিজের গুণে, আমার শক্তিতে নয়। এ ঘরে আমার আদর নেই বলে তোমারও যে অপমান ঘটে ; এমন-কি, মাও যে তোমাকে অবজ্ঞা করেন।

সুরমা। আমার সব সম্মান যে তোমার প্রেমে, সে তো কেউ কাড়তে পারে নি।

উদয়। তোমার পিতা শ্রীপুররাজ কিনা যশোরের অধীনতা স্বীকার করেন না— সেই হয়েছে তোমার অপরাধ— মহারাজ তোমার উপর রাগ দেখিয়ে তার শোধ তুলতে চান।

নেপথ্যে। দাদা, দাদা !

উদয়। কেও ! বিভা বুঝি ? (দ্বার খুলিয়া) কী বিভা ? কী হয়েছে ?

বিভা। একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি আর বাঁচি নে ! [মুখ ঢাকিয়া কান্না

সুরমা। (বিভার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) কী হয়েছে ভাই, বল্‌ !

বিভা। আর-বার যখন উনি এখানে এসেছিলেন, ঠাট্টার সম্পর্ক ধরে ওঁকে কে ঠাট্টা করেছিল।

সুরমা। সে তো জানি, ওই লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া মাখনটা ওঁর কাপড়ের সঙ্গে একটা লেজ জুড়ে দিয়েছিল— বলেছিল— উনি রামচন্দ্র নন, রামদাস।

বিভা। সে কথা তাঁরা ভুলতে পারেন নি। এবার এসে ঠাট্টায় জিততে পণ করে ওঁর রমাই ভাঁড়কে মেয়ে সাজিয়ে বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন— মাকে কী-একটা যা-তা বলেছে।

উদয়। সর্বনাশ !

বিভা। আমি তাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলুম— মোহন মালকে বলে তখনই তাকে বিদায় করে দিয়েছি। কিন্তু কী জানি যদি কেউ বুঝতে পেরে থাকে !

উদয়। তোমার কি মনে হয় মা টের পেয়েছিলেন ?

বিভা। হতেও পারে মা হয়তো টের পেয়েছেন, কিন্তু অপমানটা পাছে ছড়িয়ে পড়ে, তাই চুপ করে গেলেন।

উদয়। মা কখনো এত বড়ো সর্বনেশে কথাটা বাবাকে বলবেন না।

বিভা। তা বলবেন না, কিন্তু কেমন করে বুঝব আর কেউ জেনেছে কি না।

সুরমা। বিভা, ভয় পাস নে, নিশ্চয় কেউ টের পায় নি। পেলে এতক্ষণ আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত।

উদয়। ব্যাপার তো কাল হয়ে গেছে ?

বিভা। হাঁ।

উদয়। তা হলে আমি বলে দিচ্ছি ফাঁড়া কেটে গেছে। বিচার করতে মহারাজের এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না। খবর পেলে কালকের রাতটা কাটত না। তবু এক কাজ কর্, বিভা তুই এখনই যা। রামচন্দ্রকে বল্, এ বাড়ি থেকে চলে যেতে, যেন কিছুমাত্র বিলম্ব না করেন।

বিভা। তুমি বলো-না দাদা, আমার কথা যদি না শোনেন।

উদয়। না, আমি তাকে যেতে বললে সে অপমান বোধ করবে।

[বিভার প্রস্থান

সুরমা। রাজা হলেই কি মানুষ নিজের খেয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না ?

উদয়। সামান্য একটা মেয়েলি ঠাট্টার হার-জিতের কথা এই যশোরের রাজবাড়িতে স্বপ্নেও ভাবতে পারে, এত বড়ো নির্বোধ! এখানেও খেয়ালের রাজত্ব বটে, কিন্তু কত-বড়ো সব খেয়াল—বিধির লিখনকে মুছে ফেলে রক্তের অক্ষরে নতুন লিখন বসিয়ে দেওয়ার খেয়াল।

বসন্তরায়ের প্রবেশ

উদয়। একি, দাদামশায় যে! স্বপ্ন ? না মতিভ্রম ?

বসন্ত।— গান

আজ তোমারে দেখতে এলেম
অনেক দিনের পরে।
ভয় কিছু নেই, সুখে থাকো,
অধিক ক্ষণ থাকব নাকো—
এসেছি এক নিমেষের তরে।

দেখব শুধু মুখখানি,
শুনব দুটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে
চলে যাব দেশান্তরে।

সুরমা। দাদামশায়, কারো মুখে হাসি দেখবার জন্যে তোমাকে কোনোদিন আড়ালে থাকতে হয় নি।

উদয়। তুমি যাই বল, হাসি দেখে দেশান্তরে যেতে ইচ্ছে হয় এমন হাসি আমরা কেউ হাসি নে।

সুরমা। তুমি যে এলে আমরা কোনো খবর জানতুম না।

বসন্ত। দিদি, এ সংসারে প্রত্যক্ষ এসে না পৌছলে, কে আসবে কে না আসবে তার ঠিক খবরটি তো পাওয়া যায় না।

সুরমা। ওটা শঙ্করাচার্যের মতো কথা হল। তোমার ওই হাসিমুখে এমন কথা মানায় না।

বসন্ত। সে কথা মিথ্যে বলিস নি ভাই। সংসার অনিত্য, জীবন অনিশ্চিত, এ-সব কথা ঘোর মিথ্যে। তোদের মুখ যখনই দেখি তখনই সংসার নিত্য, তখনই জীবন চিরদিনের, তা যেদিন মরি আর যেদিন বাঁচি।

সুরমা। যে অমৃত-মুখের কথা বললে সেটিকে তোমার তৃষিত চক্ষু খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমি কি বুঝতে পারছি নে?

বসন্ত। ওটা ভাই, মিথ্যে অভিমানের কথা বললি, মহাদেব বুকের মধ্যে রেখেছেন অন্নপূর্ণাকে, আর মাথার উপরে রেখেছেন গঙ্গাকে— কাউকেই তাঁর ছাড়লে একদণ্ড চলে না— তাঁর প্রাণের অন্নজল দুইই সমান চাই।

সুরমা। আর আমার ঠাকরুনদিদি! এখানে এসেই বুঝি ভুললে?

বসন্ত। তিনি তো আমার চাঁদ। বিধাতা আমার কপালে লিখে দিয়েছেন। তাঁকে ভুলেও ভোলবার জো নেই।

সুরমা। তিনি চাঁদের মতোই চুপ করে থাকেন বটে, আমি বোধ হয় গঙ্গার মতোই মুখরা।

বসন্ত। সে কথা অস্বীকার করতে পারি নে। চক্ষু বুজে ওই স্নিগ্ধ কলকণ্ঠ নিয়তই মনে মনে শুনতে পাই।

সুরমা। এত স্তুতিবাক্যও চতুর্মুখ তোমার এক মুখে জোগান কী করে?

বসন্ত। সে আমার এই বাগ্‌বাদিনীর গুণে— বিধিরও নয়, আমারও নয়।

সুরমা। আর নয় দাদামশায়, মিষ্টির পরিমাণটা একলার পক্ষে কিছু বেশি হয়ে উঠেছে।

বিভার দ্রুত প্রবেশ

বসন্ত। বিভা! কী হয়েছে দিদি, তোমার মুখ অমন কেন?

বিভা। মহারাজের কানে গিয়েছে।

উদয়। কী সর্বনাশ! কেমন করে গেল? মা কিছু বলেছেন না কি?

বিভা। না, মা বলেন নি। ওঁরা নিজেই থাকতে পারেন নি। এই নিয়ে আমাদের রাজবাড়ির লোকদের কাছে বড়াই করতে গিয়েছেন— তার থেকেই রাষ্ট্র হয়েছে।

বসন্ত। কী হয়েছে ব্যাপারটা?

উদয়। রামচন্দ্র ছেলেমানুষি করে অন্তঃপুরে তার ভাঁড়কে পাঠিয়েছিল মেয়ে সাজিয়ে। সে কথা মহারাজের কানে উঠেছে, এখন কী হয় কিছুই বলা যায় না।

বসন্ত। আমি একবার প্রতাপের কাছে যাই।

উদয়। এখন কিছু বোলো না— উলটো হবে। আগে দেখি মহারাজ কী হুকুম দেন।

সুরমা। হুকুম যাই দিন, এখনই যশোর ছেড়ে ওঁদের পালানো চাই।

রামমোহন মালের প্রবেশ

রামমোহন। (বিভার প্রতি) তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি মা, ঘরে দেখতে পেলুম না, তাই এখানে এলুম।

বিভা। (সভয়ে) কেন, কেন, কী হয়েছে!

রামমোহন। কিছুই হয় নি। আজ কতকাল পরে মায়ের দেখা পেয়েছি। চার-জোড়া শাঁখা এনেছি তুমি পরো, আমি দেখে যাই।

উদয়। রামমোহন, তোমাদের নৌকো সব তৈরি আছে?

রামমোহন। এখনই কিসের তৈরি যুবরাজ, কতদিন পরে আমাদের আসা, এখন তো শিগগির মাকে ছেড়ে যাচ্ছি নে।

বিভা। মোহন, এখনই নৌকো তৈরি কর্‌ গে— একটুও দেরি করিস নে।

রামমোহন। কেন মা?

বিভা। বিপদ ঘটিয়েছে— তুই তো সব জানিস। ওই-যে ভাঁড় এসেছিল অন্তঃপুরে। সে কথা মহারাজের কানে গিয়েছে।

রামমোহন। বেশ তো, এখনই তার মুণ্ডু নেন না— তার নোংরা মুখটা বন্ধ হলে আমরাও বাঁচি। আমি ধরে এনে দেব তাকে— ভাবনা নেই।

উদয়। রামমোহন, সে কীটটাকে কেউ ছোঁবেও না, তার চেয়ে বড়ো বিপদের ভয় আছে। তোমাদের সব চেয়ে বড়ো যে ছিপ নৌকো তার দাঁড়ি কত?

রামমোহন। চৌষট্টি জন।

উদয়। সেই নৌকোটা আমার এই জানলার সামনের ঘাটে এখনই তৈরি করে আনো। আজ রাত্তিরেই কোনোমতে রওনা করে দিতে হবে।

রামমোহন। দেরি হবে না যুবরাজ, দণ্ড দুয়েকের মধ্যে সব তৈরি করে রেখে দেব। কী করতে হবে বলে দাও।

উদয়। এই জানলা দিয়ে তাঁকে নাবিয়ে দিতে হবে, তার পরে রাতারাতি তোরা দাঁড় টেনে চলে যাবি।

[রামমোহনের প্রস্থান। বিভা বসিয়া পড়িয়া মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন

বসন্ত। দিদি, ভয় করিস নে, ভগবানের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বেঁচে থাকতে তোর ভয় নেই রে।

বিভা। ভয় না, দাদামশায়, লজ্জা! ছি ছি, কী লজ্জা! রাজার ছেলে হয়ে এমন ব্যবহার তো আমি ভাবতে পারি নে। জন্মের মতো আমার যে মাথা হেঁট হয়ে গেল।

বসন্ত। এখন ও-সব কথা ভাবিস নে, আপাতত—

বিভা। অপরাধ করলে আমি নিজে মহারাজের কাছে মাপ চাইতে যেতুম। কিন্তু এ যে তারও বেশি। এ যে নীচতা। আমার মাপ চাইবার মুখ রইল না।

সুরমা। বিভা, এখন মনটা বিচলিত করিস নে।

বিভা। বউদিদি, যদি মহারাজ শাস্তি দেন, আমার তো কিছুই বলবার থাকবে না। তাঁর সম্মান তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের সুখদুঃখের চেয়ে অনেক বড়ো, তাঁর মেয়ে হয়ে এ কথা কি আমি বুঝতে পারি নে?

বসন্ত। এখন রামচন্দ্র আছেন কোথায়?

বিভা। বাইরের বৈঠকখানায় নাচগান জমিয়েছেন— শহর থেকে তিনি সব নাচওআলী আনিয়েছেন, আজ দুদিন ধরে এই-সব চলছে।

বসন্ত। কলি যখন সর্বনাশ করে তখন আমোদ করতে করতেই করে। যেমন করে পার বিভা, তুমি এখনই তাকে ডাকিয়ে আনাও। [বিভার প্রস্থান

নেপথ্যে। উদয়, উদয়!

উদয়। ওই-যে মহারাজ আসছেন। [সুরমার পলায়ন

প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। শুনেছ সব কথা ?

উদয়। শুনেছি।

প্রতাপ। লছমন সর্দারকে হুকুম করেছি, কাল সকালে রামচন্দ্র যখন শয়নঘর থেকে বেরিয়ে আসবে, তখন তার মুণ্ডু কাটা যাবে। আজ রাত্রে অন্তঃপুরের পাহারার ভার তোমার উপরে।

উদয়। আমার উপরে মহারাজ ? এ যে আমাকে শাস্তি।

প্রতাপ। শাস্তি আমাকেও নয় ? তা বলে রাজার কর্তব্য করতে হবে না ?

বসন্ত। বাবা প্রতাপ! (প্রতাপাদিত্য নিরুত্তর) বাবা প্রতাপ, এ ও কি সম্ভব ?

প্রতাপ। কেন সম্ভব নয় ?

বসন্ত। ছেলেমানুষ, সে তো অবজ্ঞার পাত্র, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্য ?

প্রতাপ। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, এ কথা যে বোকা না'ও বোঝে তারও হাত পোড়ে। দুর্বুদ্ধি যার মাথায় জোগাতে পারে সে বুদ্ধির ফলটা কী হবে সে কি তার মাথায় জোগায় না ? দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় জোগাবে মাথাটা তখন দেহে থাকবে না।

বসন্ত। অপরাধ যে করে সে দুর্বল, ক্ষমা যে করে শক্তি তারই, এ কথা ভুলো না।

প্রতাপ। দেখো পিতৃব্য ঠাকুর, রায়বংশের কিসে মান-অপমান সে বোধ যদি তোমার থাকবে তা হলে পাকা মাথায় আজ মোগল-বাদশার শিরোপা জড়িয়ে বেড়াতে পারতে কি ? তোমারও লাঞ্ছিত মাথার স্থান এই ধুলায়, আমারই দুর্ভাগ্য তোমাকে বাঁচিয়ে দিলে। এই তোমাকে স্পষ্ট বললুম। খুড়োমশায়, এখন আমার নিদ্রার সময়।

বসন্ত। বুঝেছি প্রতাপ, একবার যে ছুরি তোমার খাপ থেকে বেরোয় রক্ত না নিয়ে সে ফিরবে না। তা নিক, যে তার প্রথম লক্ষ্য ছিল এখনো তো সামনেই আছে। প্রতাপ, একবার বিভার কথা ভেবে দেখো।

প্রতাপ। আচ্ছা, তবে ডাকো বিভাকে।

বিভার প্রবেশ

ওই-যে এসেছে। বিভা!

বিভা। মহারাজ!

প্রতাপ। সকল কথা শুনেছ বিভা ?

বিভা। হাঁ।

প্রতাপ। তোমার মাকে, আমাদের অন্তঃপুরকে কী রকম অপমান করেছে, তা তো জান?

বিভা। জানি।

প্রতাপ। আমি যদি তার প্রাণদণ্ড দিই তবে সেটা অন্যায় হবে কি?

বিভা। না।

বসন্ত। দিদি, কী বললি দিদি! মহারাজের পায়ে ধরে মাপ চেয়ে নে।

[বিভা নিরুত্তর

প্রতাপ। খুড়ামহারাজ, মনে রেখো বিভা আমারই মেয়ে।

উদয়। মহারাজ, আপনি দণ্ডদাতা, আপনিই শাস্তি দিন। কিন্তু এ শাস্তির দণ্ডভার আমাদের উপরে দেবেন না।

প্রতাপ। কী বলতে চাও তুমি?

উদয়। পাহারা দেবার লোক মহারাজের অনেক আছে, তাদের স্নেহ নেই, এই-জন্যে তাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়েই কর্তব্যপালন করবে। আমার উপরে পাহারা দেবার ভার দেবেন না।

প্রতাপ। লোক থাকবে আমার, কিন্তু দায় থাকবে তোমার।

উদয়। আমি আমার স্নেহকে অতিক্রম করতে পারব না।

প্রতাপ। না পার তো তারও জবাবদিহি আছে। [প্রস্থান

উদয়। কোথায় ফাঁক আছে, একবার দেখে আসি।

বসন্ত। কিন্তু, দাদা, তুমি এতে হাত যদি দাও তা হলে—

উদয়। তা হলে যা হবে সেটা তো এখনকার কথা নয়—এখনকার কথা হচ্ছে হাত দেওয়াই চাই।

চতুর্থ দৃশ্য

নৃত্যসভা

রামচন্দ্র। নটনটীর দল

রামমোহনের প্রবেশ

রামমোহন। একবার উঠে আসুন।

রামচন্দ্র। এখন না, যাঃ, বিরক্ত করিস নে। গান ছেড়ো না।

রামমোহন। শুনতেই হবে।

রামচন্দ্র। কাল সকালে শুনব। দেখ্, বিরক্ত করিস নে।

রামমোহন। যুবরাজ ডাকছেন, জরুরি কাজ আছে।

রামচন্দ্র। বুঝেছি, শালা বুঝি ঠাট্টার জবাব দিতে চায়! পারবে না আমার সঙ্গে।

রামমোহন। ঠাট্টা শেষ হয়ে গেছে, এখন বিপদের পালা। শীঘ্র এসো।

রামচন্দ্র। আর ভয় দেখাতে হবে না, এখন আমার সময় নেই।

রামমোহন। এ দিকেও সময় একটুও নেই। আচ্ছা, এই দিকে আসুন, বলছি। (রামচন্দ্রকে জনান্তিকে) প্রতাপাদিত্য মহারাজ সব কথা শুনেছেন।

রামচন্দ্র। না শুনলে মজাটা কী।

রামমোহন। কী বলেন মহারাজ, মজা! তিনি আপনার শ্বশুর, আপনার ঠাট্টার সম্পর্ক তো নন।

রামচন্দ্র। আমার ঠাট্টা চলছে শালাদের নিয়ে। তিনি সেটা যদি গায়ে মাখেন সেটা কি আমার দোষ?

রামমোহন। সে বিচার এখন নয়। আপাতত প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়েছে, কাল সকালেই—

রামচন্দ্র। তুমি শুনলে কোথা থেকে?

রামমোহন। যুবরাজের নিজের মুখ থেকে।

রামচন্দ্র। তোর মতো বোকা দুনিয়ায় নেই রে। যুবরাজ ঠাট্টা করেছে বুঝতে পারিস নে! প্রাণদণ্ড!

রামমোহন। দোহাই তোমার, একটুও ঠাট্টা নয়।

রামচন্দ্র। আমাকে ঠাট্টায় ওরা হারাতে পারবে না। তুই এখন যা।

রামমোহন। আচ্ছা, আমি যুবরাজকে ডেকে আনছি। [প্রস্থান

রামচন্দ্র। (নটীদের প্রতি) ধরো গান।—

নটীদের নাচ ও গান

আমার নয়ন তোমার নয়নতলে
মনের কথা খোঁজে।
সেথায় কালো ছায়ার মায়ার ঘোরে
পথ হারালো ও যে।
নীরব দিঠে শুধায় যত
পায় না সাড়া মনের মতো,

অবুঝ হয়ে রয় সে চেয়ে
অশ্রুধারায় মজে।
তুমি আমার কথার আভাখানি
পেয়েছ কি মনে।
এই-যে আমি মালা আনি
তার বাণী কেউ শোনে?
পথ দিয়ে যাই, যেতে যেতে
হাওয়ায় ব্যথা দিই যে পেতে;
বাঁশি বিছায় বিষাদ-ছায়া
তার ভাষা কেউ বোঝে?

রামচন্দ্র। বেটা রামমোহন আমার মনটা মিছিমিছি খারাপ করে দিয়ে গেল। এ কেমন গোঁয়ার-গোছের ঠাট্টা এ বাড়ির? শ্যালাদের রসের জ্ঞান একটুও নেই। থেমো না, আর একটা গান ধরো। একটু দ্রুততালে।

নটীদের গান

না ব'লে যেয়ো না চলে মিনতি করি
গোপনে জীবন মন লইয়া হরি।
সারা নিশি জেগে থাকি
ঘুমে ঢ'লে পড়ে আঁখি,
ঘুমালে হারাই পাছে সে ভয়ে মরি।
চকিতে চমকি বঁধু তোমারে খুঁজি,
থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বুঝি।
নিশিদিন চাহে হিয়া
পরান পসারি দিয়া
অধীর চরণ তব বাঁধিয়া ধরি।

(রামচন্দ্র মাঝে মাঝে বাহবা দিতেছেন, মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিতভাবে দ্বারের দিকে চাহিতেছেন।)

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। উঠে এসো শীঘ্র।

রামচন্দ্র। একেবারে জোর তলব যে।

উদয়। দেরি কোরো না, এসো শিগগির।

রামচন্দ্র। বোনের পেয়াদা হয়ে এসেছ বুঝি, তলব দিতে ?

উদয়। আমার কর্তব্য আমি করলুম। যদি না শোন তো থাকো। বিধাতা যাকে মারেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। [প্রস্থান

রামচন্দ্র। আওয়াজটা ঠাট্টার মতো শোনাচ্ছে না। একবার দেখেই আসি গে। (নটীদের প্রতি) তোমরা গান থামিয়ো না— এখনো রাত আছে বাকি। আমি এখনই আসছি। [প্রস্থান

নটীদের গান

ফুল তুলিতে ভুল করেছি
প্রেমের সাধনে।
বঁধু তোমায় বাঁধব কিসে
মধুর বাঁধনে।
ভোলাব না মায়ার ছলে,
রইব তোমার চরণতলে,
মোহের ছায়া ফেলব না মোর
হাসি-কাঁদনে।
রইল শুধু বেদন-ভরা আশা,
রইল শুধু প্রাণের নীরব ভাষা।
নিরাভরণ যদি থাকি
চোখের কোণে চাইবে না কি,
যদি আঁখি নাই বা ভোলাই
রঙের ধাঁদনে।

প্রথমা নটী। কই, এখনো তো ফিরলেন না।

দ্বিতীয়া নটী। আর তো ভাই পারি নে। ঘুম পেয়ে আসছে।

তৃতীয়া নটী। ফের কি সভা জমবে নাকি !

প্রথমা নটী। কেউ যে জেগে আছে তা তো বোধ হচ্ছে না। এতবড়ো রাজবাড়ি সমস্ত যেন হাঁ হাঁ করছে।

দ্বিতীয়া নটী। চাকররাও সব হঠাৎ কে কোথায় যেন চলে গেল।

তৃতীয়া নটী। বাতিগুলো নিবে আসছে, কেউ জ্বালিয়ে দেবে না ?

প্রথমা নটী। আমার কেমন ভয় করছে ভাই।

দ্বিতীয়া নটী। (বাদকদিগকে দেখাইয়া দিয়া) ওরাও যে সব ঘুমোতে লাগল— কী মুশকিলেই পড়া গেল। ওদের তুলে দে-না। কেমন গা ছম্ ছম্ করছে।

তৃতীয়া নটী। মিছে না ভাই। একটা গান ধরো। ওগো, তোমরা ওঠো, ওঠো।

বাদকগণ। (ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ, এসেছেন নাকি ?

প্রথমা নটী। তোমরা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখো না গো। কেউ কোথাও নেই। আমাদের আজকে বিদায় দেবে না নাকি ?

একজন বাদক। (বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) ও দিকে যে সব বন্ধ।

প্রথমা নটী। অ্যাঁ ! বন্ধ ! আমাদের কি কয়েদ করলে নাকি ?

দ্বিতীয়া নটী। দূর। কয়েদ করতে যাবে কেন ?

প্রথমা নটী। ভালো লাগছে না। কী হল বুঝতে পারছি নে। চলো ভাই, আর এখানে নয়। একটা কী কাণ্ড হচ্ছে। [প্রস্থান

রাজমহিষীর প্রবেশ

রাজমহিষী। কই এদের মহলেও তো মোহনকে দেখতে পাচ্ছি নে। কী হল বুঝতে পারছি নে। বামী !

বামীর প্রবেশ

এ দিককার খাওয়াদাওয়া তো সব শেষ হল, মোহনকে খুঁজে পাচ্ছি নে কেন।

বামী। মা, তুমি অত ভাবছ কেন। তুমি শুতে যাও, রাত যে পুইয়ে এল, তোমার শরীরে সইবে কেন।

রাজমহিষী। সে কি হয়। আমি যে তাকে নিজে বসিয়ে খাওয়াব বলে রেখেছি।

বামী। নিশ্চয় রাজকুমারী তাকে খাইয়েছেন। তুমি চলো, শুতে চলো।

রাজমহিষী। আমি ওই মহলে খোঁজ করতে যাচ্ছিলুম, দেখি সব দরজা বন্ধ— এর মানে কী, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

বামী। বাড়িতে গোলমাল দেখে রাজকুমারী তাঁর মহলে দরজা বন্ধ করেছেন। অনেক দিন পরে জামাই এসেছেন, আজ লোকজনের ভিড় সইবে কেন। চলো, তুমি শুতে চলো।

রাজমহিষী। কী জানি বামী, আজ ভালো লাগছে না। প্রহরীদের ডাকতে বললুম, তাদের কারো কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না।

বামী। যাত্রা হচ্ছে, তারা তাই আমোদ করতে গেছে।

রাজমহিষী। মহারাজ জানতে পারলে যে তাদের আমোদ বেরিয়ে যাবে। উদয়ের মহলও যে বন্ধ, তারা ঘুমিয়েছে বুঝি!

বামী। ঘুমোবেন না! বল কী। রাত কি কম হয়েছে।

রাজমহিষী। গান-বাজনা ছিল, জামাইকে নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে না? ওরা মনে কি ভাববে বলো তো। এ-সমস্তই ওই বউমার কাণ্ড। একটু বিবেচনা নেই। রোজই তো ঘুমোচ্ছে— একটা দিন কি আর—

বামী। যাক্, সে-সব কথা কাল হবে— আজ চলো।

রাজমহিষী। মঙ্গলার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে তো?

বামী। হয়েছে বই-কি।

রাজমহিষী। ওষুধের কথা বলেছিস?

বামী। সে-সব ঠিক হয়ে গেছে। [উভয়ের প্রস্থান

প্রতাপাদিত্য প্রহরী পীতাম্বর ও অনুচরের প্রবেশ

প্রতাপ। কত রাত আছে?

পীতাম্বর। এখনো চার দণ্ড রাত আছে।

প্রতাপ। কী যেন একটা গোলমাল শুনলুম।

পীতাম্বর। আজ্ঞে হাঁ, তাই শুনেই আমি আসছি।

প্রতাপ। কী হয়েছে?

পীতাম্বর। আসবার সময় দেখলুম বাইরের প্রহরীরা দ্বারে নেই।

প্রতাপ। অন্তঃপুরের প্রহরীরা?

পীতাম্বর। হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপ। তারা কী বললে?

পীতাম্বর। আমার কথার কোনো জবাব দিলে না— হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

প্রতাপ। রামচন্দ্র রায় কোথায়? উদয়াদিত্য বসন্তরায় কোথায়?

পীতাম্বর। বোধ করি তাঁরা অন্তঃপুরেই আছেন।

প্রতাপ। বোধ করি! তোমার বোধ-করার কথা কে জিজ্ঞাসা করছে। মন্ত্রীকে ডাকো। [পীতাম্বরের প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজজামাতা—

প্রতাপ। রামচন্দ্ররায়—

মন্ত্রী। হাঁ, তিনি রাজপুরী পরিত্যাগ করে গেছেন।

প্রতাপ। পরিত্যাগ করে গেছেন, প্রহরীরা গেল কোথা?

মন্ত্রী। বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালিয়ে গেছে।

প্রতাপ। (মুষ্টি বদ্ধ করিয়া) পালিয়ে গেছে? পালাবে কোথায়? যেখানে থাকে তাদের খুঁজে আনতে হবে। অন্তঃপুরের পাহারায় কে কে ছিল?

মন্ত্রী। সীতারাম আর ভাগবত।

প্রতাপ। ভাগবত ছিল? সে তো হুঁশিয়ার; সেও কি উদয়ের সঙ্গে যোগ দিলে?

মন্ত্রী। সে হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপ। হাত-পা-বাঁধা আমি বিশ্বাস করি নে। হাত-পা ইচ্ছে করে বাঁধিয়েছে। আচ্ছা, সীতারামকে নিয়ে এসো, সেই গর্দভের কাছ থেকে কথা বের করা শক্ত হবে না।

মন্ত্রীর প্রস্থান ও সীতারামকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ

প্রতাপ। অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হল কী করে।

সীতারাম। (করজোড়ে) দোহাই মহারাজ, আমার কোনো দোষ নেই।

প্রতাপ। সে কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করছে।

সীতারাম। আজ্ঞা না, মহারাজ— যুবরাজ— যুবরাজ আমাকে বলপূর্বক বেঁধে—

ব্যস্তভাবে বসন্তরায়ের প্রবেশ

সীতারাম। যুবরাজকে নিষেধ করলুম, তিনি—

বসন্ত। হাঁ হাঁ সীতারাম, কী বললি? অধর্ম করিস নে সীতারাম, উদয়াদিত্যের এতে কোনো দোষ নেই।

সীতারাম। আজ্ঞা না, যুবরাজের কোনো দোষ নেই।

প্রতাপ। তবে তোর দোষ!

সীতারাম। আজ্ঞে না।

প্রতাপ। তবে কার দোষ?

সীতারাম। আজ্ঞা যুবরাজ—

প্রতাপ। তাঁর সঙ্গে আর কে ছিল?

সীতারাম। আজ্ঞে, বউরানীমা—

প্রতাপ। বউরানী? ওই সেই শ্রীপুরের— (বসন্তরায়ের দিকে চাহিয়া) উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জনা নেই।

বসন্ত। বাবা প্রতাপ, এতে উদয়ের কোনো দোষ ছিল না।

প্রতাপ। দোষ ছিল না! দেখো, তুমি তার পক্ষ নিয়ে যদি কথা কও তাতে তার ভালো হবে না— এই আমি বলে দিলুম।

[বসন্তরায় কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাধবপুরের পথ

ধনঞ্জয় ও প্রজাদল

ধনঞ্জয়। একেবারে সব মুখ চুন করে আছিস কেন? মেরেছে, বেশ করেছে। এতদিন আমার কাছে আছিস বেটারা, এখনো ভালো করে মার খেতে শিখলি নে? হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে নাকি রে?

প্রথম। রাজার কাছারিতে ধরে মারলে সে বড়ো অপমান!

ধনঞ্জয়। আমার চেলা হয়েও তোদের মানসম্ভ্রম আছে? এখনো সবাই তোদের গায়ে ধুলো দেয় না রে? তবে এখনো তোরা ধরা পড়িস নি? তবে এখনো আরো অনেক বাকি আছে!

দ্বিতীয়। বাকি আর রইল কী ঠাকুর। এ দিকে পেটের জ্বালায় মরছি, ও দিকে পিঠের জ্বালাও ধরিয়ে দিলে।

ধনঞ্জয়। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে— একবার খুব করে নেচে নে।

গান

আরো প্রভু, আরো আরো!

এমনি করে আমায় মারো।

লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই—
ধরা পড়ে গেছি, আর কি এড়াই ?
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।
এবার যা করবার তা সারো সারো।
আমি হারি কিম্বা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা—
দেখি কেমনে কাঁদাতে পার।

দ্বিতীয়। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি কোথায় চলেছ বলো দেখি ?

ধনঞ্জয়। যশোর যাচ্ছি রে।

তৃতীয়। কী সর্বনাশ। সেখানে কী করতে যাচ্ছ।

ধনঞ্জয়। একবার রাজাকে দেখে আসি। চিরকাল কি তোদের সঙ্গেই কাটাব ? এবার রাজ-দরবারে নাম রেখে আসব।

চতুর্থ। তোমার উপরে রাজার যে ভারি রাগ। তার কাছে গেলে কি তোমার রক্ষা আছে।

পঞ্চম। জান তো, যুবরাজ তোমাকে শাসন করতে চায় নি বলে তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ধনঞ্জয়। তোরা যে মার সইতে পারিস নে। সেইজন্যে, তোদের মারগুলো সব নিজের পিঠে নেবার জন্যে স্বয়ং রাজার কাছে চলেছি। পেয়াদা নয় রে পেয়াদা নয়—যেখানে স্বয়ং মারের বাবা বসে আছে সেইখানে ছুটেছি।

প্রথম। না না, সে হবে না ঠাকুর, সে হবে না।

ধনঞ্জয়। খুব হবে— পেট ভরে হবে, আনন্দে হবে।

প্রথম। তবে আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

ধনঞ্জয়। পেয়াদার হাতে আশ মেটে নি বুঝি ?

দ্বিতীয়। না ঠাকুর, সেখানে একলা যেতে পারছ না, আমরাও সঙ্গে যাব।

ধনঞ্জয়। আচ্ছা, যেতে চাস তো চল। একবার শহরটা দেখে আসবি।

তৃতীয়। কিছু হাতিয়ার সঙ্গে নিতে হবে।

ধনঞ্জয়। কেন রে ? হাতিয়ার নিয়ে কী করবি ?

তৃতীয়। যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তা হলে—

ধনঞ্জয়। তা হলে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কী করে হাতিয়ার দিয়ে মারতে হয়। কী আমার উপকারটা করতেই যাচ্ছ! তোদের যদি এইরকম বুদ্ধি হয়, তবে এইখানেই থাক্।

চতুর্থ। না না, তুমি যা বলবে তাই করব, কিন্তু আমরা তোমার সঙ্গে থাকব।

তৃতীয়। আমরাও রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়। কী চাইবি রে?

তৃতীয়। আমরা যুবরাজকে চাইব।

ধনঞ্জয়। বেশ, বেশ, অর্ধেক রাজত্ব চাইবি নে?

তৃতীয়। ঠাট্টা করছ ঠাকুর!

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা কেন করব। সব রাজত্বটাই কি রাজার। অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় তো কী। চাইতে দোষ নেই রে। চেয়ে দেখিস।

চতুর্থ। যখন তাড়া দেবে?

ধনঞ্জয়। তখন আবার চাইব। তুই কি ভাবিস রাজা একলা শোনে। আরো একজন শোনবার লোক দরবারে বসে থাকেন— শুনতে শুনতে তিনি একদিন মঞ্জুর করেন, তখন রাজার তাড়াতে কিছুই ক্ষতি হয় না।

গান

আমরা বসব তোমার সনে।
তোমার শরিক হব রাজার রাজা
তোমার আধেক সিংহাসনে।
তোমার দ্বারী মোদের করেছে শির নত,
তারা জানে না যে মোদের গরব কত,
তাই বাহির হতে তোমায় ডাকি
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে।

প্রথম। বাবাঠাকুর, রাজার কাছে যাচ্ছ, কিন্তু তিনি তোমাকে সহজে ছাড়বেন না।

ধনঞ্জয়। ছাড়বেন কেন বাপ-সকল। আদর করে ধরে রাখবেন।

প্রথম। সে আদরের ধরা নয়।

ধনঞ্জয়। ধরে রাখতে কষ্ট আছে বাপ— পাহারা দিতে হয়— যে-সে লোককে কি রাজা এত আদর করে? রাজবাড়িতে কত লোক যায়, দরজা থেকেই ফেরে— আমাকে ফেরাবে না।

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধ'রে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে।
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অমনি হবে।
আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে,
সে কি অমনি হবে।
তার আগে তার পাষাণ-হিয়া গলবে করুণরসে,
সে কি অমনি হবে।
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অমনি হবে।

দ্বিতীয়। বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি রাজা হাত দেন, তা হলে কিন্তু আমরা সইতে পারব না।

ধনঞ্জয়। আমার এই গা যাঁর তিনি যদি সইতে পারেন বাবা, তবে তোমাদেরও সইবে। যেদিন থেকে জন্মেছি আমার এই গায়ে তিনি কত দুঃখই সইলেন— কত মার খেলেন, কত ধুলো মাখলেন— হায় হায়—

গান

কে বলেছে তোমায় বঁধু, এত দুঃখ সইতে।
আপনি কেন এলে বঁধু, আমার বোঝা বইতে।
প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু,
সুখের বন্ধু, দুখের বন্ধু,
তোমায় দেব না দুখ, পাব না দুখ,
হেরব তোমার প্রসন্ন মুখ,
আমি সুখে দুঃখে পারব বন্ধু চিরানন্দে রইতে—
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে।

তৃতীয়। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বলব।

ধনঞ্জয়। বলব, আমরা খাজনা দেব না।

তৃতীয়। যদি শুধোয়, কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয়। বলব, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তা হলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই— কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

চতুর্থ। বাবা, এ কথা রাজা শুনবে না।

ধনঞ্জয়। তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে ব'লেই কি সে এমন হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না? ওরে, জোর করে শুনিয়ে আসব।

পঞ্চম। ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি— তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়। দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তার বুঝি জোর নেই! তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছয় তা জানিস!

ষষ্ঠ। কিন্তু ঠাকুর, আমরা দূরে ছিলুম, লুকিয়ে বাঁচতুম— একেবারে রাজার দরজায় গিয়ে পড়ব, শেষে দায়ে ঠেকলে আর পালাবার পথ থাকবে না।

ধনঞ্জয়। দেখ্ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভালো হয় না। যতদূর পর্যন্ত হবার তা হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না। যখন চূড়ান্ত হয় তখনই শান্তি হয়।

সপ্তম। তোরা অত ভয় করছিস কেন? বাবা যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন উনি আমাদের বাঁচিয়ে আনবেন।

ধনঞ্জয়। তোদের এই বাবা যার ভরসায় চলেছে তার নাম কর্। বেটারা, কেবল তোরা বাঁচতেই চাস— পণ করে বসেছিস যে মরবি নে। কেন, মরতে দোষ কী হয়েছে। যিনি মারেন তাঁর গুণগান করবি নে বুঝি। তোরা একটু দাঁড়া, চারি দিকের ভাব-গতিকটা একটু বুঝে নিয়ে আসি। [প্রস্থান

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। ওরে, মরতে এসেছিস এখানে? মহারাজ খবর পেলে রক্ষা রাখবেন না। পালা পালা।

প্রথম। আমাদের মরণ সর্বত্রই। পালাব কোথায়?

দ্বিতীয়। তা, মরতে যদি হয় তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মরব।

উদয়। তোদের কী চাই বল্ দেখি।

অনেকে। আমরা তোমাকে চাই।

উদয়। আমাকে নিয়ে তোদের কোনো লাভ হবে না রে— দুঃখই পাবি।

তৃতীয়। আমাদের দুঃখই ভালো, কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

চতুর্থ। আমাদের মাধবপুরে ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত কাঁদছে, সে কি কেবল ভাত না পেয়ে। তা নয়। তুমি চলে এসেছ ব'লে। তোমাকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।

উদয়। আরে চুপ কর্‌, চুপ কর্‌। ও কথা বলিস নে।

পঞ্চম। রাজা তোমাকে ছাড়বে না। আমরা তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব। আমরা রাজাকে মানি নে— আমরা তোমাকে রাজা করব।

প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। কাকে মানিস নে রে। তোরা কাকে রাজা করবি।

প্রজাগণ। মহারাজ, পেন্নাম হই।

প্রথম। আমরা তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

প্রতাপ। কিসের দরবার ?

প্রথম। আমরা যুবরাজকে চাই।

প্রতাপ। বলিস কী রে।

সকলে। হাঁ মহারাজ, আমরা যুবরাজকে মাধবপুরে নিয়ে যাব।

প্রতাপ। আর ফাঁকি দিবি ! খাজনা দেবার নামটি করবি নে !

সকলে। অন্ন বিনে মরছি যে।

প্রতাপ। মরতে তো সকলকেই হবে। বেটারা, রাজার দেনা বাকি রেখে মরবি ?

প্রথম। আচ্ছা, আমরা না খেয়েই খাজনা দেব, কিন্তু যুবরাজকে আমাদের দাও। মরি তো ওঁরই হাতে মরব।

প্রতাপ। সে বড়ো দেরি নেই। তোদের সর্দার কোথায় রে ?

দ্বিতীয়। (প্রথমকে দেখাইয়া) এই-যে আমাদের গণেশ সর্দার।

প্রতাপ। ও নয়— সেই বৈরাগীটা।

প্রথম। আমাদের ঠাকুর ! তিনি তো পুজোয় বসেছেন। এখনই আসবেন। ওই-যে এসেছেন।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রবেশ

ধনঞ্জয়। দয়া যখন হয় তখন সাধনা না করেই পাওয়া যায়। ভয় ছিল, কাঙালদের দরজা থেকেই ফিরতে হয় বা। প্রভুর কৃপা হল, রাজাকে অমনি দেখতে

পেলুম। (উদয়াদিত্যের প্রতি) আর, এই আমাদের হৃদয়ের রাজা। ওকে রাজা বলতে যাই, বন্ধু বলে ফেলি।

উদয়। ধনঞ্জয়!

ধনঞ্জয়। কী রাজা। কী ভাই।

উদয়। এখানে কেন এলে।

ধনঞ্জয়। তোমাকে না দেখে থাকতে পারি নে যে।

উদয়। মহারাজ রাগ করছেন।

ধনঞ্জয়। রাগই সই। আগুন জ্বলছে তবু পতঙ্গ মরতে যায়।

প্রতাপ। তুমি এই-সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ?

ধনঞ্জয়। খেপাই বই-কি। নিজে খেপি, ওদেরও খেপাই, এই তো আমাদের কাজ।

গান

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়
কোন্ খেপা সে।
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী যে বাজে কোন্ বাতাসে।

ওরে খেপার দল, গান ধর্ রে— হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রাজাকে পেয়েছিস, আনন্দ করে নে। রাজা আমাদের মাধবপুরের নৃত্যটা দেখে নিক্।

সকলে মিলিয়া নৃত্যগীত

গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা—
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা।
তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে।

(প্রতাপাদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া) আহা, আহা, রাজা আমার, অমন নিষ্ঠুর সেজে এ কী লীলা হচ্ছে। ধরা দেবে না বলে পণ করেছিলে, আমরা ধরব বলে কোমর বেঁধে বেরিয়েছি।

প্রতাপ। দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক। মাধবপুরের প্রায় দু বছরের খাজনা বাকি— দেবে কি না বলো।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপ। দেবে না! এতবড়ো আস্পর্ধা।

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপ। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে।

প্রতাপ। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না— পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ করতে নেই— প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি— তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।

প্রতাপ। দেখো ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়। যে দুঃখ কপালে ছিল তাকে আমার বুকের উপর বসিয়েছি মহারাজ, সেই দুঃখই তো আমাকে ভুলে থাকতে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে— ব্যথা আমার বেঁচে থাক্।

প্রতাপ। দেখো বৈরাগী, তোমার চাল নেই, চুলো নেই— কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেলতে চাচ্ছ। (প্রজাদের প্রতি) দেখ্ বেটারা, আমি বলছি, তোরা সব মাধবপুরে ফিরে যা।— বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।

প্রজাগণ। আমাদের প্রাণ থাকতে সে তো হবে না।

ধনঞ্জয়। কেন হবে না রে। তোদের বুদ্ধি এখনো হল না। রাজা বললে 'বৈরাগী তুমি রইলে,' তোরা বললি 'না তা হবে না'— আর বৈরাগী লক্ষ্মীছাড়াটা কি ভেসে এসেছে? তার থাকা না-থাকা কেবল রাজা আর তোরা ঠিক করে দিবি?

গান

রইল ব'লে রাখলে কারে,
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই,
রবার যেটা সেটাই রবে।
যা খুশি তাই করতে পারো,
গায়ের জোরে রাখো মারো—
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা সন সেটাই সবে।

অনেক তোমার টাকা কড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী,
অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবছ হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও—
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে
হয় না যেটা সেটাও হবে।

মন্ত্রীর প্রবেশ

প্রতাপ। তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। এই বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও। ওকে মাধবপুরে যেতে দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী। মহারাজ—

প্রতাপ। কী। হুকুমটা তোমার মনের মতো হচ্ছে না বুঝি।

উদয়। মহারাজ, বৈরাগীঠাকুর সাধুপুরুষ।

প্রজারা। মহারাজ, এ আমাদের সহ্য হবে না। মহারাজ, অকল্যাণ হবে।

ধনঞ্জয়। আমি বলছি, তোরা ফিরে যা। হুকুম হয়েছে আমি দুদিন রাজার কাছে থাকব, বেটাদের সেটা সহ্য হল না।

প্রজারা। আমরা এইজন্যেই কি দরবার করতে এসেছিলুম? আমরা যুবরাজকেও পাব না, তোমাকেও হারাব?

ধনঞ্জয়। দেখ্, তোদের কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। হারাবি কি রে বেটা। আমাকে তোদের গাঁঠে বেঁধে রেখেছিলি? তোদের কাজ হয়ে গেছে, এখন পালা সব পালা।

প্রজারা। মহারাজ, আমরা কি আমাদের যুবরাজকে পাব না।

প্রতাপ। না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

সুরমা ও বিভা

সুরমা। বিভা, ভাই বিভা, তোর চোখে যদি জল দেখতুম তা হলে আমার মনটা যে খোলসা হত। তোর হয়ে যে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে ভাই, সব কথাই কি এমনি করে চেপে রাখতে হয়।

বিভা। কোনো কথাই তো চাপা রইল না বউরানী। ভগবান তো লজ্জা রাখলেন না।

সুরমা। আমি কেবল এই কথাই ভাবি যে, জগতে সব দাহই জুড়িয়ে যায়। আজকের মতো এমন কপাল-পোড়া সকাল তো রোজ আসবে না। সংসার লজ্জা দিতেও যেমন, লজ্জা মিটিয়ে দিতেও তেমনি। সব ভাঙাচোরা জুড়ে আবার দেখতে দেখতে ঠিক হয়ে যায়।

বিভা। ঠিক নাও যদি হয়ে যায় তাতেই বা কী। যেটা হয় সেটা তো সইতেই হয়।

সুরমা। শুনেছিস তো বিভা, মাধবপুর থেকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এসেছেন। তাঁর তো খুব নাম শুনেছি, বড়ো ইচ্ছা করে তাঁর গান শুনি। গান শুনবি বিভা? ওই দেখ্, কেবল অতটুকু মাথা নাড়লে হবে না। লোক দিয়ে বলে পাঠিয়েছি, আজ যেন একবার মন্দিরে গান গাইতে আসেন, তা হলে আমরা উপরের ঘর থেকে শুনতে পাব। ও কী, পালাচ্ছিস কোথায়?

বিভা। দাদা আসছেন।

সুরমা। তা, এলই বা দাদা।

বিভা। না, আমি যাই বউরানী। [প্রস্থান

সুরমা। আজ ওর দাদার কাছেও মুখ দেখাতে পারছে না।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

আজ ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আমাদের মন্দিরে গান গাবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি।

উদয়। সে তো হবে না।

সুরমা। কেন ?

উদয়। তাঁকে মহারাজ কয়েদ করেছেন।

সুরমা। কী সর্বনাশ, অমন সাধুকে কয়েদ করেছেন ?

উদয়। ওটা আমার উপর রাগ করে। তিনি জানেন আমি বৈরাগীকে ভক্তি করি, মহারাজের কঠিন আদেশেও আমি তাঁর গায়ে হাত দিই নি— সেইজন্যে আমাকে দেখিয়ে দিলেন রাজকার্য কেমন করে করতে হয়।

সুরমা। কিন্তু এগুলো যে অমঙ্গলের কথা— শুনলে ভয় হয়। কী করা যাবে !

উদয়। মন্ত্রী আমার অনুরোধে বৈরাগীকে গারদে না দিয়ে তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি বললেন, আমি গারদেই যাব, সেখানে যত কয়েদি আছে তাদের প্রভুর নামগান শুনিয়ে আসব। তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর জন্যে কাউকেই ভাবতে হবে না, তাঁর ভাবনার লোক উপরে আছেন।

সুরমা। মাধবপুরের প্রজাদের জন্যে আমি সব সিধে সাজিয়ে রেখেছি কোথায় সব পাঠাব ?

উদয়। গোপনে পাঠাতে হবে। নির্বোধগুলো আমাকে রাজা রাজা করে চেঁচাচ্ছিল, মহারাজ সেটা শুনতে পেয়েছেন— নিশ্চয় তাঁর ভালো লাগে নি। এখন তোমার ঘর থেকে তাদের খাবার পাঠানো হলে মনে কী সন্দেহ করবেন বলা যায় না।

সুরমা। আচ্ছা, সে আমি বিভাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আমি ভাবছি, কাল রাত্রে যারা পাহারায় ছিল সেই সীতারাম-ভাগবতের কী দশা হবে !

উদয়। মহারাজ ওদের গায়ে হাত দেবেন না, সে ভয় নেই।

সুরমা। কেন ?

উদয়। মহারাজ কখনো ছোটো শিকারকে বধ করেন না। দেখলে না, রমাই ভাঁড়কে তিনি ছেড়ে দিলেন।

সুরমা। কিন্তু শাস্তি তো তিনি একজন কাউকে না দিয়ে থাকবেন না।

উদয়। সে তো আমি আছি।

সুরমা। ও কথা বোলো না।

উদয়। বলতে বারণ কর তো বলব না। কিন্তু বিপদের জন্যে কি প্রস্তুত হতে হবে না।

সুরমা। আমি থাকতে তোমার বিপদ ঘটবে কেন ? সব বিপদ আমি নেব।

উদয়। তুমি নেবে? তার চেয়ে বিপদ আমার আর আছে না কি? যাই হোক, সীতারাম-ভাগবতের অন্নবস্ত্রের একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সুরমা। তুমি কিন্তু কিছু কোরো না। তাদের জন্যে যা করবার ভার সে আমি নিয়েছি।

উদয়। না, না, এতে তুমি হাত দিয়ো না।

সুরমা। আমি দেব না তো কে দেবে? ও তো আমারই কাজ। আমি সীতারাম ভাগবতের স্ত্রীদের ডেকে পাঠিয়েছি।

উদয়। সুরমা, তুমি বড়ো অসাবধান।

সুরমা। আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। আসল ভাবনার কথা কী জান?

উদয়। কী বলো দেখি।

সুরমা। ঠাকুরজামাই তাঁর ভাঁড়কে নিয়ে যে কাণ্ডটি করলেন, বিভা সেজন্যে লজ্জায় মরে গেছে।

উদয়। লজ্জার কথা বই-কি।

সুরমা। এতদিন স্বামীর অনাদরে বাপের 'পরেই তার অভিমান ছিল— আজ যে তার সেই অভিমান করবারও মুখ রইল না। বাপের নিষ্ঠুরতার চেয়ে তার স্বামীর এই নীচতা তাকে অনেক বেশি বেজেছে! একে তো ভারি চাপা মেয়ে, তার পরে এই কাণ্ড! আজ থেকে দেখো, ওর স্বামীর কথা আমার কাছেও বলতে পারবে না। স্বামীর গর্ব যে স্ত্রীলোকের ভেঙেছে জীবন তার পক্ষে বোঝা, বিশেষত বিভার মতো মেয়ে।

উদয়। ভগবান বিভাকে দুঃখ যথেষ্ট দিলেন, তেমনি সহ্য করবার শক্তিও দিয়েছেন।

সুরমা। সে শক্তির অভাব নেই— বিভা তোমারই তো বোন বটে।

উদয়। আমার শক্তি যে তুমি।

সুরমা। তাই যদি হয় তো সেও তোমারই শক্তিতে।

উদয়। আমার কেবলই ভয় হয় তোমাকে যদি হারাই তা হলে—

সুরমা। তা হলে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না। দেখো, একদিন ভগবান প্রমাণ করিয়ে দেবেন যে, তোমার মহত্ত্ব একলা তোমাতেই।

উদয়। আমার সে প্রমাণে কাজ নেই।

সুরমা। ভাগবতের স্ত্রী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

উদয়। আচ্ছা, চললুম, কিন্তু দেখো— [প্রস্থান

ভাগবতের স্ত্রীর প্রবেশ

সুরমা। ভোর রাত্রে আমি যে টাকা আর কাপড় পাঠিয়েছি তা তোদের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে তো ?

ভাগবতের স্ত্রী। পৌঁচেছে মা, কিন্তু তাতে আমাদের কতদিন চলবে ? তোমরা আমাদের সর্বনাশ করলে !

সুরমা। ভয় নেই কামিনী ! আমার যতদিন খাওয়াপরা জুটবে তোদেরও জুটবে। আজও কিছু নিয়ে যা। কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকিস নে ! [উভয়ের প্রস্থান

রাজমহিষী ও বামীর প্রবেশ

রাজমহিষী। এত বড়ো একটা কাণ্ড হয়ে গেল, আমি জানতেও পারলুম না।

বামী। মহারানীমা, জেনেই বা লাভ হত কী। তুমি তো ঠেকাতে পারতে না !

রাজমহিষী। সকালে উঠে আমি ভাবছি হল কী— জামাই বুঝি রাগ করেই গেল ! এ দিকে যে এমন সর্বনাশের উদ্‌যোগ হচ্ছিল, তা মনে আনতেও পারি নি। তুই সে রাত্রেই জানতিস, আমাকে ভাঁড়িয়েছিলি।

বামী। জানলে তুমি যে ভয়েই মরে যেতে ! তা মা, আর ও কথায় কাজ নেই— যা হয়ে গেছে সে হয়ে গেছে।

রাজমহিষী। হয়ে চুকলে তো বাঁচতুম— এখন যে আমার উদয়ের জন্যে ভয় হচ্ছে !

বামী। ভয় খুব ছিল, কিন্তু সে কেটে গেছে।

রাজমহিষী। কী করে কাটল।

বামী। মহারাজার রাগ বউরানীর উপর পড়েছে। তিনিও আচ্ছা মেয়ে যা হোক — আমাদের মহারাজের ভয়ে যম কাঁপে, কিন্তু ওঁর ভয় ডর নেই ! যাতে তাঁরই উপরে সব রাগ পড়ে তিনি ইচ্ছে করেই যেন তার জোগাড় করছেন।

রাজমহিষী। তার জন্যে তো বেশি জোগাড় করবার দরকার দেখি নে। মহারাজ যে ওকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন। এবারে আর তো ঠেকিয়ে রাখতে পারা যাবে না। তা তোকে যা বলেছিলুম সেটা ঠিক আছে তো !

বামী। সে-সমস্তই তৈরি হয়ে রয়েছে, সেজন্যে ভেবো না।

রাজমহিষী। আর দেরি করিস নে, আজকেই যাতে—

বামী। সে আমাকে বলতে হবে না, কিন্তু—

রাজমহিষী। যা হয় হবে— অত ভাবতে পারি নে— ওকে বিদায় করতে

পারলেই আপাতত মহারাজের রাগ পড়ে যাবে, নইলে উদয়কে বাঁচাতে পারা যাবে না। তুই যা, শীঘ্র কাজ সেরে আয়।

বামী। আমি সে ঠিক করেই এসেছি— এতক্ষণে হয়তো— [প্রস্থান

রাজমহিষী। কী জানি বামী, ভয়ও হয়।

প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। মহিষী!

মহিষী। কী মহারাজ!

প্রতাপ। এসব কাজ কি আমাকে নিজের হাতে করতে হবে?

মহিষী। কী কাজ।

প্রতাপ। ওই-যে আমি তোমাকে বলেছিলুম শ্রীপুরের মেয়েকে তার পিত্রালয়ে দূর করে দিতে হবে— এ কাজটা কি আমার সৈন্য-সেনাপতি নিয়ে করতে হবে?

মহিষী। আমি তার জন্যে বন্দোবস্ত করছি।

প্রতাপ। বন্দোবস্ত! এর আবার বন্দোবস্ত কিসের! আমার রাজ্যে কজন পালকির বেহারা জুটবে না— না কি?

মহিষী। সেজন্যে নয় মহারাজ।

প্রতাপ। তবে কী জন্যে।

মহিষী। দেখো, তবে খুলে বলি! ওই বউ আমার উদয়কে যেন জাদু করে রেখেছে সে তো তুমি জান। ওকে যদি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিই তা হলে—

প্রতাপ। এমন জাদু তো ভেঙে দিতে হবে— এ বাড়ি থেকে ওই মেয়েটাকে নির্বাসিত করে দিলেই জাদু ভাঙবে।

মহিষী। মহারাজ, এ-সব কথা তোমরা বুঝবে না— আমি ঠিক করেছি।

প্রতাপ। কী ঠিক করেছ জানতে চাই।

মহিষী। আমি বামীকে দিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে ওষুধ আনিয়েছি।

প্রতাপ। ওষুধ কিসের জন্যে?

মহিষী। ওকে ওষুধ খাওয়ালেই ওর জাদু কেটে যাবে। মঙ্গলার ওষুধ অব্যর্থ, সকলেই জানে।

প্রতাপ। আমি তোমার ওষুধ-টষুধ বুঝি নে— আমি এক ওষুধ জানি— শেষকালে সেই ওষুধ প্রয়োগ করব। আমি তোমাকে বলে রাখছি, কাল যদি ওই শ্রীপুরের মেয়ে

শ্রীপুরে ফিরে না যায় তা হলে আমি উদয়কে সুদ্ধ নির্বাসনে পাঠাব— এখন যা করতে হয় করোগে।

মহিষী। আর তো বাঁচি নে। কী যে করব মাথামুণ্ডু ভেবে পাই নে। [প্রস্থান

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। সীতারাম-ভাগবতের বেতন বন্ধ হয়েছে, সে কি রাজকোষে অর্থ নেই বলে ?

উদয়। না মহারাজ, আমি বলপূর্বক তাদের কর্তব্যে বাধা দিয়েছি, আমাকে তারই দণ্ড দেবার জন্যে।

প্রতাপ। বউমা তাদের গোপনে অর্থসাহায্য করছেন।

উদয়। আমিই তাঁকে সাহায্য করতে বলেছি।

প্রতাপ। আমার ইচ্ছার অপমান করবার জন্যে ?

উদয়। না মহারাজ, যে দণ্ড আমারই প্রাপ্য তা নিজে গ্রহণ করবার জন্যে।

প্রতাপ। আমি আদেশ করছি, ভবিষ্যতে তাদের আর যেন অর্থসাহায্য না করা হয়।

উদয়। আমার প্রতি আরো গুরুতর শাস্তির আদেশ হল।

প্রতাপ। আর বউমাকে বোলো, তিনি আমাকে একেবারেই ভয় করেন না— দীর্ঘকাল তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বলেই এরকম ঘটতে পেরেছে, কিন্তু তিনি জানতে পারবেন স্পর্ধা প্রকাশ করা নিরাপদ নয়। তিনি মনে রাখেন যেন আমার রাজবাড়ি আমার রাজত্বের বাইরে নয়। [উভয়ের প্রস্থান

মহিষী ও বামীর প্রবেশ

মহিষী। ওষুধের কী করলি ?

বামী। সে তো এনেছি— পানের সঙ্গে সেজে দিয়েছি।

মহিষী। খাঁটি ওষুধ তো ?

বামী। খুব খাঁটি।

মহিষী। খুব কড়া ওষুধ হওয়া চাই, একদিনেই যাতে কাজ হয়। মহারাজ বলেছেন কালকের মধ্যে যদি সুরমা বিদায় না হয়, তা হলে উদয়কে সুদ্ধ নির্বাসনে পাঠাবেন। আমি যে কী কপাল করেছিলুম।

বামী। কড়া ওষুধ তো বটে। বড়ো ভয় হয় মা, কী হতে কী ঘটে।

মহিষী। ভয়-ভাবনা করবার সময় নেই বামী, একটা কিছু করতেই হবে। মহারাজকে তো জানিস— কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে তাঁর কথা নড়ানো যায় না। উদয়ের জন্যে আমি দিনরাত্রি ভেবে মরছি। ওই বউটাকে বিদায় করতে পারলে তবু মহারাজের রাগ একটু কম পড়বে। ও যেন ওঁর চক্ষুশূল হয়েছে।

বামী। তা তো জানি। কিন্তু ওষুধের কথা তো বলা যায় না। দেখো, শেষকালে মা, আমি যেন বিপদে না পড়ি। আর, আমার বাজুবন্দর কথাটা মনে রেখো।

মহিষী। সে আমাকে বলতে হবে না। তোকে তো গোটছড়াটা আগাম দিয়েছি।

বামী। শুধু গোট নয় মা, বাজুবন্দ চাই। [প্রস্থান

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো যাক।

উদয়। কেন মা, সুরমা কী অপরাধ করেছে।

মহিষী। কী জানি বাছা, আমরা মেয়েমানুষ কিছু বুঝি না, বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে মহারাজের রাজকার্যের যে কী সুযোগ হবে মহারাজই জানেন।

উদয়। মা, রাজবাড়িতে যদি আমার স্থান হয়ে থাকে তবে সুরমার কি হবে না? কেবল স্থানটুকু মাত্রই তার ছিল, তার বেশি তো আর কিছু সে পায় নি।

মহিষী। (সরোদনে) কী জানি বাবা, মহারাজ কখন কী যে করেন কিছু বুঝতে পারি নে। কিন্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বউমাও বড়ো ভালো মেয়ে নয়। ও রাজ-বাড়িতে প্রবেশ করে অবধিই এখানে আর শান্তি নেই। হাড় জালাতন হয়ে গেল। তা, ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই যাক-না কেন, দেখা যাক, কী বল বাছা? ও দিন-কতক এখান থেকে গেলেই দেখতে পাবে, বাড়ির শ্রী ফেরে কি না।

[উদয় নীরব থাকিয়া কিয়ৎকাল পরে প্রস্থান

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। কই এখানে তো তিনি নেই।

মহিষী। পোড়ামুখী, আমার বাছাকে তুই কী কল্লি? আমার বাছাকে আমায় ফিরিয়ে দে। এসে অবধি তুই তার কী সর্বনাশ না কল্লি। অবশেষে— সে রাজার ছেলে —তার হাতে বেড়ি না দিয়ে কি তুই ক্ষান্ত হবি নি।

সুরমা। কোনো ভয় নেই মা। বেড়ি এবার ভাঙল। আমি বুঝতে পারছি আমার বিদায় হবার সময় হয়ে এসেছে— আর বড়ো দেরি নেই। আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে। বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলে যাচ্ছে। তোমার পায়ের ধুলো নিতে এলুম। অপরাধ যা-কিছু করেছি মাপ কোরো। ভগবান করুন, যেন আমি গেলেই শাস্তি হয়। [পদধূলি লইয়া প্রস্থান

মহিষী। ওষুধ খেয়েছে বুঝি! বিপদ কিছু ঘটবে না তো? যে যা বলুক, বউমা কিন্তু লক্ষ্মী মেয়ে। ওকে এমন জোর করে বিদায় করলে কি ধর্মে সইবে। বামী, বামী!

বামীর প্রবেশ

বামী। কী মা।

মহিষী। ওষুধটা কি বড্ড কড়া হয়েছে?

বামী। তুমি তো কড়া ওষুধের কথাই বলেছিলে।

মহিষী। কিন্তু বিপদ ঘটবে না তো?

বামী। আপদ-বিপদের কথা বলা যায় কি।

মহিষী। সত্যি বলছি বামী, আমার মনটা কেমন করছে। ওষুধটা কি খেয়েছে ঠিক জানিস।

বামী। বেশিক্ষণ নয়— এই খানিকক্ষণ হল খেয়েছে।

মহিষী। দেখলুম মুখ একেবারে সাদা ফেকাশে হয়ে গেছে। কী করলুম কে জানে। হরি, রক্ষা করো।

বামী। তোমরা তো ওকে বিদায় করতেই চেয়েছিলে।

মহিষী। না, না, ছি ছি— অমন কথা বলিস নে। দেখ্‌, আমি তোকে আমার এই গলার হারগাছটা দিচ্ছি, তুই শিগগির দৌড়ে গিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে এর উলটো ওষুধ নিয়ে আয়-গে। যা বামী, যা। শিগগির যা। [বামীর প্রস্থান

বিভার সরোদনে প্রবেশ

বিভা। মা, মা, কী হল মা।

মহিষী। কী হয়েছে বিভু।

বিভা। বউদিদির এমন হল কেন মা। তোমরা তাকে কী করলে মা। কী খাওয়ালে।

মহিষী। (উচ্চস্বরে) ওরে, বামী, বামী, শিগগির দৌড়ে যা— ওরে, ওষুধ নিয়ে আয়।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, কী হয়েছে বাপ।

উদয়। সুরমা বিদায় হয়েছে মা, এবার আমি বিদায় হতে এসেছি— আর এখানে নয়।

মহিষী। (কপালে করাঘাত করিয়া) কী সর্বনাশ হল রে, কী সর্বনাশ হল।

উদয়। (প্রণাম করিয়া) চললুম তবে।

মহিষী। (হাত ধরিয়া) কোথায় যাবি বাপ। আমাকে মেরে ফেলে দিয়ে যা।

বিভা। (পা জড়াইয়া) কোথায় যাবে দাদা। আমাকে কার হাতে দিয়ে যাবে।

উদয়। তোকে কার হাতে দিয়ে যাব। আমি হতভাগা ছাড়া তোর কে আছে। ওরে বিভা, তুইই আমাকে টেনে রাখলি— নইলে এ পাপ-বাড়িতে আমি আর এক মুহূর্ত থাকতুম না।

বিভা। বুক ফেটে গেল দাদা, বুক ফেটে গেল।

উদয়। দুঃখ করিস নে বিভা, যে গেছে সে সুখে গেছে। এ বাড়িতে এসে সেই সোনার লক্ষ্মী এই আজ প্রথম আরাম পেল। ওখানে কিসের গোলমাল।

(বাতায়ন হইতে নীচে চাহিয়া) প্রজারা এসেছে দেখছি। ওদের বিদায় করে দিয়ে আসি-গে। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নীচের আঙিনায় মাধবপুরের প্রজাদল

প্রথম। (উচ্চস্বরে) আমরা এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকব।

দ্বিতীয়। আমরা এখানে না খেয়ে মরব।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। এরা সব বৈরাগী ঠাকুরের চেলা, এদের গায়ে হাত দিতে ভয় করে। কিন্তু যেরকম গোলমাল লাগিয়েছে, এখনই মহারাজের কানে যাবে— মুশকিলে পড়ব। কী বাবা, তোমরা মিছে চেঁচামেচি করছ কেন বলো তো।

সকলে। আমরা রাজার কাছে দরবার করব।

প্রহরী। আমার পরামর্শ শোন্‌ বাবা, দরবার করতে গিয়ে মরবি। তোরা নেহাত ছোটো বলেই মহারাজ তোদের গায়ে হাত দেন নি, কিন্তু হাঙ্গামা যদি করিস তো একটি প্রাণীও রক্ষা পাবি নে।

প্রথম। আমরা আর তো কিছুই চাই নে, যে গারদে বাবা আছেন আমরাও সেখানে থাকতে চাই।

প্রহরী। ওরে, চাই বললেই হবে এমন দেশ এ নয়।

দ্বিতীয়। আচ্ছা, আমরা আমাদের যুবরাজকে দেখে যাব।

প্রহরী। তিনি তোদের ভয়েই লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন।

তৃতীয়। তাঁকে না দেখে আমরা যাব না।

সকলে। (উর্ধ্বস্বরে) দোহাই যুবরাজ বাহাদুর।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। আমি তোদের হুকুম করছি তোরা দেশে ফিরে যা।

প্রথম। তোমার হুকুম মানব— আমাদের ঠাকুরও হুকুম করেছে, তাঁর হুকুমও মানব— কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

উদয়। আমায় নিয়ে কী হবে।

প্রথম। তোমাকে আমাদের রাজা করব।

উদয়। তোদের তো বড়ো আস্পর্ধা হয়েছে। এমন কথা মুখে আনিস। তোদের কি মরবার জায়গা ছিল না।

দ্বিতীয়। মরতে হয় মরব, কিন্তু আমাদের আর দুঃখ সহ্য হয় না।

তৃতীয়। আমাদের যে বুক কেমন করে ফাটছে তা বিধাতাপুরুষ জানেন।

চতুর্থ। রাজা, তোমার দুঃখে আমাদের কলিজা জ্বলে গেল।

পঞ্চম। আমরা জোর করে নিয়ে যাব, কেড়ে নিয়ে যাব।

উদয়। আচ্ছা, শোন্‌, আমি বলি— তোরা যদি দেরি না করে এখনই দেশে চলে যাস, তা হলে আমি মহারাজের কাছে নিজে মাধবপুরে যাবার দরবার করব।

প্রথম। সঙ্গে আমাদের ঠাকুরকেও নিয়ে যাবে ?

উদয়। চেষ্টা করব। কিন্তু, আর দেরি না। এই মুহূর্তে তোরা এখান থেকে বিদায় হ।

প্রজারা। আচ্ছা, আমরা বিদায় হলুম। জয় হোক। তোমার জয় হোক।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্ত্রী ও প্রতাপাদিত্য

মন্ত্রী। যুবরাজ কারাদণ্ড তো এতদিন ভোগ করলেন, এখন ছেড়ে দিন।

প্রতাপ। কারাদণ্ড দেবার কারণ ঘটেছিল, ছেড়ে দেবার তো কারণ ঘটে নি।

মন্ত্রী। কেবল সন্দেহমাত্রে ওঁকে শাস্তি দিয়েছেন। প্রমাণ তো পান নি।

প্রতাপ। মাধবপুরের প্রজারা দরখাস্ত নিয়ে দিল্লিতে চলেছিল, হাতে হাতে ধরা পড়েছিল, সেও কি তুমি অবিশ্বাস কর।

মন্ত্রী। আজ্ঞে না মহারাজ, অবিশ্বাস করছি নে।

প্রতাপ। ওরা তাতে লিখেছে আমি দিল্লীশ্বরের শত্রু, ওদের ইচ্ছা আমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে উদয়কে সিংহাসন দেওয়া হয়— এ কথাগুলো তো ঠিক?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, সে দরখাস্ত তো আমি দেখেছি।

প্রতাপ। এর চেয়ে তুমি আর কী প্রমাণ চাও।

মন্ত্রী। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের যুবরাজ আছেন, এ কথা আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারি নে।

প্রতাপ। তোমার বিশ্বাস কিম্বা তোমার আন্দাজের উপর নির্ভর করে তো আমি রাজকার্য চালাতে পারি নে। যদি বিপদ ঘটে তবে 'ওই যা, মন্ত্রী আমার ভুল বিশ্বাস করেছিল' বলে তো নিষ্কৃতি পাব না।

মন্ত্রী। কিন্তু ন্যায়বিচার করা রাজত্বের অঙ্গ মহারাজ। যুবরাজকে যে সন্দেহে কারাদণ্ড দিয়েছেন তার যদি কোনো মূল না থাকে তা হলেও রাজকার্যের মঙ্গল হবে না।

প্রতাপ। রাজ্যরক্ষা সহজ ব্যাপার নয় মন্ত্রী। অপরাধ নিশ্চয় প্রমাণ হলে তার পরে দণ্ড দেওয়াই যে রাজার কর্তব্য তা আমি মনে করি নে। যেখানে সন্দেহ করা যায় কিম্বা যেখানে ভবিষ্যতেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে, সেখানেও রাজা দণ্ড দিতে বাধ্য।

মন্ত্রী। আপনি রাগ করবেন, কিন্তু আমি এ ক্ষেত্রে সন্দেহ কিম্বা ভবিষ্যৎ অপরাধের সম্ভাবনা পর্যন্ত কল্পনা করতে পারি নে।

প্রতাপ। মাধবপুরের প্রজারা এখানে এসেছিল কি না?

মন্ত্রী। হাঁ।

প্রতাপ। তারা ওকেই রাজা করতে চেয়েছিল কি না?

মন্ত্রী। হাঁ চেয়েছিল।

প্রতাপ। তুমি বলতে চাও এ-সকলের মধ্যে উদয়ের কোনো হাত ছিল না?

মন্ত্রী। যদি হাত থাকত তা হলে এত প্রকাশ্যে এ কথার আলোচনা হত না।

প্রতাপ। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার নিঃসংশয় নিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়েই বসে থাকো— বিপদটা একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকব না। রাজার দায়িত্ব মন্ত্রীর দায়িত্বের চেয়ে ঢের বেশি। অন্যায়ের দ্বারা অবিচারের দ্বারাও রাজাকে রাজধর্ম পালন করতে হয়।

মন্ত্রী। অন্তত বৈরাগী ঠাকুরকে ছেড়ে দিন মহারাজ। প্রজাদের মনে একসঙ্গে এতগুলো বেদনা চাপাবেন না।

প্রতাপ। আচ্ছা, সে আমি বিবেচনা করে দেখব।

মন্ত্রী। চলুন-না মহারাজ, একবার স্বয়ং ভিতরে গিয়ে যুবরাজকে দেখে আসুন-না। ওঁর মুখ দেখলে, ওঁর দুটো কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন, গোপনে অপরাধ ওঁর দ্বারা কখনো ঘটতেই পারে না।

প্রতাপ। যারা মুখের ভাব দেখে আর হায়-হায় আহা-উহু করতে করতে রাজ্যশাসন করে তারা রাজা হবার যোগ্য নয়।

বসন্তরায়ের প্রবেশ

বসন্ত। বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও। পদে পদেই যদি সে তোমাদের কাছে অপরাধ করে তবে তাকে এই বুড়োর কাছে দাও-না।

[প্রতাপ নিরুত্তর

তুমি যা মনে করে উদয়কে শাস্তি দিচ্ছ, সেই অপরাধ যে যথার্থ আমার। আমিই যে রামচন্দ্ররায়কে রক্ষা করবার জন্যে চক্রান্ত করেছিলুম।

প্রতাপ। খুড়োমশায়, বৃথা কথা বলে আমার কাছে কোনোদিন কেউ কোনো ফল পায় নি।

বসন্ত। ভালো, আমার আর-একটা ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে। আমি একবার কেবল

উদয়কে দেখে যেতে চাই— আমাকে সেই কারাগৃহে প্রবেশ করতে কেউ যেন বাধা না দেয় এই অনুমতি দাও।

প্রতাপ। সে হতে পারবে না।

বসন্ত। তা হলে আমাকে তার সঙ্গে বন্দী করে রাখো। আমাদের দুজনেরই অপরাধ এক— দণ্ডও এক হোক— যতদিন সে কারাগারে থাকবে আমিও থাকব।

[নীরবে প্রতাপের প্রস্থান

রামমোহনের প্রবেশ

বসন্ত। কী মোহন। কী খবর।

রামমোহন। মাকে আমাদের চন্দ্রদ্বীপে আসবার কথা বলতে এসেছিলুম।

বসন্ত। প্রতাপকে জানিয়েছিস নাকি।

রামমোহন। তাঁকে জানাবার আগে একবার স্বয়ং মাকে নিবেদন করতে গিয়েছিলুম।

বসন্ত। তা, বিভা কী বললে।

রামমোহন। তিনি বললেন, তিনি যেতে পারবেন না।

বসন্ত। কেন, কেন। অভিমান করেছে বুঝি? সেটা মিছে অভিমান, রামমোহন, সে বেশিক্ষণ থাকবে না, একটু তুমি সবুর করো।

রামমোহন। তিনি বললেন, 'দাদাকে ছেড়ে আজ আমি যেতে পারব না।'

বসন্ত। আহা, সে কথা বলতে পারে বটে।

রামমোহন। বড়ো বুক ফুলিয়ে এসেছিলেম। মহারাজ নিষেধ করেছিলেন।— বলেছিলেম, মালক্ষ্মী আমাকে বড়ো দয়া করেন, আমার কথা ঠেলতে পারবেন না। আমাদের রাজা বললেন, প্রতাপাদিত্যের ঘরের মেয়েকে নিতে পারব না। আমি বললেম, তিনি কি কেবল প্রতাপাদিত্যের ঘরের মেয়ে? আপনার ঘরের রানী নন? শ্বশুরের উপর রাগ করে নিজের সিংহাসনকে অপমান করবেন? এই বলে চলে এসেছি, আজ আমি ফিরব কোন্ মুখে?

বসন্ত। বিভাকে দোষ দিয়ো না রামমোহন।

রামমোহন। না খুড়োমহারাজ, আমাদের মহারাজার ভাগ্যকেই দোষ দিই— এমন লক্ষ্মীকে পেয়েও হেলায় হারাতে বসেছেন।

বসন্ত। হারাবে কেন রামমোহন। শুভদিন আসবে, আবার মিলন হবে।

রামমোহন। কুপরামর্শ দেবার লোক যে ঢের আছে। ওরা বলছে যাদবপুরের ঘরের মেয়ে এনে তাকে ওঁর পাটরানী করবে।

বসন্ত। এও কি কখনো সম্ভব ? আমাদের বিভাকে ত্যাগ করবে ?

রামমোহন। সেই চক্রান্তই হয়েছে, তাই আমি ছুটে এলুম। অপরাধ করলেন নিজে, আর যিনি সতীলক্ষ্মী তাঁকে দণ্ড দিলেন। এও কি কখনো সইবে ? হোক-না কলি, ধর্ম কি একেবারে নেই। চললুম মহারাজ, আশীর্বাদ করবেন, আমাদের রাজার যেন সুমতি হয়।

বসন্ত। এখানকার বিপদ কেটে গেলে আমি নিজে যাব তোমাদের ওখানে। এমন অন্যায় হতে দেব কেন। [রামমোহনের প্রণাম করিয়া প্রস্থান

সীতারামের প্রবেশ

কী সীতারাম, খবর কি ?

সীতারাম। কারাগারে আমরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছি, এখনই যুবরাজ বেরিয়ে আসবেন।

বসন্ত। আবার আর-একটা উৎপাত ঘটবে না তো ? একটা ফাঁড়া কাটাতে গিয়ে আর-একটা ফাঁড়া ঘাড়ে চাপে যে। আমার ভালো ঠেকছে না।

সীতারাম। কাছেই নৌকো তৈরি আছে খুড়োমহারাজ, তাঁকে নিয়ে এখনই আপনাকে পালাতে হবে। এ ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

বসন্ত। তার আগে বিভার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি-গে।

সীতারাম। না, তার সময় নেই।

বসন্ত। দেরি করব না সীতারাম, তার সঙ্গে জীবনে আর তো দেখা হবে না।

সীতারাম। তা হলে সমস্ত আমাদের বৃথা হয়ে যাবে। ওই দেখুন, আগুনের শিখা জ্বলে উঠেছে।

বসন্ত। আগুন থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে তো রে ?

সীতারাম। কারাগারের মধ্যেই আমাদের চর আছে, এই এলেন বলে, দেখুন-না।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। দাদামশায় যে !

বসন্ত। আয় ভাই, আয়।

উদয়। সমস্তই স্বপ্ন নাকি ? আমি তো বুঝতে পারছি নে।

সীতারাম। যুবরাজ, এই দিকে নৌকো আছে, শীঘ্র আসুন।

উদয়। কেন, নৌকো কেন।

সীতারাম। নইলে আবার প্রহরীরা ধরে ফেলবে।

উদয়। কেন, আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি।

বসন্ত। হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি করে নিয়ে চলেছি।

সীতারাম। কয়েদখানায় আমিই আগুন লাগিয়েছি।

উদয়। কী সর্বনাশ! মরবি যে রে!

সীতারাম। যতদিন তুমি কয়েদে ছিলে, প্রতিদিন আমি মরেছি।

উদয়। না, আমি পালাব না।

বসন্ত। কেন দাদা।

উদয়। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে অন্যদের বিপদের জালে জড়াতে পারব না।

বসন্ত। অন্যদের যে তাতেই আনন্দ। তোমার তাতে কোনো অপরাধ নেই।

উদয়। সে আমি পারব না। কারাগারের বন্ধন আমার পক্ষে তার চেয়ে অনেক ভালো। যদি পালাই তবে মুক্তি আমার ফাঁস হবে। আমি কারাগারে ফিরব।

বসন্ত। কারাগার তো গেছে ছাই হয়ে, তুমি ফিরবে কোথায়।

উদয়। ওই দিকে একখানা ঘর বাকি আছে।

বসন্ত। তা হলে আমিও যাই।

উদয়। না, তুমি যেতে পারবে না। কিছুতেই না।

বসন্ত। আচ্ছা, তা হলে আমি বিভার কাছে যাই। তার প্রাণটা যে কিরকম করছে, সে আমিই জানি।

উদয়। সীতারাম, আমার জন্যে যে নৌকো তৈরি আছে সে নৌকোয় চড়ে এখন তুই রায়গড়ে চলে যা।

সীতারাম। (উদয়কে প্রণাম করিয়া) তা ছাড়া আমার আর গতি নেই। প্রভু, যদি কোনো পুণ্য করে থাকি আর-জন্মে যেন তোমার দাস হয়ে জন্মাই।

[উভয়ের প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

নৃত্য ও গীত

ওরে আগুন আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকলভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই।

তুমি দু হাত তুলে আকাশ-পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে,
একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই।
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরাবে ভাই,
আগল যাবে সরে—
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি
দিবি রে ছাই করে।
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ঐ নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল দাহ মিটবে দাহে
ঘুচবে সব বালাই।

[প্রস্থান

প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রীর প্রবেশ

প্রতাপ। দৈবাৎ আগুন লাগার কথা আমি একবর্ণ বিশ্বাস করি নে। এর মধ্যে চক্রান্ত আছে। খুড়ো কোথায়?

মন্ত্রী। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।

প্রতাপ। হুঁ। তিনিই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে ছোঁড়াটাকে নিয়ে পালিয়েছেন।

মন্ত্রী। তিনি সরল লোক— এ সকল বুদ্ধি তো তাঁর আসে না।

প্রতাপ। বাইরে থেকে যাকে সরল বলে বোধ হবে না তার কুটিল বুদ্ধি বৃথা।

মন্ত্রী। কারাগার ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যদি—

প্রতাপ। কোনো আশঙ্কা নেই, আমি বলছি উদয়কে নিয়ে খুড়োমহারাজ পালিয়েছেন। বৈরাগীটার খবর পেয়েছ?

মন্ত্রী। না মহারাজ।

প্রতাপ। সে বোধ হয় পালিয়েছে। সে যদি থাকে তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ, তাকে আবার কিসের প্রয়োজন।

প্রতাপ। আর কিছু নয়— সেই ভাঁড়টাকে নিয়ে একটু আমোদ করতে পারতুম, তার কথা শুনতে মজা আছে।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

ধনঞ্জয়। জয় হোক মহারাজ। আপনি তো আমাকে ছাড়তেই চান না, কিন্তু কোথা থেকে আগুন ছুটির পরোয়ানা নিয়ে হাজির ; কিন্তু না বলে যাই কী করে। তাই হুকুম নিতে এলুম।

প্রতাপ। ক দিন কাটল কেমন ?

ধনঞ্জয়। সুখে কেটেছে, কোনো ভাবনা ছিল না। এ-সব তারই লুকোচুরি খেলা— ভেবেছিল গারদে লুকোবে, ধরতে পারবে না। কিন্তু ধরেছি, চেপে ধরেছি, তার পর খুব হাসি, খুব গান। বড়ো আনন্দে গেছে, আমার গারদ-ভাইকে মনে থাকবে।

গান

ওরে শিকল, তোমায় অঙ্গে ধরে
দিয়েছি ঝংকার।
তুমি আনন্দে ভাই, রেখেছিলে
ভেঙে অহংকার।
তোমায় নিয়ে করে খেলা
সুখে দুঃখে কাটল বেলা—
অঙ্গ বেড়ি দিলে বেড়ি,
বিনা দামের অলংকার।
তোমার 'পরে করি নে রোষ,
দোষ থাকে তো আমারই দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ংকর।
অন্ধকারে সারা রাতি
ছিলে আমার সাথের সাথি,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার।

প্রতাপ। বল কী বৈরাগী, গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের।

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দ। অভাব কিসের। তোমাকে সুখ দিতে পারেন আর আমাকে পারেন না ?

প্রতাপ। এখন তুমি যাবে কোথায়।

ধনঞ্জয়। রাস্তায়।

প্রতাপ। বৈরাগী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার ওই রাস্তাই ভালো— আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল। ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক ; আমরা কোথায় লাগি। তা হলে অনুমতি যদি হয় তো এবারকার মতো বেরিয়ে পড়ি।

প্রতাপ। আচ্ছা, কিন্তু মাধবপুরে যেয়ো না।

ধনঞ্জয়। সে কেমন করে বলি, যখন নিয়ে যাবে তখন কার বাবার সাধ্য বলে যে যাব না। [প্রস্থান

মন্ত্রী। মহারাজ ! ওই তো দেখি যুবরাজ আসছেন।

প্রতাপ। তাই তো, পালায় নি তবে।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। কী, তুমি যে মুক্ত দেখি ?

উদয়। কেমন করে বলব মহারাজ। কারাগার পুড়লেই কি কারাগার যায়।

প্রতাপ। তুমি যে পালিয়ে গেলে না ?

উদয়। মেয়াদ না ফুরোলে পালাব কী করে। মহারাজের সঙ্গে আমার যে চিরবন্ধনের সম্বন্ধ, সেটা যখন নিজে ছিন্ন করে দেবেন সেইদিনই তো ছাড়া পাব।

প্রতাপ। তোমাকে ত্যাগ ক'রে ?

উদয়। তা ছাড়া আর কী বলব। আমাকে গ্রহণ করে আমাদের তো কারো কোনো সুখ নেই।

প্রতাপ। তুমি অথচ সিংহাসনের যোগ্য নও, সেই সিংহাসনে তোমার অধিকার আছে, এর থেকেই যত দুঃখ। যেখানে যার স্থান নয় সেইখানেই তার বন্ধন।

উদয়। না মহারাজ, আমি যোগ্য নই। আপনার এই সিংহাসন হতে আমাকে অব্যাহতি দিন এই ভিক্ষা।

প্রতাপ। তুমি যা বলছ তা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তা কী করে জানব।

উদয়। আজ আমি মা-কালীর চরণ স্পর্শ করে শপথ করব, আপনার রাজ্যের সূচ্যগ্র ভূমিও আমি কখনো শাসন করব না ; সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

প্রতাপ। তুমি তবে কী চাও।

উদয়। মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই নে— কেবল আমাকে পিঞ্জরের পশুর মতো গারদে পুরে রাখবেন না। আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করুন, আমি একাকী কাশী চলে যাই।

প্রতাপ। আচ্ছা বেশ। আমি এর ব্যবস্থা করছি।

উদয়। আমার আর-একটি প্রার্থনা আছে মহারাজ। আমি বিভাকে নিজে তার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবার অনুমতি চাই।

প্রতাপ। তার আবার শ্বশুরবাড়ি কোথায়।

উদয়। তাই যদি মনে করেন তবে সেই অনাথা কন্যাকে আমার কাছে থাকবার অনুমতি দিন। এখানে তো তার সুখও নেই, কর্মও নেই।

প্রতাপ। তার মাতার কাছে অনুমতি নিতে পার। [মন্ত্রীর প্রস্থান

মহিষী ও বিভার প্রবেশ

মহিষী। উদয় কি বেঁচে আছে।

প্রতাপ। ভয় নেই। বেঁচে আছে। তুমি এখানে যে ?

মহিষী। পারব কেন থাকতে। শুনলুম কারাগারে আগুন লেগেছে। উদয়, বাবা আমার, এখন ঘরে চল্।

উদয়। আমার ঘর নেই। আমি যাচ্ছি কাশী।

মহিষী। সে কী কথা। তা হলে আমাকে মেরে ফেলে যা।

উদয়। মা, এতদিনে তুমি কি ঠাউরেছ তোমার আশ্রয়েই ছেলে নিরাপদে থাকবে। আমার তো শিক্ষার আর কিছু বাকি নেই। আজ তোমাদেরই কল্যাণে বিশ্বনাথের আশ্রয় পেয়েছি। কারাগারের সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্য সব আশ্রয়ই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কেঁদে কী হবে মা, আজই চোখের জল মোছবার সময়।

বিভা। দাদা, আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

উদয়। কিছুতে না। (মাতার প্রতি) বিভারও তো আর জায়গা নেই— এখন তুমি অনুমতি করো, আমার সঙ্গে ওকেও অভয়-আশ্রয়ে নিয়ে যাই।

মহিষী। তুই যদি যাবি উদয়, তো ও যাক তোর সঙ্গে— তোর মায়ের হয়ে ওই তোকে দেখতে শুনতে পারবে। ইতিমধ্যে ওর শ্বশুরবাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিই, যদি তারা—

প্রতাপ। চুপ করো, ওর আবার শ্বশুরবাড়ি কোথায়।

মহিষী। গর্ভে ধরে সংসারে কী দুঃখই এনেছি। রাজার বাড়িতে এরা জন্মেছিল এইজন্যেই? এখন একবার বাড়িতে চল্— তার পরে—

উদয়। না মা, ও বাড়িতে আর নয়— রাস্তা বেয়ে সোজা চলে যাব, আমাদের পিছনে তাকাবার কিছুই নেই।

মহিষী। তোরা রাস্তায় বেরিয়ে যাবি, আর এই রাজবাড়ির অন্ন যে আমার বিষের মতো ঠেকবে।

উদয়। এখন আমাদের আশীর্বাদ করে বিদায় করো।

মহিষী। বুঝতে পারছি, তোদের দুঃখের দিন ঘুচল। এবার ঈশ্বর তোদের সুখেই রাখবেন। তবু দুর্বল মন মানে না যে। আজ থেকে মায়ের যোগ্য সেবা তোদের আর তো কিছু করতে পারব না, তোদের জন্যে যশোরেশ্বরীর কাছে রোজ পুজো দেব।

বিভা। দাদামহাশয় কোথায় দাদা।

উদয়। তিনি কাছেই কোথাও আছেন— এখনই দেখা হবে।

প্রতাপ। না, দেখা হবে না। কোনোদিন না।

উদয়। কেন, তাঁর কী হল?

প্রতাপ। তাঁর বিচার বাকি আছে। সে-সব কথা তোমাদের ভাববার কথা নয়।

উদয়। না হতে পারে, কিন্তু এই বলে গেলুম মহারাজ, রাজ্য তো মাটির নয়, রাজ্য হল পুণ্যের— সে পুণ্য রাজাকে নিয়ে, প্রজাকে নিয়ে, সকলকে নিয়ে। বিভা, আর কাঁদিস নে। দাদামশায় তো মহাপুরুষ, ভয়ে তাঁর ভয় নেই, মৃত্যুতে তাঁর মৃত্যু নেই। আমাদের মতো সামান্য মানুষই ঘা খেয়ে মরে।

প্রতাপ। এখন এসো উদয়, কালীর মন্দিরে এসো, মায়ের পা ছুঁয়ে শপথ করতে হবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বরবেশে রামচন্দ্র

রমাই। আপনি তো চলে এলেন, এ দিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে পড়লেন

মন্ত্রী। কিরকম হে রমাই।

রমাই। রাজার অভিপ্রায় ছিল, কন্যাটি বিধবা হলে হাতের নোয়া আর বালা দুগাছি বিক্রি করে রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাতে ব্যাঘাত করাতে তম্বি কত।

মন্ত্রী। মহারাজ, শুনতে পাই প্রতাপাদিত্য আপসোসে সারা হচ্ছেন। এ দিকে একটু ইশারা করলেই নিজের খরচে এখনো মেয়েটিকে পৌঁছিয়ে দিতে রাজি।

রমাই। সেটা বিনি-খরচায় হতে পারে, কিন্তু ফিরে পাঠাবার খরচাটা মহারাজের নিজের গাঁট থেকে দিতে হবে।

মন্ত্রী। সে তো বটেই। বিবাহ করেছেন তাঁদের বাড়িতে, কিন্তু নিজের বাড়িতে আনবার বেলা তো বিচার করতে হয়। কী বল রমাই।

রমাই। সে তো বটেই। পাঁকে যদি মহারাজা পা দিয়ে থাকেন সে তো পাঁকের বাবার ভাগ্যি, তা বলে ঘরে ঢোকবার সময় পা ধুয়ে আসবেন না ?

মন্ত্রী। বেশ বলেছ রমাই।

রমাই। মন্ত্রিবর, শুভকর্মে মহারাজের যশুরে শ্বশুরমশায়কে একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে তো ? কী জানি, মনে দুঃখ করতেও পারেন। [সকলের হাস্য

বরণ করবার জন্যে এয়োস্ত্রীদের মধ্যে শাশুড়ি-ঠাকরুনকেও ভুললে চলবে না। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, সেটাও চাই— অতএব সেখানে যখন মিষ্টান্ন পাঠানো হবে তখন সেই সঙ্গে দুচারছড়া কাঁচা রম্ভাও পাঠানো ভালো। কী বল মন্ত্রী।

মন্ত্রী। তার উপরে কথা। [উচ্চহাস্য

রমাই। আর দেখেন মহারাজ, যুবরাজকে একখানা পত্র লিখে জানাবেন যে, তোমাদের রাজত্ব রাজকন্যা তোমাদেরই থাক্‌, প্রজাপতির কৃপায় জগতে শালা-শ্বশুরের অভাব নেই। কী বলেন আপনারা। [সকলের উচ্চহাস্য

রামচন্দ্র। রমাই, তুমি যাও, লোকজনদের দেখো-গে। [রমাইয়ের প্রস্থান

সেনাপতি, তুমি এইখানে বোসো, রমাইয়ের হাসি আমার ভালো লাগছে না।

সেনাপতি ফর্নাণ্ডিজ। মহারাজ, রমাইয়ের হাসি গন্ধকের ধোঁয়ার মতো, তার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে।

রামচন্দ্র। ঠিক বলেছ সেনাপতি, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে চলে যাই। আজ গান বাজনা ভালো জমছে না ফর্নাণ্ডিজ।

ফর্নাণ্ডিজ। না মহারাজ, জমছে না, আমার বুকে বাজছে— আর-এক দিনের কথা মনে পড়ছে।

রামচন্দ্র। গুজবটা কি সত্য।

ফর্নাণ্ডিজ। কিসের গুজব।

রামচন্দ্র। ওই তাঁরা কি যশোর থেকে আসছেন।

ফর্নাণ্ডিজ। হাঁ মহারাজ, শুনেছি বটে। আদেশ করেন তো তাঁদের এগিয়ে আনি-গে।

রামচন্দ্র। এগিয়ে আনবে? তা হলে কিন্তু মন্ত্রী রমাই সবাই হাসবে।

ফর্নাণ্ডিজ। আদেশ করেন তো ওদের হাসিসুদ্ধ মুখ একেবারে চেঁছে পরিষ্কার করে দিই।

রামচন্দ্র। না, না, গোলমাল করে কাজ নেই। কিন্তু সেনাপতি, আমি তোমাকে গোপনে বলছি, কাউকে বোলো না, আমি তাকে কিছুতে ভুলতে পারছি নে। কালই রাত্রে তাকে স্বপ্নে দেখেছি।

ফর্নাণ্ডিজ। মহারাজ, আমি আর কী বলব— তাঁর জন্যে প্রাণ দিলে যদি কোনো কাজেও না লাগে তবু দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।

রামচন্দ্র। দেখো সেনাপতি, এক কাজ করলে হয় না?

ফর্নাণ্ডিজ। কী বলুন।

রামচন্দ্র। মোহন যদি একবার খবর পায় যে, তাঁরা আসছেন তা হলে সে আপনি ছুটে যাবে। একবার কোনোমতে তাকে সংবাদটা জানাও-না। কিন্তু দেখো, আমার নাম কোরো না।

ফর্নাণ্ডিজ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রমাইয়ের প্রবেশ

রমাই। মহারাজ, যশোর থেকে তো কেউ নিমন্ত্রণ রাখতে এল না। রাগ করলে-বা।

রামচন্দ্র। হা, হা, হা, হা।

রমাই। আপনার প্রথম পক্ষের শ্বশুর তো সেবার তাঁর কন্যার সিঁথির সিঁদুরের উপর হাত বুলাবার চেষ্টায় ছিলেন— এবারে তাঁকে—

রামমোহন দ্রুত আসিয়া

রামমোহন। চুপ। আর একটি কথা যদি কও তা হলে—

রমাই। বুঝেছি বাবা, আর বলতে হবে না।

রামমোহন। মহারাজ, হাসবেন না মহারাজ। আজকের দিনে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু মহারাজার ওই হাসি সহ্য করতে পারছি নে।

রামচন্দ্র। ফের বেয়াদবি করছিস।

রামমোহন। আমার বেয়াদবি! বেয়াদবি কে করলে বুঝলে না!

ফর্নাণ্ডিজ। মোহন, একটা কথা আছে ভাই, একটু এ দিকে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান

রামচন্দ্র। ওরা সব গান বন্ধ করে হাঁ করে বসে রইল কেন। ওদের একটু গাইতে বলো-না। আজ সব যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে। গান ধরো।

গান

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে,
উছলে পড়ে আলো—
ও রজনীগন্ধা, তোমার
গন্ধসুধা ঢালো।
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে
ডাক পড়েছে কোথায় তারে,
ফুলের বনে যার পাশে যায়
তারেই লাগে ভালো।
নীল গগনের ললাটখানি
চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন
মেলেছে আজ পাখা।
পারিজাতের কেশর নিয়ে
ধরায়, শশি, ছড়াও কি এ।
ইন্দ্রপুরীর কোন্ রমণী
বাসরপ্রদীপ জ্বালো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথে

উদয়াদিত্য ও ধনঞ্জয়

ধনঞ্জয়। আজ রাস্তায় মিলন, আজ বড়ো আনন্দ। আজ আর ভণ্ডামির কোনো দরকার নেই, আজ আর যুবরাজ নয়। আজ তো তুমি ভাই। আয় ভাই, কোলাকুলি করে নিই। [কোলাকুলি

দাদা, যেখানে দীন দরিদ্র সবাই এসে মেলে সেই দরাজ জায়গাটাতে এসে দাঁড়িয়েছ, আজ আর কিছু ভাবনা নেই।

গান

সকল ভয়ের ভয় যে তারে
কোন্ বিপদে কাড়বে।
প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ গাঁথা
কোন্ কালে সে ছাড়বে।
নাহয় গেল সবই ভেসে—
রইবে তো সেই সর্বনেশে,
যে লাভ সকল ক্ষতির শেষে
সে লাভ কেবল বাড়বে।
সুখ নিয়ে ভাই, ভয়ে থাকি—
আছে আছে দেয় সে ফাঁকি,
দুঃখে যে সুখ থাকে বাকি
কেই বা সে সুখ নাড়বে।
যে পড়েছে পড়ার শেষে
ঠাঁই পেয়েছে তলায় এসে—
ভয় মিটেছে, বেঁচেছে সে,
তারে কে আর পাড়বে।

উদয়। বৈরাগী ঠাকুর, আমি তোমার সঙ্গ ধরলুম, আর ছাড়ছি নে কিন্তু।

ধনঞ্জয়। তুমি ছাড়লে আমি ছাড়ি কই ভাই। মনে বেশ আনন্দ আছে তো? খুঁতখুঁত কিছু নেই তো?

উদয়। কিছু না, বেশ আছি।

ধনঞ্জয়। তবে দাও একটু পায়ের ধুলো।

উদয়। ও কী কর, ও কী কর। অপরাধ হবে যে।

ধনঞ্জয়। দাদা, এতবড়ো বোঝা নিজের হাতে ভগবান যার কাঁধ থেকে নামিয়ে দেন, সে যে মহাপুরুষ। তোমাকে দেখে আমার সর্ব গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। একবার দিদিকে আনো, তাকে একবার দেখি।

উদয়। সে তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে, তাকে ডেকে আনছি।

বিভার প্রবেশ ও বৈরাগীকে প্রণাম

ধনঞ্জয়। ভয় নেই দিদি, ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। এই দেখ্-না, আমাকে দেখ্-না— আমি তাঁর রাস্তার ছেলে— রাস্তার কোলে-কোলেই দিন কেটে গেল— দিনরাত্রি একেবারে ধুলোয় ধুলোময় হয়ে বেড়াই, মায়ের আদরে লাল হয়ে উঠি। আমার মায়ের ওই ধুলোঘরে আজ তোমার নতুন নিমন্ত্রণ, কিন্তু মনে কোনো ভয় রেখো না।

বিভা। বৈরাগী ঠাকুর, তুমি কোথায় যাচ্ছ। তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে।

ধনঞ্জয়। কোথায় যাব সে কথা আমার মনেই থাকে না। ওই রাস্তাই তো আমাকে মজিয়েছে। এই মাটি দেখলে আমাকে মাটি করে দেয়।

গান

সারিগানের সুর

গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।
ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধুলায় রে।
ও যে আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
ও যে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে
যায় রে কোন্ চুলায় রে।
ও যে কোন্ বাঁকে কী ধন দেখাবে,
কোন্‌খানে কী দায় ঠেকাবে,
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে—
ভেবেই না কুলায় রে।

উদয়। ঠাকুর, তুমি কি ভাবছ বিভা আমার পথের সঙ্গিনী। ওকে আমি ওর শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

ধনঞ্জয়। বেশ, বেশ, হরি যেখানে নিয়ে যান সেইখানেই ভালো। দেখি তিনি কোন্‌খানে পৌঁছিয়ে দেন, আমিও সঙ্গে আছি। কোনো ভয় নেই দিদি, কোনো ভয় নেই। [প্রস্থান

বিভা। দাদা, ওই-যে মোহন আসছে। ওর সঙ্গে আমি একটু আলাদা কথা কইতে চাই।

উদয়। আচ্ছা, আমি একটু সরে যাচ্ছি। [প্রস্থান

রামমোহনের প্রবেশ

বিভা। মোহন!

রামমোহন। মা, আজ তুমি এলে?

বিভা। হাঁ মোহন, তুই কি আমায় নিতে এলি।

রামমোহন। না মা, অত ব্যস্ত হোয়ো না, আজ থাক্‌।

বিভা। কেন মোহন, আজ কেন নয়।

রামমোহন। আজ দিন ভালো নয় যে মা, আজ দিন ভালো নয়।

বিভা। ভালো দিন নয়? তবে আজ এত উৎসবের আয়োজন কেন। বরাবর দেখলুম রাস্তায় আলোর মালা, বাঁশি বাজছে। আজ বুঝি শুভলগ্ন পড়েছে।

রামমোহন। শুভলগ্ন, মিথ্যা কথা! সমস্ত ভুল!

বিভা। মোহন, তোর কথা আমি বুঝতে পারছি নে, কী হয়েছে আমাকে সত্যি করে বল্‌। মহারাজ কি রাগ করেছেন?

রামমোহন। রাগ করেছেন বই-কি।

বিভা। তিনি তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

রামমোহন। দেরি হয়ে গেছে মা, দেরি হয়ে গেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সময় গেলে আর ফেরে না।

বিভা। কে বললে ফেরে না। আমি তপস্যা করে ফেরাব, আমি জীবন মন দিয়ে ফেরাব। মোহন, এখনই তুই আমাকে নিয়ে যা। দেরি যদি হয়ে থাকে, আর এক মুহূর্ত দেরি করব না।

রামমোহন। যুবরাজ কোথায় গেছেন?

বিভা। তিনি এখনই আসবেন।

রামমোহন। তিনি ফিরে আসুন-না।

বিভা। না মোহন, আর বিলম্ব নয়। তিনি কি খবর পেয়েছেন আমি এসেছি। দাদা বললেন, তিনি নৌকার ছাত থেকে দেখেছেন ময়ূরপংখি সাজানো হচ্ছে।

রামমোহন। হাঁ, সাজানো হচ্ছে বটে—

বিভা। এখনো কি সাজানো শেষ হয় নি।

রামমোহন। ওই ময়ূরপংখির সাজসজ্জায় আগুন লাগুক।

বিভা। মোহন, তোর মুখে এ কী কথা! তুই যখন আনতে গেলি আসতে পারি নি বলে এত রাগ করেছিস? তুইও আমার দুঃখ বুঝতে পারিস নি মোহন?

[রামমোহন নিরুত্তর

এই দেখ্, তোর দেওয়া সেই শাঁখাজোড়া পরে এসেছি— আজকের দিনে তুই আমার উপর রাগ করিস নে।

রামমোহন। আমাকে আর দগ্ধ কোরো না। মিথ্যে দিয়ে তোমার কাছে আর চাপা দিতে পারলুম না। মা জননি, এ রাজ্যের লক্ষ্মী তুমি, কিন্তু এ রাজ্যে তোমার আজ আর স্থান নেই। চলো মা, তুমি ফিরে চলো— তোমার এই পাদপদ্মের দাস, এই অধম সন্তান তোমার সঙ্গে যাবে।

বিভা। মোহন, যা তোর বলবার আছে সব তুই বল্। আমি যে কত দুঃখ সইতে পারি তা কি তুই জানিস নে?

রামমোহন। সন্তান যখন ডাকতে গেল তখন কেন এলি নে— তখন কেন এলি নে— আমার পোড়া কপাল, তোকে কেন আনতে পারলুম না।

বিভা। ওরে মোহন, জগতে এমন কোনো সুখ নেই যার লোভে আমি সেদিন দাদাকে ফেলে আসতে পারতুম— এতে আমার কপালে যা থাকে তাই হবে।

রামমোহন। তবে শোন্ মা, সেই ময়ূরপংখি তোর জন্যে নয়।

বিভা। নাই হল মোহন, দুঃখ কিসের। আমি হেঁটে চলে যাব।

রামমোহন। যাবি কোথায়। সেখানে যে আজ আর-এক রানী আসছে।

বিভা। আর-এক রানী!

রামমোহন। হাঁ, আর-এক রানী। আজ মহারাজের বিবাহ।

বিভা। ওঃ— আজ বিবাহের লগ্ন!

রামমোহন। এক বিবাহের লগ্নে মহারাজ তোমাদের ঘরে গিয়েছিলেন— আজ কোন্ বিবাহের লগ্নে তুমি তাঁর ঘরের সামনে এসে পৌঁছলে। আর, আমার এমন কপাল আজ আমি বেঁচে আছি। চল্ মা, ফিরে চল্, আর এক দণ্ড নয়— ওই বাঁশি আমার

কানে বিষ ঢালছে। ওরে, আর-একদিন কী বাঁশি শুনেছিলুম, সেই কথা মনে পড়ছে। চল্ চল্, ফিরে চল্। অমন চুপ করে বসে রইলে কেন মা? কেমন করে যে কাঁদতে হয় তাও কি একেবারে ভুলে গেছ।

বিভা। মোহন, আমার একটি কথা রাখতে হবে।

রামমোহন। কী কথা।

বিভা। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। যদি না যাস আমি একলা যাব।

রামমোহন। সে আজ ময়ুরপংখিতে চড়বে, আর তুমি আজ হেঁটে যাবে?

বিভা। হেঁটে যাওয়াই আমাকে সাজে— আমি হেঁটেই যাব। তুই সঙ্গে যাবি নে?

রামমোহন। আমি সঙ্গে যাব না, তো কে যাবে। কিন্তু মা, সে সভায় আজ তুমি কিসের জন্যে যাবে।

বিভা। তা বটে, কেন যাব। মোহন, আমাকে দুঃখ সইতে হবে সে কথাটা হঠাৎ আমি ভুলে গিয়েছিলুম— ভেবেছিলুম, যা ভোগ হবার তা বুঝি হয়ে চুকে গেছে।

রামমোহন। কেন মা, তুমি সতীলক্ষ্মী, তুমি দুঃখ কেন পাও।

বিভা। মোহন, সেদিন অপরাধ যে সত্যি হয়েছিল। সে অপরাধের শাস্তি না হয়ে তো মিটবে না, সে শাস্তি আমিই নিলুম— প্রায়শ্চিত্ত আমাকে দিয়েই হবে।

রামমোহন। মা, তোমার পিতার হাতের আঘাত সেও তুমিই মাথায় করে নিয়েছ, আবার তোমার স্বামীর হাতের আঘাত সেও তুমিই নিলে। কিন্তু আমি বলছি মা, সকলের চেয়ে বড়ো দণ্ড পেলে তোমার স্বামী। সে আজ দ্বারের কাছ থেকেও তোমাকে হারালো।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। ওরে বিভা!

বিভা। দাদা, সব জানি। কিছু ভেবো না।

উদয়। এখন কী করবি বোন।

বিভা। ভেবেছিলুম রাজবাড়িতে একবার যাব, কিন্তু যাব না।

রামমোহন। মা, যেয়ো না, যেয়ো না। গেলে তোমার অপমান হত— সেই অপমানে তোমার স্বামীর পাপ আরো বাড়ত।

বিভা। আমার মান-অপমান সব চুকে গেছে। কিন্তু দাদার অপমান হত যে। দাদা, এবার নৌকো ফেরাও।

উদয়। তুই কোথায় যাবি বিভা।

বিভা। তোমার সঙ্গে কাশী যাব। আমি আজ মুক্তি পেয়েছি। এখন তোমার চরণসেবা করে আমার জীবন আনন্দে কাটবে। মোহন, তুই তোর প্রভুর কাছে ফিরে যা।

রামমোহন। ওই দেখো মা, ফেরবার পথে আগুন লেগেছে, ওই-যে ময়ূরপংখি চলেছে। ও পথ আমার পথ নয়।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

বিভা। বৈরাগী ঠাকুর!

ধনঞ্জয়। কেন দিদি।

বিভা। আমাকে তোমাদের সঙ্গ দিয়ো ঠাকুর।

উদয়। ঠাকুর, শেষকালে বিভাকেও আমাদের পথ নিতে হল!

ধনঞ্জয়। সে তো বেশ কথা। দয়াময় হরি! কী আনন্দ, তোমার এ কী আনন্দ! ছাড় না, কিছুতেই ছাড় না। শ্বশুরবাড়ির রাস্তার ধারেও ডাকাতের মতো বসে আছে। দিদি, এই মাঝরাস্তায় আমাদের পাগল প্রভুর তলব পড়েছে। একেবারে জোর তলব। চল্ চল্। চল্ চল্। পা ফেলে চল্। খুশি হয়ে চল্। হাসতে হাসতে চল্। রাস্তা এমন করে পরিষ্কার করে দিয়েছে— আর ভয় কিসের।

গীত

আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর ফিরব না রে—
এখন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী,
কূলে ভিড়ব না আর ভিড়ব না রে।
ছড়িয়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে,
তাই খুঁটে আজ মরব কি রে।
এখন ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
বেড়া ঘিরব না আর ঘিরব না রে।
ঘাটের রসি গেছে কেটে,
কাঁদব কি তাই বক্ষ ফেটে?
এখন পালের রসি ধরব কসি,
এ রসি ছিঁড়ব না আর ছিঁড়ব না রে।

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

মানভঞ্জন

প্রথম পরিচ্ছেদ

রমানাথ শীলের ত্রিতল অট্টালিকায় সর্বোচ্চ তলের ঘরে গোপীনাথ শীলের স্ত্রী গিরিবালা বাস করে। শয়নকক্ষের দক্ষিণ দ্বারের সম্মুখে ফুলের টবে গুটিকতক বেলফুল এবং গোলাপফুলের গাছ; ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা— বহির্দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইট ফাঁক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ -বিশিষ্ট বিলাতি নারীমূর্তির বাঁধানো এন্‌গ্রেভিং টাঙানো রহিয়াছে; কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখবর্তী বৃহৎ আয়নার উপরে ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে তাহা দেয়ালের কোনো ছবি অপেক্ষা সৌন্দর্যে ন্যূন নহে।

গিরিবালার সৌন্দর্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার ন্যায়, একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না; চারি দিকে এবং চিরকাল যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি এ একেবারে হঠাৎ তাহা হইতে অনেক স্বতন্ত্র।

গিরিবালাও আপন লাবণ্যোচ্ছ্বাসে আপনি আদ্যোপান্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নবযৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য তাহার সর্বাঙ্গে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে। তাহার বসনে ভূষণে গমনে, তাহার বাহুর বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভঙ্গীতে, তাহার চঞ্চল চরণের উদ্দাম ছন্দে, নূপুরনিক্কণে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্র ভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে, একেবারে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

আপন সর্বাঙ্গের এই উচ্ছলিত মদির রসে গিরিবালার একটা নেশা লাগিয়াছে। প্রায় দেখা যাইত, একখানি কোমল রঙিন বস্ত্রে আপনার পরিপূর্ণ দেহখানি জড়াইয়া

সে ছাদের উপরে অকারণে চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে। যেন মনের ভিতরকার কোনো এক অশ্রুত অব্যক্ত সংগীতের তালে তালে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নৃত্য করিতে চাহিতেছে। আপনার অঙ্গকে নানা ভঙ্গীতে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহার যেন বিশেষ কী এক আনন্দ আছে; সে যেন আপন সৌন্দর্যের নানা দিকে নানা ঢেউ তুলিয়া দিয়া সর্বাঙ্গের উত্তপ্ত রক্তস্রোতে অপূর্ব পুলক-সহকারে বিচিত্র আঘাতপ্রতিঘাত অনুভব করিতে থাকে। সে হঠাৎ গাছ হইতে পাতা ছিঁড়িয়া দক্ষিণ বাহু আকাশে তুলিয়া সেটা বাতাসে উড়াইয়া দেয়— অমনি তাহার বালা বাজিয়া উঠে, তাহার অঞ্চল বিস্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহার সুললিত বাহুর ভঙ্গীটি পিঞ্জরমুক্ত অদৃশ্য পাখির মতো অনন্ত আকাশের মেঘরাজ্যের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া যায়। হঠাৎ সে টব হইতে একটা মাটির ঢেলা তুলিয়া অকারণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়; চরণাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বৃহৎ বহির্জগৎটা একবার চট করিয়া দেখিয়া লয় —আবার ঘুরিয়া আঁচল ঘুরাইয়া চলিয়া আসে, আঁচলের চাবির গোচ্ছা ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠে। হয়তো আয়নার সম্মুখে গিয়া খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে; চুল বাঁধিবার দড়ি দিয়া কেশমূল বেষ্টন করিয়া সেই দড়ি কুন্দদন্তপংক্তিতে দংশন করিয়া ধরে, দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া মস্তকের পশ্চাতে বেণীগুলিকে দৃঢ় আকর্ষণে কুণ্ডলায়িত করে— চুল বাঁধা শেষ করিয়া হাতের সমস্ত কাজ ফুরাইয়া যায়— তখন সে আলস্যভরে কোমল বিছানার উপরে আপনাকে পত্রান্তরালচ্যুত একটি জ্যোৎস্নালেখার মতো বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়।

তাহার সন্তানাদি নাই, ধনিগৃহে তাহার কোনো কাজকর্মও নাই— সে কেবল নির্জনে প্রতিদিন আপনার মধ্যে আপনি সঞ্চিত হইয়া শেষকালে আপনাকে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। স্বামী আছে, কিন্তু স্বামী তাহার আয়ত্তের মধ্যে নাই। গিরিবালা বাল্যকাল হইতে যৌবনে এমন পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্বামীর চক্ষু এড়াইয়া গেছে।

বরঞ্চ বাল্যকালে সে তাহার স্বামীর আদর পাইয়াছিল। স্বামী তখন ইস্কুল পালাইয়া তাহার সুপ্ত অভিভাবকদিগকে বঞ্চনা করিয়া নির্জন মধ্যাহ্নে তাহার বালিকা স্ত্রীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে আসিত। এক বাড়িতে থাকিয়াও শৌখিন চিঠির কাগজে স্ত্রীর সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করিত। ইস্কুলের বিশেষ বন্ধুদিগকে সেই-সমস্ত চিঠি দেখাইয়া গর্ব অনুভব করিত। তুচ্ছ এবং কল্পিত কারণে স্ত্রীর সহিত মান-অভিমানেরও অসদ্ভাব ছিল না।

এমন সময়ে বাপের মৃত্যুতে গোপীনাথ স্বয়ং বাড়ির কর্তা হইয়া উঠিল। কাঁচা

কাঠের তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরে— কাঁচা বয়সে গোপীনাথ যখন স্বাধীন হইয়া উঠিল তখন অনেকগুলি জীবজন্তু তাহার স্কন্ধে বাসা করিল। তখন ক্রমে অন্তঃপুরে তাহার গতিবিধি হ্রাস হইয়া অন্যত্র প্রসারিত হইতে লাগিল।

দলপতিত্বের একটা উত্তেজনা আছে, মানুষের কাছে মানুষের নেশাটা অত্যন্ত বেশি। অসংখ্য মনুষ্যজীবন এবং সুবিস্তীর্ণ ইতিহাসের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিবার প্রতি নেপোলিয়নের যে একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল—একটি ছোটো বৈঠকখানার ছোটো কর্তাটিরও নিজের ক্ষুদ্র দলের নেশা অল্পতর পরিমাণে সেই এক-জাতীয়। সামান্য ইয়ার্কিবন্ধনে আপনার চারি দিকে একটা লক্ষ্মীছাড়া ইয়ার-মণ্ডলী সৃজন করিয়া তুলিলে তাহাদের উপর আধিপত্য এবং তাহাদের নিকট হইতে বাহবা লাভ করা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়; সেজন্য অনেক লোক বিষয়-নাশ, ঋণ, কলঙ্ক সমস্তই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়।

গোপীনাথ তাহার ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাতিয়া উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়ার্কির নব নব কীর্তি, নব নব গৌরবলাভ করিতে লাগিল। তাহার দলের লোক বলিতে লাগিল— শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়ার্কিতে অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ। সেই গর্বে সেই উত্তেজনায় অন্যান্য সমস্ত সুখদুঃখকর্তব্যের প্রতি অন্ধ হইয়া হতভাগ্য ব্যক্তিটি রাত্রিদিন আবর্তের মতো পাক খাইয়া খাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

এ দিকে জগজ্জয়ী রূপ লইয়া আপন অন্তঃপুরের প্রজাহীন রাজ্যে, শয়নগৃহের শূন্য সিংহাসনে গিরিবালা অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। সে নিজে জানিত, বিধাতা তাহার হস্তে রাজদণ্ড দিয়াছেন— সে জানিত, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া যে বৃহৎ জগৎখানি দেখা যাইতেছে সেই জগৎটিকে সে কটাক্ষে জয় করিয়া আসিতে পারে— অথচ বিশ্বসংসারের মধ্যে একটি মানুষকেও সে বন্দী করিতে পারে নাই।

গিরিবালার একটি সুরসিকা দাসী আছে, তাহার নাম সুধো, অর্থাৎ সুধামুখী; সে গান গাহিত, নাচিত, ছড়া কাটিত, প্রভুপত্নীর রূপের ব্যাখ্যা করিত, এবং অরসিকের হস্তে এমন রূপ নিষ্ফল হইল বলিয়া আক্ষেপ করিত। গিরিবালার যখন-তখন এই সুধোকে নহিলে চলিত না। উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া সে নিজের মুখের শ্রী, দেহের গঠন, বর্ণের উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা শুনিত; মাঝে মাঝে তাহার প্রতিবাদ করিত এবং পরম পুলকিত চিত্তে সুধোকে মিথ্যাবাদিনী চাটুভাষিণী বলিয়া গঞ্জনা করিতে ছাড়িত না। সুধো তখন শত শত শপথ সহকারে নিজের মতের অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিতে বসিত, গিরিবালার পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা নিতান্ত কঠিন হইত না।

সুধো গিরিবালাকে গান শুনাইত— "দাসখত দিলাম লিখে শ্রীচরণে" ; এই গানের মধ্যে গিরিবালা নিজের অলক্তাঙ্কিত অনিন্দ্যসুন্দর চরণপল্লবের স্তব শুনিতে পাইত এবং একটি পদলুণ্ঠিত দাসের ছবি তাহার কল্পনায় উদিত হইত— কিন্তু হায়, দুটি শ্রীচরণ মলের শব্দে শূন্য ছাতের উপরে আপন জয়গান ঝংকৃত করিয়া বেড়ায়, তবু কোনো স্বেচ্ছাবিক্রীত ভক্ত আসিয়া দাসখত লিখিয়া দিয়া যায় না।

গোপীনাথ যাহাকে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে তাহার নাম লবঙ্গ— সে থিয়েটারে অভিনয় করে— সে স্টেজের উপর চমৎকার মূর্ছা যাইতে পারে— সে যখন সানুনাসিক কৃত্রিম কাঁদুনির স্বরে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া টানিয়া টানিয়া আধ-আধ উচ্চারণে "প্রাণনাথ" "প্রাণেশ্বর" করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে তখন পাতলা ধুতির উপর ওয়েস্ট্‌কোট পরা, ফুলমোজামণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী "এক্সেলেণ্ট্" "এক্সেলেণ্ট্" করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এই অভিনেত্রী লবঙ্গের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার বর্ণনা গিরিবালা ইতিপূর্বে অনেকবার তাহার স্বামীর মুখেই শুনিয়াছে। তখনো তাহার স্বামী সম্পূর্ণরূপে পলাতক হয় নাই। তখন সে তাহার স্বামীর মোহাবস্থা না জানিয়াও মনে মনে অসূয়া অনুভব করিত। আর-কোনো নারীর এমন কোনো মনোরঞ্জিনী বিদ্যা আছে যাহা তাহার নাই ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। সাসূয় কৌতূহলে সে অনেকবার থিয়েটার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মত করিতে পারিত না।

অবশেষে সে একদিন টাকা দিয়া সুধোকে থিয়েটার দেখিতে পাঠাইয়া দিল ; সুধো আসিয়া নাসা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রামনাম-উচ্চারণ-পূর্বক অভিনেত্রীদিগের ললাট-দেশে সম্মার্জনীর ব্যবস্থা করিল— এবং তাহাদের কদর্য মূর্তি ও কৃত্রিম ভঙ্গিতে যে-সমস্ত পুরুষের অভিরুচি জন্মে তাহাদের সম্বন্ধেও সেই একই রূপ বিধান স্থির করিল। শুনিয়া গিরিবালা বিশেষ আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু যখন তাহার স্বামী বন্ধন ছিন্ন করিয়া গেল তখন তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল। সুধোর কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে সুধো গিরির গা ছুঁইয়া বারম্বার কহিল, বস্ত্রখণ্ডাবৃত দগ্ধকাষ্ঠের মতো তাহার নীরস এবং কুৎসিত চেহারা। গিরি তাহার আকর্ষণী শক্তির কোনো কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না এবং নিজের অভিমানে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধোকে লইয়া গোপনে থিয়েটার দেখিতে গেল। নিষিদ্ধ কাজের উত্তেজনা বেশি। তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে-এক মৃদু কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল সেই কম্পনাবেগে এই আলোকময়, লোকময়, বাদ্যসংগীতমুখরিত, দৃশ্যপট-শোভিত রঙ্গভূমি তাহার চক্ষে দ্বিগুণ অপরূপতা ধারণ করিল। তাহার সেই প্রাচীর-

বেষ্টিত নির্জন নিরানন্দ অন্তঃপুর হইতে এ কোন্ এক সুসজ্জিত সুন্দর উৎসবলোকের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সেদিন 'মানভঞ্জন' অপেরা অভিনয় হইতেছে। কখন ঘণ্টা বাজিল, বাদ্য থামিয়া গেল, চঞ্চল দর্শকগণ মুহূর্তে স্থির নিস্তব্ধ হইয়া বসিল, রঙ্গমঞ্চের সম্মুখবর্তী আলোকমালা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, পট উঠিয়া গেল, একদল সুসজ্জিত নটী ব্রজাঙ্গনা সাজিয়া সংগীতসহযোগে নৃত্য করিতে লাগিল, দর্শকগণের করতালি ও প্রশংসাবাদে নাট্যশালা থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন গিরিবালার তরুণ দেহের রক্তলহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই সংগীতের তানে, আলোক ও আভরণের ছটায়, এবং সম্মিলিত প্রশংসাধ্বনিতে সে ক্ষণকালের জন্য সমাজ সংসার সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেল; মনে করিল, এমন এক জায়গায় আসিয়াছে যেখানে বন্ধনমুক্ত সৌন্দর্যপূর্ণ স্বাধীনতার কোনো বাধামাত্র নাই।

সুধো মাঝে মাঝে আসিয়া ভীতস্বরে কানে কানে বলে, "বউঠাকরুন, এই বেলা বাড়ি ফিরিয়া চলো; দাদাবাবু জানিতে পারিলে রক্ষা থাকিবে না।" গিরিবালা সে কথায় কর্ণপাত করে না। তাহার মনে এখন আর কিছুমাত্র ভয় নাই।

অভিনয় অনেক দূর অগ্রসর হইল। রাধার দুর্জয় মান হইয়াছে; সে মানসাগরে কৃষ্ণ আর কিছুতেই থই পাইতেছে না; কত অনুনয়বিনয় সাধাসাধি কাঁদাকাঁদি, কিছুতেই কিছু হয় না। তখন গর্বভরে গিরিবালার বক্ষ ফুলিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই লাঞ্ছনায় সে যেন মনে মনে রাধা হইয়া নিজের অসীম প্রতাপ নিজে অনুভব করিতে লাগিল। কেহ তাহাকে কখনো এমন করিয়া সাধে নাই; সে অবহেলিত অবমানিত পরিত্যক্ত স্ত্রী, কিন্তু তবু সে এক অপূর্ব মোহে স্থির করিল যে, এমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে কাঁদাইবার ক্ষমতা তাহারও আছে। সৌন্দর্যের যে কেমন দোর্দণ্ড প্রতাপ তাহা সে কানে শুনিয়াছে, অনুমান করিয়াছে মাত্র— আজ দীপের আলোকে, গানের সুরে, সুদৃশ্য রঙ্গমঞ্চের উপরে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিল। নেশায় তাহার সমস্ত মস্তিষ্ক ভরিয়া উঠিল।

অবশেষে যবনিকাপতন হইল, গ্যাসের আলো ম্লান হইয়া আসিল, দর্শকগণ প্রস্থানের উপক্রম করিল; গিরিবালা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়া রহিল। এখান হইতে উঠিয়া যে বাড়ি যাইতে হইবে এ কথা তাহার মনে ছিল না। সে ভাবিতেছিল অভিনয় বুঝি ফুরাইবে না, যবনিকা আবার উঠিবে। রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরাভব, জগতে ইহা ছাড়া আর কোনো বিষয় উপস্থিত নাই। সুধো কহিল, "বউঠাকরুন, করো কী, ওঠো, এখনই সমস্ত আলো নিবাইয়া দিবে।"

গিরিবালা গভীর রাত্রে আপন শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। কোণে একটি দীপ মিট্‌মিট্‌ করিতেছে— ঘরে একটি লোক নাই, শব্দ নাই— গৃহপ্রান্তে নির্জন শয্যার উপরে একটি পুরাতন মশারি বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে ; তাহার প্রতিদিনের জগৎ অত্যন্ত বিশ্রী বিরস এবং তুচ্ছ বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। কোথায় সেই সৌন্দর্যময় আলোকময় সংগীতময় রাজ্য— যেখানে সে আপনার সমস্ত মহিমা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া জগতের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতে পারে— যেখানে সে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তুচ্ছ সাধারণ নারীমাত্র নহে।

এখন হইতে সে প্রতি সপ্তাহেই থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে, তাহার সেই প্রথম মোহ অনেকটা পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল— এখন সে নটনটীদের মুখের রঙচঙ, সৌন্দর্যের অভাব, অভিনয়ের কৃত্রিমতা সমস্ত দেখিতে পাইল। কিন্তু তবু তাহার নেশা ছুটিল না। রণসংগীত শুনিলে যোদ্ধার হৃদয় যেমন নাচিয়া উঠে, রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়া গেলেই তাহার বক্ষের মধ্যে সেইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইত। ঐ যে সমস্ত সংসার হইতে স্বতন্ত্র সুদৃশ্য সমুচ্চ সুন্দর বেদিকা স্বর্ণলেখায় অঙ্কিত, চিত্রপটে সজ্জিত, কাব্য এবং সংগীতের ইন্দ্রজালে মায়ামণ্ডিত, অসংখ্য মুগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত, নেপথ্যভূমির গোপনতার দ্বারা অপূর্বরহস্যপ্রাপ্ত, উজ্জ্বল আলোকমালায় সর্বসমক্ষে সুপ্রকাশিত— বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্যরাজ্ঞীর পক্ষে এমন মায়াসিংহাসন আর কোথায় আছে।

প্রথমে যেদিন সে তাহার স্বামীকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত দেখিল, এবং যখন গোপীনাথ কোনো নটীর অভিনয়ে উন্মত্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন স্বামীর প্রতি তাহার মনে প্রবল অবজ্ঞার উদয় হইল। সে জর্জরিত চিত্তে মনে করিল, যদি কখনো এমন দিন আসে যে, তাহার স্বামী তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের মতো তাহার পদতলে আসিয়া পড়ে, এবং সে আপন চরণনখরের প্রান্ত হইতে উপেক্ষা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া অভিমানভরে চলিয়া যাইতে পারে, তবেই তাহার এই ব্যর্থ রূপ ব্যর্থ যৌবন সার্থকতা লাভ করিবে।

কিন্তু সে শুভদিন আসিল কই। আজকাল গোপীনাথের দর্শন পাওয়াই দুর্লভ হইয়াছে। সে আপন প্রমত্ততার ঝড়ের মুখে ধূলি-ধ্বজের মতো একটা দল পাকাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার আর ঠিকানা নাই।

একদিন চৈত্রমাসের বাসন্তী পূর্ণিমায় গিরিবালা বসন্তীরঙের কাপড় পরিয়া দক্ষিণ বাতাসে অঞ্চল উড়াইয়া ছাদের উপর বসিয়া ছিল। যদিও ঘরে স্বামী আসে না তবু গিরি উলটিয়া পালটিয়া প্রতিদিন বদল করিয়া নূতন নূতন গহনায় আপনাকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিত। হীরামুক্তার আভরণ তাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে একটি উন্মাদনা সঞ্চার

করিত— ঝল্‌মল্‌ করিয়া, রুন্নুঝুন্নু বাজিয়া তাহার চারি দিকে একটি হিল্লোল তুলিতে থাকিত। আজ সে হাতে বাজুবন্ধ এবং গলায় একটি চুনি ও মুক্তার কণ্ঠী পরিয়াছে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে। সুধো পায়ের কাছে বসিয়া মাঝে মাঝে তাহার নিটোল কোমল রক্তোৎপলপদপল্লবে হাত বুলাইতেছিল, এবং অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতেছিল, "আহা বউঠাকরুন, আমি যদি পুরুষমানুষ হইতাম, তাহা হইলে এই পা দুখানি বুকে লইয়া মরিতাম।" গিরিবালা সগর্বে হাসিয়া উত্তর দিতেছিল, "বোধ করি বুকে না লইয়াই মরিতে হইত— তখন কি আর এমন করিয়া পা ছড়াইয়া দিতাম। আর বকিস নে। তুই সেই গানটা গা।"

সুধো সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন ছাদের উপর গাহিতে লাগিল—

দাসখত দিলেম লিখে শ্রীচরণে,
সকলে সাক্ষী থাকুক বৃন্দাবনে।

তখন রাত্রি দশটা। বাড়ির আর সকলে আহারাদি সমাধা করিয়া ঘুমাইতে গিয়াছে। এমন সময় আতর মাখিয়া, উড়ানি উড়াইয়া, হঠাৎ গোপীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল— সুধো অনেকখানি জিভ কাটিয়া সাত হাত ঘোমটা টানিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

গিরিবালা ভাবিল, তাহার দিন আসিয়াছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। সে রাধিকার মতো গুরুমানভরে অটল হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু দৃশ্যপট উঠিল না; শিখিপুচ্ছচূড়া পায়ের কাছে লুটাইল না; কেহ রাগিণীতে গাহিয়া উঠিল না, "কেন পূর্ণিমা আঁধার কর লুকায়ে বদনশশী।" সংগীতহীন নীরসকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "একবার চাবিটা দাও দেখি।"

এমন জ্যোৎস্নায়, এমন বসন্তে, এতদিনের বিচ্ছেদের পরে এই কি প্রথম সম্ভাষণ! কাব্যে নাটকে উপন্যাসে যাহা লেখে তাহার আগাগোড়াই মিথ্যা কথা! অভিনয়মঞ্চেই প্রণয়ী গান গাহিয়া পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে— এবং তাহাই দেখিয়া যে দর্শকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায় সেই লোকটি বসন্তনিশীথে গৃহছাদে আসিয়া আপন অনুপমা যুবতী স্ত্রীকে বলে, "ওগো, একবার চাবিটা দাও দেখি।" তাহাতে না আছে রাগিণী, না আছে প্রীতি; তাহাতে কোনো মোহ নাই, মাধুর্য নাই— তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।

এমন সময়ে দক্ষিনে বাতাস জগতের সমস্ত অপমানিত কবিত্বের মর্মান্তিক দীর্ঘনিশ্বাসের মতো হুহু করিয়া বহিয়া গেল— টব-ভরা ফুটন্ত বেলফুলের গন্ধ ছাদময় ছড়াইয়া দিয়া গেল— গিরিবালার চূর্ণ অলক চোখে মুখে আসিয়া পড়িল এবং তাহার

বাসন্তীরঙের সুগন্ধি আঁচল অধীরভাবে যেখানে সেখানে উড়িতে লাগিল। গিরিবালা সমস্ত মান বিসর্জন দিয়া উঠিয়া পড়িল।

স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "চাবি দিব এখন, তুমি ঘরে চলো।" আজ সে কাঁদিবে কাঁদাইবে, তাহার সমস্ত নির্জন কল্পনাকে সার্থক করিবে, তাহার সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিয়া বিজয়ী হইবে, ইহা সে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে।

গোপীনাথ কহিল, "আমি বেশি দেরি করিতে পারিব না, তুমি চাবি দাও।"

গিরিবালা কহিল, "আমি চাবি দিব এবং চাবির মধ্যে যাহা-কিছু আছে সমস্ত দিব — কিন্তু আজ রাত্রে তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না।"

গোপীনাথ বলিল, "সে হইবে না। আমার বিশেষ দরকার আছে।"

গিরিবালা বলিল, "তবে আমি চাবি দিব না।"

গোপী বলিল, "দিবে না বই-কি। কেমন না দাও দেখিব।" বলিয়া সে গিরিবালার আঁচলে দেখিল, চাবি নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আয়নার বাক্সর দেরাজ খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যেও চাবি নাই। তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স জোর করিয়া ভাঙিয়া খুলিল— তাহাতে কাজললতা, সিঁদুরের কৌটা, চুলের দড়ি প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ আছে; চাবি নাই। তখন সে বিছানা ঘাঁটিয়া, গদি উঠাইয়া, আলমারি ভাঙিয়া নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিল।

গিরিবালা প্রস্তরমূর্তির মতো শক্ত হইয়া, দরজা ধরিয়া, ছাদের দিকে চাহিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যর্থমনোরথ গোপীনাথ রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে আসিয়া বলিল, "চাবি দাও বলিতেছি, নহিলে ভালো হইবে না।"

গিরিবালা উত্তরমাত্র দিল না। তখন গোপী তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার হাত হইতে বাজুবন্ধ, গলা হইতে কণ্ঠী, অঙ্গুলি হইতে আংটি ছিনিয়া লইয়া তাহাকে লাথি মারিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ির কাহারো নিদ্রাভঙ্গ হইল না, পল্লীর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, জ্যোৎস্নারাত্রি তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, সর্বত্র যেন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু অন্তরের চীৎকারধ্বনি যদি বাহিরে শুনা যাইত, তবে সেই চৈত্রমাসের সুখসুপ্ত জ্যোৎস্নানিশীথিনী অকস্মাৎ তীব্রতম আর্তস্বরে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এমন সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এমন হৃদয়বিদারণ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

অথচ সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। এমন পরাভব, এত অপমান গিরিবালা সুধোর কাছেও বলিতে পারিল না। মনে করিল, আত্মহত্যা করিয়া, এই অতুল রূপযৌবন নিজের হাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া, সে আপন অনাদরের প্রতিশোধ

লইবে। কিন্তু তখনই মনে পড়িল, তাহাতে কাহারো কিছু আসিবে যাইবে না; পৃথিবীর যে কতখানি ক্ষতি হইবে তাহা কেহ অনুভবও করিবে না। জীবনেও কোনো সুখ নাই, মৃত্যুতেও কোনো সান্ত্বনা নাই।

গিরিবালা বলিল, "আমি বাপের বাড়ি চলিলাম।" তাহার বাপের বাড়ি কলিকাতা হইতে দূরে। সকলেই নিষেধ করিল; কিন্তু বাড়ির কর্ত্রী নিষেধও শুনিল না, কাহাকে সঙ্গেও লইল না। এ দিকে গোপীনাথও সদলবলে নৌকাবিহারে কতদিনের জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গান্ধর্ব থিয়েটারে গোপীনাথ প্রায় প্রত্যেক অভিনয়েই উপস্থিত থাকিত। সেখানে 'মনোরমা' নাটকে লবঙ্গ মনোরমা সাজিত এবং গোপীনাথ সদলে সম্মুখের সারে বসিয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে বাহবা দিত এবং স্টেজের উপর তোড়া ছুঁড়িয়া ফেলিত। মাঝে মাঝে এক-একদিন গোলমাল করিয়া দর্শকদের অত্যন্ত বিরক্তিভাজন হইত। তথাপি রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ তাহাকে কখনো নিষেধ করিতে সাহস করে নাই।

অবশেষে একদিন গোপীনাথ কিঞ্চিৎ মত্তাবস্থায় গ্রীনরুমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারি গোল বাধাইয়া দিল। কী এক সামান্য কাল্পনিক কারণে সে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কোনো নটীকে গুরুতর প্রহার করিল। তাহার চীৎকারে এবং গোপীনাথের গালিবর্ষণে সমস্ত নাট্যশালা চকিত হইয়া উঠিল।

সেদিন অধ্যক্ষগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া গোপীনাথকে পুলিসের সাহায্যে বাহির করিয়া দেয়।

গোপীনাথ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃতনিশ্চয় হইল। থিয়েটারওয়ালারা পূজার একমাস পূর্ব হইতে নূতন নাটক 'মনোরমা'র অভিনয় খুব আড়ম্বরসহকারে ঘোষণা করিয়াছে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা কলিকাতা শহরটাকে কাগজে মুড়িয়া ফেলিয়াছে; রাজধানীকে যেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থকারের নামাঙ্কিত নামাবলী পরাইয়া দিয়াছে।

এমন সময় গোপীনাথ তাহাদের প্রধান অভিনেত্রী লবঙ্গকে লইয়া বোটে চড়িয়া কোথায় অন্তর্ধান হইল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

থিয়েটারওয়ালারা হঠাৎ অকূলপাথারে পড়িয়া গেল। কিছুদিন লবঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিয়া অবশেষে এক নূতন অভিনেত্রীকে মনোরমার অংশ অভ্যাস করাইয়া লইল; তাহাতে তাহাদের অভিনয়ের সময় পিছাইয়া গেল।

কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হইল না। অভিনয়স্থলে দর্শক আর ধরে না। শত শত লোক দ্বার হইতে ফিরিয়া যায়। কাগজেও প্রশংসার সীমা নাই।

সে প্রশংসা দূরদেশে গোপীনাথের কানে গেল। সে আর থাকিতে পারিল না। বিদ্বেষে এবং কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া সে অভিনয় দেখিতে আসিল।

প্রথম পট-উৎক্ষেপে অভিনয়ের আরম্ভভাগে মনোরমা দীনহীনবেশে দাসীর মতো তাহার শ্বশুরবাড়িতে থাকে— প্রচ্ছন্ন বিনম্র সংকুচিতভাবে সে আপনার কাজকর্ম করে— তাহার মুখে কথা নাই, এবং তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখাই যায় না।

অভিনয়ের শেষাংশে মনোরমাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া তাহার স্বামী অর্থলোভে কোনো এক লক্ষপতির একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিবাহের পর বাসরঘরে যখন স্বামী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তখন দেখিতে পাইল— এও সেই মনোরমা, কেবল সেই দাসীবেশ নাই। আজ সে রাজকন্যা সাজিয়াছে— তাহার নিরুপম সৌন্দর্য আভরণে ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হইয়া দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। শিশুকালে মনোরমা তাহার ধনী পিতৃগৃহ হইতে অপহৃত হইয়া দরিদ্রের গৃহে পালিত হইয়াছে। বহুকাল পরে সম্প্রতি তাহার পিতা সেই সন্ধান পাইয়া কন্যাকে ঘরে আনাইয়া তাহার স্বামীর সহিত পুনরায় নূতন সমারোহে বিবাহ দিয়াছে।

তাহার পরে বাসরঘরে মানভঞ্জনের পালা আরম্ভ হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ভারি এক গোলমাল বাধিয়া উঠিল। মনোরমা যতক্ষণ মলিন দাসীবেশে ঘোমটা টানিয়া ছিল ততক্ষণ গোপীনাথ নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যখন সে আভরণে ঝল্‌মল্‌ করিয়া, রক্তাম্বর পরিয়া, মাথার ঘোমটা ঘুচাইয়া, রূপের তরঙ্গ তুলিয়া বাসরঘরে দাঁড়াইল এবং এক অনির্বচনীয় গর্বে গৌরবে গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া সম্মুখবর্তী গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদ্যুতের ন্যায় অবজ্ঞাবজ্রপূর্ণ তীক্ষ্ণকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল— যখন সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত উদ্‌বেলিত হইয়া প্রশংসার করতালিতে নাট্যস্থলী সুদীর্ঘকাল কম্পান্বিত করিয়া তুলিতে লাগিল — তখন গোপীনাথ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া 'গিরিবালা' 'গিরিবালা' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া স্টেজের উপর লাফ দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল— বাদকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

এই অকস্মাৎ রসভঙ্গে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া দর্শকগণ ইংরাজিতে বাংলায় "দূর করে দাও" "বের করে দাও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

গোপীনাথ পাগলের মতো ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল, "আমি ওকে খুন করব, ওকে খুন করব।"

পুলিস আসিয়া গোপীনাথকে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। সমস্ত কলিকাতা শহরের দর্শক দুই চক্ষু ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল, কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।

বৈশাখ ১৩০২

ঠাকুরদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নয়নজোড়ের জমিদারেরা এককালে বাবু বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তখনকার কালের বাবুয়ানার আদর্শ বড়ো সহজ ছিল না। এখন যেমন রাজা-রায়বাহাদুর খেতাব অর্জন করিতে অনেক খানা নাচ ঘোড়দৌড় এবং সেলাম-সুপারিশের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তখনো সাধারণের নিকট হইতে বাবু উপাধি লাভ করিতে বিস্তর দুঃসাধ্য তপশ্চরণ করিতে হইত।

আমাদের নয়নজোড়ের বাবুরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঢাকাই কাপড় পরিতেন, কারণ পাড়ের কর্কশতায় তাঁহাদের সুকোমল বাবুয়ানা ব্যথিত হইত। তাঁহারা লক্ষ টাকা দিয়া বিড়ালশাবকের বিবাহ দিতেন এবং কথিত আছে, একবার কোনো উৎসব উপলক্ষে রাত্রিকে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দীপ জ্বালাইয়া সূর্যকিরণের অনুকরণে তাঁহারা সাচ্চা রুপার জরি উপর হইতে বর্ষণ করিয়াছিলেন।

ইহা হইতেই সকলে বুঝিবেন সেকালে বাবুদের বাবুয়ানা বংশানুক্রমে স্থায়ী হইতে পারিত না। বহুবর্তিকাবিশিষ্ট প্রদীপের মতো নিজের তৈল নিজে অল্পকালের ধুমধামেই নিঃশেষ করিয়া দিত।

আমাদের কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী সেই প্রখ্যাতযশ নয়নজোড়ের একটি নির্বাপিত বাবু। ইনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৈল তখন প্রদীপের তলদেশে আসিয়া ঠেকিয়াছিল; ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে পর নয়নজোড়ের বাবুয়ানা গোটাকতক অসাধারণ শ্রাদ্ধশান্তিতে অন্তিম দীপ্তি প্রকাশ করিয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। সমস্ত বিষয়-আশয় ঋণের দায়ে বিক্রয় হইল— যে অল্প অবশিষ্ট রহিল তাহাতে পূর্বপুরুষের খ্যাতি রক্ষা করা অসম্ভব।

সেইজন্য নয়নজোড় ত্যাগ করিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসবাবু কলিকাতায়

আসিয়া বাস করিলেন; পুত্রটিও একটি কন্যামাত্র রাখিয়া এই হৃতগৌরব সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

আমরা তাঁহার কলিকাতার প্রতিবেশী। আমাদের ইতিহাসটা তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার পিতা নিজের চেষ্টায় ধন উপার্জন করিয়াছিলেন; তিনি কখনো হাঁটুর নিম্নে কাপড় পরিতেন না, কড়াক্রান্তির হিসাব রাখিতেন, এবং বাবু উপাধি লাভের জন্য তাঁহার লালসা ছিল না। সেজন্য আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। আমি যে লেখাপড়া শিখিয়াছি এবং নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার উপযোগী যথেষ্ট অর্থ বিনা চেষ্টায় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাই আমি পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি— শূন্য ভাণ্ডারে পৈতৃক বাবুয়ানার উজ্জ্বল ইতিহাসের অপেক্ষা লোহার সিন্দুকের মধ্যে পৈতৃক কোম্পানির কাগজ আমার নিকট অনেক বেশি মূল্যবান বলিয়া মনে হয়।

বোধ করি, সেই কারণেই, কৈলাসবাবু তাঁহাদের পূর্বগৌরবের ফেল্‌-করা ব্যাঙ্কের উপর যখন দেদার লম্বাচৌড়া চেক চালাইতেন তখন তাহা আমার এত অসহ্য ঠেকিত। আমার মনে হইত, আমার পিতা স্বহস্তে অর্থ উপার্জন করিয়াছেন বলিয়া কৈলাসবাবু বুঝি মনে মনে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা অনুভব করিতেছেন। আমি রাগ করিতাম এবং ভাবিতাম অবজ্ঞার যোগ্য কে। যে লোক সমস্ত জীবন কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিয়া, নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, লোকমুখের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করিয়া, অশ্রান্ত এবং সতর্ক বুদ্ধিকৌশলে সমস্ত প্রতিকূল বাধা প্রতিহত করিয়া, সমস্ত অনুকূল অবসরগুলিকে আপনার আয়ত্তগত করিয়া, একটি একটি রৌপ্যের স্তরে সম্পদের একটি সমুচ্চ পিরামিড একাকী স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি হাঁটুর নীচে কাপড় পরিতেন না বলিয়া যে কম লোক ছিলেন তাহা নয়।

তখন বয়স অল্প ছিল সেইজন্য এইরূপ তর্ক করিতাম, রাগ করিতাম— এখন বয়স বেশি হইয়াছে; এখন মনে করি, ক্ষতি কী। আমার তো বিপুল বিষয় আছে, আমার কিসের অভাব। যাহার কিছু নাই সে যদি অহংকার করিয়া সুখী হয় তাহাতে আমার তো সিকি পয়সার লোকসান নাই, বরং সে বেচারার সান্ত্বনা আছে।

ইহাও দেখা গিয়াছে আমি ব্যতীত আর কেহ কৈলাসবাবুর উপর রাগ করিত না। কারণ এতবড়ো নিরীহ লোক সচরাচর দেখা যায় না। ক্রিয়াকর্মে সুখে দুঃখে প্রতিবেশীদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ যোগ ছিল। ছেলে হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলকেই দেখা হইবা মাত্র তিনি হাসি মুখে প্রিয়সম্ভাষণ করিতেন; যেখানে যাহার যে-কেহ আছে সকলেরই কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তবে তাঁহার শিষ্টতা বিরাম

লাভ করিত। এইজন্য কাহারো সহিত তাঁহার দেখা হইলে একটা সুদীর্ঘ প্রশ্নোত্তর-মালার সৃষ্টি হইত— ভালো তো? শশী ভালো আছে? আমাদের বড়োবাবু ভালো আছেন? মধুর ছেলেটির জ্বর হয়েছিল শুনেছিলুম, সে এখন ভালো আছে তো? হরিচরণবাবুকে অনেক কাল দেখি নি, তাঁর অসুখবিসুখ কিছু হয় নি? তোমাদের রাখালের খবর কী। বাড়ির এঁয়ারা সকলে ভালো আছেন? ইত্যাদি।

লোকটি ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাপড়চোপড় অধিক ছিল না, কিন্তু মেরজাইটি চাদরটি জামাটি, এমন-কি, বিছানায় পাতিবার একটি পুরাতন র‍্যাপার, বালিশের ওয়াড়, একটি ক্ষুদ্র সতরঞ্চ, সমস্ত স্বহস্তে রৌদ্রে দিয়া, ঝাড়িয়া, দড়িতে খাটাইয়া, ভাঁজ করিয়া, আলনায় তুলিয়া, পরিপাটি করিয়া রাখিতেন। যখনই তাঁহাকে দেখা যাইত তখনই মনে হইত যেন তিনি সুসজ্জিত প্রস্তুত হইয়া আছেন। অল্পস্বল্প সামান্য আসবাবেও তাঁহার ঘরদ্বার সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিত। মনে হইত যেন তাঁহার আরো অনেক আছে।

ভৃত্যাভাবে অনেক সময় ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি নিজের হস্তে অতি পরিপাটি করিয়া ধুতি কোঁচাইতেন এবং চাদর ও জামার আস্তিন বহু যত্নে ও পরিশ্রমে গিলে করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বড়ো বড়ো জমিদারি ও বহুমূল্যের বিষয়সম্পত্তি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু একটি বহুমূল্য গোলাপপাশ, আতরদান, একটি সোনার রেকাবি, একটি রুপার আলবোলা, একটি বহুমূল্য শাল ও সেকেলে জামাজোড়া ও পাগড়ি দারিদ্র্যের গ্রাস হইতে বহুচেষ্টায় তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। কোনো একটা উপলক্ষ উপস্থিত হইলে এইগুলি বাহির হইত এবং নয়নজোড়ের জগদ্‌বিখ্যাত বাবুদের গৌরব রক্ষা হইত।

এ দিকে কৈলাসবাবু মাটির মানুষ হইলেও কথায় যে অহংকার করিতেন সেটা যেন পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্যবোধে করিতেন; সকল লোকেই তাহাতে প্রশ্রয় দিত এবং বিশেষ আমোদ বোধ করিত।

পাড়ার লোকে তাঁহাকে ঠাকুরদামশাই বলিত এবং তাঁহার ওখানে সর্বদা বিস্তর লোকসমাগম হইত; কিন্তু দৈন্যাবস্থায় পাছে তাঁহার তামাকের খরচটা গুরুতর হইয়া উঠে এইজন্য প্রায়ই পাড়ার কেহ না কেহ দুই-এক সের তামাক কিনিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিত, "ঠাকুরদামশায়, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখো দেখি, ভালো গয়ার তামাক পাওয়া গেছে।"

ঠাকুরদামশায় দুই-এক টান টানিয়া বলিতেন, "বেশ ভাই, বেশ তামাক।" অমনি

সেই উপলক্ষে ষাট-পঁয়ষট্টি টাকা ভরির তামাকের গল্প পাড়িতেন ; এবং জিজ্ঞাসা করিতেন, সে তামাক কাহারো আস্বাদ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে কি না।

সকলেই জানিত যে যদি কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে নিশ্চয় চাবির সন্ধান পাওয়া যাইবে না অথবা অনেক অন্বেষণের পর প্রকাশ পাইবে যে, পুরাতন ভৃত্য গণেশ বেটা কোথায় যে কী রাখে তাহার আর ঠিকানা নাই— গণেশও বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অপবাদ স্বীকার করিয়া লইবে। এইজন্যই সকলেই একবাক্যে বলিত, "ঠাকুরদামশায়, কাজ নেই, সে তামাক আমাদের সহ্য হবে না, আমাদের এই ভালো।"

শুনিয়া ঠাকুরদা দ্বিরুক্তি না করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেন। সকলে বিদায় লইবার কালে বৃদ্ধ হঠাৎ বলিয়া উঠিতেন, "সে যেন হল, তোমরা কবে আমার এখানে খাবে বলো দেখি ভাই।"

অমনি সকলে বলিত, "সে একটা দিন ঠিক করে দেখা যাবে।"

ঠাকুরদামহাশয় বলিতেন, "সেই ভালো, একটু বৃষ্টি পড়ুক, ঠাণ্ডা হোক, নইলে এ গরমে গুরুভোজনটা কিছু নয়।"

যখন বৃষ্টি পড়িত তখন ঠাকুরদাকে কেহ তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিত না ; বরঞ্চ কথা উঠিলে সকলে বলিত, "এই বৃষ্টিবাদলটা না ছাড়লে সুবিধে হচ্ছে না।"

ক্ষুদ্র বাসাবাড়িতে বাস করাটা তাঁহার পক্ষে ভালো দেখাইতেছে না এবং কষ্টও হইতেছে এ কথা তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহার সমক্ষে স্বীকার করিত, অথচ কলিকাতায় কিনিবার উপযুক্ত বাড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যে কত কঠিন সে বিষয়েও কাহারো সন্দেহ ছিল না— এমন-কি, আজ ছয় সাত বৎসর সন্ধান করিয়া ভাড়া লইবার মতো একটা বড়ো বাড়ি পাড়ার কেহ দেখিতে পাইল না— অবশেষে ঠাকুরদামশায় বলিতেন, "তা হোক ভাই, তোমাদের কাছাকাছি আছি এই আমার সুখ। নয়নজোড়ে বড়ো বাড়ি তো পড়েই আছে, কিন্তু সেখানে কি মন টেঁকে।"

আমার বিশ্বাস, ঠাকুরদাও জানিতেন যে সকলে তাঁহার অবস্থা জানে এবং যখন তিনি ভূতপূর্ব নয়নজোড়কে বর্তমান বলিয়া ভাণ করিতেন এবং অন্য সকলেও তাহাতে যোগ দিত তখন তিনি মনে মনে বুঝিতেন যে, পরস্পরের এই ছলনা কেবল পরস্পরের প্রতি সৌহার্দবশত।

কিন্তু আমার বিষম বিরক্তি বোধ হইত। অল্পবয়সে পরের নিরীহ গর্বও দমন করিতে ইচ্ছা করে এবং সহস্র গুরুতর অপরাধের তুলনায় নির্বুদ্ধিতাই সর্বাপেক্ষা অসহ্য বোধ হয়। কৈলাসবাবু ঠিক নির্বোধ ছিলেন না, কাজে কর্মে তাঁহার সহায়তা এবং পরামর্শ সকলেই প্রার্থনীয় জ্ঞান করিত। কিন্তু নয়নজোড়ের গৌরব প্রকাশ

সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। সকলে তাঁহাকে ভালোবাসিয়া এবং আমোদ করিয়া তাঁহার কোনো অসম্ভব কথাতেই প্রতিবাদ করিত না বলিয়া তিনি আপনার কথার পরিমাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। অন্য লোকেও যখন আমোদ করিয়া অথবা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নয়নজোড়ের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে বিপরীত মাত্রায় অত্যুক্তি প্রয়োগ করিত তিনি অকাতরে সমস্ত গ্রহণ করিতেন এবং স্বপ্নেও সন্দেহ করিতেন না যে, অন্য কেহ এ-সকল কথা লেশমাত্র অবিশ্বাস করিতে পারে।

আমার এক-এক সময় ইচ্ছা করিত, বৃদ্ধ যে মিথ্যা দুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে এবং মনে করিতেছে ইহা চিরস্থায়ী, সেই দুর্গটি দুই তোপে সর্বসমক্ষে উড়াইয়া দিই। একটা পাখিকে সুবিধামতো ডালের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিলেই শিকারির ইচ্ছা করে তাহাকে গুলি বসাইয়া দিতে, পাহাড়ের গায়ে একটা প্রস্তর পতনোন্মুখ থাকিতে দেখিলেই বালকের ইচ্ছা করে এক লাথি মারিয়া তাহাকে গড়াইয়া ফেলিতে— যে জিনিসটা প্রতি মুহূর্তে পড়ি-পড়ি করিতেছে অথচ কোনো একটা কিছুতে সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাকে ফেলিয়া দিলেই তবে যেন তাহার সম্পূর্ণতা-সাধন এবং দর্শকের মনে তৃপ্তিলাভ হয়। কৈলাসবাবুর মিথ্যাগুলি এতই সরল, তাহার ভিত্তি এতই দুর্বল, তাহা ঠিক সত্য-বন্দুকের লক্ষ্যের সামনে এমনি বুক ফুলাইয়া নৃত্য করিত যে, তাহাকে মুহূর্তের মধ্যে বিনাশ করিবার জন্য একটি আবেগ উপস্থিত হইত— কেবল নিতান্ত আলস্যবশত এবং সর্বজনসম্মত প্রথার অনুসরণ করিয়া সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের অতীত মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া যতটা মনে পড়ে তাহাতে বোধ করি, কৈলাসবাবুর প্রতি আমার আন্তরিক বিদ্বেষের আর-একটি গূঢ় কারণ ছিল। তাহা একটু বিবৃত করিয়া বলা আবশ্যক।

আমি বড়োমানুষের ছেলে হইয়াও যথাকালে এম. এ. পাস করিয়াছি, যৌবন সত্ত্বেও কোনোপ্রকার কুসংসর্গ কুৎসিত-আমোদে যোগ দিই নাই, এবং অভিভাবকদের মৃত্যুর পরে স্বয়ং কর্তা হইয়াও আমার স্বভাবের কোনোপ্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয় নাই। তাহা ছাড়া চেহারাটা এমন যে, তাহাকে আমি নিজমুখে সুশ্রী বলিলে অহংকার হইতে পারে, কিন্তু মিথ্যাবাদ হয় না।

অতএব বাংলাদেশে ঘটকালির হাটে আমার দাম যে অত্যন্ত বেশি তাহাতে আর

সন্দেহ নাই— এই হাটে আমার সেই দাম আমি পুরা আদায় করিয়া লইব, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ধনী পিতার পরমরূপবতী একমাত্র বিদুষী কন্যা আমার কল্পনায় আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছিল।

দশ হাজার বিশ হাজার টাকা পণের প্রস্তাব করিয়া দেশ বিদেশ হইতে আমার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। আমি অবিচলিতচিত্তে নিক্তি ধরিয়া তাহাদের যোগ্যতা ওজন করিয়া লইতেছিলাম, কোনোটাই আমার সমযোগ্য বোধ হয় নাই। অবশেষে ভবভূতির ন্যায় আমার ধারণা হইয়াছিল যে—

কী জানি জন্মিতে পারে মম সমতুল,
অসীম সময় আছে, বসুধা বিপুল।

কিন্তু বর্তমান কালে এবং ক্ষুদ্র বঙ্গদেশে সেই অসম্ভব দুর্লভ পদার্থ জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।

কন্যাদায়গ্রস্তগণ প্রতিনিয়ত নানা ছন্দে আমার স্তবস্তুতি এবং বিবিধোপচারে আমার পূজা করিতে লাগিল। কন্যা পছন্দ হউক বা না হউক, এই পূজা আমার মন্দ লাগিত না। ভালো ছেলে বলিয়া কন্যার পিতৃগণের এই পূজা আমার উচিত প্রাপ্য স্থির করিয়াছিলাম। শাস্ত্রে পড়া যায়, দেবতা বর দিন আর না দিন, যথাবিধি পূজা না পাইলে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। নিয়মিত পূজা পাইয়া আমারও মনে সেইরূপ অত্যুচ্চ দেবভাব জন্মিয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছিলাম, ঠাকুরদামশায়ের একটি পৌত্রী ছিল। তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু কখনো রূপবতী বলিয়া ভ্রম হয় নাই। সুতরাং তাহাকে বিবাহ করিবার কল্পনাও আমার মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, কৈলাসবাবু লোক মারফত অথবা স্বয়ং পৌত্রীটিকে অর্ঘ্য দিবার মানসে আমার পূজার বোধন করিতে আসিবেন, কারণ আমি ভালো ছেলে। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না।

শুনিতে পাইলাম, আমার কোনো বন্ধুকে তিনি বলিয়াছিলেন, নয়নজোড়ের বাবুরা কখনো কোনো বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কাহারো নিকটে প্রার্থনা করে নাই— কন্যা যদি চিরকুমারী হইয়া থাকে তথাপি সে কুলপ্রথা তিনি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

শুনিয়া আমার বড়ো রাগ হইল। সে রাগ অনেক দিন পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ছিল; কেবল ভালো ছেলে বলিয়াই চুপচাপ করিয়া ছিলাম।

যেমন বজ্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ থাকে, তেমনি আমার চরিত্রে রাগের সঙ্গে সঙ্গে একটা

কৌতুকপ্রিয়তা জড়িত ছিল। বৃদ্ধকে শুদ্ধমাত্র নিপীড়ন করা আমার দ্বারা সম্ভব হইত না; কিন্তু একদিন হঠাৎ এমন একটা কৌতুকাবহ প্ল্যান মাথায় উদয় হইল যে, সেটা কাজে খাটাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

পূর্বেই বলিয়াছি, বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানা লোকে নানা মিথ্যা কথার সৃজন করিত। পাড়ার একজন পেনসনভোগী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রায় বলিতেন, "ঠাকুরদা, ছোটোলাটের সঙ্গে যখনই দেখা হয় তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের খবর না নিয়ে ছাড়েন না— সাহেব বলেন, বাংলাদেশে, বর্ধমানের রাজা এবং নয়নজোড়ের বাবু, এই দুটি মাত্র যথার্থ বনেদি বংশ আছে।"

ঠাকুরদা ভারি খুশি হইতেন এবং ভূতপূর্ব ডেপুটিবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে অন্যান্য কুশলসংবাদের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন, "ছোটোলাট সাহেব ভালো আছেন? তাঁর মেমসাহেব ভালো আছেন? তাঁর পুত্রকন্যারা সকলেই ভালো আছেন? সাহেবের সহিত শীঘ্র একদিন সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ভূতপূর্ব ডেপুটি নিশ্চয়ই জানিতেন, নয়নজোড়ের বিখ্যাত চৌঘুড়ি প্রস্তুত হইয়া দ্বারে আসিতে আসিতে বিস্তর ছোটোলাট এবং বড়োলাট বদল হইয়া যাইবে।

আমি একদিন প্রাতঃকালে গিয়া কৈলাসবাবুকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া চুপিচুপি বলিলাম, "ঠাকুরদা, কাল লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের লেভিতে গিয়েছিলুম। তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের কথা পাড়াতে আমি বললুম, নয়নজোড়ের কৈলাসবাবু কলকাতাতেই আছেন; শুনে, ছোটোলাট এতদিন দেখা করতে আসেন নি বলে ভারি দুঃখিত হলেন— বলে দিলেন, আজই দুপুরবেলা তিনি গোপনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন।"

আর কেহ হইলে কথাটার অসম্ভবতা বুঝিতে পারিত এবং আর-কাহারো সম্বন্ধে হইলে কৈলাসবাবুও এ কথায় হাস্য করিতেন কিন্তু নিজের সম্বন্ধীয় বলিয়া এ সংবাদ তাঁহার লেশমাত্র অবিশ্বাস্য বোধ হইল না। শুনিয়া যেমন খুশি হইলেন তেমনি অস্থির হইয়া উঠিলেন— কোথায় বসাইতে হইবে, কী করিতে হইবে, কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন, কী উপায়ে নয়নজোড়ের গৌরব রক্ষিত হইবে, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাহা ছাড়া তিনি ইংরাজি জানেন না, কথা চালাইবেন কী করিয়া সেও এক সমস্যা।

আমি বলিলাম, "সেজন্য ভাবনা নাই, তাঁহার সঙ্গে একজন করিয়া দোভাষী থাকে; কিন্তু ছোটোলাট-সাহেবের বিশেষ ইচ্ছা, আর কেহ উপস্থিত না থাকে।"

মধ্যাহ্নে পাড়ার অধিকাংশ লোক যখন আপিসে গিয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রামগ্ন, তখন কৈলাসবাবুর বাসার সম্মুখে এক জুড়ি আসিয়া দাঁড়াইল।

তকমা-পরা চাপরাশি তাঁহাকে খবর দিল, "ছোটোলাট-সাহেব আয়া।" ঠাকুরদা প্রাচীনকাল-প্রচলিত শুভ্র জামাজোড়া এবং পাগড়ি পরিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, তাঁহার পুরাতন ভৃত্য গণেশটিকেও তাঁহার নিজের ধুতি চাদর জামা পরাইয়া ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছোটোলাটের আগমনসংবাদ শুনিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন— এবং সন্নতদেহে বারম্বার সেলাম করিতে করিতে ইংরেজবেশধারী আমার এক প্রিয় বয়স্যকে ঘরে লইয়া গেলেন।

সেখানে চৌকির উপরে তাঁহার একমাত্র বহুমূল্য শালটি পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারই উপর কৃত্রিম ছোটোলাটকে বসাইয়া উর্দুভাষায় এক অতিবিনীত সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলেন, এবং নজরের স্বরূপে স্বর্ণরেকাবিতে তাঁহাদের বহুকষ্টরক্ষিত কুলক্রমাগত এক আসরফির মালা ধরিলেন। প্রাচীন ভৃত্য গণেশ গোলাপপাশ এবং আতরদান লইয়া উপস্থিত ছিল।

কৈলাসবাবু বারম্বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের নয়নজোড়ের বাড়িতে হুজুরবাহাদুরের পদধূলি পড়িলে তাঁহাদের যথাসাধ্য যথোচিত আতিথ্যের আয়োজন করিতে পারিতেন— কলিকাতায় তিনি প্রবাসী— এখানে তিনি জলহীন মীনের ন্যায় সর্ববিষয়েই অক্ষম— ইত্যাদি।

আমার বন্ধু দীর্ঘ হ্যাট সমেত অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। ইংরেজি কায়দা-অনুসারে এরূপ স্থলে মাথায় টুপি না থাকিবার কথা কিন্তু আমার বন্ধু ধরা পড়িবার ভয়ে যথাসম্ভব আচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টায় টুপি খোলেন নাই। কৈলাসবাবু এবং তাঁহার গর্বান্ধ প্রাচীন ভৃত্যটি ছাড়া আর-সকলেই মুহূর্তের মধ্যে বাঙালির এই ছদ্মবেশ ধরিতে পারিত।

দশ মিনিট কাল ঘাড় নাড়িয়া আমার বন্ধু গাত্রোত্থান করিলেন এবং পূর্ব-শিক্ষা-মত চাপরাশিগণ সোনার রেকাবিসুদ্ধ আসরফির মালা, চৌকি হইতে সেই শাল, এবং ভৃত্যের হাত হইতে গোলাপপাশ এবং আতরদান সংগ্রহ করিয়া ছদ্মবেশীর গাড়িতে তুলিয়া দিল— কৈলাসবাবু বুঝিলেন, ইহাই ছোটোলাটের প্রথা। আমি গোপনে এক পাশের ঘরে লুকাইয়া দেখিতেছিলাম এবং রুদ্ধ হাস্যবেগে আমার পঞ্জর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

অবশেষে কিছুতে আর থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া কিঞ্চিৎ দূরবর্তী এক ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম— এবং সেখানে হাসির উচ্ছ্বাস উন্মুক্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ

দেখি, একটি বালিকা তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

আমাকে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তক্তা ছাড়িয়া দাঁড়াইল, এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রোষের গর্জন আনিয়া, আমার মুখের উপর সজল বিপুল কৃষ্ণচক্ষের সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া কহিল, "আমার দাদামশায় তোমাদের কী করেছেন— কেন তোমরা তাঁকে ঠকাতে এসেছ— কেন এসেছ তোমরা"— অবশেষে আর কোনো কথা জুটিল না— বাক্‌রুদ্ধ হইয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কোথায় গেল আমার হাস্যাবেগ। আমি যে কাজটি করিয়াছি তাহার মধ্যে কৌতুক ছাড়া আর যে কিছু ছিল এতক্ষণ তাহা আমার মাথায় আসে নাই। হঠাৎ দেখিলাম, অত্যন্ত কোমল স্থানে অত্যন্ত কঠিন আঘাত করিয়াছি; হঠাৎ আমার কৃতকার্যের বীভৎস নিষ্ঠুরতা আমার সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল— লজ্জায় এবং অনুতাপে পদাহত কুক্কুরের ন্যায় ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। বৃদ্ধ আমার কাছে কী দোষ করিয়াছিল। তাহার নিরীহ অহংকার তো কখনো কোনো প্রাণীকে আঘাত করে নাই। আমার অহংকার কেন এমন হিংস্রমূর্তি ধারণ করিল।

তাহা ছাড়া আর-একটি বিষয়ে আজ হঠাৎ দৃষ্টি খুলিয়া গেল। এতদিন আমি কুসুমকে কোনো অবিবাহিত পাত্রের প্রসন্নদৃষ্টিপাতের প্রতীক্ষায় সংরক্ষিত পণ্যপদার্থের মতো দেখিতাম; ভাবিতাম, আমি পছন্দ করি নাই বলিয়া ও পড়িয়া আছে, দৈবাৎ যাহার পছন্দ হইবে ও তাহারই হইবে। আজ দেখিলাম, এই গৃহকোণে ঐ বালিকা-মূর্তির অন্তরালে একটি মানবহৃদয় আছে। তাহার নিজের সুখদুঃখ অনুরাগবিরাগ লইয়া একটি অন্তঃকরণ এক দিকে অজ্ঞেয় অতীত আর-এক দিকে অভাবনীয় ভবিষ্যৎ -নামক দুই অনন্ত রহস্যরাজ্যের দিকে পূর্বে পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। যে মানুষের মধ্যে হৃদয় আছে সে কি কেবল পণের টাকা এবং নাক-চোখের পরিমাণ মাপিয়া পছন্দ করিয়া লইবার যোগ্য।

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রত্যুষে বৃদ্ধের সমস্ত অপহৃত বহুমূল্য দ্রব্যগুলি লইয়া চোরের ন্যায় চুপিচুপি ঠাকুরদার বাসায় গিয়া প্রবেশ করিলাম— ইচ্ছা ছিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে চাকরের হস্তে সমস্ত দিয়া আসিব।

চাকরকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্তত করিতেছি এমন সময় অদূরবর্তী ঘরে বৃদ্ধের সহিত বালিকার কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। বালিকা সুমিষ্ট সস্নেহস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "দাদামশায়, কাল লাটসাহেব তোমাকে কী বললেন।" ঠাকুরদা

অত্যন্ত হর্ষিতচিত্তে লাটসাহেবের মুখে প্রাচীন নয়নজোড়-বংশের বিস্তর কাল্পনিক গুণানুবাদ বসাইতেছিলেন। বালিকা তাহাই শুনিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতেছিল।

বৃদ্ধ অভিভাবকের প্রতি মাতৃহৃদয়া এই ক্ষুদ্র বালিকার সকরুণ ছলনায় আমার দুই চক্ষে জল ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম; অবশেষে ঠাকুরদা তাঁহার কাহিনী সমাপন করিয়া চলিয়া আসিলে আমার প্রতারণার বমালগুলি লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং নিঃশব্দে তাহার সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া আসিলাম।

বর্তমান কালের প্রথানুসারে অন্যদিন বৃদ্ধকে দেখিয়া কোনোপ্রকার অভিবাদন করিতাম না; আজ তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বৃদ্ধ নিশ্চয় মনে ভাবিলেন, গতকল্য ছোটোলাট তাঁহার বাড়িতে আসাতেই সহসা তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। তিনি পুলকিত হইয়া শতমুখে ছোটোলাটের গল্প বানাইয়া বলিতে লাগিলেন, আমিও কোনো প্রতিবাদ না করিয়া তাহাতে যোগ দিলাম। বাহিরের অন্য লোক যাহারা শুনিল তাহারা এ কথাটাকে আদ্যোপান্ত গল্প বলিয়া স্থির করিল, এবং সকৌতুকে বৃদ্ধের সহিত সকল কথায় সায় দিয়া গেল।

সকলে উঠিয়া গেলে আমি অত্যন্ত সলজ্জমুখে দীনভাবে বৃদ্ধের নিকট একটি প্রস্তাব করিলাম। বলিলাম, যদিও নয়নজোড়ের বাবুদের সহিত আমাদের বংশমর্যাদার তুলনাই হইতে পারে না, তথাপি—

প্রস্তাবটা শেষ হইবামাত্র বৃদ্ধ আমাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন এবং আনন্দবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আমি গরিব— আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে তা আমি জানতুম না ভাই, আমার কুসুম অনেক পুণ্য করেছে তাই তুমি আজ ধরা দিলে।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ, আজ এই প্রথম তাঁহার মহিমান্বিত পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া স্বীকার করিলেন যে তিনি গরিব, স্বীকার করিলেন যে আমাকে লাভ করিয়া নয়নজোড়-বংশের গৌরবহানি হয় নাই। আমি যখন বৃদ্ধকে অপদস্থ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছিলাম তখন বৃদ্ধ আমাকে পরম সৎপাত্র জানিয়া একান্ত মনে কামনা করিতেছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

প্রতিহিংসা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুকুন্দবাবুদের ভূতপূর্ব দেওয়ানের পৌত্রী, বর্তমান ম্যানেজারের স্ত্রী ইন্দ্রাণী অশুভক্ষণে বাবুদের বাড়িতে তাঁহাদের দৌহিত্রের বিবাহে বউভাতের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

তৎপূর্বকার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে।

এক্ষণে মুকুন্দবাবুও ভূতপূর্ব, তাঁহার দেওয়ান গৌরীকান্তও ভূতপূর্ব; কালের আহ্বান অনুসারে উভয়ের কেহই স্বস্থানে সশরীরে বর্তমান নাই। কিন্তু যখন ছিলেন তখন উভয়ের মধ্যে বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। পিতৃমাতৃহীন গৌরীকান্তের যখন কোনো জীবনোপায় ছিল না তখন মুকুন্দলাল কেবলমাত্র মুখ দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপরে নিজের ক্ষুদ্র বিষয়সম্পত্তির পর্যবেক্ষণের ভার দেন। কালে প্রমাণ হইল যে, মুকুন্দলাল ভুল করেন নাই। কীট যেমন করিয়া বল্মীক রচনা করে, স্বর্গকামী যেমন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করে, গৌরীকান্ত তেমনি করিয়া অশ্রান্ত যত্নে তিলে তিলে দিনে দিনে মুকুন্দলালের বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন তিনি কৌশলে আশ্চর্য সুলভ মূল্যে তরফ বাঁকাগাড়ি ক্রয় করিয়া মুকুন্দলালের সম্পত্তিভুক্ত করিলেন তখন হইতে মুকুন্দবাবুরা গণ্যমান্য জমিদারশ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রভুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যেরও উন্নতি হইল; অল্পে অল্পে তাঁহার কোঠাবাড়ি, জোতজমা এবং পূজার্চনা বিস্তার লাভ করিল। এবং যিনি এক কালে সামান্য তহশিলদার শ্রেণীর ছিলেন তিনিও সাধারণের নিকট দেওয়ানজি নামে পরিচিত হইলেন।

ইহাই ভূতপূর্ব কালের ইতিহাস। বর্তমান কালে মুকুন্দবাবুর একটি পোষ্যপুত্র আছেন, তাঁহার নাম বিনোদবিহারী। এবং গৌরীকান্তের সুশিক্ষিত নাতজামাই অম্বিকাচরণ তাঁহাদের ম্যানেজারের কাজ করিয়া থাকেন। দেওয়ানজি তাঁহার পুত্র রমাকান্তকে বিশ্বাস করিতেন না— সেইজন্য বার্ধক্যবশত নিজে যখন কাজ ছাড়িয়া দিলেন তখন পুত্রকে লঙ্ঘন করিয়া নাতজামাই অম্বিকাকে আপন কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কাজকর্ম বেশ চলিতেছে; পূর্বের আমলে যেমন ছিল এখনো সকলই প্রায় তেমনি আছে, কেবল একটা বিষয়ে একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে; এখন প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক কেবল

কাজকর্মের সম্পর্ক— হৃদয়ের সম্পর্ক নহে। পূর্বকালে টাকা সস্তা ছিল এবং হৃদয়টাও কিছু সুলভ ছিল, এখন সর্বসম্মতিক্রমে হৃদয়ের বাজে খরচটা একপ্রকার রহিত হইয়াছে; নিতান্ত আত্মীয়ের ভাগেই টানাটানি পড়িয়াছে, তা বাহিরের লোকে পাইবে কোথা হইতে।

ইতিমধ্যে বাবুদের বাড়িতে দৌহিত্রের বিবাহে বউভাতের নিমন্ত্রণে দেওয়ানজির পৌত্রী ইন্দ্রাণী গিয়া উপস্থিত হইল।

সংসারটা কৌতূহলী অদৃষ্টপুরুষের রাসায়নিক পরীক্ষাশালা। এখানে কতকগুলা বিচিত্রচরিত্র মানুষ একত্র করিয়া তাহাদের সংযোগ-বিয়োগে নিয়ত কত চিত্রবিচিত্র অভূতপূর্ব ইতিহাস সৃজিত হইতেছে, তাহার আর সংখ্যা নাই।

এই বউভাতের নিমন্ত্রণস্থলে, এই আনন্দকার্যের মধ্যে, দুটি দুই রকমের মানুষের দেখা হইল এবং দেখিতে দেখিতে সংসারের অশ্রান্ত জালবুনানির মধ্যে একটা নূতন বর্ণের সূত্র উঠিয়া পড়িল এবং একটা নূতন রকমের গ্রন্থি পড়িয়া গেল।

সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গেলে ইন্দ্রাণী বৈকালের দিকে কিছু বিলম্বে মনিব-বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিনোদের স্ত্রী নয়নতারা যখন বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দ্রাণী গৃহকর্মের ব্যস্ততা, শারীরিক অস্বাস্থ্য প্রভৃতি দুই-চারিটা কারণ প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহা কাহারো সন্তোষজনক বোধ হইল না।

প্রকৃত কারণ যদিও ইন্দ্রাণী গোপন করিল তথাপি তাহা বুঝিতে কাহারো বাকি রহিল না। সে কারণটি এই— মুকুন্দবাবুরা প্রভু, ধনী বটেন, কিন্তু কুলমর্যাদায় গৌরীকান্ত তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রাণী সে শ্রেষ্ঠতা ভুলিতে পারে না। সেইজন্য মনিবের বাড়ি পাছে খাইতে হয় এই ভয়ে সে যথেষ্ট বিলম্ব করিয়া গিয়াছিল। তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তাহাকে খাওয়াইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্রাণী পরাস্ত হইবার মেয়ে নহে, তাহাকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না।

একবার মুকুন্দ এবং গৌরীকান্ত বর্তমানেও কুলাভিমান লইয়া ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর বিপ্লব বাধিয়াছিল। সে ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রাণী দেখিতে বড়ো সুন্দর। আমাদের ভাষায় সুন্দরীর সহিত স্থিরসৌদামিনীর তুলনা প্রসিদ্ধ আছে। সে তুলনা অধিকাংশ স্থলেই খাটে না, কিন্তু ইন্দ্রাণীকে খাটে। ইন্দ্রাণী যেন আপনার মধ্যে একটা প্রবল বেগ এবং প্রখর জ্বালা একটি সহজ শক্তির দ্বারা অটল গাম্ভীর্যপাশে অতি অনায়াসে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুৎ তাহার মুখে চক্ষে এবং সর্বাঙ্গে নিত্যকাল ধরিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এখানে তাহার চপলতা নিষিদ্ধ।

এই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়া মুকুন্দবাবু তাঁহার পোষ্যপুত্রের সহিত ইহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব গৌরীকান্তের নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রভুভক্তিতে গৌরীকান্ত কাহারো নিকটে ন্যূন ছিলেন না; তিনি প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে পারিতেন; এবং তাঁহার অবস্থার যতই উন্নতি হউক এবং কর্তা তাঁহার প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে যতই প্রশ্রয় দিন, তিনি কখনো ভ্রমেও স্বপ্নেও প্রভুর সম্মান বিস্মৃত হন নাই; প্রভুর সম্মুখে, এমন-কি, প্রভুর প্রসঙ্গে তিনি যেন সন্নত হইয়া পড়িতেন— কিন্তু এই বিবাহের প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। প্রভুভক্তির দেনা তিনি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিতেন, কুলমর্যাদার পাওনা তিনি ছাড়িবেন কেন। মুকুন্দলালের পুত্রের সহিত তিনি তাঁহার পৌত্রীর বিবাহ দিতে পারেন না।

ভৃত্যের এই কুলগর্ব মুকুন্দলালের ভালো লাগে নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দ্বারা তাঁহার ভক্ত সেবকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইবে; গৌরী-কান্ত যখন কথাটা সেভাবে লইলেন না তখন মুকুন্দলাল কিছুদিন তাঁহার সহিত বাক্যা-লাপ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত মনঃকষ্ট দিয়াছিলেন। প্রভুর এই বিমুখভাব গৌরী-কান্তের বক্ষে মৃত্যুশেলের ন্যায় বাজিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার পৌত্রীর সহিত এক পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র কুলীনসন্তানের বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘরে পালন করিয়া নিজের অর্থে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন।

সেই কুলমদগর্বিত পিতামহের পৌত্রী ইন্দ্রাণী তাহার প্রভুগৃহে গিয়া আহার করিল না; ইহাতে তাহার প্রভুপত্নী নয়নতারার অন্তঃকরণে সুমধুর প্রীতিরস উদ্‌বেলিত হইয়া উঠে নাই সে কথা বলা বাহুল্য। তখন ইন্দ্রাণীর অনেকগুলি স্পর্ধা নয়নতারার বিদ্বেষ-কষায়িত কল্পনাচক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

প্রথম, ইন্দ্রাণী অনেক গহনা পরিয়া অত্যন্ত সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। মনিব-বাড়িতে এত ঐশ্বর্যের আড়ম্বর করিয়া প্রভুদের সহিত সমকক্ষতা দেখাইবার কী আবশ্যক ছিল।

দ্বিতীয়, ইন্দ্রাণীর রূপের গর্ব। ইন্দ্রাণীর রূপটা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং নিম্নপদস্থ ব্যক্তির এত অধিক রূপ থাকা অনাবশ্যক এবং অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু তাহার গর্বটা সম্পূর্ণ নয়নতারার কল্পনা। রূপের জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না, এইজন্য নিন্দা করিতে হইলে অগত্যা গর্বের অবতারণা করিতে হয়।

তৃতীয়, ইন্দ্রাণীর দাম্ভিকতা, চলিত ভাষায় যাহাকে বলে দেমাক। ইন্দ্রাণীর একটি স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ছিল। অত্যন্ত প্রিয় পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত সে কাহারো সহিত মাখামাখি করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া গায়ে পড়িয়া একটা সোরগোল করা,

অগ্রসর হইয়া সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া, সেও তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল না।

এইরূপ নানাপ্রকার অমূলক ও সমূলক কারণে নয়নতারা ক্রমশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং অনাবশ্যক সূত্র ধরিয়া ইন্দ্রাণীকে 'আমাদের ম্যানেজারের স্ত্রী' 'আমাদের দেওয়ানের নাৎনী' বলিয়া বারম্বার পরিচিত ও অভিহিত করিতে লাগিল। তাহার একজন প্রিয় মুখরা দাসীকে শিখাইয়া দিল— সে ইন্দ্রাণীর গায়ের উপর পড়িয়া সখীভাবে তাহার গহনাগুলি হাত দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া সমালোচনা করিতে লাগিল। কণ্ঠী এবং বাজুবন্দের প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, এ কি গিল্টি-করা।"

ইন্দ্রাণী পরম গম্ভীরমুখে কহিল, "না, এ পিতলের।"

নয়নতারা ইন্দ্রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ওগো, তুমি ওখানে একলা দাঁড়িয়ে কী করছ, এই খাবারগুলো হাটখোলার পালকিতে তুলে দিয়ে এসো-না।"

অদূরে বাড়ির দাসী উপস্থিত ছিল।

ইন্দ্রাণী কেবল মুহূর্তকালের জন্য তাহার বিপুলপক্ষ্মচ্ছায়াগভীর উদার দৃষ্টি মেলিয়া নয়নতারার মুখের দিকে চাহিল এবং পরক্ষণেই নীরবে মিষ্টান্নপূর্ণ সরা খুরি তুলিয়া লইয়া হাটখোলার পালকির উদ্দেশে নীচে চলিল।

যিনি এই মিষ্টান্ন উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কেন ভাই, কষ্ট করছ, দাও-না ঐ দাসীর হাতে দাও।"

ইন্দ্রাণী তাহাতে সম্মত না হইয়া কহিল, "এতে আর কষ্ট কিসের।"

অপরা কহিলেন, "তবে ভাই, আমার হাতে দাও।"

ইন্দ্রাণী কহিল, "না, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।"

বলিয়া, অন্নপূর্ণা যেমন স্নিগ্ধগম্ভীর মুখে সমুচ্চ স্নেহে ভক্তকে স্বহস্তে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন তেমনি অটল স্নিগ্ধভাবে ইন্দ্রাণী পালকিতে মিষ্টান্ন রাখিয়া আসিল— এবং সেই দুই মিনিট-কালের সংস্রবে হাটখোলাবাসিনী ধনিগৃহবধূ এই স্বল্পভাষিণী মিতহাসিনী ইন্দ্রাণীর সহিত জন্মের মতো প্রাণের সখীত্ব স্থাপনের জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে নয়নতারা স্ত্রীজনসুলভ নিষ্ঠুর নৈপুণ্যের সহিত যতগুলি অপমানশর বর্ষণ করিল ইন্দ্রাণী তাহার কোনোটাকেই গায়ে বিঁধিতে দিল না; সকলগুলিই তাহার অকলঙ্ক সমুজ্জ্বল সহজ তেজস্বিতার কঠিন বর্মে ঠেকিয়া আপনি ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। তাহার গম্ভীর অবিচলতা দেখিয়া নয়নতারার আক্রোশ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং ইন্দ্রাণী তাহা বুঝিতে পারিয়া একসময় অলক্ষ্যে কাহারো নিকট বিদায় না লইয়া বাড়ি চলিয়া আসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাহারা শান্তভাবে সহ্য করে তাহারা গভীরতররূপে আহত হয়; অপমানের আঘাত ইন্দ্রাণী যদিও অসীম অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তথাপি তাহা তাহার অন্তরে বাজিয়াছিল।

ইন্দ্রাণীর সহিত যেমন বিনোদবিহারীর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল তেমনি এক সময় ইন্দ্রাণীর এক দূরসম্পর্কের নিঃস্ব পিসতুতো ভাই বামাচরণের সহিত নয়নতারার বিবাহের কথা হয়, সেই বামাচরণ এখন বিনোদের সেরেস্তায় একজন সামান্য কর্মচারী। ইন্দ্রাণীর এখনো মনে পড়ে, বাল্যকালে একদিন নয়নতারার বাপ নয়নকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাড়িতে আসিয়া বামাচরণের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য গৌরী-কান্তকে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে ক্ষুদ্র বালিকা নয়নতারার অসামান্য প্রগল্‌ভতায় গৌরীকান্তের অন্তঃপুরে সকলেই আশ্চর্য এবং কৌতুকান্বিত হইয়াছিলেন এবং তাহার সেই অকালপক্কতার নিকট মুখচোরা লাজুক ইন্দ্রাণী নিজেকে নিতান্ত অক্ষমা অনভিজ্ঞা জ্ঞান করিয়াছিল। গৌরীকান্ত এই মেয়েটির অনর্গল কথায়-বার্তায় এবং চেহারায় বড়োই খুশি হইয়াছিলেন, কিন্তু কুলের যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকায় বামাচরণের সহিত ইহার বিবাহপ্রস্তাবে মত দিলেন না। অবশেষে তাঁহারই পছন্দে এবং তাঁহারই চেষ্টায় অকুলীন বিনোদের সহিত নয়নতারার বিবাহ হয়।

এই-সকল কথা মনে করিয়া ইন্দ্রাণী কোনো সান্ত্বনা পাইল না, বরং অপমান আরো বেশি করিয়া বাজিতে লাগিল। মহাভারতে বর্ণিত শুক্রাচার্যদুহিতা দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার কথা মনে পড়িল। দেবযানী যেমন তাহার প্রভুকন্যা শর্মিষ্ঠার দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাকে দাসী করিয়াছিল, ইন্দ্রাণী যদি তেমনি করিতে পারিত তবেই যথোপযুক্ত বিধান হইত। এক সময় ছিল, যখন দৈত্যদের নিকট দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের ন্যায় মুকুন্দবাবুর পরিবারবর্গের নিকট তাহার পিতামহ গৌরীকান্ত একান্ত আবশ্যক ছিলেন। তখন তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে মুকুন্দবাবুকে হীনতা স্বীকার করাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনিই মুকুন্দলালের বিষয়সম্পত্তিকে উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অতএব আজ আর তাঁহাকে স্মরণ করিয়া প্রভুদের কৃতজ্ঞ হইবার আবশ্যকতা নাই। ইন্দ্রাণী মনে করিল, বাঁকাগাড়ি পরগনা তাহার পিতামহ অনায়াসে নিজের জন্যই কিনিতে পারিতেন, তখন তাঁহার সে ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, তাহা না করিয়া তিনি সেটা মনিবকে কিনিয়া দিলেন— ইহা যে একপ্রকার দান করা সে কথা কি আজ সেই মনিবের বংশে কেহ মনে করিয়া রাখিয়াছে।

'আমাদেরই দত্ত ধনমানের গর্বে তোমরা আমাদিগকে আজ অপমান করিবার অধিকার পাইয়াছ' ইহাই মনে করিয়া ইন্দ্রাণীর চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল তাহার স্বামী প্রভুগৃহের নিমন্ত্রণ ও তাহার পরে জমিদারি কাছারির সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া তাহার শয়নকক্ষের একটি কেদারা আশ্রয় করিয়া নিভৃতে খবরের কাগজ পাঠ করিতেছেন।

অনেকের ধারণা আছে যে, স্বামী-স্ত্রীর স্বভাব প্রায়ই একরূপ হইয়া থাকে। তাহার কারণ, দৈবাৎ কোনো কোনো স্থলে স্বামী-স্ত্রীর স্বভাবের মিল দেখিতে পাইলে সেটা আমাদের নিকট এমন সমুচিত এবং সংগত বলিয়া বোধ হয় যে, আমরা আশা করি এই নিয়ম বুঝি অধিকাংশ স্থলেই খাটে। যাহা হউক, বর্তমান ক্ষেত্রে অম্বিকাচরণের সহিত ইন্দ্রাণীর দুই-একটা বিশেষ বিষয়ে বাস্তবিক স্বভাবের মিল দেখা যায়। অম্বিকাচরণ তেমন মিশুক লোক নহেন। তিনি বাহিরে যান কেবলমাত্র কাজ করিতে। নিজের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করিয়া এবং অন্যকে পুরামাত্রায় কাজ করাইয়া লইয়া বাড়ি আসিয়া যেন তিনি অনাত্মীয়তার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক দুর্গম দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেন। বাহিরে তিনি এবং তাঁহার কর্তব্য কর্ম, ঘরের মধ্যে তিনি এবং তাঁহার ইন্দ্রাণী, ইহাতেই তাঁহার সমস্ত জীবন পর্যাপ্ত।

ভূষণের ছটা বিস্তার করিয়া যখন সুসজ্জিতা ইন্দ্রাণী ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন অম্বিকাচরণ তাঁহাকে পরিহাস করিয়া কী একটা কথা বলিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু সহসা ক্ষান্ত হইয়া চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কী হয়েছে।"

ইন্দ্রাণী তাঁহার সমস্ত চিন্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "কী আর হবে। সম্প্রতি আমার স্বামিরত্নের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে।"

অম্বিকা খবরের কাগজ ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "সে তো আমার অগোচর নেই। তৎপূর্বে ?"

ইন্দ্রাণী একে একে গহনা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "তৎপূর্বে স্বামিনীর কাছ থেকে সমাদর লাভ হয়েছে।"

অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমাদরটা কী রকমের।"

ইন্দ্রাণী স্বামীর কাছে আসিয়া তাঁহার কেদারার হাতার উপর বসিয়া তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া উত্তর করিল, "তোমার কাছ থেকে যে রকমের পাই ঠিক সেই রকমের নয়।"

তাহার পর, ইন্দ্রাণী একে একে সকল কথা বলিয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল স্বামীর কাছে এ-সকল অপ্রিয় কথার উত্থাপন করিবে না ; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল

না এবং ইহার অনুরূপ প্রতিজ্ঞাও ইন্দ্রাণী ইতিপূর্বে কখনো রক্ষা করিতে পারে নাই। বাহিরের লোকের নিকট ইন্দ্রাণী যতই সংযত সমাহিত হইয়া থাকিত স্বামীর নিকটে সে সেই পরিমাণে আপন প্রকৃতির সমুদয় স্বাভাবিক বন্ধন মোচন করিয়া ফেলিত— সেখানে লেশমাত্র আত্মগোপন করিতে পারিত না।

অম্বিকাচরণ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এখনই আমি কাজে ইস্তফা দিব।" তৎক্ষণাৎ তিনি বিনোদবাবুকে এক কড়া চিঠি লিখিতে উদ্যত হইলেন।

ইন্দ্রাণী তখন চৌকির হাতা হইতে নীচে নামিয়া মাদুর-পাতা মেঝের উপর স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার কোলের উপর বাহু রাখিয়া বলিল, "এত তাড়াতাড়ি কাজ নেই। চিঠি আজ থাক্। কাল সকালে যা হয় স্থির কোরো।"

অম্বিকা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "না, আর এক দণ্ড বিলম্ব করা উচিত নয়।"

ইন্দ্রাণী তাহার পিতামহের হৃদয়মৃণালে একটিমাত্র পদ্মের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অন্তর হইতে সে যেমন স্নেহরস আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল তেমনি পিতামহের চিত্তসঞ্চিত অনেকগুলি ভাব সে অলক্ষ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। মুকুন্দলালের পরিবারের প্রতি গৌরীকান্তের যে-একটি অচল নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল ইন্দ্রাণী যদিও তাহা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু প্রভুপরিবারের হিতসাধনে জীবন অর্পণ করা যে তাহাদের কর্তব্য এই ভাবটি তাহার মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাহার সুশিক্ষিত স্বামী ইচ্ছা করিলে ওকালতি করিতে পারিতেন, সম্মানজনক কাজ লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর হৃদয়ের দৃঢ় সংস্কার অনুসরণ করিয়া তিনি অনন্যমনে সন্তুষ্টচিত্তে বিনোদের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ইন্দ্রাণী যদিও অপমানে আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহার স্বামী যে বিনোদবিহারীর কাজ ছাড়িয়া দিবে এ তাহার কিছুতেই মনে লইল না।

ইন্দ্রাণী তখন যুক্তির অবতারণা করিয়া মৃদুস্বরে মিষ্টস্বরে কহিল, "বিনোদবাবুর তো কোনো দোষ নেই, তিনি এর কিছুই জানেন না। তাঁর স্ত্রীর উপর রাগ করে তুমি হঠাৎ তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবে কেন।"

শুনিয়া অম্বিকাবাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন; নিজের সংকল্প তাঁহার নিকট অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। তিনি কহিলেন, "সে একটা কথা বটে। কিন্তু মনিব হোন আর যিনিই হোন, ওদের ওখানে আর কখনো তোমাকে পাঠাচ্ছি নে।"

এই অল্প একটু ঝড়েই সেদিনকার মতো মেঘ কাটিয়া গেল, গৃহ প্রসন্ন হইয়া

উঠিল এবং স্বামীর বিশেষ আদরে ইন্দ্রাণী বাহিরের সমস্ত অনাদর বিস্মৃত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিনোদবিহারী অম্বিকাচরণের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া জমিদারির কাজ কিছুই দেখিতেন না। নিতান্তনির্ভর ও অতিনিশ্চয়তাবশত কোনো কোনো স্বামী ঘরের স্ত্রীকে যেরূপ অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকে, নিজের জমিদারির প্রতিও বিনোদের কতকটা সেইভাবের উপেক্ষা ছিল। জমিদারির আয় এতই নিশ্চিত, এতই বাঁধা যে তাহাকে আয় বলিয়া বোধ হয় না, তাহা অভ্যস্ত, এবং তাহার কোনো আকর্ষণ ছিল না।

বিনোদের ইচ্ছা ছিল, একটা সংক্ষেপ সুড়ঙ্গপথ অবলম্বন করিয়া হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে কুবেরের ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেইজন্য নানা লোকের পরামর্শে তিনি গোপনে নানাপ্রকার আজগবি ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেন। কখনো স্থির হইত, দেশের সমস্ত বাবলা গাছ জমা লইয়া গোরুর গাড়ির চাকা তৈরি করিবেন; কখনো পরামর্শ হইত, সুন্দরবনের সমস্ত মধুচক্র তিনি আহরণ করিবেন; কখনো লোক পাঠাইয়া পশ্চিমপ্রদেশের বনগুলি বন্দোবস্ত করিয়া হরীতকীর ব্যবসায় একচেটে করিবার আয়োজন হইত। বিনোদ মনে মনে ইহা বুঝিতেন যে অন্য লোকে শুনিলে হাসিবে, সেইজন্য কাহারো কাছে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। বিশেষত অম্বিকাচরণকে তিনি একটু বিশেষ লজ্জা করিতেন; অম্বিকা পাছে মনে করেন তিনি টাকাগুলো নষ্ট করিতে বসিয়াছেন, সেজন্য মনে মনে সংকুচিত ছিলেন। অম্বিকার নিকট তিনি এমনভাবে থাকিতেন যেন অম্বিকাই জমিদার এবং তিনি কেবল বসিয়া থাকিবার জন্য বার্ষিক কিছু বেতন পাইতেন।

নিমন্ত্রণের পরদিন হইতে নয়নতারা তাঁহার স্বামীর কানে মন্ত্র দিতে লাগিলেন। "তুমি তো নিজে কিছুই দেখ না, তোমাকে অম্বিকা হাত তুলিয়া যাহা দেয় তাহাই তুমি শিরোধার্য করিয়া লও; এ দিকে ভিতরে ভিতরে কী সর্বনাশ হইতেছে তাহা কেহই জানে না। তোমার ম্যানেজারের স্ত্রী যা গয়না পরিয়া আসিয়াছিল এমন গয়না তোমার ঘরে আসিয়া আমি কখনো চক্ষেও দেখি নাই। এ-সব গয়না সে পায় কোথা হইতে এবং এত দেমাকই বা তাহার বাড়িল কিসের জোরে" ইত্যাদি ইত্যাদি। গহনার বর্ণনা নয়নতারা অনেকটা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল, এবং ইন্দ্রাণী নিজমুখে তাহার দাসীকে কী-সকল কথা বলিয়া গেছে তাহাও সে বহুল পরিমাণে রচনা করিয়া গেল।

বিনোদ দুর্বল প্রকৃতির লোক ; এক দিকে সে পরের প্রতি নির্ভর না করিয়াও থাকিতে পারে না, অপর দিকে যে তাহার কানে যেরূপ সন্দেহ তুলিয়া দেয় সে তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসে। ম্যানেজার যে চুরি করিতেছে মুহূর্তকালের মধ্যেই এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। বিশেষত কাজ সে নিজে দেখে না বলিয়া কল্পনায় সে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। অথচ কেমন করিয়া ম্যানেজারের চুরি ধরিতে হইবে তাহারও রাস্তা সে জানে না। স্পষ্ট করিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারে এমন সাহস নাই। মহা মুশকিল হইল।

অম্বিকাচরণের একাধিপত্যে কর্মচারিগণ সকলেই ঈর্ষান্বিত ছিল। বিশেষত গৌরীকান্ত তাঁহার যে দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় বামাচরণকে কাজ দিয়াছিলেন অম্বিকার প্রতি বিদ্বেষ তাহারই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কারণ, সম্পর্ক প্রভৃতি অনুসারে সে নিজেকে অম্বিকার সমান জ্ঞান করিত এবং অম্বিকা তাহার আত্মীয় হইয়াও কেবলমাত্র ঈর্ষাবশতই তাহাকে উচ্চপদ দিতেছে না, এ ধারণা তাহার দৃঢ় ছিল। পদ পাইলেই পদের উপযুক্ত যোগ্যতা আপনি জোগায় এই তাহার মত। বিশেষত ম্যানেজারের কাজকে সে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিত ; বলিত, সেকালে রথের উপর যেমন ধ্বজা থাকিত, আজকাল আপিসের কাজে ম্যানেজার সেইরূপ— ঘোড়া-বেটা খাটিয়া মরে আর ধ্বজা-মহাশয় রথের সঙ্গে সঙ্গে কেবল দর্পভরে দুলিতে থাকেন।

বিনোদ ইতিপূর্বে কাজকর্মের কোনো খোঁজখবর লইত না ; কেবল যখন ব্যাবসা উপলক্ষে হঠাৎ অনেক টাকার প্রয়োজন হইত তখন গোপনে খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত, এখন তহবিলে কত টাকা আছে ? খাজাঞ্চি টাকার পরিমাণ বলিলে কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া সে টাকাটা চাহিয়া ফেলিত, যেন তাহা পরের টাকা। খাজাঞ্চি তাহার নিকট সই লইয়া টাকা দিত, তাহার পরে কিছুকাল ধরিয়া অম্বিকাবাবুর নিকট বিনোদ কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত। কোনোমতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেই আরাম বোধ করিত।

অম্বিকাচরণ মাঝে মাঝে ইহা লইয়া বিপদে পড়িতেন। কারণ, জমিদারের অংশ জমিদারকে দিয়া তহবিলে প্রায় আমানতি সদরখাজনা, অথবা আমলাবর্গের বেতন প্রভৃতির খরচের টাকা জমা থাকিত। সে টাকা অন্যায় ব্যয় হইয়া গেলে বড়োই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বিনোদ টাকাটি লইয়া এমনি চোরের মতো লুকাইয়া বেড়াইত যে, তাহাকে এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলিবার অবসর পাওয়া যাইত না ; পত্র লিখিলেও কোনো ফল হইত না ; কারণ, লোকটার কেবল চক্ষুলজ্জা ছিল, আর-কোনো লজ্জা ছিল না, এইজন্য সে কেবল সাক্ষাৎকারকে ডরাইত।

ক্রমে যখন বিনোদ বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল, তখন অম্বিকাচরণ বিরক্ত হইয়া লোহার সিন্ধুকের চাবি নিজের কাছে রাখিলেন। বিনোদের গোপনে টাকা লওয়া একেবারে বন্ধ হইল। অথচ লোকটা এতই দুর্বল প্রকৃতি যে, প্রভু হইয়াও স্পষ্ট করিয়া এ সম্বন্ধে কোনোপ্রকার বল খাটাইতে পারিল না। অম্বিকাচরণের বৃথা চেষ্টা। অলক্ষ্মী যাহার সহায় লোহার সিন্ধুকের চাবি তাহার টাকা আটক করিয়া রাখিতে পারে না। বরং হিতে বিপরীত হইল। কিন্তু সে-সকল কথা পরে হইবে।

অম্বিকাচরণের কড়া নিয়মে বিনোদ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়াছিল। এমন সময় নয়নতারা যখন তাহার মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল তখন সে কিছু খুশি হইল। গোপনে একে একে নিম্নতন কর্মচারীদিগকে ডাকিয়া সন্ধান লইতে লাগিল। তখন বামাচরণ তাহার প্রধান চর হইয়া উঠিল।

গৌরীকান্তের আমলে দেওয়ানজি বলপূর্বক পার্শ্ববর্তী জমিদারের জমিতে হস্তক্ষেপ করিতে কুন্ঠিত হইতেন না। এমন করিয়া তিনি অনেকের অনেক জমি অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু অম্বিকাচরণ কখনো সে কাজে প্রবৃত্ত হইতেন না। এবং মকদ্দমা বাধিবার উপক্রম হইলে তিনি যথাসাধ্য আপসের চেষ্টা করিতেন। বামাচরণ ইহারই প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল, অম্বিকাচরণ নিশ্চয় অপর পক্ষ হইতে ঘুষ লইয়া মনিবের ক্ষতি করিয়া আপস করিয়াছে। বামাচরণের নিজেরও বিশ্বাস তাহাই; যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে যে ঘুষ না লইয়া থাকিতে পারে, ইহা সে মরিয়া গেলেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

এইরূপে গোপনে নানা মুখ হইতে ফুৎকার পাইয়া বিনোদের সন্দেহশিখা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু সে প্রত্যক্ষভাবে কোনো উপায় অবলম্বন করিতেই সাহস করিল না। এক চক্ষুলজ্জা; দ্বিতীয়ত আশঙ্কা, পাছে সমস্ত অবস্থাভিজ্ঞ অম্বিকাচরণ তাহার কোনো অনিষ্ট করে।

অবশেষে নয়নতারা স্বামীর এই কাপুরুষতায় জ্বলিয়া পুড়িয়া বিনোদের অজ্ঞাতসারে একদিন অম্বিকাচরণকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিলেন, "তোমাকে আর রাখা হবে না, তুমি বামাচরণকে সমস্ত হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাও।"

তাঁহার সম্বন্ধে বিনোদের নিকট আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে সে কথা অম্বিকা পূর্বেই আভাসে জানিতে পারিয়াছিলেন, সেজন্য নয়নতারার কথায় তিনি তেমন আশ্চর্য হন নাই; তৎক্ষণাৎ বিনোদবিহারীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি আপনি কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিতে চান।"

বিনোদ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, কখনোই না।"

অম্বিকাচরণ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার উপর কি আপনার কোনো সন্দেহের কারণ ঘটেছে।"

বিনোদ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "কিছুমাত্র না।" অম্বিকাচরণ নয়নতারার ঘটনা উল্লেখমাত্র না করিয়া আপিসে চলিয়া আসিলেন; বাড়িতে ইন্দ্রাণীকেও কিছু বলিলেন না। এইভাবে কিছুদিন গেল।

এমন সময় অম্বিকাচরণ ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়িলেন। শক্ত ব্যামো নহে, কিন্তু দুর্বলতা-বশত অনেক দিন আপিস কামাই করিতে হইল।

সেই সময় সদর খাজনা দেয় এবং অন্যান্য কাজের বড়ো ভিড়। সেইজন্য একদিন সকালে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া অম্বিকাচরণ হঠাৎ আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন কেহই তাঁহাকে প্রত্যাশা করে নাই এবং সকলেই বলিতে লাগিল, "আপনি বাড়ি যান, এত কাহিল শরীরে কাজ করিবেন না।"

অম্বিকাচরণ নিজের দুর্বলতার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিয়া, ডেস্কে গিয়া বসিলেন। আমলারা সকলেই কিছু যেন অস্থির হইয়া উঠিল এবং হঠাৎ অত্যন্ত অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হইল।

অম্বিকাচরণ ডেস্ক খুলিয়া দেখেন তাহার মধ্যে তাঁহার একখানি কাগজও নাই। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কী!" সকলেই যেন আকাশ হইতে পড়িল, চোরে লইয়াছে কি ভূতে লইয়াছে কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

বামাচরণ কহিল, "আরে মশায়, আপনারা ন্যাকামি রেখে দিন। সকলেই জানেন, ওর কাগজপত্র বাবু নিজে তলব করে নিয়ে গেছেন।"

অম্বিকা রুদ্ধ রোষে শ্বেতবর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন।"

বামাচরণ কাগজ লিখিতে লিখিতে বলিল, "সে আমরা কেমন করে বলব।"

বিনোদ অম্বিকাচরণের অনুপস্থিতি-সুযোগে বামাচরণের মন্ত্রণাক্রমে নূতন চাবি তৈয়ার করাইয়া ম্যানেজারের প্রাইভেট ডেস্ক খুলিয়া তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে লইয়া গিয়াছেন। চতুর বামাচরণ সে কথা গোপন করিল না, অম্বিকা অপমানিত হইয়া কাজে ইস্তফা দেন ইহা তাহার অনভিপ্রেত ছিল না।

অম্বিকাচরণ ডেস্কে চাবি লাগাইয়া কম্পিতদেহে বিনোদের সন্ধানে গেলেন— বিনোদ বলিয়া পাঠাইল তাহার মাথা ধরিয়াছে— সেখান হইতে বাড়ি গিয়া হঠাৎ দুর্বলদেহে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া যেন আবৃত করিয়া ধরিল। ক্রমে ইন্দ্রাণী সকল কথা শুনিল।

স্থিরসৌদামিনী আজ স্থির রহিল না— তাহার বক্ষ ফুলিতে লাগিল, বিস্ফারিত

মেঘকৃষ্ণ চক্ষুপ্রান্ত হইতে উন্মুক্ত বজ্রশিখা সুতীব্র উগ্রজ্বালা বিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন স্বামীর এমন অপমান! এত বিশ্বাসের এই পুরস্কার!

ইন্দ্রাণীর এই অত্যুগ্র নিঃশব্দ রোষদাহ দেখিয়া অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল। তিনি যেন দেবতার শাসন হইতে পাপীকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রাণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "বিনোদ ছেলেমানুষ, দুর্বলস্বভাব, পাঁচজনের কথা শুনে তার মন বিগড়ে গেছে।"

তখন ইন্দ্রাণী দুই হস্তে তাহার স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত চাপিয়া ধরিল এবং হঠাৎ তাহার দুই চক্ষুর রোষদীপ্তি ম্লান করিয়া দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় হইতে, সমস্ত অপমান হইতে, দুই বাহুপাশে টানিয়া লইয়া সে যেন তাহার হৃদয়-দেবতাকে আপন হৃদয়মন্দিরে তুলিয়া রাখিতে চায়।

স্থির হইল অম্বিকাচরণ এখনই কাজ ছাড়িয়া দিবেন— আজ আর কেহ তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু এই তুচ্ছ প্রতিশোধে ইন্দ্রাণীর মন কিছুই সান্ত্বনা মানিল না। যখন সন্দিগ্ধ প্রভু নিজেই অম্বিকাকে ছাড়াইতে উদ্যত তখন কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাহার আর কী শাসন হইল। কাজে জবাব দিবার সংকল্প করিয়াই অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল, কিন্তু সকল কাজকর্ম সকল আরামবিশ্রামের মধ্যে ইন্দ্রাণীর রাগ তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে জ্বলিতে লাগিল।

পরিশিষ্ট

এমন সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল, বাবুদের বাড়ির খাজাঞ্চি আসিয়াছে। অম্বিকা মনে করিলেন, বিনোদ স্বাভাবিক চক্ষুলজ্জাবশত খাজাঞ্চির মুখ দিয়া তাঁহাকে কাজ হইতে জবাব দিয়া পাঠাইয়াছেন। সেইজন্য নিজেই একখানি ইস্তফাপত্র লিখিয়া খাজাঞ্চির হস্তে গিয়া দিলেন।

খাজাঞ্চি তৎসম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না করিয়া কহিল, "সর্বনাশ হইয়াছে।"

অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে।"

তদুত্তরে শুনিলেন, যখন হইতে অম্বিকাচরণের সতর্কতাবশত খাজাঞ্চিখানা হইতে বিনোদের টাকা লওয়া বন্ধ হইয়াছে তখন হইতে বিনোদ নানা স্থান হইতে গোপনে বিস্তর টাকা ধার লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটার পর একটা ব্যাবসা ফাঁদিয়া সে যতই প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল ততই তাহার রোখ চড়িয়া যাইতেছিল; ততই নূতন নূতন অসম্ভব উপায়ে আপন ক্ষতি নিবারণের চেষ্টা করিয়া অবশেষে আকণ্ঠ ঋণে নিমগ্ন হইয়াছে। অম্বিকাচরণ যখন পীড়িত ছিলেন তখন বিনোদ সেই সুযোগে

তহবিল হইতে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইয়াছে। বাঁকাগাড়ি পরগনা অনেক কাল হইতেই পার্শ্ববর্তী জমিদারের নিকট রেহেনে আবদ্ধ; সে এ-পর্যন্ত টাকার জন্য কোনোপ্রকার তাগাদা না দিয়া অনেক টাকা সুদ জমিতে দিয়াছে, এখন সময় বুঝিয়া হঠাৎ ডিক্রি করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। এই তো বিপদ।

শুনিয়া অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আজ কিছুই ভেবে উঠতে পারছি নে, কাল এর পরামর্শ করা যাবে।"

খাজাঞ্চি যখন বিদায় লইতে উঠিলেন তখন অম্বিকা তাঁহার ইস্তফাপত্র চাহিয়া লইলেন।

অন্তঃপুরে আসিয়া অম্বিকা ইন্দ্রাণীকে সকল কথা বিস্তারিত জানাইয়া কহিলেন, "বিনোদের এ অবস্থায় তো আমি কাজ ছেড়ে দিতে পারি নে।"

ইন্দ্রাণী অনেকক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মতো স্থির হইয়া রহিল। অবশেষে অন্তরের সমস্ত বিরোধদ্বন্দ্ব সবলে দলন করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "না, এখন ছাড়তে পার না।"

তাহার পরে 'কোথায় টাকা' 'কোথায় টাকা' করিয়া সন্ধান পড়িয়া গেল— যথেষ্ট পরিমাণে টাকা আর জুটে না। অন্তঃপুর হইতে গহনাগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য অম্বিকা বিনোদকে পরামর্শ দিলেন। ইতিপূর্বে ব্যাবসা উপলক্ষে বিনোদ সে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কথনো কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এবারে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া, অনেক দীনতা স্বীকার করিয়া গহনাগুলি ভিক্ষা চাহিলেন। নয়নতারা কিছুতেই দিলেন না; তিনি মনে করিলেন, তাঁহার চারি দিক হইতে সকলই খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে; এখন এই গহনাগুলি তাঁহার একমাত্র শেষ অবলম্বনস্থল— এবং ইহা তিনি অন্তিম আগ্রহ সহকারে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিলেন।

যখন কোথা হইতেও কোনো টাকা পাওয়া গেল না তখন ইন্দ্রাণীর প্রতিহিংসা-ভ্রূকুটির উপরে একটা তীব্র আনন্দের জ্যোতি পতিত হইল। সে তাহার স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তোমার যাহা কর্তব্য তাহা তো করিয়াছ; এখন তুমি ক্ষান্ত হও, যাহা হইবার তা হউক।"

স্বামীর অবমাননায় উদ্দীপ্ত সতীর রোষানল এখনো নির্বাপিত হয় নাই দেখিয়া অম্বিকা মনে মনে হাসিলেন। বিপদের দিনে অসহায় বালকের ন্যায় বিনোদ তাঁহার উপরে এমন একান্ত নির্ভর করিয়াছে যে, তাহার প্রতি তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইয়াছে— এখন তাহাকে তিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি মনে করিতেছিলেন, তাঁহার নিজের বিষয় আবদ্ধ রাখিয়া টাকা উঠাইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু

ইন্দ্রাণী তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া বলিল, "ইহাতে আর তুমি হাত দিতে পারিবে না।"

অম্বিকাচরণ বড়ো ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে আস্তে আস্তে বুঝাইবার যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন ইন্দ্রাণী কিছুতেই তাঁহাকে কথা কহিতে দিল না। অবশেষে অম্বিকা কিছু বিমর্ষ হইয়া, গম্ভীর হইয়া, নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

তখন ইন্দ্রাণী লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাহার সমস্ত গহনা একটি বৃহৎ থালায় স্তূপাকার করিল এবং সেই গুরুভার থালাটি বহুকষ্টে দুই হস্তে তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহার স্বামীর পায়ের কাছে রাখিল।

পিতামহের একমাত্র স্নেহের ধন ইন্দ্রাণী পিতামহের নিকট হইতে জন্মাবধি বৎসরে বৎসরে অনেক বহুমূল্য অলংকার উপহার পাইয়া আসিয়াছে; মিতাচারী স্বামীরও জীবনের অধিকাংশ সঞ্চয় এই সন্তানহীন রমণীর ভাণ্ডারে অলংকাররূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেই সমস্ত স্বর্ণমাণিক্য স্বামীর নিকট উপস্থিত করিয়া ইন্দ্রাণী কহিল, "আমার এই গহনাগুলি দিয়া আমার পিতামহের দত্ত দান উদ্ধার করিয়া আমি পুনর্বার তাঁহার প্রভুবংশকে দান করিব!"

এই বলিয়া সে সজল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মস্তক নত করিয়া কল্পনা করিল, তাহার সেই বিরলশুভ্রকেশধারী, সরলসুন্দরমুখচ্ছবি, শান্তস্নেহহাস্যময়, ধীপ্রদীপ্ত উজ্জ্বলগৌর-কান্তি বৃদ্ধ পিতামহ এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত আছেন এবং তাহার নত মস্তকে শীতল স্নেহহস্ত রাখিয়া তাহাকে নীরবে আশীর্বাদ করিতেছেন।

বাঁকাগাড়ি পরগনা পুনশ্চ ক্রয় হইয়া গেলে, তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গতভূষণা ইন্দ্রাণী আবার নয়নতারার অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণে গমন করিল। আর তাহার মনে কোনো অপমান-বেদনা রহিল না।

আষাঢ় ১৩০২

ক্ষুধিত পাষাণ

আমি এবং আমার আত্মীয় পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় রেলগাড়িতে বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আরো ধাঁধা লাগিয়া যায়। পৃথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারের ভিতরে ভিতরে যে এমন-সকল অশ্রুতপূর্ব নিগূঢ় ঘটনা ঘটিতেছিল, রুশিয়ানরা যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের যে এমন-সকল গোপন মতলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা খিচুড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে, এ-সমস্ত কিছুই না জানিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম। আমাদের নবপরিচিত আলাপীটি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন : There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your newspapers. আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, সুতরাং লোকটির রকমসকম দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। লোকটা সামান্য উপলক্ষে কখনো বিজ্ঞান বলে, কখনো বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনো পার্সি বয়েত আওড়াইতে থাকে। বিজ্ঞান বেদ এবং পার্সিভাষায় আমাদের কোনোরূপ অধিকার না থাকাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এমন-কি, আমার থিয়সফিস্ট্ আত্মীয়টির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাত্রীর সহিত কোনো এক রকমের অলৌকিক ব্যাপারের কিছু-একটা যোগ আছে; কোনো একটা অপূর্ব ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা-কিছু। তিনি এই অসামান্য লোকের সমস্ত সামান্য কথাও ভক্তিবিহ্বল মুগ্ধভাবে শুনিতেছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতেছিলেন; আমার ভাবে বোধ হইল, অসামান্য ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং কিছু খুশি হইয়াছিলেন।

গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায় ওয়েটিংরুমে সমবেত হইলাম। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। পথের মধ্যে একটা কী ব্যাঘাত হওয়াতে গাড়ি অনেক বিলম্বে আসিবে শুনিলাম। আমি ইতিমধ্যে টেবিলের উপর বিছানা পাতিয়া ঘুমাইব স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে সেই অসামান্য ব্যক্তিটি নিম্নলিখিত গল্প

কাঁদিয়া বসিলেন। সে রাত্রে আমার আর ঘুম হইল না।

রাজ্যচালনা সম্বন্ধে দুই-একটা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে আমি জুনাগড়ের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া হাইদ্রাবাদে যখন নিজাম-সরকারে প্রবেশ করিলাম তখন আমাকে অল্প-বয়স্ক ও মজবুত লোক দেখিয়া প্রথমে বরীচে তুলার মাশুল-আদায়ে নিযুক্ত করিয়া দিল।

বরীচ জায়গাটি বড়ো রমণীয়। নির্জন পাহাড়ের নীচে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া শুস্তা নদীটি (সংস্কৃত স্বচ্ছতোয়ার অপভ্রংশ) উপলমুখরিত পথে নিপুণা নর্তকীর মতো পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড়-শত-সোপান-ময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে একটি শ্বেতপ্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদমূলে একাকী দাঁড়াইয়া আছে— নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জন স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধী জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকরশীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া সেতার-কোলে দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত।

এখন আর সে ফোয়ারা খেলে না, সে গান নাই, সাদা পাথরের উপর শুভ্র চরণের সুন্দর আঘাত পড়ে না— এখন ইহা আমাদের মতো নির্জনবাসপীড়িত সঙ্গিনীহীন মাশুল-কালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শূন্য বাসস্থান। কিন্তু আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, ইচ্ছা হয় দিনের বেলা থাকিবেন, কিন্তু কখনো এখানে রাত্রিযাপন করিবেন না। আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। ভৃত্যেরা বলিল, তাহারা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিবে, কিন্তু রাত্রে এখানে থাকিবে না। আমি বলিলাম, তথাস্তু। এ বাড়ির এমন বদনাম ছিল যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না।

প্রথম প্রথম আসিয়া এই পরিত্যক্ত পাষাণপ্রাসাদের বিজনতা আমার বুকের উপর যেন একটা ভয়ংকর ভারের মতো চাপিয়া থাকিত, আমি যতটা পারিতাম বাহিরে থাকিয়া অবিশ্রাম কাজকর্ম করিয়া রাত্রে ঘরে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নিদ্রা দিতাম।

কিন্তু সপ্তাহখানেক না যাইতেই বাড়িটার এক অপূর্ব নেশা আমাকে ক্রমশ আক্রমণ

করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানোও শক্ত। সমস্ত বাড়িটা একটা সজীব পদার্থের মতো আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহরসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।

বোধ হয় এ বাড়িতে পদার্পণমাত্রেই এ প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছিল— কিন্তু আমি যেদিন সচেতনভাবে প্রথম ইহার সূত্রপাত অনুভব করি সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বাজার নরম; আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরাম-কেদারা লইয়া বসিয়াছি। তখন শুস্তানদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; ও পারে অনেকখানি বালুতট অপরাহ্ণের আভায় রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, এ পারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড়িগুলি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

সূর্য যখন গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হইল তৎক্ষণাৎ দিবসের নাট্যশালায় একটা দীর্ঘ ছায়াযবনিকা পড়িয়া গেল— এখানে পর্বতের ব্যবধান থাকাতে সূর্যাস্তের সময় আলো আঁধারের সম্মিলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছুটিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব-উঠিব করিতেছি, এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম, কেহ নাই।

ইন্দ্রিয়ের ভ্রম মনে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া বসিতেই একেবারে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল, যেন অনেকে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ঈষৎ ভয়ের সহিত এক অপরূপ পুলক মিশ্রিত হইয়া আমার সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। যদিও আমার সম্মুখে কোনো মূর্তি ছিল না তথাপি স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে হইল যে, এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদীতীরে, নির্জন প্রাসাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না, তথাপি আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম নির্ঝরের শতধারার মতো সকৌতুক কলহাস্যের সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ্য করিল না। তাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন সেইরূপ তাহাদের নিকট অদৃশ্য। নদী পূর্ববৎ স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পষ্ট বোধ হইল, স্বচ্ছতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে; হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের

গায়ে জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে, এবং সন্তরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তামুষ্টির মতো আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।

আমার বক্ষের মধ্যে একপ্রকার কম্পন হইতে লাগিল ; সে উত্তেজনা ভয়ের কি আনন্দের কি কৌতূহলের, ঠিক বলিতে পারি না। বড়ো ইচ্ছা হইতে লাগিল ভালো করিয়া দেখি, কিন্তু সম্মুখে দেখিবার কিছুই ছিল না ; মনে হইল ভালো করিয়া কান পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই স্পষ্ট শোনা যাইবে, কিন্তু একান্তমনে কান পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব শোনা যায়। মনে হইল, আড়াই শত বৎসরের কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে— ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করি— সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ গুমট ভাঙিয়া হু হু করিয়া একটা বাতাস দিল— শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্তে একসঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নই বল আর সত্যই বল, আড়াই শত বৎসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমার সম্মুখে যে এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া শুস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিকর্ষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন আমার বড়ো আশঙ্কা হইল যে, হঠাৎ বুঝি নির্জন পাইয়া কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে আসিয়া ভর করিলেন ; আমি বেচারা তুলার মাশুল আদায় করিয়া খাটিয়া খাই, সর্বনাশিনী এইবার বুঝি আমার মুণ্ডপাত করিতে আসিলেন। ভাবিলাম, ভালো করিয়া আহার করিতে হইবে ; শূন্য উদরেই সকল প্রকার দুরারোগ্য রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরে। আমার পাচকটিকে ডাকিয়া প্রচুরঘৃতপক্ব মসলা-সুগন্ধি রীতিমত মোগলাই খানা হুকুম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাস্যজনক বলিয়া বোধ হইল। আনন্দমনে সাহেবের মতো সোলাটুপি পরিয়া, নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া, গড় গড় শব্দে আপন তদন্তকার্যে চলিয়া গেলাম। সেদিন ত্রৈমাসিক রিপোর্ট্ লিখিবার দিন থাকাতে বিলম্বে বাড়ি ফিরিবার কথা। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাকে বাড়ির দিকে টানিতে লাগিল। কে টানিতে লাগিল বলিতে পারি না ; কিন্তু মনে হইল, আর বিলম্ব করা

উচিত হয় না। মনে হইল, সকলে বসিয়া আছে। রিপোর্ট্ অসমাপ্ত রাখিয়া সোলার টুপি মাথায় দিয়া সেই সন্ধ্যাধূসর তরুচ্ছায়াঘন নির্জন পথ রথচক্রশব্দে সচকিত করিয়া সেই অন্ধকার শৈলান্তবর্তী নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

সিঁড়ির উপরে সম্মুখের ঘরটি অতি বৃহৎ। তিন সারি বড়ো বড়ো থামের উপর কারুকার্যখচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকাণ্ড ঘরটি আপনার বিপুল শূন্যতাভরে অহর্নিশি গম্ গম্ করিতে থাকে। সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তখনো প্রদীপ জ্বালানো হয় নাই। দরজা ঠেলিয়া আমি সেই বৃহৎ ঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম অমনি মনে হইল ঘরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল— যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া চারি দিকের দরজা জানলা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন্ দিকে পলাইল তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম— ঝর্ঝর শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কী সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত, কোথাও বা নূপুরের নিক্বণ, কখনো বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিকদোলকগুলির ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার এমন একটা মোহ উপস্থিত হইল, মনে হইল, এই অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য; আর সমস্তই মিথ্যা মরীচিকা। আমি যে আমি— অর্থাৎ আমি যে শ্রীযুক্ত অমুক, ৺অমুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুলার মাশুল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চার-শো টাকা বেতন পাই, আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্তা পরিয়া টম্‌টম্ হাঁকাইয়া আপিস করিতে যাই, এ-সমস্তই আমার কাছে এমন অদ্ভুত হাস্যকর অমূলক মিথ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল যে, আমি সেই বিশাল নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তখনই আমার মুসলমান ভৃত্য প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে পাগল মনে করিল কি না জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হইল যে, আমি ৺অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অমুকনাথ বটে; ইহাও মনে করিলাম যে, জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমূর্ত ফোয়ারা নিত্যকাল

উৎসারিত ও অদৃশ্য অঙ্গুলির আঘাতে কোনো মায়া-সেতারে অনন্ত রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে কি না তাহা আমাদের মহাকবি এবং কবিবরেরাই বলিতে পারেন, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় সত্য যে, আমি বরীচের হাটে তুলার মাশুল আদায় করিয়া মাসে সাড়ে চার-শো টাকা বেতন লইয়া থাকি। তখন আবার আমার পূর্বক্ষণের অদ্ভুত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসিন-প্রদীপ্ত ক্যাম্প্‌টেবিলের কাছে খবরের কাগজ লইয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলাম।

খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগলাই খানা খাইয়া একটি ক্ষুদ্র কোণের ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। আমার সম্মুখবর্তী খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার বনবেষ্টিত আরালী পর্বতের ঊর্ধ্বদেশের একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সহস্র কোটি যোজন দূর আকাশ হইতে সেই অতিতুচ্ছ ক্যাম্প্‌খাটের উপর শ্রীযুক্ত মাশুল-কালেক্টরকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল ইহাতে আমি বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা এক সময় শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলাম; ঘরে যে কোনো শব্দ হইয়াছিল তাহা নহে, কোনো যে লোক প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকার পর্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রালোক অনধিকারসংকুচিত ম্লানভাবে আমার বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়াছে।

কোনো লোককেই দেখিলাম না। তবু যেন আমার স্পষ্ট মনে হইল, কে একজন আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে। আমি জাগিয়া উঠিতেই সে কোনো কথা না বলিয়া কেবল যেন তাহার অঙ্গুরীখচিত পাঁচ অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল।

আমি অত্যন্ত চুপিচুপি উঠিলাম। যদিও সেই শতকক্ষপ্রকোষ্ঠময় প্রকাণ্ডশূন্যতাময়, নিদ্রিত ধ্বনি এবং সজাগ প্রতিধ্বনি -ময় বৃহৎ প্রাসাদে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীও ছিল না তথাপি পদে পদে ভয় হইতে লাগিল, পাছে কেহ জাগিয়া উঠে। প্রাসাদের অধিকাংশ ঘর রুদ্ধ থাকিত এবং সে-সকল ঘরে আমি কখনো যাই নাই।

সে রাত্রে নিঃশব্দপদবিক্ষেপে সংযতনিশ্বাসে সেই অদৃশ্য-আহ্বান-রূপিণীর অনুসরণ করিয়া আমি যে কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছিলাম, আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সংকীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গম্ভীর নিস্তব্ধ সুবৃহৎ সভাগৃহ, কত রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।

আমার অদৃশ্য দূতীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই, তথাপি তাহার মূর্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেত-প্রস্তররচিতবৎ কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে, টুপির প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি সূক্ষ্ম বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবন্ধে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা।

আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিমগ্ন বোগদাদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ণ পথে কোনো এক সংকটসংকুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।

অবশেষে আমার দূতী একটি ঘননীল পর্দার সম্মুখে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া যেন নিম্নে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। নিম্নে কিছুই ছিল না, কিন্তু ভয়ে আমার বক্ষের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পর্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের-সাজ-পরা একটি ভীষণ কাফ্রি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া দুই পা ছড়াইয়া দিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। দূতী লঘুগতিতে তাহার দুই পা ডিঙাইয়া পর্দার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল।

ভিতর হইতে একটি পারস্য-গালিচা-পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না— কেবল জাফরান রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির-চটি-পরা দুইখানি ক্ষুদ্র সুন্দর চরণ গোলাপি মখমল-আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের এক পার্শ্বে একটি নীলাভ স্ফটিকপাত্রে কতকগুলি আপেল নাশপাতি নারাঙ্গি এবং প্রচুর আঙুরের গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে দুইটি ছোটো পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা অপূর্ব ধূপের এক-প্রকার মাদক সুগন্ধি ধূম আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

আমি কম্পিতবক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদদ্বয় যেমন লঙ্ঘন করিতে গেলাম অমনি সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল— তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেজেয় শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

সহসা একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া দেখিলাম, আমার সেই ক্যাম্পখাটের উপরে ঘর্মাক্তকলেবরে বসিয়া আছি, ভোরের আলোয় কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড-চাঁদ জাগরণ-ক্লিষ্ট রোগীর মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেছে— এবং আমাদের পাগলা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক প্রথা-অনুসারে প্রত্যুষের জনশূন্য পথে "তফাত যাও" "তফাত যাও" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে।

এইরূপে আমার আরব্য উপন্যাসের এক রাত্রি অকস্মাৎ শেষ হইল— কিন্তু এখনো এক সহস্র রজনী বাকি আছে।

আমার দিনের সহিত রাত্রের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্তক্লান্তদেহে কর্ম করিতে যাইতাম এবং শূন্যস্বপ্নময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম, আবার সন্ধ্যার পরে আমার দিনের বেলাকার কর্মবদ্ধ অস্তিত্বকে অত্যন্ত তুচ্ছ মিথ্যা এবং হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।

সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্বেকার কোনো-এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর-একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতি খাটো কোর্তা এবং আঁট প্যাণ্টলুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ তুলিয়া, ঢিলা পায়জামা, ফুলকাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া, রঙিন রুমালে আতর মাখিয়া, বহুযত্নে সাজ করিতাম এবং সিগারেট ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপূর্ণ বহুকুণ্ডলায়িত বৃহৎ আল-বোলা লইয়া এক উচ্চগদিবিশিষ্ট বড়ো কেদারায় বসিতাম। যেন রাত্রে কোন্-এক অপূর্ব প্রিয়সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।

তাহার পর অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইত ততই কী-যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক যেন একটা চমৎকার গল্পের কতক-গুলি ছিন্ন অংশ বসন্তের আকস্মিক বাতাসে এই বৃহৎ প্রাসাদের বিচিত্র ঘরগুলির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দূর পর্যন্ত পাওয়া যাইত তাহার পরে আর শেষ দেখা যাইত না। আমিও সেই ঘূর্ণ্যমান বিচ্ছিন্ন অংশগুলির অনুসরণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

এই খণ্ডস্বপ্নের আবর্তের মধ্যে— এই কচিৎ হেনার গন্ধ, কচিৎ সেতারের শব্দ, কচিৎ সুরভিজলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মতো চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারই জাফরান রঙের পায়জামা এবং দুটি শুভ্র রক্তিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরির চটি পরা, বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচুলি আবদ্ধ, মাথায় একটি লাল টুপি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে।

সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতি রাত্রে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বপ্নের জটিলপথসংকুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় বড়ো আয়নার দুই দিকে দুই বাতি জ্বালাইয়া যত্নপূর্বক

শাহজাদার মতো সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইতাম, আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরাণীর ছায়া আসিয়া পড়িল— পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষুতারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে ঊর্ধ্বাভিমুখে আবর্তিত করিয়া, মুহূর্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া, দর্পণেই মিলাইয়া গেল। গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উদ্দাম বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত; আমি সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিয়া, বেশগৃহের প্রান্তবর্তী শয্যাতলে পুলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম— আমার চারি দিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই আরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে, যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল করস্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত— কানের কাছে অনেক কলগুঞ্জন শুনিতে পাইতাম, আমার কপালের উপর সুগন্ধ নিশ্বাস আসিয়া পড়িত, এবং আমার কপোলে একটি মৃদুসৌরভরমণীয় সুকোমল ওড়না বারম্বার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া স্পর্শ করিত। অল্পে অল্পে যেন একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদক-বেষ্টনে আমার সর্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অপরাহ্ণে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইব সংকল্প করিলাম— কে আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল জানি না— কিন্তু সেদিন নিষেধ মানিলাম না। একটা কাষ্ঠদণ্ডে আমার সাহেবি হ্যাট এবং খাটো কোর্তা ঝুলিতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় শুস্তানদীর বালি এবং আরালী পর্বতের শুষ্ক পল্লবরাশির ধ্বজা তুলিয়া হঠাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অত্যন্ত সুমিষ্ট কলহাস্য সেই হাওয়ার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে কৌতুকের সমস্ত পর্দায় পর্দায় আঘাত করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উঠিয়া সূর্যাস্তলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।

সেদিন আর ঘোড়ায় চড়া হইল না এবং তাহার পরদিন হইতে সেই কৌতুকাবহ খাটো কোর্তা এবং সাহেবি হ্যাট পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।

আবার সেইদিন অর্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া, বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে— যেন আমার খাটের নীচে, মেঝের নীচে, এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর

হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, 'তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও— কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া, তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া, তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার করো।'

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব। আমি এই ঘূর্ণ্যমান পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব। তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিণী। তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুর-কুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমাকে কোন্ বেদুয়ীন দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া, বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া, জলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া, কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গনিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল। সেখানে সে কী ইতিহাস। সেই সারঙ্গীর সংগীত, নূপুরের নিক্বণ এবং সিরাজের স্বর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসীম ঐশ্বর্য, কী অনন্ত কারাগার। দুই দিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে। শাহেনশা বাদশা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে; বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মতো হাবশি দেবদূতের মতো সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে?

এমন সময় হঠাৎ সেই পাগলা মেহের আলি চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাত যাও, তফাৎ যাও। সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।" চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে; চাপরাশি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া আমার হাতে দিল এবং পাচক আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কিরূপ খানা প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমি কহিলাম, না, আর এ বাড়িতে থাকা হয় না। সেইদিনই আমার জিনিসপত্র তুলিয়া আপিস-ঘরে গিয়া উঠিলাম। আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে দেখিয়া

ঈষৎ হাসিল। আমি তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া কোনো উত্তর না করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম।

যত বিকাল হইয়া আসিতে লাগিল ততই অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম— মনে হইতে লাগিল, এখনই কোথায় যাইবার আছে— তুলার হিসাব পরীক্ষার কাজটা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হইল, নিজামের নিজামতও আমার কাছে বেশি কিছু বোধ হইল না— যাহা-কিছু বর্তমান, যাহা-কিছু আমার চারি দিকে চলিতেছে ফিরিতেছে খাটিতেছে খাইতেছে সমস্তই আমার কাছে অত্যন্ত দীন অর্থহীন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

আমি কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, বৃহৎ খাতা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ টম্‌টম্‌ চড়িয়া ছুটিলাম। দেখিলাম টম্‌টম্‌ ঠিক গোধূলিমুহূর্তে আপনিই সেই পাষাণ-প্রাসাদের দ্বারের কাছে গিয়া থামিল। দ্রুতপদে সিঁড়িগুলি উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। অন্ধকার ঘরগুলি যেন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে। অনুতাপে আমার হৃদয় উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকে জানাইব, কাহার নিকট মার্জনা চাহিব খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি শূন্য মনে অন্ধকার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিতে লাগিল একখানা যন্ত্র হাতে লইয়া কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া গান গাহি ; বলি, 'হে বহ্নি, যে পতঙ্গ তোমাকে ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আবার মরিবার জন্য আসিয়াছে। এবার তাহাকে মার্জনা করো, তাহার দুই পক্ষ দগ্ধ করিয়া দাও, তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলো।'

হঠাৎ উপর হইতে আমার কপালে দুই ফোঁটা অশ্রুজল পড়িল। সেদিন আরালী পর্বতের চূড়ায় ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকার অরণ্য এবং শুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া ছিল। জলস্থল আকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল ; এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দন্তবিকশিত ঝড় শৃঙ্খলছিন্ন উন্মাদের মতো পথহীন সুদূর বনের ভিতর দিয়া আর্ত চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। প্রাসাদের বড়ো বড়ো শূন্য ঘরগুলা সমস্ত দ্বার আছড়াইয়া তীব্র বেদনায় হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ ভৃত্যগণ সকলেই আপিস-ঘরে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেহ ছিল না। সেই মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম— একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ় বদ্ধ মুষ্টিতে আপনার আলুলায়িত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে,

তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনো সে শুষ্ক তীব্র অট্টহাস্যে হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনো ফুলিয়া ফুলিয়া ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জন করিয়া আসিতেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।

সমস্ত রাত্রি ঝড়ও থামে না, ক্রন্দনও থামে না। আমি নিষ্ফল পরিতাপে ঘরে ঘরে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই; কাহাকে সান্ত্বনা করিব। এই প্রচণ্ড অভিমান কাহার। এই অশান্ত আক্ষেপ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে।

পাগল চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাত যাও, তফাত যাও! সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।"

দেখিলাম ভোর হইয়াছে এবং মেহের আলি এই ঘোর দুর্যোগের দিনেও যথানিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যস্ত চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল, হয়তো ওই মেহের আলিও আমার মতো এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিল, এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষাণ-রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যুষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগলার নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেহের আলি, ক্যা ঝুট হ্যায় রে?"

সে আমার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ির চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারম্বার বলিতে লাগিল, "তফাত যাও, তফাত যাও, সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।"

আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মতো আপিসে গিয়া করিম খাঁকে ডাকিয়া বলিলাম, "ইহার অর্থ কী আমায় খুলিয়া বলো।"

বৃদ্ধ যাহা কহিল তাহার মর্মার্থ এই: একসময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত— সেই-সকল চিত্তদাহে, সেই-সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষার্ত হইয়া আছে; সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্রি ওই প্রাসাদে বাস করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার উদ্ধারের কি কোনো পথ নাই।"

বৃদ্ধ কহিল, "একটিমাত্র উপায় আছে তাহা অত্যন্ত দুরূহ। তাহা তোমাকে বলিতেছি— কিন্তু তৎপূর্বে ওই গুলবাগের একটি ইরানী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য এবং তেমন হৃদয়বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনো ঘটে নাই।"

এমন সময় কুলিরা আসিয়া খবর দিল, গাড়ি আসিতেছে। এত শীঘ্র? তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বাঁধিতে বাঁধিতে গাড়ি আসিয়া পড়িল। সে গাড়ির ফার্স্ট্ ক্লাসে একজন সুপ্তোত্থিত ইংরাজ জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া স্টেশনের নাম পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের সহযাত্রী বন্ধুটিকে দেখিয়াই 'হ্যালো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইল। আমরা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলাম। বাবুটি কে খবর পাইলাম না, গল্পেরও শেষ শোনা হইল না।

আমি বলিলাম লোকটা আমাদিগকে বোকার মতো দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল; গল্পটা আগাগোড়া বানানো।

এই তর্কের উপলক্ষে আমার থিয়সফিস্ট আত্মীয়টির সহিত আমার জন্মের মতো বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে।

শ্রাবণ ১৩০২

অতিথি

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু নৌকা করিয়া সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে মধ্যাহ্নে নদীতীরের এক গঞ্জের নিকট নৌকা বাঁধিয়া পাকের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণবালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমরা যাচ্ছ কোথায়?"

প্রশ্নকর্তার বয়স পনেরো-ষোলোর অধিক হইবে না।

মতিবাবু উত্তর করিলেন, "কাঁঠালে।"

ব্রাহ্মণবালক কহিল, "আমাকে পথের মধ্যে নন্দীগাঁয়ে নাবিয়ে দিতে পার?"

বাবু সম্মতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

ব্রাহ্মণবালক কহিল, "আমার নাম তারাপদ।"

গৌরবর্ণ ছেলেটিকে বড়ো সুন্দর দেখিতে। বড়ো বড়ো চক্ষু এবং হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে একখানি মলিন ধুতি। অনাবৃত দেহখানি সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত; কোনো শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁত নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। যেন সে পূর্বজন্মে তাপসবালক ছিল এবং নির্মল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুলপরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মতিলালবাবু তাহাকে পরম স্নেহভরে কহিলেন, "বাবা, তুমি স্নান করে এসো, এইখানেই আহারাদি হবে।"

তারাপদ বলিল, "রোসুন।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ অসংকোচে রন্ধনের আয়োজনে যোগদান করিল। মতিলালবাবুর চাকরটা ছিল হিন্দুস্থানী, মাছ কোটা প্রভৃতি কার্যে তাহার তেমন পটুতা ছিল না; তারাপদ তাহার কাজ নিজে লইয়া অল্পকালের মধ্যেই সুসম্পন্ন করিল এবং দুই-একটা তরকারিও অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সহিত রন্ধন করিয়া দিল। পাককার্য শেষ হইলে তারাপদ নদীতে স্নান করিয়া বোঁচকা খুলিয়া একটি শুভ্র বস্ত্র পরিল; একটি ছোটো কাঠের কাঁকই লইয়া মাথার বড়ো বড়ো চুল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফেলিল এবং মার্জিত পইতার গোচ্ছা বক্ষে বিলম্বিত করিয়া নৌকায় মতিবাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

মতিবাবু তাহাকে নৌকার ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে মতিবাবুর স্ত্রী এবং তাঁহার নবমবর্ষীয়া এক কন্যা বসিয়া ছিলেন। মতিবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া স্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন— মনে মনে কহিলেন, আহা, কাহার বাছা, কোথা হইতে আসিয়াছে— ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে।

যথাসময়ে মতিবাবু এবং এই ছেলেটির জন্য পাশাপাশি দুইখানি আসন পড়িল। ছেলেটি তেমন ভোজনপটু নহে; অন্নপূর্ণা তাহার স্বল্প আহার দেখিয়া মনে করিলেন, সে লজ্জা করিতেছে; তাহাকে এটা ওটা খাইতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন; কিন্তু যখন সে আহার হইতে নিরস্ত হইল তখন সে কোনো অনুরোধ মানিল না। দেখা গেল, ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা-অনুসারে কাজ করে, অথচ এমন সহজে করে যে তাহাতে কোনোপ্রকার জেদ বা গোঁ প্রকাশ পায় না। তাহার ব্যবহারে লজ্জার লক্ষণও লেশমাত্র দেখা গেল না।

সকলের আহারাদির পরে অন্নপূর্ণা তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার ইতিহাস জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তারিত বিবরণ কিছুই সংগ্রহ হইল না। মোট কথা এইটুকু জানা গেল, ছেলেটি সাত-আট বৎসর বয়সেই স্বেচ্ছাক্রমে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, "তোমার মা নাই?"

তারাপদ কহিল, "আছেন।"

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি তোমাকে ভালোবাসেন না?"

তারাপদ এই প্রশ্ন অত্যন্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কেন ভালোবাসবেন না?"

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, "তবে তুমি তাঁকে ছেড়ে এলে যে।"

তারাপদ কহিল, "তাঁর আরো চারটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে আছে।"

অন্নপূর্ণা বালকের এই অদ্ভুত উত্তরে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, "ওমা, সে কী কথা! পাঁচটি আঙুল আছে বলে কি একটি আঙুল ত্যাগ করা যায়।"

তারাপদর বয়স অল্প, তাহার ইতিহাসও সেই পরিমাণে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ছেলেটি সম্পূর্ণ নূতনতর। সে তাহার পিতামাতার চতুর্থ পুত্র, শৈশবেই পিতৃহীন হয়। বহু সন্তানের ঘরেও তারাপদ সকলের অত্যন্ত আদরের ছিল; মা ভাই বোন এবং পাড়ার সকলেরই নিকট হইতে সে অজস্র স্নেহ লাভ করিত। এমন-কি, গুরুমহাশয়ও তাহাকে মারিত না; মারিলেও বালকের আত্মীয়পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ করিত। এমন অবস্থায় তাহার গৃহত্যাগ করিবার কোনোই কারণ ছিল না। যে উপেক্ষিত রোগা ছেলেটা সর্বদাই চুরি-করা গাছের ফল এবং গৃহস্থ লোকদের নিকট তাহার চতুর্গুণ প্রতিফল খাইয়া বেড়ায় সেও তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে তাহার নির্যাতনকারিণী মার নিকট পড়িয়া রহিল, আর সমস্ত গ্রামের এই আদরের ছেলে একটা বিদেশী যাত্রার দলের সহিত মিলিয়া অকাতরচিত্তে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সকলে খোঁজ করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল। তাহার মা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুজলে আর্দ্র করিয়া দিল, তাহার বোনরা কাঁদিতে লাগিল; তাহার বড়ো ভাই পুরুষ-অভিভাবকের কঠিন কর্তব্য পালন উপলক্ষে তাহাকে মৃদু রকম শাসন করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে অনুতপ্তচিত্তে বিস্তর প্রশ্রয় এবং পুরস্কার দিল। পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া প্রচুরতর আদর এবং বহুতর প্রলোভনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বন্ধন, এমন-কি, স্নেহবন্ধনও তাহার

সহিল না ; তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে ; সে যখনই দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বত্থগাছের তলে কোন্ দূরদেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, অথবা বেদেরা নদীতীরের পতিত মাঠে ছোটো ছোটো চাটাই বাঁধিয়া বাঁখারি ছুলিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। উপরি-উপরি দুই-তিনবার পলায়নের পর তাহার আত্মীয়বর্গ এবং গ্রামের লোক তাহার আশা পরিত্যাগ করিল।

প্রথম সে একটা যাত্রার দলের সঙ্গ লইয়াছিল। অধিকারী যখন তাহাকে পুত্রনির্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিল এবং দলস্থ ছোটো-বড়ো সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল, এমন-কি, যে বাড়িতে যাত্রা হইত সে বাড়ির অধ্যক্ষগণ, বিশেষত পুরমহিলাবর্গ, যখন বিশেষরূপে তাহাকে আহ্বান করিয়া সমাদর করিতে লাগিল, তখন একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারাপদ হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ। যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগি করিয়া দেয়। গানের স্বরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল তখনো সংগীতসভায় সে যেরূপ সংযত গম্ভীর বয়স্কভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া বসিয়া বসিয়া দুলিত, দেখিয়া প্রবীণ লোকের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইত। কেবল সংগীত কেন, গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি সকলই তাহাকে উতলা করিত। এই সংগীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে অনতিবিলম্বে এক পাঁচালির দলের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম যত্নে গান শিখাইতে এবং পাঁচালি মুখস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাকে আপন বক্ষ-পিঞ্জরের পাখির মতো প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতে লাগিল। পাখি কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যুষে উড়িয়া চলিয়া গেল।

শেষবারে সে এক জিম্‌ন্যাস্টিকের দলে জুটিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ়মাসের অবসান পর্যন্ত এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে পর্যায়ক্রমে বারোয়ারির মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে দুই-তিন দল যাত্রা পাঁচালি কবি নর্তকী এবং নানাবিধ দোকান

নৌকাযোগে ছোটো ছোটো নদী-উপনদী দিয়া এক মেলা অন্তে অন্য মেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। গত বৎসর হইতে কলিকাতার এক ক্ষুদ্র জিম্‌ন্যাস্টিকের দল এই পর্যটনশীল মেলার আমোদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমত নৌকারোহী দোকানির সহিত মিশিয়া মেলায় পানের খিলি বিক্রয়ের ভার লইয়াছিল। পরে তাহার স্বাভাবিক কৌতূহলবশত এই জিম্‌ন্যাস্টিকের ছেলেদের আশ্চর্য ব্যায়ামনৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ করিয়াছিল। তারাপদ নিজে নিজে অভ্যাস করিয়া ভালো বাঁশি বাজাইতে শিখিয়াছিল— জিম্‌ন্যাস্টিকের সময় তাহাকে দ্রুত তালে লক্ষ্ণৌ ঠুংরির সুরে বাঁশি বাজাইতে হইত— এই তাহার একমাত্র কাজ ছিল।

এই দল হইতেই তাহার শেষ পলায়ন। সে শুনিয়াছিল, নন্দীগ্রামের জমিদারবাবুরা মহাসমারোহে এক শখের যাত্রা খুলিতেছেন— শুনিয়া সে তাহার ক্ষুদ্র বোঁচকাটি লইয়া নন্দীগ্রামে যাত্রার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় মতিবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

তারাপদ পর্যায়ক্রমে নানা দলের মধ্যে ভিড়িয়াও আপন স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতিপ্রভাবে কোনো দলের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত ছিল। সংসারে অনেক কুৎসিত কথা সে সর্বদা শুনিয়াছে এবং অনেক কদর্য দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইবার তিলমাত্র অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। এ ছেলেটির কিছুতেই খেয়াল ছিল না। অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোনোপ্রকার অভ্যাসবন্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করিতে পারে নাই, সে এই সংসারের পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কৌতূহল-বশত যতবারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না। এইজন্য এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মুখে একটি শুভ্র স্বাভাবিক তারুণ্য অম্লানভাবে প্রকাশ পাইত, তাহার সেই মুখশ্রী দেখিয়া প্রবীণ বিষয়ী মতিলালবাবু তাহাকে বিনা প্রশ্নে বিনা সন্দেহে পরম আদরে আহ্বান করিয়া লইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল। অন্নপূর্ণা পরম স্নেহে এই ব্রাহ্মণবালককে তাহার ঘরের কথা, তাহার আত্মীয়পরিজনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তারাপদ অত্যন্ত সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া বাহিরে আসিয়া পরিত্রাণ লাভ করিল। বাহিরে বর্ষার নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্ম-হারা উদ্দাম চাঞ্চল্যে প্রকৃতিমাতাকে যেন উদ্‌বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘনির্মুক্ত

রৌদ্রে নদীতীরে অর্ধনিমগ্ন কাশতৃণশ্রেণী, এবং তাহার ঊর্ধ্বে সরস সঘন ইক্ষুক্ষেত্র এবং তাহার পরপ্রান্তে দূরদিগন্তচুম্বিত নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা সমস্তই যেন কোন্-এক রূপকথার সোনার কাঠির স্পর্শে সদ্যজাগ্রত নবীন সৌন্দর্যের মতো নির্বাক্ নীলাকাশের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল— সমস্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্‌ভ, আলোকে উদ্ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্কণ, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইল। পর্যায়ক্রমে ঢালু সবুজ মাঠ, প্লাবিত পাটের খেত, গাঢ় শ্যামল আমনধান্যের আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখী সংকীর্ণ পথ, ঘনবনবেষ্টিত ছায়াময় গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জল স্থল আকাশ, এই চারি দিকের সচলতা সজীবতা মুখরতা, এই ঊর্ধ্ব-অধোদেশের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত সুদূরতা, এই সুবৃহৎ চিরস্থায়ী নির্নিমেষ বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মীয় ছিল; অথচ সে এই চঞ্চল মানবকটিকে এক মুহূর্তের জন্যও স্নেহবাহু দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না। নদী-তীরে বাছুর লেজ তুলিয়া ছুটিতেছে, গ্রাম্য টাট্টুঘোড়া সম্মুখের দুই দড়ি-বাঁধা পা লইয়া লাফ দিয়া দিয়া ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে, মাছরাঙা জেলেদের জাল বাঁধিবার বংশদণ্ডের উপর হইতে ঝপ্ করিয়া সবেগে জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে, মেয়েরা উচ্চকণ্ঠে সহাস্য গল্প করিতে করিতে আবক্ষজলে বসনাঞ্চল প্রসারিত করিয়া দুই হস্তে তাহা মার্জন করিয়া লইতেছে, কোমর-বাঁধা মেছুনিরা চুপড়ি লইয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে, এ-সমস্তই সে চিরনূতন অশ্রান্ত কৌতূহলের সহিত বসিয়া বসিয়া দেখে, কিছুতেই তাহার দৃষ্টির পিপাসা নিবৃত্ত হয় না।

নৌকার ছাতের উপরে গিয়া তারাপদ ক্রমশ দাঁড়িমাঝিদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে আবশ্যকমতে মাল্লাদের হাত হইতে লগি লইয়া নিজেই ঠেলিতে প্রবৃত্ত হইল; মাঝির যখন তামাক খাইবার আবশ্যক তখন সে নিজে গিয়া হাল ধরিল— যখন যে দিকে পাল ফিরানো আবশ্যক সমস্ত সে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অন্নপূর্ণা তারাপদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে তুমি কী খাও?"

তারাপদ কহিল, "যা পাই তাই খাই; সকল দিন খাইও না।"

এই সুন্দর ব্রাহ্মণবালকটির আতিথ্যগ্রহণে ঔদাসীন্য অন্নপূর্ণাকে ঈষৎ পীড়া দিতে লাগিল। তাঁহার বড়ো ইচ্ছা, খাওয়াইয়া পরাইয়া এই গৃহচ্যুত পান্থ বালকটিকে পরিতৃপ্ত করিয়া দেন। কিন্তু কিসে যে তাহার পরিতোষ হইবে তাহার কোনো সন্ধান

পাইলেন না। অন্নপূর্ণা চাকরদের ডাকিয়া গ্রাম হইতে দুধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ধুমধাম বাধাইয়া দিলেন। তারাপদ যথাপরিমাণে আহার করিল; কিন্তু দুধ খাইল না। মৌনস্বভাব মতিলালবাবুও তাহাকে দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; সে সংক্ষেপে বলিল, "আমার ভালো লাগে না।"

নদীর উপর দুই-তিন দিন গেল। তারাপদ রাঁধাবাড়া, বাজার করা হইতে নৌকা-চালনা পর্যন্ত সকল কাজেই স্বেচ্ছা এবং তৎপরতার সহিত যোগ দিল। যে-কোনো দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে আসে তাহার প্রতি তারাপদর সকৌতূহল দৃষ্টি ধাবিত হয়, যে-কোনো কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতেই সে আপনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া আছে; এইজন্য সে এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন, অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসক্ত। মানুষমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে; কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ— ভূত-ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোনো বন্ধন নাই— সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য।

এ দিকে অনেক দিন নানা সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া অনেকপ্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। কোনোপ্রকার চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকাতে তাহার নির্মল স্মৃতিপটে সকল জিনিস আশ্চর্য সহজে মুদ্রিত হইয়া যাইত। পাঁচালি কথকতা কীর্তনগান যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ খণ্ডসকল তাহার কণ্ঠাগ্রে ছিল। মতিলালবাবু চিরপ্রথামত একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার স্ত্রীকন্যাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতে-ছিলেন; কুশলবের কথার সূচনা হইতেছে এমন সময় তারাপদ উৎসাহ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নৌকার ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, "বই রাখুন। আমি কুশলবের গান করি, আপনারা শুনে যান।"

এই বলিয়া সে কুশলবের পাঁচালি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মতো সুমিষ্ট পরিপূর্ণস্বরে দাশুরায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল। দাঁড়ি মাঝি সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল; হাস্য করুণা এবং সংগীতে সেই নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপূর্ব রসস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল— দুই নিস্তব্ধ তটভূমি কুতূহলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া যে-সকল নৌকা চলিতেছিল তাহাদের আরোহিগণ ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিকে কান দিয়া রহিল; যখন শেষ হইয়া গেল সকলেই ব্যথিতচিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে শেষ হইল কেন।

সজলনয়না অন্নপূর্ণার ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছেলেটিকে কোলে বসাইয়া বক্ষে চাপিয়া

তাহার মস্তক আঘ্রাণ করেন। মতিলালবাবু ভাবিতে লাগিলেন, এই ছেলেটিকে যদি কোনোমতে কাছে রাখিতে পারি তবে পুত্রের অভাব পূর্ণ হয়। কেবল ক্ষুদ্র বালিকা চারুশশীর অন্তঃকরণ ঈর্ষা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারুশশী তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাঁহাদের পিতৃমাতৃস্নেহের একমাত্র অধিকারিণী। তাহার খেয়াল এবং জেদের অন্ত ছিল না। খাওয়া, কাপড় পরা, চুল বাঁধা সম্বন্ধে তাহার নিজের স্বাধীন মত ছিল ; কিন্তু সে মতের কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। যেদিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিত সেদিন তাহার মায়ের ভয় হইত, পাছে মেয়েটি সাজসজ্জা সম্বন্ধে একটা অসম্ভব জেদ ধরিয়া বসে। যদি দৈবাৎ একবার চুল বাঁধাটা তাহার মনের মতো না হইল তবে সেদিন যতবার চুল খুলিয়া যতরকম করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাক্ কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে না, অবশেষে মহা কান্নাকাটির পালা পড়িয়া যাইবে। সকল বিষয়েই এইরূপ। আবার এক-এক সময় চিত্ত যখন প্রসন্ন থাকে তখন কিছুতেই তাহার কোনো আপত্তি থাকে না। তখন সে অতিমাত্রায় ভালোবাসা প্রকাশ করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া, চুম্বন করিয়া, হাসিয়া বকিয়া একেবারে অস্থির করিয়া তোলে। এই ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।

এই বালিকা তাহার দুর্বাধ্য হৃদয়ের সমস্ত বেগ প্রয়োগ করিয়া মনে মনে তারাপদকে সুতীব্র বিদ্বেষে তাড়না করিতে লাগিল। পিতামাতাকেও সর্বতোভাবে উদ্‌বেজিত করিয়া তুলিল। আহারের সময় রোদনোন্মুখী হইয়া ভোজনের পাত্র ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, রন্ধন তাহার রুচিকর বোধ হয় না, দাসীকে মারে, সকল বিষয়েই অকারণ অভিযোগ করিতে থাকে। তারাপদর বিদ্যাগুলি যতই তাহার এবং অন্য সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল ততই যেন তাহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। তারাপদর যে কোনো গুণ আছে ইহা স্বীকার করিতে তাহার মন বিমুখ হইল, অথচ তাহার প্রমাণ যখন প্রবল হইতে লাগিল তাহার অসন্তোষের মাত্রাও উচ্চে উঠিল। তারাপদ যেদিন কুশলবের গান করিল সেদিন অন্নপূর্ণা মনে করিলেন, 'সংগীতে বনের পশু বশ হয়, আজ বোধ হয় আমার মেয়ের মন গলিয়াছে।' তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চারু, কেমন লাগল।" সে কোনো উত্তর না দিয়া অত্যন্ত প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া দিল। এই ভঙ্গিটিকে ভাষায় তর্জমা করিলে এইরূপ দাঁড়ায়— কিছুমাত্র ভালো লাগে নাই এবং কোনোকালে ভালো লাগিবে না।

চারুর মনে ঈর্ষার উদয় হইয়াছে বুঝিয়া তাহার মাতা চারুর সম্মুখে তারাপদর প্রতি

স্নেহ প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন। সন্ধ্যার পরে যখন সকাল সকাল খাইয়া চারু শয়ন করিত তখন অন্নপূর্ণা নৌকাকক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া বসিতেন এবং মতিবাবু ও তারাপদ বাহিরে বসিত এবং অন্নপূর্ণার অনুরোধে তারাপদ গান আরম্ভ করিত; তাহার গানে যখন নদীতীরের বিশ্রামনিরতা গ্রামশ্রী সন্ধ্যার বিপুল অন্ধকারে মুগ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিত এবং অন্নপূর্ণার কোমল হৃদয়খানি স্নেহে ও সৌন্দর্যরসে উচ্ছলিত হইতে থাকিত তখন হঠাৎ চারু দ্রুতপদে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া সরোষ-সরোদনে বলিত, "মা, তোমরা কী গোল করছ, আমার ঘুম হচ্ছে না।" পিতামাতা তাহাকে একলা ঘুমাইতে পাঠাইয়া তারাপদকে ঘিরিয়া সংগীত উপভোগ করিতেছেন ইহা তাহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত। এই দীপ্তকৃষ্ণনয়না বালিকার স্বাভাবিক সুতীব্রতা তারাপদর নিকটে অত্যন্ত কৌতুকজনক বোধ হইত। সে ইহাকে গল্প শুনাইয়া, গান গাহিয়া, বাঁশি বাজাইয়া বশ করিতে অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইল না। কেবল তারাপদ মধ্যাহ্নে যখন নদীতে স্নান করিতে নামিত, পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তনু দেহখানি নানা সন্তরণভঙ্গিতে অবলীলাক্রমে সঞ্চালন করিয়া তরুণ জলদেবতার মতো শোভা পাইত, তখন বালিকার কৌতূহল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না। সে সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত; কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ কাহাকেও জানিতে দিত না, এবং এই অশিক্ষাপটু অভিনেত্রী পশমের গলাবন্ধ বোনা একমনে অভ্যাস করিতে করিতে মাঝে মাঝে যেন অত্যন্ত উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদর সন্তরণলীলা দেখিয়া লইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নন্দীগ্রাম কখন ছাড়াইয়া গেল তারাপদ তাহার খোঁজ লইল না। অত্যন্ত মৃদুমন্দ গতিতে বৃহৎ নৌকা কখনো পাল তুলিয়া, কখনো গুণ টানিয়া, নানা নদীর শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল; নৌকারোহীদের দিনগুলিও এই-সকল নদী-উপনদীর মতো শান্তিময় সৌন্দর্যময় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সহজ সৌম্য গমনে মৃদুমিষ্ট কলস্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাহারো কোনোরূপ তাড়া ছিল না; মধ্যাহ্নে স্নানাহারে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইত; এ দিকে সন্ধ্যা হইতে না হইতেই একটা বড়ো দেখিয়া গ্রামের ধারে, ঘাটের কাছে, ঝিল্লিমন্দ্রিত খদ্যোতখচিত বনের পার্শ্বে নৌকা বাঁধিত।

এমনি করিয়া দিন-দশেকে নৌকা কাঁঠালিয়ায় পৌঁছিল। জমিদারের আগমনে বাড়ি হইতে পালকি এবং টাটুঘোড়ার সমাগম হইল, এবং বাঁশের লাঠি হস্তে পাইক-

বরকন্দাজের দল ঘন ঘন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে গ্রামের উৎকণ্ঠিত কাকসমাজকে যৎপরোনাস্তি মুখর করিয়া তুলিল।

এই-সমস্ত সমারোহে কালবিলম্ব হইতেছে, ইতিমধ্যে তারাপদ নৌকা হইতে দ্রুত নামিয়া একবার সমস্ত গ্রাম পর্যটন করিয়া লইল। কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খুড়া, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসি বলিয়া দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দ্যবন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল। কোথাও তাহার প্রকৃত কোনো বন্ধন ছিল না বলিয়াই এই বালক আশ্চর্য সত্বর ও সহজে সকলেরই সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিত। তারাপদ দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল।

এত সহজে হৃদয় হরণ করিবার কারণ এই, তারাপদ সকলেরই সঙ্গে তাহাদের নিজের মতো হইয়া স্বভাবতই যোগ দিতে পারিত। সে কোনোপ্রকার বিশেষ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না, অথচ সকল অবস্থা সকল কাজের প্রতিই তাহার একপ্রকার সহজ প্রবণতা ছিল। বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক, অথচ তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র; বৃদ্ধের কাছে সে বালক নহে, অথচ জ্যাঠাও নহে; রাখালের সঙ্গে সে রাখাল, অথচ ব্রাহ্মণ। সকলের সকল কাজেই সে চিরকালের সহযোগীর ন্যায় অভ্যস্ত-ভাবে হস্তক্ষেপ করে। ময়রার দোকানে গল্প করিতে করিতে ময়রা বলে "দাদাঠাকুর, একটু বোসো তো ভাই, আমি আসছি"— তারাপদ অম্লানবদনে দোকানে বসিয়া একখানা শালপাতা লইয়া সন্দেশের মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়। ভিয়ান করিতেও সে মজবুত, তাঁতের রহস্যও তাহার কিছু কিছু জানা আছে, কুমারের চক্রচালনও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে।

তারাপদ সমস্ত গ্রামটি আয়ত্ত করিয়া লইল, কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার ঈর্ষা সে এখনো জয় করিতে পারিল না। এই বালিকাটি তারাপদর সুদূরে নির্বাসন তীব্রভাবে কামনা করিতেছে জানিয়াই বোধ করি তারাপদ এই গ্রামে এতদিন আবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন, চারুশশী তাহার প্রমাণ দিল।

বামুনঠাকরুনের মেয়ে সোনামণি পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়; সেই চারুর সম-বয়সী সখী। তাহার শরীর অসুস্থ থাকাতে গৃহপ্রত্যাগত সখীর সহিত সে কিছুদিন সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। সুস্থ হইয়া যেদিন দেখা করিতে আসিল সেদিন প্রায় বিনা কারণেই দুই সখীর মধ্যে একটু মনোবিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।

চারু অত্যন্ত ফাঁদিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, তারাপদ নামক তাহাদের নবার্জিত পরমরত্নটির আহরণকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া সে তাহার সখীর কৌতূহল এবং বিস্ময় সপ্তমে চড়াইয়া দিবে। কিন্তু যখন সে শুনিল, তারাপদ সোনামণির নিকট কিছুমাত্র অপরিচিত নহে, বামুনঠাকরুনকে সে মাসি বলে এবং সোনামণি তাহাকে দাদা বলিয়া থাকে— যখন শুনিল, তারাপদ কেবল যে বাঁশিতে কীর্তনের সুর বাজাইয়া মাতা ও কন্যার মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহা নহে, সোনামণির অনুরোধে তাহাকে স্বহস্তে একটি বাঁশের বাঁশি বানাইয়া দিয়াছে, তাহাকে কতদিন উচ্চশাখা হইতে ফল ও কণ্টকশাখা হইতে ফুল পাড়িয়া দিয়াছে, তখন চারুর অন্তঃ-করণে যেন তপ্তশেল বিঁধিতে লাগিল। চারু জানিত, তারাপদ বিশেষরূপে তাহাদেরই তারাপদ— অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয়, ইতরসাধারণে তাহার একটু-আধটু আভাসমাত্র পাইবে, অথচ কোনোমতে নাগাল পাইবে না, দূর হইতে তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইবে এবং চারুশশীদের ধন্যবাদ দিতে থাকিবে। এই আশ্চর্য দুর্লভ দৈবলব্ধ ব্রাহ্মণবালকটি সোনামণির কাছে কেন সহজগম্য হইল। আমরা যদি এত যত্ন করিয়া না আনিতাম, এত যত্ন করিয়া না রাখিতাম, তাহা হইলে সোনামণিরা তাহার দর্শন পাইত কোথা হইতে। সোনামণির দাদা! শুনিয়া সর্বশরীর জ্বলিয়া যায়।

যে তারাপদকে চারু মনে মনে বিদ্বেষশরে জর্জর করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই একাধিকার লইয়া এমন প্রবল উদ্‌বেগ কেন।— বুঝিবে কাহার সাধ্য।

সেই দিনই অপর একটা তুচ্ছসূত্রে সোনামণির সহিত চারুর মর্মান্তিক আড়ি হইয়া গেল। এবং সে তারাপদর ঘরে গিয়া তাহার শখের বাঁশিটি বাহির করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া মাড়াইয়া নির্দয়ভাবে ভাঙিতে লাগিল।

চারু যখন প্রচণ্ড আবেগে এই বংশিধ্বংসকার্যে নিযুক্ত আছে এমন সময় তারাপদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে বালিকার এই প্রলয়মূর্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কহিল, "চারু, আমার বাঁশিটা ভাঙছ কেন!" চারু রক্তনেত্রে রক্তিমমুখে "বেশ করছি" "খুব করছি" বলিয়া আরো বার দুই-চার বিদীর্ণ বাঁশির উপর অনাবশ্যক পদাঘাত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারাপদ বাঁশিটা তুলিয়া উলটিয়া পালটিয়া দেখিল, তাহাতে আর পদার্থ নাই। অকারণে তাহার পুরাতন নিরপরাধ বাঁশিটার এই আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া সে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। চারুশশী প্রতিদিনই তাহার পক্ষে পরম কৌতূহলের বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহার আর-একটি কৌতূহলের ক্ষেত্র ছিল, মতিলালবাবুর লাইব্রেরিতে ইংরাজি

ছবির বইগুলি। বাহিরের সংসারের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির জগতে সে কিছুতেই ভালো করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কল্পনার দ্বারা আপনার মনে অনেকটা পূরণ করিয়া লইত, কিন্তু তাহাতে মন কিছুতেই তৃপ্তি মানিত না।

ছবির বহির প্রতি তারাপদর এই আগ্রহ দেখিয়া একদিন মতিলালবাবু বলিলেন, "ইংরিজি শিখবে? তা হলে এ-সমস্ত ছবির মানে বুঝতে পারবে।"

তারাপদ তৎক্ষণাৎ বলিল, "শিখব।"

মতিবাবু খুব খুশি হইয়া গ্রামের এন্‌ট্রেন্স্‌স্কুলের হেড-মাস্টার রামরতনবাবুকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই বালকের ইংরাজি-অধ্যাপনকার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তারাপদ তাহার প্রখর স্মরণশক্তি এবং অখণ্ড মনোযোগ লইয়া ইংরাজি-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সে যেন এক নূতন দুর্গম রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইল, পুরাতন সংসারের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখিল না; পাড়ার লোকেরা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না; যখন সে সন্ধ্যার পূর্বে নির্জন নদীতীরে দ্রুতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিত তখন তাহার উপাসক বালকসম্প্রদায় দূর হইতে ক্ষুণ্ণচিত্তে সসম্ভ্রমে তাহাকে নিরীক্ষণ করিত, তাহার পাঠে ব্যাঘাত করিতে সাহস করিত না।

চারুও আজকাল তাহাকে বড়ো একটা দেখিতে পাইত না। পূর্বে তারাপদ অন্তঃপুরে গিয়া অন্নপূর্ণার স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া আহার করিত— কিন্তু তদুপলক্ষে প্রায় মাঝে মাঝে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইত বলিয়া সে মতিবাবুকে অনুরোধ করিয়া বাহিরে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা ব্যথিত হইয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাবু বালকের অধ্যয়নের উৎসাহে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই নূতন ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন।

এমন সময় চারুও হঠাৎ জেদ করিয়া বসিল, "আমিও ইংরাজি শিখিব।" তাহার পিতামাতা তাঁহাদের খামখেয়ালি কন্যার এই প্রস্তাবটিকে প্রথমে পরিহাসের বিষয় জ্ঞান করিয়া স্নেহমিশ্রিত হাস্য করিলেন; কিন্তু কন্যাটি এই প্রস্তাবের পরিহাস্য অংশটুকুকে প্রচুর অশ্রুজলধারায় অতি শীঘ্রই নিঃশেষে ধৌত করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে এই স্নেহদুর্বল নিরুপায় অভিভাবকদ্বয় বালিকার প্রস্তাব গম্ভীরভাবে গ্রাহ্য করিলেন। চারু মাস্টারের নিকট তারাপদর সহিত একত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু পড়াশুনা করা এই অস্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাবসংগত ছিল না। সে নিজে

কিছু শিখিল না, কেবল তারাপদর অধ্যয়নে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। সে পিছাইয়া পড়ে, পড়া মুখস্থ করে না, কিন্তু তবু কিছুতেই তারাপদর পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়া থাকিতে চাহে না। তারাপদ তাহাকে অতিক্রম করিয়া নূতন পড়া লইতে গেলে সে মহা রাগারাগি করিত, এমন-কি, কান্নাকাটি করিতে ছাড়িত না। তারাপদ পুরাতন বই শেষ করিয়া নূতন বই কিনিলে তাহাকেও সেই নূতন বই কিনিয়া দিতে হইত। তারাপদ অবসরের সময় নিজে ঘরে বসিয়া লিখিত এবং পড়া মুখস্থ করিত, ইহা সেই ঈর্ষাপরায়ণা কন্যাটির সহ্য হইত না; সে গোপনে তাহার লেখা খাতায় কালী ঢালিয়া আসিত, কলম চুরি করিয়া রাখিত, এমন-কি বইয়ের যেখানে অভ্যাস করিবার, সেই অংশটি ছিঁড়িয়া আসিত। তারাপদ এই বালিকার অনেক দৌরাত্ম্য সকৌতুকে সহ্য করিত, অসহ্য হইলে মারিত, কিন্তু কিছুতেই শাসন করিতে পারিত না।

দৈবাৎ একটা উপায় বাহির হইল। একদিন বড়ো বিরক্ত হইয়া নিরুপায় তারাপদ তাহার মসীবিলুপ্ত লেখা খাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া গম্ভীর বিষণ্নমুখে বসিয়া ছিল; চারু দ্বারের কাছে আসিয়া মনে করিল, আজ মার খাইবে। কিন্তু তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না। তারাপদ একটি কথামাত্র না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকা ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘুর্‌ঘুর্‌ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারম্বার এত কাছে ধরা দিল যে, তারাপদ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বালিকা মহা মুশকিলে পড়িল। কেমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কোনোকালেই অভ্যাস ছিল না, অথচ অনুতপ্ত ক্ষুদ্র হৃদয়টি তাহার সহপাঠীর ক্ষমালাভের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অবশেষে কোনো উপায় না দেখিয়া ছিন্ন খাতার এক টুকরা লইয়া তারাপদর নিকটে বসিয়া খুব বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল, "আমি আর কখনো খাতায় কালী মাখাব না।" লেখা শেষ করিয়া সেই লেখার প্রতি তারাপদর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেকপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিয়া তারাপদ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না—হাসিয়া উঠিল। তখন বালিকা লজ্জায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া ঘর হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যে কাগজের টুকরায় সে স্বহস্তে দীনতা প্রকাশ করিয়াছে সেটা অনন্ত কাল এবং অনন্ত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ লোপ করিতে পারিলে তবে তাহার হৃদয়ের নিদারুণ ক্ষোভ মিটিতে পারিত।

এ দিকে সংকুচিতচিত্ত সোনামণি দুই-একদিন অধ্যয়নশালার বাহিরে উঁকিঝুঁকি মারিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। সখী চারুশশীর সহিত তাহার সকল বিষয়েই বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু তারাপদর সম্বন্ধে চারুকে সে অত্যন্ত ভয় এবং সন্দেহের সহিত

দেখিত। চারু যে সময়ে অন্তঃপুরে থাকিত সেই সময়টি বাছিয়া সোনামণি সসংকোচে তারাপদর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। তারাপদ বই হইতে মুখ তুলিয়া সস্নেহে বলিত, "কী সোনা। খবর কী। মাসি কেমন আছে।"

সোনামণি কহিত, "অনেক দিন যাও নি, মা তোমাকে একবার যেতে বলেছে। মার কোমরে ব্যথা বলে দেখতে আসতে পারে না।"

এমন সময় হয়তো হঠাৎ চারু আসিয়া উপস্থিত। সোনামণি শশব্যস্ত। সে যেন গোপনে তাহার সখীর সম্পত্তি চুরি করিতে আসিয়াছিল। চারু কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিত, "অ্যাঁ সোনা! তুই পড়ার সময় গোল করতে এসেছিস, আমি এখনই বাবাকে গিয়ে বলে দেব।" যেন তিনি নিজে তারাপদর একটি প্রবীণা অভিভাবিকা; তাহার পড়াশুনায় লেশমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে রাত্রিদিন ইহার প্রতিই তাহার একমাত্র দৃষ্টি। কিন্তু সে নিজে কী অভিপ্রায়ে এই অসময়ে তারাপদর পাঠগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না এবং তারাপদও তাহা ভালোরূপ জানিত। কিন্তু সোনামণি বেচারা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ত সৃজন করিত; অবশেষে চারু যখন ঘৃণাভরে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সম্ভাষণ করিত তখন সে লজ্জিত শঙ্কিত পরাজিত হইয়া ব্যথিতচিত্তে ফিরিয়া যাইত। দয়ার্দ্র তারাপদ তাহাকে ডাকিয়া বলিত, "সোনা, আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি তোদের বাড়ি যাব এখন।" চারু সর্পিণীর মতো ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিত, "যাবে বৈকি। তোমার পড়া করতে হবে না? আমি মাস্টারমশায়কে বলে দেব না?"

চারুর এই শাসনে ভীত না হইয়া তারাপদ দুই-একদিন সন্ধ্যার পর বামুনঠাকরুনের বাড়ি গিয়াছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ বারে চারু ফাঁকা শাসন না করিয়া আস্তে আস্তে এক সময় বাহির হইতে তারাপদর ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিয়া মার মসলার বাক্সর চাবিতালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সমস্ত সন্ধ্যাবেলা তারাপদকে এইরূপ বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আহারের সময় দ্বার খুলিয়া দিল। তারাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখন অনুতপ্ত ব্যাকুল বালিকা করজোড়ে সানুনয়ে বারম্বার বলিতে লাগিল, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর আমি এমন করব না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি খেয়ে যাও।" তাহাতেও যখন তারাপদ বশ মানিল না, তখন সে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল; তারাপদ সংকটে পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিল।

চারু কতবার একান্তমনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে তারাপদর সহিত সদ্‌ব্যবহার করিবে, আর কখনো তাহাকে মুহূর্তের জন্য বিরক্ত করিবে না, কিন্তু সোনামণি প্রভৃতি

আর পাঁচজন মাঝে আসিয়া পড়াতে কখন তাহার কিরূপ মেজাজ হইয়া যায় কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। কিছুদিন যখন উপরি-উপরি সে ভালোমানুষি করিতে থাকে তখনই একটা উৎকট আসন্ন বিপ্লবের জন্য তারাপদ সতর্কভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আক্রমণটা হঠাৎ কী উপলক্ষে কোন্ দিক হইতে আসে কিছুই বলা যায় না। তাহার পরে প্রচণ্ড ঝড়, ঝড়ের পরে প্রচুর অশ্রুবারিবর্ষণ, তাহার পরে প্রসন্ন স্নিগ্ধ শান্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এমনি করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিল। এত সুদীর্ঘকালের জন্য তারাপদ কখনো কাহারো নিকট ধরা দেয় নাই। বোধ করি, পড়াশুনার মধ্যে তাহার মন এক অপূর্ব আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াছিল; বোধ করি, বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল; বোধ করি, তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিয়তদৌরাত্ম্যচঞ্চল সৌন্দর্য অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।

এ দিকে চারুর বয়স এগারো উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মতিবাবু সন্ধান করিয়া তাঁহার মেয়ের বিবাহের জন্য দুই-তিনটি ভালো ভালো সম্বন্ধ আনাইলেন। কন্যার বিবাহ-বয়স উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মতিবাবু তাহার ইংরাজি পড়া এবং বাহিরে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক অবরোধে চারু ঘরের মধ্যে ভারি-একটা আন্দোলন উপস্থিত করিল।

তখন একদিন অন্নপূর্ণা মতিবাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, "পাত্রের জন্যে তুমি অত খোঁজ করে বেড়াচ্ছ কেন। তারাপদ ছেলেটি তো বেশ। আর তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে।"

শুনিয়া মতিবাবু অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "সেও কি কখনো হয়। তারাপদর কুলশীল কিছুই জানা নেই। আমার একটিমাত্র মেয়ে, আমি ভালো ঘরে দিতে চাই।"

একদিন রায়ডাঙার বাবুদের বাড়ি হইতে মেয়ে দেখিতে আসিল। চারুকে বেশভূষা পরাইয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হইল। সে শোবার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই বাহির হইল না। মতিবাবু ঘরের বাহির হইতে অনেক অনুনয় করিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। অবশেষে বাহিরে আসিয়া

রায়ডাঙার দূতবর্গের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইল, কন্যার হঠাৎ অত্যন্ত অসুখ করিয়াছে, আজ আর দেখানো হইবে না। তাহারা ভাবিল, মেয়ের বুঝি কোনো-একটা দোষ আছে, তাই এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করা হইল।

তখন মতিবাবু ভাবিতে লাগিলেন, তারাপদ ছেলেটি দেখিতে শুনিতে সকল হিসাবেই ভালো ; উহাকে আমি ঘরেই রাখিতে পারিব, তাহা হইলে আমার একমাত্র মেয়েটিকে পরের বাড়ি পাঠাইতে হইবে না। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অশান্ত অবাধ্য মেয়েটির দুরন্তপনা তাঁহাদের স্নেহের চক্ষে যতই মার্জনীয় বোধ হউক, শ্বশুরবাড়িতে কেহ সহ্য করিবে না।

তখন স্ত্রী-পুরুষে অনেক আলোচনা করিয়া তারাপদর দেশে তাহার সমস্ত কৌলিক সংবাদ সন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। খবর আসিল যে, বংশ ভালো, কিন্তু দরিদ্র। তখন মতিবাবু ছেলের মা এবং ভাইয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। তাঁহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সম্মতি দিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কাঁঠালিয়ায় মতিবাবু এবং অন্নপূর্ণা বিবাহের দিনক্ষণ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাবু কথাটা গোপনে রাখিলেন।

চারুকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে মাঝে মাঝে বর্গির হাঙ্গামার মতো তারাপদর পাঠগৃহে গিয়া পড়িত। কখনো রাগ, কখনো অনুরাগ, কখনো বিরাগের দ্বারা তাহার পাঠচর্যার নিভৃত শান্তি অকস্মাৎ তরঙ্গিত করিয়া তুলিত। তাহাতে আজকাল এই নির্লিপ্ত মুক্তস্বভাব ব্রাহ্মণবালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার হইত। যে ব্যক্তির লঘুভার চিত্ত চিরকাল অক্ষুণ্ণ অব্যাহতভাবে কালস্রোতের তরঙ্গচূড়ায় ভাসমান হইয়া সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত সে আজকাল এক-একবার অন্যমনস্ক হইয়া বিচিত্র দিবাস্বপ্নজালের মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এক-একদিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সে মতিবাবুর লাইব্রেরির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছবির বইয়ের পাতা উল্‌টাইতে থাকিত ; সেই ছবিগুলির মিশ্রণে যে কল্পনালোক সৃজিত হইত তাহা পূর্বেকার হইতে অনেক স্বতন্ত্র এবং অধিকতর রঙিন। চারুর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিয়া সে আর পূর্বের মতো স্বভাবত পরিহাস করিতে পারিত না, দুষ্টামি করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না। নিজের এই গূঢ় পরিবর্তন, এই আবদ্ধ আসক্ত ভাব তাহার নিজের কাছে এক নূতন স্বপ্নের মতো মনে হইতে লাগিল।

শ্রাবণ মাসে বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া মতিবাবু তারাপদর মা ও ভাইদের আনিতে পাঠাইলেন, তারাপদকে তাহা জানিতে দিলেন না। কলিকাতায়

মোক্তারকে গড়ের বাগু বায়না দিতে আদেশ করিলেন এবং জিনিসপত্রের ফর্দ পাঠাইয়া দিলেন।

আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল। গ্রামের নদী এতদিন শুষ্কপ্রায় হইয়া ছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক-একটা ডোবায় জল বাধিয়া থাকিত; ছোটো ছোটো নৌকা সেই পঙ্কিল জলে ডোবানো ছিল এবং শুষ্ক নদীপথে গোরুর গাড়ি -চলাচলের সুগভীর চক্রচিহ্ন খোদিত হইতেছিল— এমন সময় একদিন, পিতৃগৃহপ্রত্যাগত পার্বতীর মতো, কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্যসহকারে গ্রামের শূন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল— উলঙ্গ বালকবালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নৃত্য করিতে লাগিল, অতৃপ্ত আনন্দে বারম্বার জলে ঝাঁপ দিয়া দিয়া নদীকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে লাগিল, কুটিরবাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়সঙ্গিনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল— শুষ্ক নির্জীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এক প্রবল বিপুল প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল। দেশবিদেশ হইতে বোঝাই হইয়া ছোটো বড়ো নানা আয়তনের নৌকা আসিতে লাগিল, বাজারের ঘাট সন্ধ্যাবেলায় বিদেশী মাঝির সংগীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই তীরের গ্রামগুলি সম্বৎসর আপনার নিভৃত কোণে আপনার ক্ষুদ্র ঘরকন্না লইয়া একাকিনী দিনযাপন করিতে থাকে, বর্ষার সময় বাহিরের বৃহৎ পৃথিবী বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া গৈরিকবর্ণজলরথে চড়িয়া এই গ্রামকন্যকাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে; তখন জগতের সঙ্গে আত্মীয়তাগর্বে কিছুদিনের জন্য তাহাদের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়, সমস্তই সচল সজাগ সজীব হইয়া উঠে এবং মৌন নিস্তব্ধ দেশের মধ্যে সুদূর রাজ্যের কলালাপধ্বনি আসিয়া চারি দিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে।

এই সময়ে কুড়ুলকাটায় নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা হইবে। জ্যোৎস্নাসন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল, কোনো নৌকা নাগরদোলা, কোনো নৌকা যাত্রার দল, কোনো নৌকা পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে মেলা অভিমুখে চলিয়াছে; কলিকাতার কন্‌সর্টের দল বিপুলশব্দে দ্রুততালের বাজনা জুড়িয়া দিয়াছে; যাত্রার দল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাহাঃ শব্দে চীৎকার উঠিতেছে; পশ্চিমদেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাগুলো কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মত্ত উৎসাহে বিনা সংগীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে— উদ্দীপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে পূর্বদিগন্ত হইতে ঘনমেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল— পুবে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল— নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক

ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা— চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর এক তীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়া গ্রাম আপন কুটিরদ্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

পরদিন তারাপদর মাতা ও ভ্রাতাগণ কাঁঠালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পরদিন কলিকাতা হইতে বিবিধসামগ্রীপূর্ণ তিনখানা বড়ো নৌকা আসিয়া কাঁঠালিয়ার জমিদারি কাছারির ঘাটে লাগিল, এবং পরদিন অতি প্রাতে সোনামণি কাগজে কিঞ্চিৎ আমসত্ত এবং পাতার ঠোঙায় কিঞ্চিৎ আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদর পাঠগৃহদ্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল, কিন্তু পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না। স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারি দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।

ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

ইচ্ছাপূরণ

সুবলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সুশীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মানুষটি হয় না। সেইজন্যই সুবলচন্দ্র কিছু দুর্বল ছিলেন এবং সুশীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না।

ছেলেটি পাড়াসুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেইজন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলেটি হরিণের মতো দৌড়িতে পারিত; কাজেই কিল চড়-চাপড় সকল সময় ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িত না। কিন্তু সুশীলচন্দ্র দৈবাৎ যেদিন ধরা পড়িতেন সেদিন তাঁহার আর রক্ষা থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় স্কুলের ছুটি ছিল, কিন্তু আজ স্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতেছিল না। তাহার অনেকগুলা কারণ ছিল। একে তো আজ স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও পাড়ার বোসেদের বাড়ি আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধুমধাম চলিতেছে। সুশীলের ইচ্ছা, সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে স্কুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার বাপ সুবল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী রে, বিছানায় পড়ে আছিস যে। আজ ইস্কুলে যাবি নে?"

সুশীল বলিল, "আমার পেট কামড়াচ্ছে, আজ আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।"

সুবল তাহার মিথ্যা কথা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, 'রোসো, একে আজ জব্দ করতে হবে।' এই বলিয়া কহিলেন, "পেট কামড়াচ্ছে? তবে আর তোর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। বোসেদের বাড়ি বাজি দেখতে হরিকে একলাই পাঠিয়ে দেব এখন। তোর জন্যে আজ লজঞ্জুস কিনে রেখেছিলুম, সেও আজ খেয়ে কাজ নেই। তুই এখানে চুপ করে পড়ে থাক্, আমি খানিকটা পাঁচন তৈরি করে নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া সুবলচন্দ্র খুব তিতো পাঁচন তৈয়ার করিয়া আনিতে গেলেন। সুশীল মহা মুশকিলে পড়িয়া গেল। লজঞ্জুস সে যেমন ভালোবাসিত পাঁচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সর্বনাশ বোধ হইত। ও দিকে আবার বোসেদের বাড়ি যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহাও বুঝি বন্ধ হইল।

সুবলবাবু যখন খুব বড়ো এক বাটি পাঁচন লইয়া ঘরে ঢুকিলেন সুশীল বিছানা হইতে ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ ইস্কুলে যাব।"

বাবা বলিলেন, "না না, সে কাজ নেই, তুই পাঁচন খেয়ে এইখানে চুপচাপ করে শুয়ে থাক্।" এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাঁচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবল মনে করিতে লাগিল যে, 'আহা, যদি কালই আমার বাবার মতো বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ করে রাখতে পারে না।'

তাহার বাপ সুবলবাবু বাহিরে একলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, 'আমার বাপ মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন বলেই তো আমার ভালোরকম পড়াশুনো

কিছু হল না। আহা, আবার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই, তা হলে আর কিছুতেই সময় নষ্ট না করে কেবল পড়াশুনো করে নিই।'

ইচ্ছাঠাকরুন সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'আচ্ছা, ভালো, কিছুদিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক।'

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে।" ছেলেকে গিয়া বলিলেন, "কাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।" শুনিয়া দুইজনে ভারি খুশি হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ সুবলচন্দ্র রাত্রে ভালো ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটায় ঘুমাইতেন। কিন্তু আজ তাঁহার কী হইল, হঠাৎ খুব ভোরে উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, খুব ছোটো হইয়া গেছেন; পড়া দাঁত সবগুলি উঠিয়াছে; মুখের গোঁফদাড়ি সমস্ত কোথায় গেছে, তাহার আর চিহ্ন নাই। রাত্রে যে ধুতি এবং জামা পরিয়া শুইয়াছিলেন, সকালবেলায় তাহা এত ঢিলা হইয়া গেছে যে, হাতের দুই আস্তিন প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, জামার গলা বুক পর্যন্ত নাবিয়াছে, ধুতির কোঁচাটা এতই লুটাইতেছে যে, পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের সুশীলচন্দ্র অন্যদিন ভোরে উঠিয়া চারি দিকে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ান, কিন্তু আজ তাহার ঘুম আর ভাঙে না; যখন তাহার বাপ সুবলচন্দ্রের চেঁচামেচিতে সে জাগিয়া উঠিল তখন দেখিল, কাপড়-চোপড়গুলো গায়ে এমনি আঁটিয়া গেছে যে, ছিঁড়িয়া ফাটিয়া কুটিকুটি হইবার জো হইয়াছে; শরীরটা সমস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে; কাঁচা-পাকা গোঁফে-দাড়িতে অর্ধেকটা মুখ দেখাই যায় না; মাথায় একমাথা চুল ছিল, হাত দিয়া দেখে সামনে চুল নাই— পরিষ্কার টাক তক্‌তক্ করিতেছে।

আজ সকালে সুশীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই চায় না। অনেকবার তুড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিল; অনেকবার এপাশ ওপাশ করিল; শেষকালে বাপ সুবলচন্দ্রের গোলমালে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভারি মুশকিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, সুশীলচন্দ্র মনে করিত যে, সে যদি তাহার বাবা সুবলচন্দ্রের মতো বড়ো এবং স্বাধীন হয়, তবে যেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া, কাঁচা আম খাইয়া, পাখির বাচ্ছা পাড়িয়া, দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবে; যখন ইচ্ছা ঘরে আসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেদিন সকালে উঠিয়া

তাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানাপুকুরটা দেখিয়া তাহার মনে হইল, ইহাতে ঝাঁপ দিলেই আমার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিবে। চুপচাপ করিয়া দাওয়ায় একটা মাতুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খেলাধুলোগুলো একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় না, একবার চেষ্টা করিয়াই দেখা যাক। এই ভাবিয়া কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেকরকম চেষ্টা করিল। কাল যে গাছটাতে কাঠবিড়ালির মতো তর তর করিয়া চড়িতে পারিত আজ বুড়া শরীর লইয়া সে গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিল না; নিচেকার একটা কচি ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙিয়া গেল এবং বুড়া সুশীল ধপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা বুড়াকে ছেলেমানুষের মতো গাছে চড়িতে ও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। সুশীলচন্দ্র লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া আবার সেই দাওয়ায় মাতুরে আসিয়া বসিল; চাকরকে বলিল, "ওরে, বাজার থেকে এক টাকার লজঞ্জুস কিনে আন্।"

লজঞ্জুসের প্রতি সুশীলচন্দ্রের বড়ো লোভ ছিল। স্কুলের ধারে দোকানে সে রোজ নানা রঙের লজঞ্জুস সাজানো দেখিত; দু-চার পয়সা যাহা পাইত তাহাতেই লজঞ্জুস কিনিয়া খাইত; মনে করিত যখন বাবার মতো টাকা হইবে তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজঞ্জুস কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকায় একরাশ লজঞ্জুস কিনিয়া আনিয়া দিল; তাহারই একটা লইয়া সে দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিয়া চুষিতে লাগিল; কিন্তু বুড়ার মুখে ছেলেমানুষের লজঞ্জুস কিছুতেই ভালো লাগিল না। একবার ভাবিল 'এগুলো আমার ছেলেমানুষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক্'; আবার তখনই মনে হইল, 'না কাজ নাই, এত লজঞ্জুস খাইলে উহার আবার অসুখ করিবে।'

কাল পর্যন্ত যে-সকল ছেলে সুশীলচন্দ্রের সঙ্গে কপাটি খেলিয়াছে আজ তাহারা সুশীলের সন্ধানে আসিয়া বুড়ো সুশীলকে দেখিয়া দূরে ছুটিয়া গেল।

সুশীল ভাবিয়াছিল, বাপের মতো স্বাধীন হইলে তাহার সমস্ত ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে সমস্তদিন ধরিয়া কেবলই ডুডু ডুডু শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে; কিন্তু আজ রাখাল গোপাল অক্ষয় নিবারণ হরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল; ভাবিল, 'চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, এখনই বুঝি ছোঁড়াগুলো গোলমাল বাধাইয়া দিবে।'

আগেই বলিয়াছি, বাবা সুবলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়ায় মাতুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেন, যখন ছোটো ছিলাম তখন দুষ্টামি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্তদিন শান্ত শিষ্ট হইয়া, ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া, কেবল বই

লইয়া পড়া মুখস্থ করি। এমন-কি, সন্ধ্যার পরে ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনাও বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইয়া সুবলচন্দ্র কিছুতেই স্কুলমুখো হইতে চাহেন না। সুশীল বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিত, "বাবা, ইস্কুলে যাবে না?" সুবল মাথা চুলকাইয়া মুখ নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেন, "আজ আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।" সুশীল রাগ করিয়া বলিত, "পারবে না বইকি! ইস্কুলে যাবার সময় আমারও অমন ঢের পেট কামড়েছে, আমি ও-সব জানি।"

বাস্তবিক সুশীল এতরকম উপায়ে স্কুল পলাইত এবং সে এত অল্পদিনের কথা যে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম নহে। সুশীল জোর করিয়া ক্ষুদ্র বাপটিকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের ছুটির পরে সুবল বাড়ি আসিয়া খুব একচোট ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে বৃদ্ধ সুশীলচন্দ্র চোখে চশমা দিয়া একখানা কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়া সুর করিয়া করিয়া পড়িত, সুবলের ছুটাছুটি গোলমালে তাহার পড়ার ব্যাঘাত হইত। তাই সে জোর করিয়া সুবলকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা শ্লেট দিয়া আঁক কষিতে দিত। আঁকগুলো এমনি বড়ো বড়ো বাছিয়া দিত যে, তাহার একটা কষিতেই তাহার বাপের একঘণ্টা চলিয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলায় বুড়া সুশীলের ঘরে অনেক বুড়ায় মিলিয়া দাবা খেলিত। সে সময়টায় সুবলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুশীল একজন মাস্টার রাখিয়া দিল; মাস্টার রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে সুশীলের বড়ো কড়াক্কড় ছিল। কারণ, তাহার বাপ সুবল যখন বৃদ্ধ ছিলেন তখন তাঁহার খাওয়া ভালো হজম হইত না, একটু বেশি খাইলেই অম্বল হইত— সুশীলের সে কথাটা বেশ মনে আছে, সেইজন্য সে তাহার বাপকে কিছুতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অল্পবয়স হইয়া আজকাল তাঁহার এমনি ক্ষুধা হইয়াছে যে, নুড়ি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সুশীল তাঁহাকে যতই অল্প খাইতে দিত পেটের জ্বালায় তিনি ততই অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শুকাইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। সুশীল ভাবিল, শক্ত ব্যামো হইয়াছে; তাই কেবলই ঔষধ গিলাইতে লাগিল।

বুড়া সুশীলেরও বড়ো গোল বাধিল। সে তাহার পূর্বকালের অভ্যাসমত যাহা করে তাহাই তাহার সহ্য হয় না; পূর্বে সে পাড়ায় কোথাও যাত্রাগানের খবর পাইলেই বাড়ি হইতে পালাইয়া, হিমে হোক, বৃষ্টিতে হোক, সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া, সর্দি হইয়া, কাসি হইয়া, গায়ে মাথায়

ব্যথা হইয়া, তিন হপ্তা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহাই করিতে গিয়া হাতের গাঁট পায়ের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল ; তাহার চিকিৎসা করিতে ছয় মাস গেল। তাহার পর হইতে দুই দিন অন্তর সে গরম জলে স্নান করিত এবং সুবলকেও কিছুতেই পুকুরে স্নান করিতে দিত না। পূর্বেকার অভ্যাসমত, ভুলিয়া তক্তপোষ হইতে সে লাফ দিয়া নামিতে যায়, আর হাড়গুলো টন্‌টন্ ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠে। মুখের মধ্যে আস্ত পান পুরিয়াই হঠাৎ দেখে, দাঁত নাই, পান চিবানো অসাধ্য। ভুলিয়া চিরুনি ব্রুশ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে, প্রায় সকল মাথাতেই টাক। এক-একদিন হঠাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সী বুড়া হইয়াছে এবং ভুলিয়া পূর্বের অভ্যাসমত দুষ্টামি করিয়া পাড়ার বুড়ি আন্দি পিসির জলের কলসে হঠাৎ ঠন্ করিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত— বুড়ামানুষের এই ছেলেমানুষি দুষ্টামি দেখিয়া লোকেরা তাহাকে মার্ মার্ করিয়া তাড়াইয়া যাইত, সেও লজ্জায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

সুবলচন্দ্রও এক-একদিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে আজকাল ছেলেমানুষ হইয়াছে। আপনাকে পূর্বের মতো বুড়া মনে করিয়া যেখানে বুড়ামানুষেরা তাস পাশা খেলিতেছে সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং বুড়ার মতো কথা বলিত, শুনিয়া সকলেই তাহাকে "যা যা, খেলা কর্‌গে যা, জ্যাঠামি করতে হবে না" বলিয়া কান ধরিয়া বিদায় করিয়া দিত। হঠাৎ ভুলিয়া মাস্টারকে গিয়া বলিত, "দাও তো, তামাকটা দাও তো, খেয়ে নিই।" শুনিয়া মাস্টার তাহাকে বেঞ্চের উপর এক পায়ে দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, "ওরে বেজা, ক দিন আমাকে কামাতে আসিস নি কেন।" নাপিত ভাবিত, ছেলেটি খুব ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে। সে উত্তর দিত, "আর বছর-দশেক বাদে আসব এখন।" আবার এক-একদিন তাহার পূর্বের অভ্যাসমত তাহার ছেলে সুশীলকে গিয়া মারিত। সুশীল ভারি রাগ করিয়া বলিত, "পড়াশুনো করে তোমার এই বুদ্ধি হচ্ছে ? একরত্তি ছেলে হয়ে বুড়োমানুষের গায়ে হাত তোল !" অমনি চারি দিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া কেহ কিল, কেহ চড়, কেহ গালি দিতে আরম্ভ করে।

তখন সুবল একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, "আহা, যদি আমি আমার ছেলে সুশীলের মতো বুড়ো হই এবং স্বাধীন হই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই।"

সুশীলও প্রতিদিন জোড়হাত করিয়া বলে, "হে দেবতা, আমার বাপের মতো আমাকে ছোটো করিয়া দাও, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা যেরকম দুষ্টামি আরম্ভ করিয়াছেন উঁহাকে আর আমি সামলাইতে পারি না, সর্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।"

তখন ইচ্ছাঠাকরুন আসিয়া বলিলেন, "কেমন, তোমাদের শখ মিটিয়াছে ?"

তাঁহারা দুইজনেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, "দোহাই ঠাকরুন, মিটিয়াছে। এখন আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদিগকে তাহাই করিয়া দাও।"

ইচ্ছাঠাকরুন বলিলেন, "আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।"

পরদিন সকালে সুবল পূর্বের মতো বুড়া হইয়া এবং সুশীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দুইজনেরই মনে হইল যে, স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছি। সুবল গলা ভার করিয়া বলিলেন, "সুশীল, ব্যাকরণ মুখস্থ করবে না ?"

সুশীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে।"

আশ্বিন ১৩০২

প্রবন্ধ

রাশিয়ার চিঠি

কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ করকে
আশীর্বাদ

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাশিয়ার চিঠি

১

মস্কৌ

রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।

চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে, কম প'রে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে— জীবনযাত্রার জন্য যত-কিছু সুযোগ সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে— উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই। এক দল তলায় না থাকলে আর-এক দল উপরে থাকতেই পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না; কেবলমাত্র জীবিকানির্বাহ করার জন্যে তো মানুষের মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে-সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীরমনের গতিকে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষাস্বাস্থ্য-সুখসুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

মুশকিল এই, দয়া করে কোনো স্থায়ী জিনিস করা চলে না; বাইরে থেকে উপকার

করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হতে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব হয়। যাই হোক, আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাই নি, অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চে থাকবে এ কথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্‌কার আসে।

ভেবে দেখো-না, নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংলণ্ড্ পরিপুষ্ট হয়েছে। ইংলণ্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে, ইংলণ্ড্‌কে চিরদিন পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা। ইংলণ্ড্ বড়ো হয়ে উঠে মানবসমাজে বড়ো কাজ করছে, অতএব এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে চিরকালের মতো একটা জাতিকে দাসত্বে বদ্ধ করে রেখে দিলে দোষ নেই। এই জাতি যদি কম খায়, কম পরে, তাতে কী যায় আসে— তবুও দয়া করে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করা উচিত, এমন কথা তাদের মনে জাগে। কিন্তু এক-শো বছর হয়ে গেল ; না পেলুম শিক্ষা, না পেলুম স্বাস্থ্য, না পেলুম সম্পদ।

প্রত্যেক সমাজের নিজের ভিতরেও এই একই কথা। যে মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলছে। তার শেষ ফলের কথা এখনো বিচার করবার সময় হয় নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। আমাদের সকল সমস্যার সব চেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত— ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা যে কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত-রাশিয়ার জন্যে নয়— মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে ; সায়ন্সের শেষ-ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই। এখানে থিয়েটারে ভালো ভালো অপেরা ও বড়ো নাটকের অভিনয়ে বিষম ভিড়, কিন্তু যারা দেখছে তারা কৃষি ও কর্মীদের দলের। কোথাও এদের অপমান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে দুই-একটা প্রতিষ্ঠান দেখলুম সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি এদের চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার আনন্দ। আমাদের দেশের জনসাধারণের তো কথাই নেই, ইংলণ্ডের মজুর-শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করলে আকাশপাতাল তফাত দেখা যায়। আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরা

যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তা হলে ভারি উপকার হত। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি, কী হয়েছে আর কী হতে পারত। আমার আমেরিকান সঙ্গী ডাক্তার হ্যারি টিম্বর্স্ এখানকার স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা আলোচনা করছে— তার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমক লাগে— আর কোথায় পড়ে আছে রোগতপ্ত অভুক্ত হতভাগ্য নিরুপায় ভারতবর্ষ! কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল— এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুত বেগে বদলে গেছে— আমরা পড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।

এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই তা বলি নে; গুরুতর গলদ আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে— কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না— সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।

এখানকার ছেলেদের মধ্যে বিভাগ করে কর্মের ভার দেওয়া হয়েছে দেখলুম, ওদের আবাসের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একদল স্বাস্থ্য, একদল ভাণ্ডার ইত্যাদি নানারকম তদারকের দায়িত্ব নেয়; কর্তৃত্ব সবই ওদের হাতে, কেবল একজন পরিদর্শক থাকে। শান্তিনিকেতনে আমি চিরকাল এই-সমস্ত নিয়ম প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছি— কেবলই নিয়মাবলী রচনা হয়েছে, কোনো কাজ হয় নি। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, স্বভাবতই পাঠবিভাগের চরম লক্ষ্য হয়েছে পরীক্ষায় পাস করা, আর সব-কিছুই উপলক্ষ; অর্থাৎ হলে ভালোই, না হলেও ক্ষতি নেই। আমাদের অলস মন জবরদস্ত দায়িত্বের বাইরে কাজ বাড়াতে অনিচ্ছুক। তা ছাড়া শিশুকাল থেকেই আমরা পুঁথিমুখস্থ বিদ্যাতেই অভ্যস্ত। নিয়মাবলী রচনা করে কোনো লাভ নেই; নিয়ামকদের পক্ষে যেটা আন্তরিক নয় সেটা উপেক্ষিত না হয়ে থাকতে পারে না। গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা এতকাল ভেবেছি এখানে তার বেশি কিছু নেই— কেবল আছে শক্তি, আছে উদ্যম, আর কার্যকর্তাদের ব্যবস্থাবুদ্ধি। আমার মনে হয়, অনেকটাই নির্ভর করে গায়ের জোরের উপর— ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ অপরিপুষ্ট দেহ নিয়ে সম্পূর্ণ বেগে কাজ করা দুঃসাধ্য; এখানকার শীতের দেশের লোকের হাড় শক্ত বলেই কাজ এমন করে সহজে এগোয়। মাথা গুনতি করে আমাদের দেশের কর্মীদের সংখ্যা নির্ণয় করা ঠিক নয়, তারা পুরো একখানা মানুষ নয়। ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

২

মস্কৌ

স্থান রাশিয়া। দৃশ্য, মস্কৌয়ের উপনগরীতে একটি প্রাসাদভবন। জানলার ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখি, দিক্‌প্রান্ত পর্যন্ত অরণ্যভূমি, সবুজ রঙের ঢেউ উঠেছে— ঘন সবুজ, ফিকে সবুজ, বেগনির সঙ্গে মেশামেশি সবুজ, হলদের-আমেজ-দেওয়া সবুজ। বনের শেষ-সীমায় বহু দূরে গ্রামের কুটিরশ্রেণী। বেলা প্রায় দশটা, আকাশে স্তরে স্তরে মেঘ করেছে, অবৃষ্টিসংরম্ভ সমারোহ, বাতাসে ঋজুকায়া পপ্‌লার গাছের শিখরগুলি দোদুল্যমান।

মস্কৌয়েতে কয়দিন যে হোটেলে ছিলুম তার নাম গ্র্যান্‌ড্‌ হোটেল। বাড়িটা মস্ত, কিন্তু অবস্থা অতি দরিদ্র। যেন ধনীর ছেলে দেউলে হয়ে গেছে। সাবেক কালের সাজসজ্জা কতক গেছে বিকিয়ে, কতক গেছে ছিঁড়ে; তালি দেওয়ারও সঙ্গতি নেই; ময়লা হয়ে আছে, ধোবার বাড়ির সম্পর্ক বন্ধ। সমস্ত শহরেরই অবস্থা এইরকম— একান্ত অপরিচ্ছন্নতার ভিতর দিয়েও নবাবী আমলের চেহারা দেখা যাচ্ছে, যেন ছেঁড়া জামাতেও সোনার বোতাম লাগানো, যেন ঢাকাই ধুতি রিফু-করা। আহারে ব্যবহারে এমন সর্বব্যাপী নির্ধনতা য়ুরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। তার প্রধান কারণ, আর-আর সব জায়গায় ধনীদরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সব চেয়ে বড়ো করে চোখে পড়ে— সেখানে দারিদ্র্য থাকে যবনিকার আড়ালে নেপথ্যে; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর, দুঃখে দুর্দশায় দুষ্কর্মে নিবিড় অন্ধকার। কিন্তু বাইরে থেকে গিয়ে আমরা যেখানে বাসা পাই সেখানকার জানলা দিয়ে যা-কিছু দেখতে পাই সমস্তই সুভদ্র, শোভন, সুপরিপুষ্ট। এই সমৃদ্ধি যদি সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেত তা হলে তখনই ধরা পড়ত, দেশের ধন এত কিছু বেশি নয় যাতে সকলেরই ভাত কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে জোটে। এখানে ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘুচে; দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা। দেশ-জোড়া এই অধন আর কোথাও দেখি নি বলেই প্রথমেই এটা আমাদের খুব চোখে পড়ে। অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে তারাই একমাত্র।

মস্কৌয়ের রাস্তা দিয়ে নানা লোক চলেছে। কেউ ফিটফাট নয়, দেখলেই বোঝা যায় অবকাশভোগীর দল একেবারে অন্তর্ধান করেছে। সকলকেই স্বহস্তে কাজকর্ম করে দিনপাত করতে হয়, বাবুগিরির পালিশ কোনো জায়গাতেই নেই। ডাক্তার পেট্রোভ বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ি যেতে হয়েছিল, তিনি এখানকার একজন সম্মানী লোক, উচ্চপদস্থ কর্মচারী। যে বাড়িতে তাঁর আপিস সেটা সেকালের একজন বড়োলোকের

বাড়ি। কিন্তু ঘরে আসবাব অতি সামান্য, পারিপাট্যের কোনো লক্ষণ নেই ; নিষ্কার্পেট মেঝের এক কোণে যেমন-তেমন একখানা টেবিল ; সবসুদ্ধ, পিতৃবিয়োগে ধোবা-নাপিত-বর্জিত অশৌচদশার মতো শয্যাসনলুপ্ত ভাব, যেন বাইরের লোকের কাছে সামাজিকতা রক্ষার কোনো দায় নেই। আমার বাসায় আহারাদির যে ব্যবস্থা তা গ্র্যান্ড্ হোটেল নামধারী পান্থাবাসের পক্ষে নিতান্তই অসংগত। কিন্তু এজন্যে কোনো কুণ্ঠা নেই, কেননা সকলেরই এক দশা।

আমাদের বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। তখনকার জীবনযাত্রা ও তার আয়োজন এখনকার তুলনায় কতই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সেজন্যে আমাদের কারো মনে কিছুমাত্র সংকোচ ছিল না। তার কারণ, তখনকার সংসারযাত্রার আদর্শে অত্যন্ত বেশি উঁচুনিচু ছিল না। সকলেরই ঘরে একটা মোটামুটি রকমের চালচলন ছিল ; তফাত যা ছিল তা বৈদগ্ধ্যের, অর্থাৎ গানবাজনা পড়াশুনো ইত্যাদি নিয়ে। তা ছাড়া ছিল কৌলিক রীতির পার্থক্য, অর্থাৎ ভাষাভাবভঙ্গী আচারবিচার -গত বিশেষত্ব। কিন্তু তখন আমাদের আহারবিহার ও সকল -প্রকার উপকরণ যা ছিল তা দেখলে এখনকার মধ্যবিত্ত লোকদের মনেও অবজ্ঞা জাগতে পারত।

ধনগত বৈষম্যের বড়াই আমাদের দেশে এসেছে পশ্চিম মহাদেশ থেকে। এক সময়ে আমাদের দেশে যখন হাল আমলের আপিসবিহারী ও ব্যাবসাদারদের ঘরে নতুন টাকার আমদানি হল তখন তারা বিলিতি বাবুগিরির চলন শুরু করে দিলে। তখন থেকে আসবাবের মাপেই ভদ্রতার পরিমাপ আরম্ভ হয়েছে। তাই আমাদের দেশেও আজকাল কুলশীল রীতিনীতি বুদ্ধিবিদ্যা সমস্ত ছাপিয়ে চোখে পড়ে ধনের বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতার গৌরবই মানুষের পক্ষে সব চেয়ে অগৌরব। এরই ইতরতা যাতে মজ্জার মধ্যে প্রবেশ না করে সেজন্যে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

এখানে এসে সব চেয়ে যেটা আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে, এই ধন-গরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এ দেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভুষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে, এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কী আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে। অনেক কথা বলবার আছে, বলবার চেষ্টা করব ; কিন্তু এই মুহূর্তে আপাতত বিশ্রাম করবার দরকার হয়েছে। অতএব জানলার সামনে লম্বা কেদারার উপর হেলান দিয়ে বসব, পায়ের উপর একটা কম্বল টেনে দেব— তার পরে চোখ যদি বুজে আসতে চায় জোর করে টেনে রাখতে চেষ্টা করব না। ইতি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

৩

মস্কৌ

বহুকাল গত হল তোমাদের উভয়কে পত্র লিখেছিলুম। তোমাদের সম্মিলিত নৈঃশব্দ্য থেকে অনুমান করি সেই যুগলপত্র কৈবল্য লাভ করেছে। এমনতরো মহতী বিনষ্টি ভারতীয় ডাকঘরে আজকাল মাঝে মাঝে ঘটছে বলে শঙ্কা করি। এই কারণেই আজকাল চিঠি লিখতে উৎসাহ বোধ করি নে। অন্তত তোমাদের দিক থেকে সাড়া না পেলে চুপ করে যাই। নিঃশব্দ রাত্রির প্রহরগুলোকে দীর্ঘ বলে মনে হয়; তেমনিতরোই নিশ্চিঠি কাল কল্পনায় অত্যন্ত লম্বা হয়ে ওঠে। তাই থেকে থেকে মনে হয় যেন লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়েছে। তাই পাঁজি গেছে বদল হয়ে, ঘড়ি বাজছে লম্বা তালে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো আমার দেশে যাবার সময়কে যতই টান মারছে ততই অফুরান হয়ে বেড়ে চলেছে। যেদিন ফিরব সেদিন নিশ্চিতই ফিরব— আজকের দিন যেমন অব্যবহিত নিকটে সেদিনও তেমনিই নিকটে আসবে, এই মনে করে সান্ত্বনার চেষ্টা করি।

তা হোক, আপাতত রাশিয়ায় এসেছি— না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনে-প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে; তার কত দিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্‌সো আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেছে পর্বতপ্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে; ভয় ভাবনা সংশয় কিছু মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে। পশ্চিম মহাদেশ বিজ্ঞানের জাদুবলে দুঃসাধ্য সাধন করে, দেখে মনে মনে তারিফ করি। কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে সেটা দেখে আমি সব চেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছি। শুধু যদি একটা ভীষণ ভাঙচুরের কাণ্ড হত তাতে তেমন আশ্চর্য হতুম না— কেননা নাস্তানাবুদ করবার শক্তি এদের যথেষ্ট আছে— কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। দেরি সইছে না; কেননা জগৎ জুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী— যত শীঘ্র পারে এদের খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে— হাতে হাতে প্রমাণ করে দিতে হবে, এরা যেটা চাচ্ছে সেটা ভুল নয়, ফাঁকি নয়। হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ-পনেরো বছর জিতবে বলে পণ করেছে। অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্ধর্ষ।

এই-যে বিপ্লবটা ঘটল এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেক কাল থেকে অপেক্ষা

করছিল। আয়োজন কত দিন থেকেই চলছে। খ্যাত-অখ্যাত কত লোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েছে, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেছে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্তু এক-একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে উঠলেও এক-একটা দুর্বল জায়গায় ফোড়া হয়ে লাল হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকারসাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।

একদিন ফরাসী-বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন সেখানকার পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডি পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু টিঁকল না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে। এ বাণী চিরদিন টিঁকবে কি না কেউ বলতে পারে না। কিন্তু স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত, এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।

এই যুগে বিশ্ব-ইতিহাসের রঙ্গভূমির পর্দা উঠে গেছে। এতকাল যেন আড়ালে আড়ালে রিহার্স্যাল চলছিল, টুকরো টুকরো ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন কামরায়। প্রত্যেক দেশের চারি দিকে বেড়া ছিল। বাহির থেকে আনাগোনা করবার পথ একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু বিভাগের মধ্যে মানবসংসারের যে চেহারা দেখেছি আজ তা দেখি নে। সেদিন দেখা যাচ্ছিল একটি-একটি গাছ, আজ দেখছি অরণ্য। মানবসমাজের মধ্যে যদি ভারসামঞ্জস্যের অভাব ঘটে থাকে সেটা আজ দেখা দিচ্ছে পৃথিবীর এক দিক থেকে আর-এক দিক পর্যন্ত। এমন বিরাট করে দেখতে পাওয়া কম কথা নয়।

টোকিয়োতে যখন কোরীয় যুবককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম "তোমাদের দুঃখটা কী" সে বললে, "আমাদের কাঁধে চেপেছে মহাজনের রাজত্ব, আমরা তাদের মুনফার বাহন।" আমি প্রশ্ন করলুম, যে কারণেই হোক, "তোমরা যখন দুর্বল তখন এই বোঝা নিজের জোরে ঝেড়ে ফেলবে কী উপায়ে।" সে বললে, নিরুপায়ের দল আজ পৃথিবী জুড়ে, দুঃখে তাদের মেলাবে— যারা ধনী, যারা শক্তিমান, তারা নিজের নিজের লোহার সিন্দুক ও সিংহাসনের চার দিকে পৃথক হয়ে থাকবে, তারা কখনো মিলতে পারবে না। কোরিয়ার জোর হচ্ছে তার দুঃখের জোর।[1]

[1] দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট : কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত

দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে, এইটে মস্ত কথা। আগেকার দিনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে বলেই কোনোমতে নিজের শক্তিরূপ দেখতে পায় নি— অদৃষ্টের উপর ভর করে সব সহ্য করেছে। আজ অত্যন্ত নিরুপায়ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারছে যে রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা নড়ে উঠেছে।

যারা শক্তিমান তারা উদ্ধত। দুঃখীদের মধ্যে আজ যে শক্তির প্রেরণা সঞ্চারিত হয়ে তাদের অস্থির করে তুলেছে তাকে বলশালীরা বাইরে থেকে ঠেকাবার চেষ্টা করছে— তার দূতদের ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না, তাদের কণ্ঠ দিচ্ছে রুদ্ধ করে। কিন্তু আসল যাকে সব চেয়ে ওদের ভয় করা উচিত ছিল সে হচ্ছে দুঃখীর দুঃখ— কিন্তু তাকেই এরা চিরকাল সব চেয়ে অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত। নিজের মুনফার খাতিরে সেই দুঃখকে এরা বাড়িয়ে চলতে ভয় পায় না, হতভাগ্য চাষীকে দুর্ভিক্ষের কবলের মধ্যে ঠেসে ধরে শতকরা দু-শো তিন-শো হারে মুনফা ভোগ করতে এদের হৃৎকম্প হয় না। কেননা সেই মুনফাকেই এরা শক্তি বলে জানে। কিন্তু মানুষের সমাজে সমস্ত আতিশয্যের মধ্যেই বিপদ, সে বিপদকে কখনোই বাইরে থেকে ঠেকানো যায় না। অতিশয় শক্তি অতিশয় অশক্তির বিরুদ্ধে চিরদিন নিজেকে বাড়িয়ে চলতেই পারে না। ক্ষমতাশালী যদি আপন শক্তিমদে উন্মত্ত হয়ে না থাকত তা হলে সব চেয়ে ভয় করত এই অসাম্যের বাড়াবাড়িকে— কারণ অসামঞ্জস্য মাত্রই বিশ্ববিধির বিরুদ্ধে।

মস্কৌ থেকে যখন নিমন্ত্রণ এল তখনো বলশেভিকদের সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তাদের সম্বন্ধে ক্রমাগতই উলটো উলটো কথা শুনেছি। আমার মনে তাদের বিরুদ্ধে একটা খটকা ছিল। কেননা গোড়ায় ওদের সাধনা ছিল জবরদস্তির সাধনা। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখলুম, ওদের প্রতি বিরুদ্ধতা য়ুরোপে যেন অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আমি রাশিয়াতে আসছি শুনে অনেক লোকেই আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। এমন-কি, অনেক ইংরেজের মুখেও ওদের প্রশংসা শুনেছি। অনেকে বলেছে, ওরা অতি আশ্চর্য একটা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত।

আবার অনেকে আমাকে ভয় দেখিয়েছে; কিন্তু প্রধান ভয়ের বিষয়, আরামের অভাব; বলেছে, আহারাদি সমস্তই এমন মোটারকম যে আমি তা সহ্য করতে পারব না। তা ছাড়া এমন কথাও অনেকে বলেছে, আমাকে যা এরা দেখাবে তার অধিকাংশই বানানো। এ কথা মানতেই হবে, আমার বয়সে আমার মতো শরীর নিয়ে রাশিয়ায় ভ্রমণ দুঃসাহসিকতা। কিন্তু পৃথিবীতে যেখানে সব চেয়ে বড়ো

রবীন্দ্রচিত্রপ্রদর্শনীতে কবির আগমন

পায়োনিয়র্‌স্ কম্যুনে আলাপ-আলোচনা

পায়োনিয়র ছাত্রছাত্রীগণকর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা

ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হত।

তা ছাড়া আমার কানে সেই কোরীয় যুবকের কথাটা বাজছিল। মনে মনে ভাবছিলুম, ধনশক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে ওই রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তিসাধনার আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এটা দেখবার জন্যে আমি যাব না তো কে যাবে। ওরা শক্তিশালীর শক্তিকে, ধনশালীর ধনকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায়, তাতে আমরা ভয় করব কিসের, রাগই করব বা কেন। আমাদের শক্তিই বা কী, ধনই বা কত। আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের দলের।

যদি কেউ বলে, দুর্বলের শক্তিকে উদ্‌বোধিত করবার জন্যেই তারা পণ করেছে, তা হলে আমরা কোন্ মুখে বলব যে, তোমাদের ছায়া মাড়াতে নেই। তারা হয়তো ভুল করতে পারে— তাদের প্রতিপক্ষেরাও যে ভুল করছে না তা নয়। কিন্তু আমাদের বলবার আজ সময় এসেছে যে, অশক্তের শক্তি এখনই যদি না জাগে তা হলে মানুষের পরিত্রাণ নেই, কারণ শক্তিমানের শক্তিশেল অতিমাত্র প্রবল হয়ে উঠেছে— এতদিন ভূলোক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, আজ আকাশকে পর্যন্ত পাপে কলুষিত করে তুললে; নিরুপায় আজ অতিমাত্র নিরুপায়— সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আজ কেবল মানবসমাজের এক পাশে পুঞ্জীভূত, অন্য পাশে নিঃসহায়তা অন্তহীন।

এরই কিছুদিন পূর্বে থেকে ঢাকার অত্যাচারের কাহিনী আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। কী সব অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, অথচ ইংলণ্ডের খবরের কাগজে তার খবর নেই—এখানকার মোটরগাড়ির দুর্যোগে দুটো-একটা মানুষ ম'লে তার খবর এ দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের ধন প্রাণ মান কী অসম্ভব সস্তা হয়ে গেছে। যারা এত সস্তা তাদের সম্বন্ধে কখনো সুবিচার হতেই পারে না।

আমাদের নালিশ পৃথিবীর কানে ওঠবার জো নেই, সমস্ত রাস্তা বন্ধ। অথচ আমাদের বিরুদ্ধ বচন জগতে ব্যাপ্ত করবার সকলপ্রকার উপায় এদের হাতে। আজকের দিনে দুর্বল জাতির পক্ষে এও একটি প্রবলতম গ্লানির বিষয়। কেননা আজকের দিনের জনশ্রুতি সমস্ত জগতের কাছে ঘোষিত হয়, বাক্যচালনার যন্ত্রগুলো যে-সব শক্তিমান জাতির হাতে তারা অখ্যাতির এবং অপযশের আড়ালে অশক্তজাতীয়দের বিলুপ্ত করে রাখতে পারে। পৃথিবীর লোকের কাছে এ কথা প্রচারিত যে, আমরা হিন্দু মুসলমানে কাটাকাটি মারামারি করি, অতএব ইত্যাদি। কিন্তু য়ুরোপেও একদা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে

কাটাকাটি মারামারি চলত— গেল কী উপায়ে। কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা। আমাদের দেশেও সেই উপায়েই যেত। কিন্তু শতাধিক বৎসরের ইংরেজ-শাসনের পরে দেশে শতকরা পাঁচজনের কপালে শিক্ষা জুটেছে, সে শিক্ষাও শিক্ষার বিড়ম্বনা।

অবজ্ঞার কারণকে দূর করবার চেষ্টা না করে লোকের কাছে প্রমাণ করা যে, আমরা অবজ্ঞার যোগ্য, এইটে হচ্ছে আমাদের অশক্তির সব চেয়ে বড়ো ট্যাক্‌সো। মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের মূলে হচ্ছে তার সুশিক্ষা। আমাদের দেশে তার রাস্তা বন্ধ, কারণ 'ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার' আর কোনো উপকারের জন্যে জায়গা রাখলে না, তহবিল একেবারে ফাঁকা। আমি দেশের কাজের মধ্যে একটি কাজকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলুম; জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা দেবার শিক্ষা দেব বলে এতকাল ধরে আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়েছি। এজন্যে কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যও আমি প্রত্যাখ্যান করতে চাই নি, প্রত্যাশাও করেছি, কিন্তু তুমি জান কতটা ফল পেয়েছি। বুঝতে পেরেছি, হবার নয়। মস্ত আমাদের পাপ, আমরা অশক্ত।

তাই যখন শুনলুম, রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূত-পরিমাণে বেড়ে গেছে, তখন মনে মনে ঠিক করলুম, ভাঙা শরীর আরো যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে, অশক্তকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা— অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই 'পরে নির্ভর করে। ফাঁকা 'ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার' নিয়ে না ভরে পেট, না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে গিয়ে সর্বস্ব বিকিয়ে গেল।

আধুনিক ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় আমি মানুষ, তাই এতকাল আমার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, প্রায় তেত্রিশ কোটি মূর্খকে বিদ্যাদান করা অসম্ভব বললেই হয়; এজন্য আমাদের মন্দ ভাগ্য ছাড়া আর কাউকে বুঝি দোষ দেওয়া চলে না। যখন শুনেছিলুম, এখানে চাষী ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হুহু করে এগিয়ে চলেছে আমি ভেবেছিলুম, সে শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ক কষা— কেবলমাত্র মাথা-গুনতিতেই তার গৌরব। সেও কম কথা নয়। আমাদের দেশে তাই হলেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যেতুম। কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্থ করে এম. এ. পাস করবার মতন নয়।

কিন্তু এ-সব কথা আর-একটু বিস্তারিত করে পরে লিখব, আজ আর সময় নেই। আজই সন্ধ্যাবেলায় বর্লিন অভিমুখে যাত্রা করব। তার পরে ৩রা অক্টোবর আটলান্টিক পাড়ি দেব— কত দিনের মেয়াদ আজও নিশ্চিত করে বলতে পারছি নে।

কিন্তু, শরীর মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। তবু এবারকার সুযোগ ছাড়তে সাহস হয় না— যদি কিছু কুড়িয়ে আনতে পারি তা হলেই বাকি যে-ক'টা দিন বাঁচি বিশ্রাম করতে

পারব। নইলে দিনে দিনে মূলধন খুইয়ে দিয়ে অবশেষে বাতি নিবিয়ে দিয়ে বিদায় নেওয়া সেও মন্দ প্ল্যান নয়; সামান্য কিছু উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে রেখে গেলে জিনিসটা নোংরা হয়ে উঠবে। সম্বল যতই কমে আসতে থাকে মানুষের আন্তরিক দুর্বলতা ততই ধরা পড়ে— ততই শৈথিল্য, ঝগড়াঝাঁটি, পরস্পরের বিরুদ্ধে কানাকানি। ঔদার্য ভরা উদরের উপরে অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু যেখানেই যথার্থ সিদ্ধির একটি চেহারা দেখতে পাই সেখানেই দেখা যায় সেটা কেবলমাত্র টাকা দিয়ে হাটে কেনবার নয়— দারিদ্র্যের জমিতেই সে সোনার ফসল ফলায়। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় যে অক্লান্ত উদ্যম, সাহস, বুদ্ধিশক্তি, যে আত্মোৎসর্গ দেখলুম, তার অতি অল্প পরিমাণ থাকলেও কৃতার্থ হতুম। আন্তরিক শক্তি ও অকৃত্রিম উৎসাহ যত কম থাকে টাকা খুঁজতে হয় ততই বেশি করে। ইতি ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

৪

মস্কৌ থাকতে সোভিয়েট ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুটো বড়ো বড়ো চিঠি লিখেছিলুম। সে চিঠি কবে পাবে এবং পাবে কি না কী জানি।

বর্লিনে এসে একসঙ্গে তোমার দুখানা চিঠি পাওয়া গেল। ঘন বর্ষার চিঠি, শান্তিনিকেতনের আকাশে শালবনের উপরে মেঘের ছায়া এবং জলের ধারায় শ্রাবণ ঘনিয়ে উঠেছে, সেই ছবি মনে জাগলে আমার চিত্ত কি রকম উৎসুক হয়ে ওঠে সে তোমাকে বলা বাহুল্য।

কিন্তু এবারে রাশিয়া ঘুরে এসে সেই সৌন্দর্যের ছবি আমার মন থেকে মুছে গেছে। কেবলই ভাবছি আমাদের দেশ-জোড়া চাষীদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট-পরিচয় হয়েছে। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশোনা— ওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে। আমি জানি, ওদের মতো নিঃসহায় জীব অল্পই আছে, ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছয়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়।

তখনকার দিনে দেশের পলিটিক্স্‌ নিয়ে যাঁরা আসর জমিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যাঁরা পল্লীবাসীকে এ দেশের লোক বলে অনুভব করতেন। আমার মনে আছে পাবনা কন্‌ফারেন্সের সময় আমি তখনকার খুব বড়ো একজন রাষ্ট্রনেতাকে বলেছিলুম, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই তা হলে সব-

আগে আমাদের এই তলার লোকদের মানুষ করতে হবে। তিনি সে কথাটাকে এতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলেন যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না। এইরকম মনোবৃত্তির সুবিধে হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশ আছে বিদেশীর হাতে এই কথা নিয়ে আক্ষেপ করা, উত্তেজিত হওয়া, কবিতা লেখা, খবরের কাগজ চালানো সহজ; কিন্তু দেশের লোক আমাদের আপন লোক, এ কথা বলবামাত্র তার দায়িত্ব তখন থেকেই স্বীকার করে নিতে হয়, কাজ শুরু হয় সেই মুহূর্তে।

সেদিনকার পরেও অনেক দিন চলে গেল। সেই পাবনা কন্‌ফারেন্সে পল্লী সম্বন্ধে যা বলেছিলুম তার প্রতিধ্বনি অনেকবার শুনেছি— শুধু শব্দ নয়, পল্লীর হিতকল্পে অর্থও সংগ্রহ হয়েছে, কিন্তু দেশের যে উপরিতলায় শব্দের আবৃত্তি হয় সেইখানটাতেই সেই অর্থও আবর্তিত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে, সমাজের যে গভীরতলায় পল্লী তলিয়ে আছে সেখানে তার কিছুই পৌঁছল না।

একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচর্চা করেছিলুম। মনে ধারণা ছিল, লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজের আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন এ কথা কাউকে বলে কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্যে কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হল— আচ্ছা, আমিই এ কাজে লাগব। এই সংকল্পে আমার সহায়তা করবার জন্যে সেদিন একটিমাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্ছে কালীমোহন। শরীর তার রোগে জীর্ণ, দু-বেলা তার জ্বর আসে, তার উপরে পুলিসের খাতায় তার নাম উঠেছে।

তার পর থেকে দুর্গম বন্ধুর পথে সামান্য পাথেয় নিয়ে চলেছে সেই ইতিহাস। চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে— জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি-অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।

কিন্তু এই দুটো পন্থাই দুরূহ। প্রথমত চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বই কমবে না। কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা করে-

ছিলুম। শিলাইদহে আমি যে বাড়িতে থাকতুম তার বারান্দা থেকে দেখা যায়, খেতের পর খেত নিরন্তর চলে গেছে দিগন্ত পেরিয়ে। ভোরবেলা থেকে হাল লাঙল এবং গোরু নিয়ে একটি-একটি করে চাষী আসে, আপন টুকরো খেতটুকু ঘুরে ঘুরে চাষ করে চলে যায়। এইরকম ভাগ-করা শক্তির যে কতটা অপচয় ঘটে প্রতিদিন সে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। চাষীদের ডেকে যখন সমস্ত জমি একত্র করে কলের লাঙলে চাষ করার সুবিধের কথা বুঝিয়ে বললুম, তারা তখনই সমস্ত মেনে নিলে। কিন্তু, বললে, আমরা নির্বোধ, এতবড়ো ব্যাপার করে তুলতে পারব কী করে। আমি যদি বলতে পারতুম, এ ভার আমিই নেব, তা হলে তখনই মিটে যেতে পারত। কিন্তু আমার সাধ্য কী! এমন কাজের চালনাভার নেবার দায়িত্ব আমার পক্ষে অসম্ভব; সে শিক্ষা, সে শক্তি আমার নেই।

কিন্তু এই কথাটা বরাবর আমার মনে জেগে ছিল। যখন বোলপুরের কো-অপারেটিভের ব্যবস্থা বিশ্বভারতীর হাতে এল তখন আবার একদিন আশা হয়েছিল, এইবার বুঝি সুযোগ হতে পারবে। যাদের হাতে আপিসের ভার তাদের বয়স অল্প, আমার চেয়ে তাদের হিসাবী বুদ্ধি এবং শিক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু আমাদের যুবকেরা ইস্কুলে-পড়া ছেলে, তাদের বই মুখস্থ করার মন। যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে করে আমাদের চিন্তা করার সাহস, কর্ম করবার দক্ষতা থাকে না, পুঁথির বুলি পুনরাবৃত্তি করার 'পরেই ছাত্রদের পরিত্রাণ নির্ভর করে।

বুদ্ধির এই পল্লবগ্রাহিতা ছাড়া আমাদের আর-একটা বিপদ ঘটে। ইস্কুলে যারা পড়া মুখস্থ করেছে আর ইস্কুলের বাইরে পড়ে থেকে যারা পড়া মুখস্থ করে নি, তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ঘটে গেছে— শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত। ইস্কুলে-পড়া মনের আত্মীয়তাবোধ পুঁথি-পোড়োদের পাড়ার বাইরে পৌঁছতে পারে না। যাদের আমরা বলি চাষাভুষো, পুঁথির পাতার পর্দা ভেদ করে তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পৌঁছয় না, তারা আমাদের কাছে অস্পষ্ট। এইজন্যেই ওরা আমাদের সকল প্রচেষ্টা থেকে স্বভাবতই বাদ পড়ে যায়। তাই কো-অপারেটিভের যোগে অন্য দেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় না। কেননা ধার দেওয়া, তার সুদ কষা এবং দেনার টাকা আদায় করা অত্যন্ত ভীরু মনের পক্ষেও সহজ কাজ, এমন-কি ভীরু মনের পক্ষেই সহজ, তাতে যদি নামতার ভুল না ঘটে তা হলে কোনো বিপদ নেই।

বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদ-বোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েছে; কিন্তু এই অভাবের জন্যে

কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা কেরানি-তৈরির কারখানা বসাবার জন্যেই একদা আমাদের দেশে বণিক-রাজত্বে ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল। ডেস্ক্-লোকে মনিবের সঙ্গে সাযুজ্যলাভই আমাদের সদ্গতি। সেইজন্যে উমেদারিতে অকৃতার্থ হলেই আমাদের বিদ্যাশিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। এইজন্যেই আমাদের দেশে প্রধানত দেশের কাজ কংগ্রেসের পান্ডালে এবং খবরের কাগজের প্রবন্ধশালায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদনা উদ্‌ঘোষণের মধ্যেই পাক খাচ্ছিল। আমাদের কলমে-বাঁধা হাত দেশকে গড়ে তোলবার কাজে এগোতেই পারলে না।

ঐ দেশের হাওয়াতেই আমিও তো মানুষ, সেইজন্যেই জোরের সঙ্গে মনে করতে সাহস হয় নি যে, বহু কোটি জনসাধারণের বুকের উপর থেকে অশিক্ষা ও অসামর্থ্যের জগদ্দল পাথর ঠেলে নামানো সম্ভব। অল্পস্বল্প কিছু করতে পারা যায় কি না এতদিন এই কথাই ভেবেছি। মনে করেছিলুম, সমাজের একটা চিরবাধাগ্রস্ত তলা আছে, সেখানে কোনোকালেই সূর্যের আলো সম্পূর্ণ প্রবেশ করানো চলবে না, সেইজন্যেই সেখানে অন্তত তেলের বাতি জ্বালাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগা উচিত। কিন্তু সাধারণত সেটুকু কর্তব্যবোধও লোকের মনে যথেষ্ট জোরের সঙ্গে ধাক্কা মারতে চায় না; কারণ যাদের আমরা অন্ধকারে দেখতেই পাই নে তাদের জন্যে যে কিছুই করা যেতে পারে এ কথা স্পষ্ট করে মনে আসে না।

এইরকম স্বল্পসাহস মন নিয়েই রাশিয়াতে এসেছিলুম; শুনেছিলুম, এখানে চাষী ও কর্মিকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পরিমাণ অনেক বেড়ে চলেছে। ভেবেছিলুম, তার মানে ওখানে পল্লীর পাঠশালায় শিশুশিক্ষা প্রথমভাগ, বড়োজোর দ্বিতীয়ভাগ পড়ানোর কাজ সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশি হয়েছে। ভেবেছিলুম, ওদের সাংখ্যিক তালিকা নেড়েচেড়ে দেখতে পাব ওদের কজন চাষী নাম সই করতে পারে আর কজন চাষীর নামতা দশের কোঠা পর্যন্ত এগিয়েছে।

মনে রেখো, এখানে যে বিপ্লবে জারের শাসন লয় পেলে সেটা ঘটেছে ১৯১৭ খৃস্টাব্দে। অর্থাৎ তেরো বছর পার হল মাত্র। ইতিমধ্যে ঘরে বাইরে এদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চলতে হয়েছে। এরা একা, অত্যন্ত ভাঙাচোরা একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার বোঝা নিয়ে। পথ পূর্বতন দুঃশাসনের প্রভূত আবর্জনায় দুর্গম। যে আত্মবিপ্লবের প্রবল ঝড়ের মুখে এরা নবযুগের ঘাটে পাড়ি দিলে সেই বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য সহায় ছিল ইংলণ্ড্ এবং আমেরিকা। অর্থসম্বল এদের সামান্য; বিদেশের মহাজনী গদিতে এদের ক্রেডিট্ নেই। দেশের মধ্যে কলকারখানা এদের যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে অর্থ-উৎপাদনে এরা শক্তিহীন। এইজন্যে কোনোমতে পেটের ভাত বিক্রি

করে চলছে এদের উদ্যোগপর্ব। অথচ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকলের চেয়ে যে অনুৎপাদক বিভাগ— সৈনিক-বিভাগ— তাকে সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের পক্ষে অনিবার্য। কেননা আধুনিক মহাজনী যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এদের শত্রুপক্ষ এবং তারা সকলেই আপন আপন অস্ত্রশালা কানায় কানায় ভরে তুলেছে।

মনে আছে, এরাই 'লীগ অব নেশন্‌স্‌'এ অস্ত্রবর্জনের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়ে কপট শান্তিকামীদের মনে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। কেননা নিজেদের প্রতাপ-বর্ধন বা রক্ষণ সোভিয়েটদের লক্ষ্য নয়— এদের সাধনা হচ্ছে জনসাধারণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নসম্বলের উপায়-উপকরণকে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে ব্যাপক করে গড়ে তোলা, এদেরই পক্ষে নিরুপদ্রব শান্তির দরকার সব চেয়ে বেশি। কিন্তু তুমি তো জান, 'লীগ অব নেশন্‌স্‌'এর সমস্ত পালোয়ানই গুণ্ডাগিরির বহুবিস্তৃত উদ্যোগ কিছুতেই বন্ধ করতে চায় না, কিন্তু 'শান্তি চাই' বলে সকলে মিলে হাঁক পাড়ে। এইজন্যেই সকল সাম্রাজ্যিক দেশেই অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবনের চাষ অন্নের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে আবার কিছুকাল ধরে রাশিয়ায় অতি ভীষণ দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল ; কত লোক মরেছে তার ঠিক নেই। তার ধাক্কা কাটিয়ে সবেমাত্র আট বছর এরা নূতন যুগকে গড়ে তোলবার কাজে লাগতে পেরেছে, বাইরের উপকরণের অভাব সত্ত্বেও।

কাজ সামান্য নয়— য়ুরোপ-এশিয়া জুড়ে প্রকাণ্ড এদের রাষ্ট্রক্ষেত্র। প্রজামণ্ডলীর মধ্যে যত বিভিন্ন জাতের মানুষ আছে ভারতবর্ষেও এত নেই। তাদের ভূপ্রকৃতি মানবপ্রকৃতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য অনেক বেশি। বস্তুত এদের সমস্যা বহুবিচিত্র-জাতি-সমাকীর্ণ, বহুবিচিত্র-অবস্থা-সংকুল বিশ্বপৃথিবীর সমস্যারই সংক্ষিপ্ত রূপ।

তোমাকে পূর্বেই বলেছি, বাহির থেকে মস্কৌ শহরে যখন চোখ পড়ল দেখলুম, য়ুরোপের অন্য সমস্ত ধনী শহরের তুলনায় অত্যন্ত মলিন। রাস্তায় যারা চলেছে তারা একজনও শৌখিন নয়, সমস্ত শহর আটপৌরে-কাপড়-পরা। আটপৌরে কাপড়ে শ্রেণীভেদ থাকে না, শ্রেণীভেদ পোষাকী কাপড়ে। এখানে সাজে পরিচ্ছদে সবাই এক। সবটা মিলেই শ্রমিকদের পাড়া ; যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেখানেই ওরা। এখানে শ্রমিকদের কৃষাণদের কি রকম বদল হয়েছে তা দেখবার জন্যে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই খুলতে অথবা গাঁয়ে কিম্বা বস্তিতে গিয়ে নোট নিতে হয় না। যাদের আমরা 'ভদ্দর লোক' বলে থাকি তারা কোথায় সেইটেই জিজ্ঞাস্য।

এখানকার জনসাধারণ ভদ্রলোকের আওতায় একটুও ছায়া ঢাকা পড়ে নেই, যারা

যুগে যুগে নেপথ্যে ছিল তারা আজ সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। এরা যে প্রথমভাগ শিশুশিক্ষা পড়ে কেবলমাত্র ছাপার অক্ষর হাৎড়ে বেড়াতে শিখেছে, এ ভুল ভাঙতে একটুও দেরি হল না। এরা মানুষ হয়ে উঠেছে এই ক'টা বছরেই।

নিজের দেশের চাষীদের মজুরদের কথা মনে পড়ল। মনে হল, আরব্য উপন্যাসের জাদুকরের কীর্তি। বছর দশেক আগেই এরা ঠিক আমাদেরই দেশের জন-মজুরদের মতোই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল, তাদেরই মতো অন্ধসংস্কার এবং মূঢ় ধার্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েছে ; পরলোকের ভয়ে পাণ্ডাপুরুতদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারের হাতে ; যারা এদের জুতো-পেটা করত তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল। হাজার বছর থেকে এদের প্রথাপদ্ধতির বদল হয় নি ; যান-বাহন চরকা-ঘানি সমস্ত প্রপিতামহের আমলের, হালের হাতিয়ারে হাত লাগাতে বললে বেঁকে বসত। আমাদের দেশের ত্রিশ কোটির পিঠের উপরে যেমন চেপে বসেছে ভূতকালের ভূত, চেপে ধরেছে তাদের দুই চোখ— এদেরও ঠিক তেমনিই ছিল। ক'টা বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার অক্ষমতার অভ্রভেদী পাহাড় নড়িয়ে দিলে যে কী করে, সে কথা এই হতভাগ্য ভারতবাসীকে যেমন একান্ত বিস্মিত করেছে এমন আর কাকে করবে বলো। অথচ যে সময়ের মধ্যে এই পরিবর্তন চলছিল সে সময়ে এ দেশে আমাদের দেশের বহুপ্রশংসিত 'ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার' ছিল না।

তোমাকে পূর্বেই বলেছি, এদের জনসাধারণের শিক্ষার চেহারা দেখবার জন্যে আমাকে দূরে যেতে হয় নি, কিম্বা স্কুলের ইন্‌স্‌পেক্টরের মতো এদের বানান তদন্ত করবার সময় দেখতে হয় নি 'কান'এ 'সোনা'য় এরা মূর্ধন্য ণ লাগায় কি না। একদিন সন্ধ্যাবেলা মস্কো শহরে একটা বাড়িতে গিয়েছিলুম, সেটা চাষীদের বাসা, গ্রাম থেকে কোনো উপলক্ষে যখন তারা শহরে আসে তখন সস্তায় ঐ বাড়িতে কিছু দিনের মতো থাকতে পায়। তাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। সে-রকম কথাবার্তা যখন আমাদের দেশের চাষীদের সঙ্গে হবে সেইদিন সাইমন কমিশনের জবাব দিতে পারব।

আর কিছু নয়, এটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, সবই হতে পারত কিন্তু হয় নি— না হোক, আমরা পেয়েছি 'ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার'। আমাদের ওখানে সাম্প্রদায়িক লড়াই ঘটে বলে একটা অখ্যাতি বিশেষ ঝোঁক দিয়ে রটনা হয়ে থাকে— এখানেও য়িহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে খৃস্টান সম্প্রদায়ের লড়াই আমাদের দেশেরই আধুনিক উপসর্গের মতো অতিকুৎসিত অতিবর্বর ভাবেই ঘটত— শিক্ষায় এবং শাসনে একেবারে তার মূল উৎপাটিত হয়েছে।

কতবার আমি ভেবেছি, আমাদের দেশে সাইমন কমিশন যাবার আগে একবার রাশিয়ায় তার ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল।

তোমার মতো ভদ্রমহিলাকে সাধারণ ভদ্রগোছের চিঠি না লিখে এরকম চিঠি যে কেন লিখলুম তার কারণ চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, দেশের দশা আমার মনের মধ্যে কি রকম তোলপাড় করছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের উপদ্রবের পর একবার আমার মনে এই রকম অশান্তি জেগেছিল। এবার ঢাকার উপদ্রবের পর আবার সেইরকম দুঃখ পাচ্ছি। সে ঘটনার উপর সরকারী চুনকামের কাজ হয়েছে, কিন্তু এরকম সরকারী চুনকামের যে কী মূল্য তা রাষ্ট্রনীতিবিৎ সবাই জানে। এই রকম ঘটনা যদি সোভিয়েট রাশিয়ায় ঘটত তা হলে কোনো চুনকামেই তার কলঙ্ক ঢাকা পড়ত না। সুধীন্দ্র, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যার কোনো শ্রদ্ধা কোনোদিন ছিল না, সেও এবারে আমাকে এমন চিঠি লিখেছে যাতে বোঝা যাচ্ছে সরকারী ধর্মনীতির প্রতি ধিক্‌কার আজ আমাদের দেশে কতদূর পর্যন্ত পৌঁচেছে। যা হোক, তোমার চিঠি অসমাপ্ত রইল —কাগজ এবং সময় ফুরিয়ে এসেছে, পরের চিঠিতে এ চিঠির অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করব। ইতি ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

৫

বর্লিন

মস্কৌ থেকে তোমাকে একটা বড়ো চিঠিতে রাশিয়া সম্বন্ধে আমার ধারণা লিখেছিলুম। সে চিঠি যদি পাও তো রাশিয়া সম্বন্ধে কিছু খবর পাবে।

এখানে চাষীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কতটা কাজ করা হচ্ছে তারই বিবরণ কিছু দিয়েছি। আমাদের দেশে যে শ্রেণীর লোক মূক মূঢ়, জীবনের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাদের মন অন্তর-বাহিরের দৈন্যের তলায় চাপা পড়ে গেছে, এখানে সেই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হল তখন বুঝতে পারলুম, সমাজের অনাদরে মানুষের চিত্তসম্পদ কত প্রভূতপরিমাণে অবলুপ্ত হয়ে থাকে— কী অসীম তার অপব্যয়, কী নিষ্ঠুর তার অবিচার।

মস্কৌতে একটি কৃষিভবন দেখতে গিয়েছিলুম ; এটা ওদের ক্লাবের মতো। রাশিয়ার সমস্ত ছোটোবড়ো শহরে এবং গ্রামে এরকম আবাস ছড়ানো আছে। এ-সব জায়গায় কৃষিবিদ্যা সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে ; যারা নিরক্ষর তাদের পড়াশুনো শেখানোর উপায় করেছে ; এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক রীতিতে

চাষ করার ব্যবস্থা কৃষাণদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এইরকম প্রত্যেক বাড়িতে প্রাকৃতিক সামাজিক সকলপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয়ে ম্যুজিয়ম, তা ছাড়া চাষীদের সকলপ্রকার প্রয়োজনের উপযোগী পরামর্শ দেবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

চাষীরা কোনো উপলক্ষে গ্রাম থেকে যখন শহরে আসে তখন খুব কম খরচে অন্তত তিন সপ্তাহ এইরকম বাড়িতে থাকতে পারে। এই বহুব্যাপক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সোভিয়েট গবর্মেন্ট এককালে নিরক্ষর চাষীদের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করে সমাজব্যাপী নবজীবন প্রতিষ্ঠার প্রশস্ততম ভিত্তি স্থাপন করেছে।

বাড়িতে ঢুকে দেখি, খাবার ঘরে কেউ কেউ বসে খাচ্ছে, পড়বার ঘরে এক দল খবরের কাগজ পড়তে প্রবৃত্ত। উপরে একটা বড়ো ঘরে আমি এসে বসলুম; সেখানে সবাই এসে জমা হল। তারা নানা স্থানের লোক, কেউ বা অনেক দূর প্রদেশ থেকে এসেছে। বেশ সহজ ওদের ভাবগতিক, কোনোরকম সংকোচ নেই।

প্রথম অভ্যর্থনা ও পরিচয় উপলক্ষে বাড়ির পরিদর্শক কিছু বললে, আমিও কিছু বললুম। তার পরে ওরা আমাকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলে।

প্রথমেই ওদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হয় কেন।

উত্তর দিলুম, "যখন আমার বয়স অল্প ছিল কখনো এরকম বর্বরতা দেখি নি। তখন গ্রামে ও শহরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের অভাব ছিল না। পরস্পরের ক্রিয়াকাণ্ডে পরস্পরের যোগ ছিল, জীবনযাত্রায় সুখে দুঃখে তারা ছিল এক। এ-সব কুৎসিত কাণ্ড দেখতে পাচ্ছি যখন থেকে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশীদের মধ্যে এইরকম অমানুষিক দুর্ব্যবহারের আশু কারণ যাই হোক, এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষা। যে পরিমাণ শিক্ষার দ্বারা এইরকম দুর্বুদ্ধি দূর হয় আমাদের দেশে বিস্তৃত ভাবে তার প্রচলন করা আজ পর্যন্ত হয় নি। যা তোমাদের দেশে দেখলুম তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি।"

প্রশ্ন। তুমি তো লেখক, তোমাদের চাষীদের কথা কি কিছু লিখেছ। ভবিষ্যতে তাদের কী গতি হবে।

উত্তর। শুধু লেখা কেন, তাদের জন্য আমি কাজ ফেঁদেছি। আমার একলার সাধ্যে যতটুকু সম্ভব তাই দিয়ে তাদের শিক্ষার কাজ চালাই, পল্লীর উন্নতিসাধনে তাদের সাহায্য করি। কিন্তু তোমাদের এখানে যে প্রকাণ্ড শিক্ষাব্যাপার যে আশ্চর্য অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হয়েছে তার তুলনায় আমার এ উদ্যোগ অতি যৎসামান্য।

প্রশ্ন। আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রের একত্রীকরণের যে চেষ্টা চলছে সে সম্বন্ধে তোমার মত কী।

উত্তর। মত দেবার মতো আমার অভিজ্ঞতা হয় নি, তোমাদেরই কাছ থেকে শুনতে চাই। আমার জানবার কথা এই যে, এতে তোমাদের ইচ্ছার উপর জবরদস্তি করা হচ্ছে কি না।

প্রশ্ন। ভারতবর্ষে সবাই কি এই ঐকত্রিকতা এবং সাধারণভাবে এখানকার অন্য সমস্ত উদ্যোগের কথা কিছু জানে না।

উত্তর। জানবার মতো শিক্ষা অতি অল্প লোকেরই আছে। তা ছাড়া তোমাদের খবর নানা কারণে চাপা পড়ে যায়। এবং যা-কিছু শোনা যায় তাও সব বিশ্বাসযোগ্য নয়।

প্রশ্ন। আমাদের দেশে এই-যে চাষীদের জন্যে আবাস-ব্যবস্থা হয়েছে, এর অস্তিত্বও কি তুমি আগে জানতে না।

উত্তর। তোমাদের কল্যাণের জন্যে কী করা হচ্ছে মস্কৌয়ে এসে তা প্রথম দেখলুম এবং জানলুম। যাই হোক, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর তোমরা দাও। চাষী প্রজার পক্ষে এই ঐকত্রিকতার ফলাফল সম্বন্ধে তোমাদের মত কী, তোমাদের ইচ্ছা কী।

একজন যুবক চাষী য়ুক্রেন প্রদেশ থেকে এসেছে, সে বললে, "দু বছর হল একটি ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে, আমি তাতে কাজ করি। এই ক্ষেত্রের মধ্যে ফল-ফসলের বাগান আছে, তার থেকে আমরা সবজির জোগান দিই সব কারখানাঘরে। সেখানে সেগুলো টিনের কৌটোয় মোড়াই হয়। এ ছাড়া বড়ো বড়ো খেত আছে, সেখানে সব গমের চাষ। আট ঘণ্টা করে আমাদের খাটুনি, প্রত্যেক পঞ্চম দিনে আমাদের ছুটি। আমাদের প্রতিবেশী যে-সব চাষী নিজের খেত নিজে চষে তাদের চেয়ে আমাদের এখানে অন্তত দুনো ফল উৎপন্ন হয়।

"প্রায় গোড়াতেই আমাদের এই ঐকত্রিক চাষে দেড়-শো চাষীর খেত মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৯ সালে অর্ধেক চাষী তাদের খেত ফিরিয়ে নিলে। তার প্রধান কারণ, সোভিয়েট কম্যুন্ দলের প্রধান মন্ত্রী স্ট্যালিনের উপদেশ আমাদের কর্মচারীরা ঠিকমত ব্যবহার করে নি। তাঁর মতে, ঐকত্রিকতার মূলনীতি হচ্ছে সমাজবদ্ধ স্বেচ্ছাকৃত যোগ। কিন্তু অনেক জায়গায় আমলারা এই কথাটা মনে না রাখাতেই গোড়ার দিকে অনেক চাষী ঐকত্রিক কৃষিসমন্বয় ছেড়ে দিয়েছিল। তার পরে ক্রমে তাদের মধ্যেকার সিকি ভাগ লোক আবার ফিরে এসেছে। এখন আগেকার

চেয়ে আরো আমরা বল পেয়েছি। আমাদের দলের লোকের জন্যে নতুন সব বাসা, একটা নতুন ভোজনশালা, আর-একটা ইস্কুল তৈরি আরম্ভ হয়েছে।”

তার পরে সাইবীরিয়ার একজন চাষী স্ত্রীলোক বললে, “সমবেত খেতের কাজে আমি প্রায় দশ বছর আছি। একটা কথা মনে রেখো, ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে নারী-উন্নতি-প্রচেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। আজ দশ বছরের মধ্যে এখানে চাষী-মেয়েদের বদল হয়েছে যথেষ্ট। নিজের উপর তাদের অনেক বেশি ভরসা হয়েছে। যে-সব মেয়ে পিছিয়ে আছে, ঐকত্রিক চাষের যারা প্রধান বাধা, এরাই তাদের মন গড়ে তুলছে। আমরা মেয়ে-ঐকত্রিকের দল তৈরি করেছি; তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়ায়, মেয়েদের মধ্যে কাজ করে, চিত্তের এবং অর্থের উন্নতিসাধনে ঐকত্রিকতার সুযোগ কত তা ওদের বুঝিয়ে দেয়। ঐকত্রিক দলের চাষী-মেয়েদের জীবনযাত্রা সহজ করে দেবার জন্যে প্রত্যেক ঐকত্রিক ক্ষেত্রে একটি করে শিশুপালনাবাস, শিশুবিদ্যালয়, আর সাধারণ-পাকশালা স্থাপিত হয়েছে।”

সুখোজ প্রদেশে জাইগানট্ নামক একটি সুবিখ্যাত সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে। সেখানকার একজন চাষী রাশিয়ায় ঐকত্রিকতার কিরকম বিস্তার হচ্ছে সেই সম্বন্ধে আমাকে বললে, “আমাদের এই খেতে জমির পরিমাণ এক লক্ষ হেক্টার (hectares)। গত বছরে সেখানে তিন হাজার চাষী কাজ করত। এ বছরে সংখ্যা কিছু কমে গেছে, কিন্তু ফসলের ফলন আগেকার চেয়ে বাড়বার কথা। কেননা জমিতে বিজ্ঞানসম্মত সার দেবার এবং কলের লাঙল ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এইরকম লাঙল এখন আমাদের তিন-শো’র বেশি আছে। প্রতিদিন আমাদের আট ঘণ্টা কাজ করবার মেয়াদ। যারা তার বেশি কাজ করে তারা উপরি পারিশ্রমিক পায়। শীতের সময় খেতের কাজের পরিমাণ কমে; তখন চাষীরা বাড়ি-তৈরি রাস্তা-মেরামত প্রভৃতি নানা কাজে শহরে চলে যায়। এই অনুপস্থিতির সময়েও তারা বেতনের এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে আর তাদের পরিবারের লোক তাদের নির্দিষ্ট ঘরে বাস করতে পায়।”

আমি বললেম, “ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আপন স্বতন্ত্র সম্পত্তি মিলিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে তোমাদের আপত্তি কিম্বা সম্মতি যদি থাকে আমাকে স্পষ্ট করে বলো।”

পরিদর্শক প্রস্তাব করলে, হাত তুলে মত জানানো হোক। দেখা গেল, যাদের সম্মতি নেই এমন লোকও অনেক আছে। অসম্মতির কারণ তাদের বলতে বললুম; ভালো করে বলতে পারলে না। একজন বললে, “আমি ভালো বুঝতে পারি নে।” বেশ বোঝা গেল, অসম্মতির কারণ মানবচরিত্রের মধ্যে। নিজের সম্পত্তির প্রতি

নিজের মমতা, ওটা তর্কের বিষয় নয়, ওটা আমাদের সংস্কারগত। নিজেকে আমরা প্রকাশ করতে চাই, সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটা উপায়।

তার চেয়ে বড়ো উপায় যাদের হাতে আছে তারা মহৎ, তারা সম্পত্তিকে গ্রাহ্য করে না। সমস্ত খুইয়ে দিতে তাদের বাধা নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি তার আপন ব্যক্তিস্বরূপের ভাষা—সেটা হারালে সে যেন বোবা হয়ে যায়। সম্পত্তি যদি কেবল আপন জীবিকার জন্যে হত, আত্মপ্রকাশের জন্যে না হত, তা হলে যুক্তির দ্বারা বোঝানো সহজ হত যে, ওটা ত্যাগের দ্বারাই জীবিকার উন্নতি হতে পারে। আত্মপ্রকাশের উচ্চতন উপায়, যেমন বুদ্ধি, যেমন গুণপনা, কেউ কারো কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে পারে না; সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া চলে, ফাঁকি দেওয়া চলে। সেই কারণে সম্পত্তি-বিভাগ ও ভোগ নিয়ে সমাজে এত নিষ্ঠুরতা, এত ছলনা, এত অন্তহীন বিরোধ।

এর একটা মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করি নে; অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্‌বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তা হলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতায় প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না।

সোভিয়েটরা এই সমস্যাকে সমাধান করতে গিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সেজন্যে জবরদস্তির সীমা নেই। এ কথা বলা চলে না যে, মানুষের স্বাতন্ত্র্য থাকবে না; কিন্তু বলা চলে যে, স্বার্থপরতা থাকবে না। অর্থাৎ নিজের জন্যে কিছু নিজত্ব না হলে নয়, কিন্তু বাকি সমস্তই পরের জন্যে হওয়া চাই। আত্ম এবং পর উভয়কেই স্বীকার করে তবেই তার সমাধান সম্ভব। কোনো একটাকে বাদ দিতে গেলেই মানবচরিত্রের সত্যের সঙ্গে লড়াই বেধে যায়। পশ্চিম মহাদেশের মানুষ জোর জিনিসটাকে অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস করে। যে ক্ষেত্রে জোরের যথার্থ কাজ আছে সে ক্ষেত্রে সে খুবই ভালো, কিন্তু অন্যত্র সে বিপদ ঘটায়। সত্যের জোরকে গায়ের জোরের দ্বারা যত প্রবলভাবেই আমরা মেলাতে চেষ্টা করি একদা তত প্রবলভাবেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

মধ্য-এশিয়ার বাস্‌কির রিপাব্লিকের (Bashkir Republic) একজন চাষী বললে, "আজও আমার নিজের স্বতন্ত্র খেত আছে, কিন্তু নিকটবর্তী ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আমি শীঘ্রই যোগ দেব। কেননা, দেখছি, স্বাতন্ত্রিক প্রণালীর চেয়ে ঐকত্রিক প্রণালীতে ঢের ভালো জাতের এবং অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করানো যায়। যেহেতু প্রকৃষ্টভাবে

চাষ করতে গেলেই যন্ত্র চাই ; ছোটো খেতের মালিকের পক্ষে যন্ত্র কেনা চলে না। তা ছাড়া, আমাদের টুকরো জমিতে যন্ত্রের ব্যবহার অসম্ভব।"

আমি বললুম, "কাল একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বললেন, মেয়েদের এবং শিশুদের সর্বপ্রকার সুযোগের জন্য সোভিয়েট গবর্মেন্টের দ্বারা যেরকম সব ব্যবস্থা হয়েছে এরকম আর কোথাও হয় নি। আমি তাঁকে বললুম, তোমরা পারিবারিক দায়িত্বকে সরকারী দায়িত্ব করে তুলে হয়তো পরিবারের সীমা লোপ করে দিতে চাও। তিনি বললেন, সেটাই যে আমাদের আশু সংকল্প তা নয়— কিন্তু শিশুদের প্রতি দায়িত্বকে ব্যাপক করে দিয়ে যদি স্বভাবতই একদা পরিবারের গণ্ডী লোপ পায় তা হলে এই প্রমাণ হবে, সমাজে পারিবারিক যুগ আপন সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা -বশতই নবযুগের প্রসারের মধ্যে আপনিই অন্তর্ধান করেছে। যা হোক, এ সম্বন্ধে তোমাদের কী মত জানতে ইচ্ছে করি। তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের একত্রীকরণের নীতি বজায় রেখে পরিবার বজায় থাকতে পারে।"

সেই য়ুক্রেনিয়ার যুবকটি বললে, "আমাদের নূতন সমাজব্যবস্থা পারিবারিকতার উপর কিরকম প্রভাব বিস্তার করেছে আমার নিজের দিক থেকে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমার পিতা যখন বেঁচে ছিলেন, শীতের ছয় মাস তিনি শহরে কাজ করতেন আর গরমের ছয় মাস ভাইবোনদের নিয়ে আমি ধনীর চাকরি নিয়ে পশুচারণ করতে যেতুম। বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা প্রায়ই হত না। এখন এরকম বিচ্ছেদ ঘটে না। শিশুবিদ্যালয় থেকে আমার ছেলে রোজ ফিরে আসে, রোজই তার সঙ্গে দেখা হয়।"

একজন চাষী-মেয়ে বললে, "শিশুদের দেখাশোনা ও শেখানোর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়াতে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ঢের কমে গেছে। তা ছাড়া, ছেলেদের সম্বন্ধে দায়িত্ব যে কতখানি তা বাপ-মা ভালো করে শিখতে পারছে।"

একটি ককেশীয় যুবতী দোভাষীকে বললে, "কবিকে বলো, আমরা ককেশীয় রিপাব্লিকের লোকেরা বিশেষ করেই অনুভব করি যে, অক্টোবরের বিপ্লবের পর থেকে আমরা যথার্থ স্বাধীনতা এবং সুখ পেয়েছি। আমরা নতুন যুগ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত, তার কঠিন দায়িত্ব খুবই বুঝি, তার জন্যে চূড়ান্ত রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে আমরা রাজী। কবিকে জানাও, সোভিয়েট-সম্মিলনের বিচিত্র জাতির লোক তাঁর মারফত ভারতবাসীদের 'পরে তাদের আন্তরিক দরদ জানাতে চায়। আমি বলতে পারি, যদি সম্ভব হত, আমার ঘরদুয়োর, আমার ছেলেপুলে, সবাইকে ছেড়ে তাঁর স্বদেশীয়ের সাহায্য করতে যেতুম।"

দলের মধ্যে একজন ছিল তার মঙ্গোলীয় ছাঁদের মুখ। তার কথা জিজ্ঞাসা করতেই জবাব পেলুম, সে খিরগিজ-জাতীয় চাষীর ছেলে, মস্কো এসেছে কলে কাপড় বোনার বিদ্যা শিখতে। তিন বছর বাদে এঞ্জিনিয়র হয়ে তাদের রিপাব্লিকে ফিরে যাবে— বিপ্লবের পরে সেখানে একটা বড়ো কারখানা স্থাপিত হয়েছে, সেইখানে সে কাজ করবে।

একটা কথা মনে রেখো, এরা নানা জাতির লোক কল-কারখানার রহস্য আয়ত্ত করবার জন্যে এত অবাধ উৎসাহ এবং সুযোগ পেয়েছে, তার একমাত্র কারণ যন্ত্রকে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। যত লোকেই শিক্ষা করুক তাতে সকল লোকেরই উপকার, কেবল ধনীলোকের নয়। আমরা আমাদের লোভের জন্যে যন্ত্রকে দোষ দিই, মাৎলামির জন্যে শাস্তি দিই তালগাছকে। মাস্টারমশায় যেমন নিজের অক্ষমতার জন্যে বেঞ্চির উপরে দাঁড় করিয়ে রাখেন ছাত্রকে।

সেদিন মস্কো কৃষি-আবাসে গিয়ে স্পষ্ট করে স্বচক্ষে দেখতে পেলুম, দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষীরা ভারতবর্ষের চাষীদের কত বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। কেবল বই পড়তে শেখে নি, ওদের মন গেছে বদলে, ওরা মানুষ হয়ে উঠেছে। শুধু শিক্ষার কথা বললে সব কথা বলা হল না, চাষের উন্নতির জন্যে সমস্ত দেশ জুড়ে যে প্রভূত উদ্যম সেও অসাধারণ। ভারতবর্ষেরই মতো এ দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এইজন্যে কৃষিবিদ্যাকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে দিতে না পারলে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায় না। এরা সে কথা ভোলে নি। এরা অতি দুঃসাধ্য সাধন করতে প্রবৃত্ত।

সিভিল সার্ভিসের আমলাদের দিয়ে এরা মোটা মাইনেয় আপিস চালাবার কাজ করছে না— যারা যোগ্য লোক, যারা বৈজ্ঞানিক, তারা সবাই লেগে গেছে। এই দশ বছরের মধ্যে এদের কৃষিচর্চাবিভাগের যে উন্নতি ঘটেছে তার খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে জগতের বৈজ্ঞানিক-মহলে। যুদ্ধের পূর্বে এ দেশে বীজ-বাছাইয়ের কোনো চেষ্টাই ছিল না। আজ প্রায় তিন কোটি মণ বাছাই-করা বীজ এদের হাতে জমেছে। তা ছাড়া নূতন শস্যের প্রচলন শুধু এদের কৃষি-কলেজের প্রাঙ্গণে নয়, দ্রুতবেগে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা আজরবাইজান উজ্‌বেকিস্তান জর্জিয়া য়ুক্রেন প্রভৃতি রাশিয়ার প্রত্যন্তপ্রদেশেও স্থাপিত হয়েছে।

রাশিয়ার সমস্ত দেশ-প্রদেশকে জাতি-উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে এতবড়ো সর্বব্যাপী অসামান্য অক্লান্ত উদ্যোগ আমাদের মতো ব্রিটিশ সাব্‌জেক্টের সুদূর কল্পনার অতীত। এতটা দূর পর্যন্ত করে তোলা যে সম্ভব, এখানে আসবার আগে কখনো আমি তা মনেও করতে পারি নি। কেননা শিশুকাল থেকে আমরা যে

'ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার'এর আবহাওয়ায় মানুষ, সেখানে এর কাছে পৌঁছতে পারে এমন দৃষ্টান্ত দেখি নি।

এবার ইংলণ্ডে থাকতে একজন ইংরেজের কাছে প্রথম শুনেছিলুম সাধারণের কল্যাণের জন্যে এরা কিরকম অসাধারণ আয়োজন করেছে। চোখে দেখলুম— এও দেখতে পেলুম, এদের রাষ্ট্রে জাতিবর্ণবিচার একটুও নেই। সোভিয়েট শাসনের অন্তর্গত বর্বরপ্রায় প্রজার মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে এরা যে প্রকৃষ্ট প্রণালীর ব্যবস্থা করেছে ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে তা দুর্লভ। অথচ এই অশিক্ষার অনিবার্য ফলে আমাদের বুদ্ধিতে চরিত্রে যে দুর্বলতা, ব্যবহারে যে মূঢ়তা, দেশ-বিদেশের কাছে তার রটনা চলছে। ইংরেজিতেই কথা চলিত আছে, যে কুকুরকে ফাঁসি দিতে হবে তাকে বদনাম দিলে কাজ সহজ হয়। যাতে বদনামটা কোনোদিন না ঘোচে তার উপায় করলে যাবজ্জীবন মেয়াদ ও ফাঁসি দুই'ই মিলিয়ে নেওয়া চলে। ইতি ১ অক্টোবর ১৯৩০

৬

বর্লিন

রাশিয়া ঘুরে এসে আজ আমেরিকার মুখে চলেছি, এমন সন্ধিক্ষণে তোমার চিঠি পেলুম। রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তারা সমাজের অন্ধকুটুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে, তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এক কালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন। এদের সামনে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত; সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়।

এরা তিনটে জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করছে। আমাদের দেশের মতোই এখানকার মানুষ কৃষিজীবী। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষক এক দিকে মূঢ়, আর-এক দিকে অক্ষম; শিক্ষা এবং শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত। তার একমাত্র ক্ষীণ আশ্রয় হচ্ছে প্রথা— পিতামহের আমলের চাকরের মতো সে কাজ করে কম, অথচ কর্তৃত্ব করে বেশি। তাকে মেনে চলতে হলে

তাকে এগিয়ে চলবার উপায় থাকে না। অথচ শত শত বৎসর থেকে সে খুঁড়িয়ে চলছে।

আমাদের দেশে কোনো-এক সময়ে গোবর্ধনধারী কৃষ্ণ বোধ হয় ছিলেন কৃষির দেবতা, গোয়ালার ঘরে তাঁর বিহার; তাঁর দাদা বলরাম, হলধর। ঐ লাঙল-অস্ত্রটা হল মানুষের যন্ত্রবলের প্রতীক। কৃষিকে বল দান করেছে যন্ত্র। আজকের দিনে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কোনো কিনারায় বলরামের দেখা নেই— তিনি লজ্জিত— যে দেশে তাঁর অস্ত্রে তেজ আছে সেই সাগরপারে তিনি চলে গেছেন। রাশিয়ায় কৃষি বলরামকে ডাক দিয়েছে; দেখতে দেখতে সেখানকার কেদারখণ্ডগুলো অখণ্ড হয়ে উঠল, তাঁর নূতন হলের স্পর্শে অহল্যাভূমিতে প্রাণসঞ্চার হয়েছে।

একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, রামেরই হলযন্ত্রধারী রূপ হচ্ছে বলরাম।

১৯১৭ খৃস্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এ দেশে শতকরা নিরানব্বই জন চাষী আধুনিক হলযন্ত্র চক্ষেও দেখে নি। তারা সেদিন আমাদেরই চাষীদের মতো সম্পূর্ণ দুর্বলরাম ছিল, নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্বাক্‌। আজ দেখতে দেখতে এদের খেতে হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেছে। আগে এরা ছিল যাকে আমাদের ভাষায় বলে কৃষ্ণের জীব, আজ এরা হয়েছে বলরামের দল।

কিন্তু শুধু যন্ত্রে কোনো কাজ হয় না যন্ত্রী যদি মানুষ না হয়ে ওঠে। এদের খেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে। এখানকার শিক্ষার কাজ সজীব প্রণালীতে। আমি বরাবর বলে এসেছি শিক্ষাকে জীবযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালানো উচিত। তার থেকে অবচ্ছিন্ন করে নিলে ওটা ভাণ্ডারের সামগ্রী হয়, পাকযন্ত্রের খাদ্য হয় না।

এখানে এসে দেখলুম, এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেছে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখে নি। এরা পাস করবার কিম্বা পণ্ডিত করবার জন্যে শেখায় না— সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায়। আমাদের দেশে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়ো, সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়ো, পুঁথির পংক্তির বোঝার ভারে চিত্তকে চালনা করবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। কতবার চেষ্টা করেছি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্নও নেই। জানতে চাওয়ার সঙ্গে জানতে পাওয়ার যে যোগ আছে সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোনোদিন জানতে চাইতে শেখে নি— প্রথম থেকেই কেবলই বাঁধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তার পরে সেই শিক্ষিত বিদ্যার পুনরাবৃত্তি করে ওরা পরীক্ষার মার্কা সংগ্রহ করে।

আমার মনে আছে শান্তিনিকেতনে যখন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মহাত্মাজীর ছাত্রেরা ছিল তখন একদিন তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের ছেলেদের সঙ্গে পারুল-বনে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা কর কি। সে বললে, জানি নে। এ সম্বন্ধে সে তাদের দলপতিকে জিজ্ঞাসা করতে চাইলে। আমি বললুম, জিজ্ঞাসা পরে কোরো, কিন্তু বেড়াতে যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কি না আমাকে বলো। সে বললে, আমি জানি নে। অর্থাৎ এ ছাত্র স্বয়ং কোনো বিষয়ে কিছু ইচ্ছা করবার চর্চাই করে না ; তাকে চালনা করা হয়, সে চলে, আপনা থেকে তাকে কিছু ভাবতে হয় না।

এরকম সামান্য বিষয়ে মনের এতটা অসাড়তা যদিও সাধারণত আমাদের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় না, কিন্তু এর চেয়ে আরো একটুখানি শক্ত রকমের চিন্তনীয় বিষয় যদি পাড়া যায় তবে দেখা যাবে সেজন্যে এদের মন একটুখানিও প্রস্তুত নেই। এরা কেবলই অপেক্ষা করে থাকে আমরা উপরে থেকে কী বলতে পারি তাই শোনবার জন্যে। সংসারে এরকম মনের মতো নিরুপায় মন আর হতে পারে না।

এখানে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষা চলছে, তার বিস্তারিত বিবরণ পরে দেবার চেষ্টা করব। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে রিপোর্ট্ এবং বই পড়ে অনেকটা জানা যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষার চেহারা মানুষের মধ্যে যেটা প্রত্যক্ষ দেখা যায় সেটাই সব চেয়ে বড়ো কাজের। সেইটে সেদিন দেখে এসেছি। পায়োনিয়র্‌স্ কম্যুন বলে এ দেশে যে-সব আশ্রম স্থাপিত হয়েছে তারই একটা দেখতে সেদিন গিয়েছিলুম। আমাদের শান্তিনিকেতনে যেরকম ব্রতীবালক ব্রতীবালিকা আছে এদের পায়োনিয়র্‌স্ দল কতকটা সেই ধরনের।

বাড়িতে প্রবেশ করেই দেখি আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সিঁড়ির দু ধারে বালকবালিকার দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে আসতেই ওরা আমার চার দিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল, যেন আমি ওদেরই আপন দলের। একটা কথা মনে রেখো, এরা সকলেই পিতৃমাতৃহীন। এরা যে শ্রেণী থেকে এসেছে একদা সে শ্রেণীর মানুষ কারো কাছে কোনো যত্নের দাবি করতে পারত না, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে নিতান্ত নীচ বৃত্তির দ্বারা দিনপাত করত। এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, অনাদরের অসম্মানের কুয়াশা-ঢাকা চেহারা একেবারেই নয়। সংকোচ নেই, জড়তা নেই। তা ছাড়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা পণ, সামনে একটা কর্মক্ষেত্র আছে বলে মনে হয় যেন সর্বদা তৎপর হয়ে আছে, কোনো-কিছুতে অনবধানের শৈথিল্য থাকবার জো নেই।

অভ্যর্থনার জবাবে আমি ওদের অল্প যা বলেছিলুম তারই প্রসঙ্গক্রমে একজন ছেলে

বললে, "পরশ্রমজীবীরা (bourgeoisie) নিজের ব্যক্তিগত মুনফা খোঁজে, আমরা চাই দেশের ঐশ্বর্যে সকল মানুষের সমান স্বত্ব থাকে। এই বিদ্যালয়ে আমরা সেই নীতি অনুসারে চলে থাকি।"

একটি মেয়ে বললে, "আমরা নিজেরা নিজেদের চালনা করি। আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে কাজ করে থাকি, যেটা সকলের পক্ষেই শ্রেয় সেইটেই আমাদের স্বীকার্য।"

আর-একটি ছেলে বললে, "আমরা ভুল করতে পারি, কিন্তু যদি ইচ্ছা করি যারা আমাদের চেয়ে বড়ো তাদের পরামর্শ নিয়ে থাকি। প্রয়োজন হলে ছোটো ছেলে-মেয়েরা বড়ো ছেলেমেয়েদের মত নেয় এবং তারা যেতে পারে তাদের শিক্ষকদের কাছে। আমাদের দেশের শাসনতন্ত্রের এই বিধি। আমরা এখানে সেই বিধিরই চর্চা করে থাকি।"

এর থেকে বুঝতে পারবে, এদের শিক্ষা কেবল পুঁথিপড়ার শিক্ষা নয়। নিজের ব্যবহারকে চরিত্রকে একটা বৃহৎ লোকযাত্রার অনুগত করে এরা তৈরি করে তুলছে। সেই সম্বন্ধে এদের একটা পণ আছে এবং সেই পণ রক্ষায় এদের গৌরববোধ।

আমার ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকদের আমি অনেকবার বলেছি, লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ববোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি করে থাকি শান্তিনিকেতনের ছোটো সীমার মধ্যে তারই একটি সম্পূর্ণ রূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার— সেই ব্যবস্থায় যখন এখানকার সমস্ত কর্ম সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন এইটুকুর মধ্যে আমাদের সমস্ত দেশের সমস্যার পূরণ হতে পারবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অনুগত করে তোলবার চর্চা রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে হতে পারে না, তার জন্যে ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়— সেই ক্ষেত্র আমাদের আশ্রম।

একটা ছোটো দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। আহারের রুচি এবং অভ্যাস সম্বন্ধে বাংলাদেশে যেমন কদাচার এমন আর কোথাও নেই। পাকশালা এবং পাকযন্ত্রকে অত্যন্ত অনাবশ্যক আমরা ভারগ্রস্ত করে তুলেছি। এ সম্বন্ধে সংস্কার করা বড়ো কঠিন। স্বজাতির চিরন্তন হিতের প্রতি লক্ষ করে আমাদের ছাত্ররা ও শিক্ষকেরা পথ্য সম্বন্ধে নিজের রুচিকে যথোচিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার পণ গ্রহণ করতে যদি পারত তা হলে আমি যাকে শিক্ষা বলি সেই শিক্ষা সার্থক হত। তিন-নয়ে সাতাশ হয় এইটে মুখস্থ করাকে আমরা শিক্ষা বলে গণ্য করে থাকি, সে সম্বন্ধে ছেলেরা কোনো-মতেই ভুল না করে তার প্রতি লক্ষ না করাকে গুরুতর অপরাধ বলে জানি, কিন্তু যে

জিনিসটাকে উদরস্থ করি সে সম্বন্ধে শিক্ষাকে তার চেয়ে কম দাম দেওয়াই মূর্খতা। আমাদের প্রতিদিনের খাওয়া সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত দেশের কাছে দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব অতি গুরুতর— সম্পূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে এটাকে মনে রাখা পাসের মার্কার চেয়ে অনেক বড়ো।

আমি এদের জিজ্ঞাসা করলুম, "কেউ কোনো অপরাধ করলে এখানে তার বিধান কী।"

একটি মেয়ে বললে, "আমাদের কোনো শাসন নেই, কেননা আমরা নিজেদের শাস্তি দিই।"

আমি বললুম, "আর-একটু বিস্তারিত করে বলো। কেউ অপরাধ করলে তার বিচার করবার জন্যে তোমরা কি বিশেষ সভা ডাকো। নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে কি তোমরা বিচারক নির্বাচন করো। শাস্তি দেবার বিধিই বা কী রকমের।"

একটি মেয়ে বললে, "বিচারসভা যাকে বলে তা নয়, আমরা বলা-কওয়া করি। কাউকে অপরাধী করাই শাস্তি, তার চেয়ে শাস্তি আর নেই।"

একটি ছেলে বললে, "সেও দুঃখিত হয় আমরাও দুঃখিত হই, বাস্ চুকে যায়।"

আমি বললুম, "মনে করো কোনো ছেলে যদি ভাবে তার প্রতি অযথা দোষারোপ হচ্ছে তা হলে তোমাদের উপরেও আর-কারো কাছে কি সে ছেলের আপিল চলে।"

ছেলেটি বললে, "তখন আমরা ভোট নিই— অধিকাংশের মতে যদি স্থির হয় যে সে অপরাধ করেছে তা হলে তার উপরে আর কথা চলে না।"

আমি বললুম, "কথা না চলতে পারে, কিন্তু তবু ছেলেটি যদি মনে করে অধিকাংশই তার উপরে অন্যায় করছে তা হলে তার কোনো প্রতিবিধান আছে কি।"

একটি মেয়ে উঠে বললে, "তা হলে হয়তো আমরা শিক্ষকদের পরামর্শ নিতে যাই— কিন্তু এরকম ঘটনা কখনো ঘটে নি।"

আমি বললুম, "যে-একটি সাধনার মধ্যে সকলে আছ সেইটেতেই আপনা হতেই অপরাধ থেকে তোমাদের রক্ষা করে।"

ওদের কর্তব্য কী প্রশ্ন করাতে বললে, "অন্য দেশের লোকেরা নিজের কাজের জন্য অর্থ চায়, সম্মান চায়, আমরা তার কিছুই চাই নে, আমরা সাধারণের হিত চাই। আমরা গাঁয়ের লোকদের শিক্ষা দেবার জন্যে পাড়াগাঁয়ে যাই— কী করে পরিষ্কার হয়ে থাকতে হয়, সকল কাজ কী করে বুদ্ধিপূর্বক করতে হয়, এইসব তাদের বুঝিয়ে দিই। অনেক সময়ে আমরা তাদের মধ্যে গিয়েই বাস করি, নাটক-অভিনয় করি, দেশের অবস্থার কথা বলি।"

তার পরে আমাকে দেখাতে চাইলে কাকে ওরা বলে সজীব সংবাদপত্র। একটি মেয়ে বললে, "দেশের সম্বন্ধে আমাদের অনেক খবর জানতে হয়, আমরা যা জানি তাই আবার অন্য সবাইকে জানানো আমাদের কর্তব্য। কেননা, ঠিকমত করে তথ্যগুলিকে জানতে এবং তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারলে তবেই আমাদের কাজ খাঁটি হতে পারে।"

একটি ছেলে বললে, "প্রথমে আমরা বই থেকে, আমাদের শিক্ষকের কাছ থেকে শিখি, তার পরে তাই নিয়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করি, তার পরে সেইগুলি সাধারণকে জানাবার জন্যে যাবার হুকুম হয়।"

সজীব সংবাদপত্র অভিনয় করে আমাকে দেখালে। বিষয়টা হচ্ছে এদের পাঞ্চবার্ষিক সংকল্প। ব্যাপারটা হচ্ছে, এরা কঠিন পণ করেছে পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত দেশকে যন্ত্রশক্তিতে সুদক্ষ করে তুলবে, বিদ্যুৎশক্তি বাষ্পশক্তিকে দেশের এক ধার থেকে আর-এক ধার পর্যন্ত কাজে লাগিয়ে দেবে। এদের দেশ বলতে কেবল য়ুরোপীয় রাশিয়া বোঝায় না। এশিয়ার অনেক দূর পর্যন্ত তার বিস্তার। সেখানেও নিয়ে যাবে এদের শক্তির বাহনকে। ধনীকে ধনীতর করবার জন্যে নয়, জনসমষ্টিকে শক্তিসম্পন্ন করবার জন্যে— সেই জনসমষ্টির মধ্যে মধ্য-এশিয়ার অসিতচর্ম মানুষও আছে। তারাও শক্তির অধিকারী হবে ব'লে ভয় নেই, ভাবনা নেই।

এই কাজের জন্য এদের প্রভূত টাকার দরকার— য়ুরোপীয় বড়োবাজারে এদের হুণ্ডি চলে না, নগদ দামে কেনা ছাড়া উপায় নেই। তাই পেটের অন্ন দিয়ে এরা জিনিস কিনছে, উৎপন্ন শস্য পশুমাংস ডিম মাখন সমস্ত চালান হচ্ছে বিদেশের হাটে। সমস্ত দেশের লোক উপবাসের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনো দেড় বছর বাকি। অন্য দেশের মহাজনরা খুশি নয়। বিদেশী এঞ্জিনিয়াররা এদের কল-কারখানা অনেক নষ্টও করেছে। ব্যাপারটা বৃহৎ ও জটিল, সময় অত্যন্ত অল্প। সময় বাড়াতে সাহস হয় না, কেননা সমস্ত ধনী-জগতের প্রতিকূলতার মুখে এরা দাঁড়িয়ে, যত শীঘ্র সম্ভব আপন শক্তিতে ধন উৎপাদন এদের পক্ষে নিতান্ত দরকার। তিন বছর কষ্টে কেটে গেছে, এখনো দু বছর বাকি।

'সজীব খবরের কাগজ'টা অভিনয়ের মতো; নেচে গেয়ে পতাকা তুলে এরা জানিয়ে দিতে চায় দেশের অর্থশক্তিকে যন্ত্রবাহিনী করে ক্রমে ক্রমে কী পরিমাণে এরা সফলতা লাভ করছে। দেখবার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। যারা জীবনযাত্রার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে বহু কষ্টে কাল কাটাচ্ছে তাদের বোঝানো চাই অনতিকালের মধ্যে এই কষ্টের অবসান হবে এবং বদলে যা পাবে তার কথা স্মরণ করে যেন তারা আনন্দের সঙ্গে, গৌরবের সঙ্গে, কষ্টকে বরণ করে নেয়।

এর মধ্যে সান্ত্বনার কথাটা এই যে, কোনো এক-দল লোক নয়, দেশের সকল লোকই একসঙ্গে তপস্থার প্রবৃত্ত। এই 'সজীব সংবাদপত্র' অন্য দেশের বিবরণও এইরকম করে প্রচার করে। মনে পড়ল পতিসরে দেহতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব নিয়ে এক যাত্রার পালা শুনেছিলুম— প্রণালীটা একই, লক্ষ্যটা আলাদা। মনে করছি দেশে ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে স্কুলে 'সজীব সংবাদপত্র' চালাবার চেষ্টা করব।

ওদের দৈনিক কার্যপদ্ধতি হচ্ছে এইরকম— সকাল সাতটার সময় ওরা বিছানা থেকে ওঠে। তার পর পনেরো মিনিট ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ। আটটার সময় ক্লাস বসে। একটার সময় কিছুক্ষণের জন্য আহার ও বিশ্রাম। বেলা তিনটে পর্যন্ত ক্লাস চলে। শেখবার বিষয় হচ্ছে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক প্রাকৃতবিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন, প্রাথমিক জীববিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, হাতের কাজ, ছুতোরের কাজ, বই-বাঁধাই, হাল আমলের চাষের যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার ইত্যাদি। রবিবার নেই। প্রত্যেক পঞ্চম দিনে ছুটি। তিনটের পরে বিশেষ দিনের কার্যতালিকা অনুসারে পায়োনিয়ররা (পুরোযায়ীর দল) কারখানা, হাসপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখতে যায়।

পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করতে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মাঝে মাঝে নিজেরা অভিনয় করে ; মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখতে, সিনেমা দেখতে যায়। সন্ধ্যাবেলায় গল্প পড়া, গল্প বলা, তর্কসভা, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সভা। ছুটির দিনে পায়োনিয়ররা কিছু পরিমাণে নিজেদের কাপড় কাচে, ঘর পরিষ্কার করে, বাড়ি এবং বাড়ির চার দিক পরিষ্কার করে, ক্লাস-পাঠ্যের অতিরিক্ত পড়া পড়ে, বেড়াতে যায়। ভর্তি হবার বয়েস সাত-আট, বিদ্যালয় ত্যাগ করবার বয়েস ষোলো। এদের অধ্যয়নকাল আমাদের দেশের মতো লম্বা লম্বা ছুটি দিয়ে ফাঁক করে দেওয়া নয়, সুতরাং অল্পদিনে অনেক বেশি পড়তে পারে।

এখানকার বিদ্যালয়ের মস্ত একটা গুণ, এরা যা পড়ে, তার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকে। তাতে পড়ার বিষয় মনে চিত্রিত হয়ে ওঠে, ছবির হাত পেকে যায়— আর পড়ার সঙ্গে রূপসৃষ্টি করার আনন্দ মিলিত হয়। হঠাৎ মনে হতে পারে, এরা বুঝি কেবলই কাজের দিকে ঝোঁক দিয়েছে গোঁয়ারের মতো ললিতকলাকে অবজ্ঞা ক'রে। একেবারেই তা নয়। সম্রাটের আমলের তৈরি বড়ো বড়ো রঙ্গশালায় উচ্চ অঙ্গের নাটক ও অপেরার অভিনয়ে বিলম্বে টিকিট পাওয়াই শক্ত হয়। নাট্যাভিনয়কলায় এদের মতো ওস্তাদ জগতে অল্পই আছে, পূর্বতন কালে আমীর-ওমরাওরাই সে-সমস্ত ভোগ করে এসেছেন— তখনকার দিনে যাদের পায়ে না ছিল জুতো, গায়ে ছিল ময়লা ছেঁড়া কাপড়, আহার

ছিল আধ-পেটা, দেবতা মানুষ সবাইকেই যারা অহোরাত্র ভয় করে করে বেড়িয়েছে, পরিত্রাণের জন্যে পুরুত-পাণ্ডাকে দিয়েছে ঘুষ, আর মনিবের কাছে ধুলোয় মাথা লুটিয়ে আত্মাবমাননা করেছে, তাদেরই ভিড়ে থিয়েটারে জায়গা পাওয়া যায় না।

আমি যেদিন অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম সেদিন হচ্ছিল টলস্টয়ের 'রিসারেক্শান'। জিনিসটা জনসাধারণের পক্ষে সহজে উপভোগ্য বলে মনে করা যায় না। কিন্তু শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শুনছিল। অ্যাংলোস্যাক্শন চাষী-মজুর শ্রেণীর লোকে এ জিনিস রাত্রি একটা পর্যন্ত এমন স্তব্ধ শান্ত ভাবে উপভোগ করছে এ কথা মনে করা যায় না, আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দাও।

আর-একটা উদাহরণ দিই। মস্কৌ শহরে আমার ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। এ ছবিগুলো সৃষ্টিছাড়া সে কথা বলা বাহুল্য। শুধু যে বিদেশী তা নয়, বলা চলে যে তারা কোনোদেশীই নয়। কিন্তু লোকের ঠেলাঠেলি ভিড়। অল্প কয় দিনে পাঁচ হাজার লোক ছবি দেখেছে। আর যে যা বলুক, অন্তত আমি তো এদের রুচির প্রশংসা না করে থাকতে পারব না।

রুচির কথা ছেড়ে দাও, মনে করা যাক এ একটা ফাঁকা কৌতূহল। কিন্তু কৌতূহল থাকাটাই যে জাগ্রত চিত্তের পরিচয়। মনে আছে একদা আমাদের ইঁদারার জন্যে আমেরিকা থেকে একটা বায়ুচল চক্রযন্ত্র এনেছিলুম, তাতে কুয়োর গভীর তলা থেকে জল উঠেছিল। কিন্তু যখন দেখলুম ছেলেদের চিত্তের গভীর তলদেশ থেকে একটুও কৌতূহল টেনে তুলতে পারলে না তখন মনে বড়োই ধিক্কার লাগল। এই তো আমাদের ওখানে আছে বৈদ্যুত আলোর কারখানা, কজন ছেলের তাতে একটুও ঔৎসুক্য আছে? অথচ এরা তো ভদ্রশ্রেণীর ছেলে। বুদ্ধির জড়তা যেখানে সেইখানে কৌতূহল দুর্বল।

এখানে ইস্কুলের ছেলেদের আঁকা অনেকগুলি ছবি আমরা পেয়েছি— দেখে বিস্মিত হতে হয়; সেগুলো রীতিমত ছবি, কারো নকল নয়, নিজের উদ্ভাবন। এখানে নির্মাণ এবং সৃষ্টি দুইয়েরই প্রতি লক্ষ দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি। এখানে এসে অবধি স্বদেশের শিক্ষার কথা অনেক ভাবতে হয়েছে। আমার নিঃসহায় সামান্য শক্তি দিয়ে কিছু এর আহরণ এবং প্রয়োগ করতে চেষ্টা করব। কিন্তু আর সময় কই— আমার পক্ষে পাঞ্চবার্ষিক সংকল্পও হয়তো পূরণ না হতে পারে। প্রায় ত্রিশ বছর কাল যেমন একা একা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লগি ঠেলে কাটিয়েছি আরো দু-চার বছর তেমনি করেই ঠেলতে হবে— বিশেষ এগোবে না তাও জানি, তবু নালিশ করব না। আজ আর সময় নেই। আজ রাত্রের গাড়িতে জাহাজের ঘাটের অভিমুখে যেতে হবে, সমুদ্রে কাল পাড়ি দেব। ইতি ২ অক্টোবর ১৯৩০

৭

ব্রেমেন স্টীমার
অতলান্তিক

রাশিয়া থেকে ফিরে এসে আজ চলেছি আমেরিকার ঘাটে। কিন্তু রাশিয়ার স্মৃতি আজও আমার সমস্ত মন অধিকার করে আছে। তার প্রধান কারণ— অন্যান্য যে-সব দেশে ঘুরেছি তারা সমগ্রভাবে মনকে নাড়া দেয় না, তাদের নানা কর্মের উদ্যম আছে আপন আপন মহলে। কোথাও আছে পলিটিক্‌স্‌, কোথাও আছে হাসপাতাল, কোথাও আছে বিশ্ববিদ্যালয়, কোথাও আছে ম্যুজিয়ম— বিশেষজ্ঞরা তাই নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে সমস্ত দেশটা এক অভিপ্রায় মনে নিয়ে সমস্ত কর্মবিভাগকে এক স্নায়ুজালে জড়িত করে এক বিরাট দেহ এক বৃহৎ ব্যক্তিস্বরূপ ধারণ করেছে। সব-কিছু মিলে গেছে একটি অখণ্ড সাধনার মধ্যে।

যে-সব দেশে অর্থ এবং শক্তির অধ্যবসায় ব্যক্তিগত স্বার্থদ্বারা বিভক্ত সেখানে এরকম চিত্তের নিবিড় ঐক্য অসম্ভব। যখন এখানে পাঞ্চবার্ষিক য়ুরোপীয় যুদ্ধ চলছিল তখন দায়ে পড়ে দেশের অধিকাংশ ভাবনা ও কাজ এক অভিপ্রায়ে মিলিত হয়ে এক চিত্তের অধিকারে এসেছিল, এটা হয়েছিল অস্থায়ীভাবে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় যে কাণ্ড চলছে তার প্রকৃতিই এই— সাধারণের কাজ, সাধারণের চিত্ত, সাধারণের স্বত্ব ব'লে একটা অসাধারণ সত্তা এরা সৃষ্টি করতে লেগে গেছে।

উপনিষদের একটা কথা আমি এখানে এসে খুব স্পষ্ট করে বুঝেছি— 'মা গৃধঃ', লোভ কোরো না। কেন লোভ করবে না। যেহেতু সমস্ত কিছু এক সত্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ; ব্যক্তিগত লোভেতেই সেই একের উপলব্ধির মধ্যে বাধা আনে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'— সেই একের থেকে যা আসছে তাকেই ভোগ করো। এরা আর্থিক দিক থেকে সেই কথাটা বলছে। সমস্ত মানবসাধারণের মধ্যে এরা একটি অদ্বিতীয় মানবসত্যকেই বড়ো বলে মানে— সেই একের যোগে উৎপন্ন যা-কিছু, এরা বলে, তাকেই সকলে মিলে ভোগ করো— 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং'— কারো ধনে লোভ কোরো না। কিন্তু ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। সেইটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বলতে চায়, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।'

য়ুরোপে অন্য সকল দেশেরই সাধনা ব্যক্তির লাভকে, ব্যক্তির ভোগকে নিয়ে। তারই মন্থন-আলোড়ন খুবই প্রচণ্ড, আর পৌরাণিক সমুদ্রমন্থনের মতোই তার থেকে বিষ ও সুধা দুই'ই উঠছে। কিন্তু সুধার ভাগ কেবল এক দলই পাচ্ছে অধিকাংশই পাচ্ছে না—

এই নিয়ে অসুখ-অশান্তির সীমা নেই। সবাই মেনে নিয়েছিল এইটেই অনিবার্য; বলেছিল মানবপ্রকৃতির মধ্যেই লোভ আছে এবং লোভের কাজই হচ্ছে ভোগের মধ্যে অসমান ভাগ করে দেওয়া। অতএব প্রতিযোগিতা চলবে এবং লড়াইয়ের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। কিন্তু সোভিয়েটরা যা বলতে চায় তার থেকে বুঝতে হবে মানুষের মধ্যে ঐক্যটাই সত্য, ভাগটাই মায়া, সম্যক্ চিন্তা সম্যক্ চেষ্টা -দ্বারা সেটাকে যে মুহূর্তে মানব না সেই মুহূর্তেই স্বপ্নের মতো সে লোপ পাবে।

রাশিয়ায় সেই না-মানার চেষ্টা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকাণ্ড করে চলছে। সব-কিছু এই এক চেষ্টার অন্তর্গত হয়ে গেছে। এইজন্যে রাশিয়ায় এসে একটা বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল। শিক্ষার বিরাটপর্ব আর কোনো দেশে এমন করে দেখি নি, তার কারণ অন্য দেশে শিক্ষা যে করে শিক্ষার ফল তারই— 'দুধুভাতু খায় সেই।' এখানে প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা। একজনের মধ্যে শিক্ষার যে অভাব হবে সে অভাব সকলকেই লাগবে। কেননা সম্মিলিত শিক্ষায়ই যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্বসাধারণের কাজে সফল করতে চায়। এরা 'বিশ্বকর্মা'; অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই। অতএব এদের জন্যেই যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা-ব্যাপারকে এরা নানা প্রণালী দিয়ে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ম্যুজিয়ম। নানাপ্রকার ম্যুজিয়মের জালে এরা সমস্ত গ্রাম-শহরকে জড়িয়ে ফেলেছে। সে ম্যুজিয়ম আমাদের শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরির মতো অকারী (passive) নয়, সকারী (active)।

রাশিয়ার region study অর্থাৎ স্থানিক তথ্যসন্ধানের উদ্যোগ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এরকম শিক্ষাকেন্দ্র প্রায় দু হাজার আছে, তার সদস্যসংখ্যা সত্তর হাজার পেরিয়ে গেছে। এই-সব কেন্দ্রে তত্তৎ স্থানের অতীত ইতিহাস এবং অতীত ও বর্তমানের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান হয়। তা ছাড়া সে-সব জায়গার উৎপাদিকা শক্তি কিরকম শ্রেণীর কিম্বা কোনো খনিজ পদার্থ সেখানে প্রচ্ছন্ন আছে কি না, তার খোঁজ হয়ে থাকে। এই-সব কেন্দ্রের সঙ্গে যে-সব ম্যুজিয়ম আছে তারই যোগে সাধারণের শিক্ষাবিস্তার একটা গুরুতর কর্তব্য। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সর্বসাধারণের জ্ঞানোন্নতির যে নবযুগ এসেছে, এই স্থানিক তথ্যসন্ধানের ব্যাপক চর্চা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ম্যুজিয়ম তার একটা প্রধান প্রণালী।

এইরকম নিকটবর্তী স্থানের তথ্যানুসন্ধান শান্তিনিকেতনে কালীমোহন কিছু পরিমাণে করেছেন; কিন্তু এই কাজের সঙ্গে আমাদের ছাত্র ও শিক্ষকেরা যুক্ত না থাকাতে তাদের এতে কোনো উপকার হয় নি। সন্ধান করবার ফল পাওয়ার চেয়ে

সন্ধান করার মন তৈরি করা কম কথা নয়। কলেজ-বিভাগের ইকনমিক্‌স্‌ ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে প্রভাত এইরকম চর্চার পত্তন করছেন শুনেছিলুম; কিন্তু এ কাজটা আরো বেশি সাধারণভাবে করা দরকার, পাঠভবনের ছেলেদেরও এই কাজে দীক্ষিত করা চাই, আর এইসঙ্গে সমস্ত প্রাদেশিক সামগ্রীর ম্যুজিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক।

এখানে ছবির ম্যুজিয়মের কাজ কিরকম চলে তার বিবরণ শুনলে নিশ্চয় তোমার ভালো লাগবে। মস্কো শহরে ট্রেটিয়াকভ গ্যালারি (Tretyakov Gallery) নামে এক বিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার আছে। সেখানে ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত এক বছরের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ লোক ছবি দেখতে এসেছে। যত দর্শক আসতে চায় তাদের ধরানো শক্ত হয়ে উঠেছে। সেইজন্যে ছুটির দিনে আগে থাকতে দর্শকদের নাম রেজেস্ট্রি করানো দরকার হয়েছে।

১৯১৭ খৃস্টাব্দে সোভিয়েট-শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্বে যে-সব দর্শক এইরকম গ্যালারিতে আসত তারা ধনী মানী জ্ঞানী দলের লোক এবং তারা, যাদের এরা বলে bourgeoisie, অর্থাৎ পরশ্রমজীবী। এখন আসে অসংখ্য স্বশ্রমজীবীর দল, যথা রাজমিস্ত্রি, লোহার, মুদি, দরজি ইত্যাদি। আর আসে সোভিয়েট সৈনিক, সেনানায়ক, ছাত্র এবং চাষী-সম্প্রদায়।

আর্টের বোধ ক্রমে ক্রমে এদের মনে জাগিয়ে তোলা আবশ্যক। এদের মতো আনাড়িদের পক্ষে চিত্রকলার রহস্য প্রথম দৃষ্টিতে ঠিকমত বোঝা অসাধ্য। দেয়ালে দেয়ালে ছবি দেখে দেখে এরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বুদ্ধি যায় পথ হারিয়ে। এই কারণে প্রায় সব ম্যুজিয়মেই উপযুক্ত পরিচায়ক রেখে দেওয়া হয়েছে। ম্যুজিয়মের শিক্ষাবিভাগে কিম্বা অন্যত্র তদনুরূপ রাষ্ট্রকর্মশালায় যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক কর্মী আছে তাদেরই মধ্যে থেকে পরিচায়ক বাছাই করে নেওয়া হয়। যারা দেখতে আসে তাদের সঙ্গে এদের দেনাপাওনার কোনো কারবার থাকে না। ছবিতে যে বিষয়টা প্রকাশ করছে সেইটে দেখলেই যে ছবি দেখা হয়, দর্শকেরা যাতে সেই ভুল না করে পরিদর্শয়িতার সেটা জানা চাই।

চিত্রবস্তুর সংস্থান (composition), তার বর্ণকল্পনা (colour scheme), তার অঙ্কন, তার অবকাশ (space), তার উজ্জ্বলতা (illumination), যাতে করে তার বিশেষ সম্প্রদায় ধরা পড়ে সেই তার বিশেষ আঙ্গিক (technique)— এ-সকল বিষয়ে আজও অল্প লোকেরই জানা আছে। এইজন্যে পরিচায়কের বেশ দস্তুরমত শিক্ষা থাকা চাই, তবেই দর্শকদের ঔৎসুক্য ও মনোযোগ সে জাগিয়ে রাখতে পারে। আর-একটি কথা তাকে বুঝতে হবে, ম্যুজিয়মে কেবল একটিমাত্র ছবি নেই, অতএব একটা

ছবিকে চিনে নেওয়া দর্শকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয় ; ম্যুজিয়মে যে-সব বিশেষ শ্রেণীর ছবি রক্ষিত আছে তাদের শ্রেণীগত রীতি বোঝা চাই। পরিচায়কদের কর্তব্য কয়েকটি করে বিশেষ ছাঁদের ছবি বেছে নিয়ে তাদের প্রকৃতি বুঝিয়ে দেওয়া। আলোচ্য ছবিগুলির সংখ্যা খুব বেশি হলে চলবে না এবং সময়ও বিশ মিনিটের বেশি হওয়া ঠিক নয়। ছবির যে-একটি স্বকীয় ভাষা, একটি ছন্দ আছে সেইটেই বুঝিয়ে দেবার বিষয় ; ছবির রূপের সঙ্গে ছবির বিষয়ের ও ভাবের সম্বন্ধ কী সেইটে ব্যাখ্যা করা দরকার। ছবির পরস্পর-বৈপরীত্যদ্বারা তাদের বিশেষত্ব বোঝানো অনেক সময় কাজে লাগে। কিন্তু দর্শকদের মন একটুমাত্র শ্রান্ত হলেই তাদের তখনই ছুটি দেওয়া চাই।

অশিক্ষিত দর্শকদের এরা কী করে ছবি দেখতে শেখায় তারই একটা রিপোর্ট্ থেকে উল্লিখিত কথাগুলি তোমাকে সংগ্রহ করে পাঠালুম। এর থেকে আমাদের দেশের লোকের যেটি ভাববার কথা আছে সেটি হচ্ছে এই—

পূর্বে যে চিঠি লিখেছি তাতে আমি বলেছি, সমস্ত দেশকে কৃষিবলে যন্ত্রবলে অতিক্রতমাত্রায় শক্তিমান করে তোলবার জন্যে এরা একান্ত উদ্যমের সঙ্গে লেগে গেছে। এটা ঘোরতর কেজো কথা। অন্য-সব ধনী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের জোরে টিঁকে থাকবার জন্যে এদের এই বিপুল সাধনা। আমাদের দেশে যখন এই-জাতীয় দেশব্যাপী রাষ্ট্রিক সাধনার কথা ওঠে তখনই আমরা বলতে শুরু করি, এই একটিমাত্র লাল মশাল জ্বালিয়ে তুলে দেশের অন্য সকল বিভাগের সকল আলো নিবিয়ে দেওয়া চাই, নইলে মানুষ অন্যমনস্ক হবে। বিশেষত ললিতকলা সকল প্রকার কঠোর সংকল্পের বিরোধী। স্বজাতিকে পালোয়ানি করবার জন্যে কেবলই তাল ঠুকিয়ে পঁয়তারা করাতে হবে, সরস্বতীর বীণাটাকে নিয়ে যদি লাঠি বানানো সম্ভব হয় তবেই সেটা চলবে, নতুবা নৈব নৈব চ। এই কথাগুলো যে কতখানি মেকি পৌরুষের কথা তা এখানে এলে স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে এরা দেশ জুড়ে কারখানা চালাতে যে-সব শ্রমিকদের পাকা করে তুলতে চায়, তারাই যাতে শিক্ষিত মন নিয়ে ছবির রস বুঝতে পারে তারই জন্যে এত প্রভূত আয়োজন। এরা জানে, রসজ্ঞ যারা নয় তারা বর্বর ; যারা বর্বর তারা বাইরে রুক্ষ, অন্তরে দুর্বল। রাশিয়ায় নবনাট্যকলার অসামান্য উন্নতি হয়েছে। এদের ১৯১৭ খৃস্টাব্দের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরতর দুর্দিন দুর্ভিক্ষের মধ্যেই এরা নেচেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে— এদের ঐতিহাসিক বিরাট নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ঘটে নি।

মরুভূমিতে শক্তি নেই। শক্তির যথার্থ রূপ দেখা যায় সেইখানেই যেখানে পাথরের বুক থেকে জলের ধারা কল্লোলিত হয়ে বেরিয়ে আসে, যেখানে বসন্তের রূপহিল্লোলে

হিমাচলের গাম্ভীর্য মনোহর হয়ে ওঠে। বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষ থেকে শক শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কালিদাসকে নিষেধ করেন নি মেঘদূত লিখতে। জাপানীরা তলোয়ার চালাতে পারে না এ কথা বলবার জো নেই, কিন্তু সমান নৈপুণ্যেই তারা তুলিও চালায়। রাশিয়ায় এসে যদি দেখতুম এরা কেবলই মজুর সেজে কারখানাঘরের সরঞ্জাম জোগাচ্ছে আর লাঙল চালাচ্ছে, তা হলেই বুঝতুম, এরা শুকিয়ে মরবে। যে বনস্পতি পল্লবমর্মর বন্ধ করে দিয়ে খট্‌ খট্‌ আওয়াজে অহংকার করে বলতে থাকে 'আমার রসের দরকার নেই' সে নিশ্চয়ই ছুতোরের দোকানের নকল বনস্পতি— সে খুবই শক্ত হতে পারে, কিন্তু খুবই নিষ্ফল। অতএব আমি বীরপুরুষদের বলে রাখছি এবং তপস্বীদেরও সাবধান করে দিচ্ছি যে, দেশে যখন ফিরে যাব পুলিসের যষ্টিধারার শ্রাবণবর্ষণেও আমার নাচগান বন্ধ হবে না।

রাশিয়ার নাট্যমঞ্চে যে কলাসাধনার বিকাশ হয়েছে সে অসামান্য। তার মধ্যে নূতন সৃষ্টির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্ছে, এখনো থামে নি। ওখানকার সমাজবিপ্লবে এই নূতন সৃষ্টিরই অসমসাহস কাজ করছে। এরা সমাজে রাষ্ট্রে কলাতত্ত্বে কোথাও নূতনকে ভয় করে নি।

যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায় করে দিয়েছে এই সোভিয়েট-বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে; এত বড়ো বন্ধনজর্জর জাতিকে এত অল্পকালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েছে দেখে মন আনন্দিত হয়। কেননা, যে ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন করে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে, কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শত্রু হতে পারে না— সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক-না। এ-পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো; আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।

সোভিয়েটরা রুশসম্রাট্‌কৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে— অন্য দেশের ধার্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। রাশিয়ার বুকের 'পরে ধর্ম ও অত্যাচারী রাজার পাথর চাপা ছিল; দেশের উপর থেকে সেই পাথর নড়ে যাওয়ায় কী প্রকাণ্ড নিষ্কৃতি হয়েছে, এখানে এলে সেটা স্বচক্ষে দেখতে পেতে। ইতি ৩ অক্টোবর ১৯৩০

৮

অতলান্তিক মহাসাগর

রাশিয়া থেকে ফিরে এসেছি, চলেছি আমেরিকার পথে। রাশিয়াযাত্রায় আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল— ওখানে জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তারের কাজ কিরকম চলছে আর ওরা তার ফল কিরকম পাচ্ছে সেইটে অল্প সময়ের মধ্যে দেখে নেওয়া।

আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত-কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য— সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। সাইমন কমিশনে ভারতবর্ষের সমস্ত অপরাধের তালিকা শেষ করে ব্রিটিশ শাসনের কেবল একটিমাত্র অপরাধ কবুল করেছে। সে হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষাবিধানের ত্রুটি। কিন্তু আর-কিছু বলবার দরকার ছিল না। মনে করুন যদি বলা হয়— গৃহস্থ সাবধান হতে শেখে নি; এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে যেতে চৌকাঠে হুঁচট লেগে সে আছাড় খেয়ে পড়ে; জিনিসপত্র কেবলই হারায়, তার পরে খুঁজে পায় না; ছায়া দেখলে তাকে জুজু বলে ভয় করে; নিজের ভাইকে দেখে চোর এসেছে বলে লাঠি উঁচিয়ে মারতে যায়; কেবলই বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকে; উঠে হেঁটে বেড়াবার সাহসই নেই; খিদে পায়, কিন্তু খাবার কোথায় আছে খুঁজে পায় না; অদৃষ্টের উপর অন্ধ নির্ভর করে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত পথ তার কাছে লুপ্ত; অতএব নিজের গৃহস্থালির তদারকের ভার তার উপর দেওয়া চলে না— তার পরে সবশেষে গলা অত্যন্ত খাটো করে যদি বলা হয় 'আমি ওর বাতি নিবিয়ে রেখেছি'— তা হলে সেটা কেমন হয়।

ওরা একদিন ডাইনী বলে নিরপরাধাকে পুড়িয়েছে, পাপিষ্ঠ বলে বৈজ্ঞানিককে মেরেছে, ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্যকে অতি নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করেছে, নিজেরই ধর্মের ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রাধিকারকে খর্ব করে রেখেছে, এ ছাড়া কত অন্ধতা কত মূঢ়তা কত কদাচার মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে তার তালিকা স্তূপাকার করে তোলা যায়। এ-সমস্ত দূর হল কী করে। বাইরেকার কোনো কোর্ট্ অফ ওয়ার্ড্সের হাতে ওদের অক্ষমতার সংস্কারসাধনের ভার দেওয়া হয় নি; একটিমাত্র শক্তি ওদের এগিয়ে দিয়েছে, সে হচ্ছে ওদের শিক্ষা।

জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্পকালের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে সর্বসাধারণের ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে, দেশের অর্থ-উৎপাদনের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। বর্তমান তুরস্ক প্রবলবেগে এই শিক্ষা অগ্রসর করে দিয়ে ধর্মান্ধতার প্রবল

বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত করবার পথে চলেছে। 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়'। কেননা ঘরে আলো আসতে দেওয়া হয় নি; যে আলোতে আজকের পৃথিবী জেগে সেই শিক্ষার আলো ভারতের রুদ্ধ দ্বারের বাইরে।

রাশিয়ায় যখন যাত্রা করলুম খুব বেশি আশা করি নি। কেননা, কতটা সাধ্য এবং অসাধ্য তার আদর্শ ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকেই আমি পেয়েছি। ভারতের উন্নতিসাধনের দুরূহতা যে কত বেশি সে কথা স্বয়ং খৃস্টান পাদ্রি টমসন অতি করুণস্বরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে জানিয়েছেন। আমাকেও মানতে হয়েছে দুরূহতা আছে বই-কি, নইলে আমাদের এমন দশা হবেই বা কেন। একটা কথা আমার জানা ছিল, রাশিয়ায় প্রজাসাধারণের উন্নতিবিধান ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি দুরূহ বই কম নয়। প্রথমত এখানকার সমাজে যারা ভদ্রেতর শ্রেণীতে ছিল আমাদের দেশের সেই শ্রেণীর লোকের মতোই তাদের অন্তর-বাহিরের অবস্থা। সেইরকমই নিরক্ষর নিরুপায়, পূজার্চনা পুরুতপাণ্ডা দিনক্ষণ তাগাতাবিজে বুদ্ধিসুদ্ধি সমস্ত চাপা-পড়া, উপরওআলাদের পায়ের ধুলোতেই মলিন তাদের আত্মসম্মান, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সুযোগ-সুবিধা তারা কিছুই পায় নি, প্রপিতামহদের ভূতে-পাওয়া তাদের ভাগ্য, সেই ভূত তাদের বেঁধে রেখেছে হাজার বছরের আগেকার অচল খোঁটায়— মাঝে মাঝে য়িহুদী প্রতিবেশীদের 'পরে খুন চেপে যায়, তখন পাশবিক নিষ্ঠুরতার আর অন্ত থাকে না। উপরওআলাদের কাছ থেকে চাবুক খেতে যেমন মজবুত, নিজেদের সমশ্রেণীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করতে তারা তেমনি প্রস্তুত।

এই তো হল ওদের দশা— বর্তমানে যাদের হাতে ওদের ভাগ্য ইংরেজের মতো তারা ঐশ্বর্যশালী নয়, কেবলমাত্র ১৯১৭ খৃস্টাব্দের পর থেকে নিজের দেশে তাদের অধিকার আরম্ভ হয়েছে; রাষ্ট্রব্যবস্থা আটে-ঘাটে পাকা হবার মতো সময় এবং সম্বল তারা পায় নি; ঘরে-বাইরে প্রতিকূলতা; তাদের মধ্যে আত্মবিদ্রোহ সমর্থন করবার জন্যে ইংরেজ এমন-কি আমেরিকানরাও গোপনে ও প্রকাশ্যে চেষ্টা করছে। জনসাধারণকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে তারা যে পণ করেছে তার 'ডিফিকাল্‌টি' ভারতকর্তৃপক্ষের ডিফিকাল্‌টির চেয়ে বহুগুণে বড়ো।

অতএব রাশিয়ায় গিয়ে বেশি কিছু দেখতে পাব এরকম আশা করা অন্যায় হত। কীই বা জানি, কীই বা দেখেছি যাতে আমাদের আশার জোর বেশি হতে পারে। আমাদের দুঃখী দেশে লালিত অতিদুর্বল আশা নিয়ে রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখলুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। 'ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার' কী পরিমাণে রক্ষিত হচ্ছে বা না হচ্ছে তার তদন্ত করবার যথেষ্ট সময় পাই নি— শোনা যায়, যথেষ্ট জবরদস্তি

আছে ; বিনা বিচারে দ্রুত পদ্ধতিতে শাস্তি, সেও চলে ; আর-সব বিষয়ে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে নেই। এটা তো হল চাঁদের কলঙ্কের দিক, কিন্তু আমার দেখবার প্রধান লক্ষ্য ছিল আলোকের দিক। সে দিকটাতে যে দীপ্তি দেখা গেল সে অতি আশ্চর্য— যারা একেবারেই অচল ছিল তারা সচল হয়ে উঠেছে।

শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় এক মুহূর্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেছে। এখানে তাই হল ; দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে, পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানবসমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত-হাতিয়ার স্ববশ।

আমাদের সম্রাট্‌বংশীয় খৃস্টান পাদ্রিরা বহুকাল ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন, ডিফিকাল্‌টিজ যে কিরকম অনড় তা তাঁরা দেখে এসেছেন। একবার তাঁদের মস্কৌ আসা উচিত। কিন্তু এলে বিশেষ ফল হবে না। কারণ বিশেষ করে কলঙ্ক দেখাই তাঁদের ব্যাবসা-গত অভ্যাস ; আলো চোখে পড়ে না, বিশেষত যাদের উপর বিরাগ আছে। ভুলে যান তাঁদের শাসনচন্দ্রেও কলঙ্ক খুঁজে বের করতে বড়ো চশমার দরকার করে না।

প্রায় সত্তর বছর আমার বয়স হল ; এতকাল আমার ধৈর্যচ্যুতি হয় নি। নিজেদের দেশের অতি দুর্বহ মূঢ়তার বোঝার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকেই বেশি করে দোষ দিয়েছি। অতি সামান্য শক্তি নিয়ে অতি সামান্য প্রতিকারের চেষ্টাও করেছি, কিন্তু জীর্ণ আশার রথ যত মাইল চলেছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় দড়ি ছিঁড়েছে, চাকা ভেঙেছে। দেশের হতভাগাদের দুঃখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়েছি। কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চেয়েছি ; তাঁরা বাহবাও দিয়েছেন ; যেটুকু ভিক্ষে দিয়েছেন তাতে জাত যায় পেট ভরে না। সব চেয়ে দুঃখ এবং লজ্জার কথা এই যে, তাঁদের প্রসাদলালিত আমাদের স্বদেশী জীবরাই সব চেয়ে বাধা দিয়েছে। যে দেশ পরের কর্তৃত্বে চালিত সেই দেশে সব চেয়ে গুরুতর ব্যাধি হল এই— সে-সব জায়গায় দেশের লোকের মনে যে ঈর্ষা যে ক্ষুদ্রতা যে স্বদেশবিরুদ্ধতার কলুষ জন্মায় তার মতো বিষ নেই।

বাইরের সকল কাজের উপরেও একটা জিনিস আছে যেটা আত্মার সাধনা। রাষ্ট্রিক আর্থিক নানা গোলেমালে যখন মনটা আবিল হয়ে ওঠে তখন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে বলেই তার জোর কমে যায়। আমার মধ্যে যে বিপদ আছে, সেই-জন্যেই আসল জিনিসকে আঁকড়ে ধরতে চাই। কেউ বা আমাকে উপহাস করে, কেউ বা আমার উপর রাগ করে, তাদের নিজের পথেই আমাকে টেনে নিতে চায়। কিন্তু

কোথা থেকে জানি নে আমি এসেছি এই পৃথিবীর তীর্থে, আমার পথ আমার তীর্থ-দেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েছেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্মাল্য ললাটে প'রে যাই তখন সব জাতের লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে। যখন ভারতবর্ষীয়ের মুখোস পরে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর। যখন আমাকে এরা মানুষরূপে দেখে তখনই এরা আমাকে ভারতবর্ষীয়রূপেই শ্রদ্ধা করে; যখন নিছক ভারতবর্ষীয়রূপে দেখা দিতে চাই তখন এরা আমাকে মানুষরূপে সমাদর করতে পারে না। আমার স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে আমার চলবার পথ ভুল-বোঝার দ্বারা বন্ধুর হয়ে ওঠে। আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে; অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।

আমার এখানকার খবর সত্য মিথ্যা নানাভাবে দেশে গিয়ে পৌঁছয়। সে সম্বন্ধে সব সময় উদাসীন থাকতে পারি নে বলে নিজের উপর ধিক্‌কার জন্মে। বার বার মনে হয়, বানপ্রস্থের বয়সে সমাজস্থের মতো ব্যবহার করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়।

যাই হোক এ দেশের 'এনর্মাস্ ডিফিকাল্‌টিজ'এর কথা বইয়ে পড়েছিলুম, কানে শুনেছিলুম, কিন্তু সেই ডিফিকাল্‌টিজ অতিক্রমণের চেহারা চোখে দেখলুম। ইতি

৪ অক্টোবর ১৯৩০

৯

ব্রেমেন জাহাজ

আমাদের দেশে পলিটিক্‌স্‌কে যারা নিছক পালোয়ানি বলে জানে সব-রকম ললিতকলাকে তারা পৌরুষের বিরোধী বলে ধরে রেখেছেন। এ সম্বন্ধে আমি আগেই লিখেছি। রাশিয়ার জার ছিল একদিন দশাননের মতো সম্রাট; তার সাম্রাজ্য পৃথিবীর অনেকখানিকেই অজগর সাপের মতো গিলে ফেলেছিল, লেজের পাকে যাকে সে জড়িয়েছে তার হাড়গোড় দিয়েছে পিষে।

প্রায় বছর-তেরো হল এরই প্রতাপের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঝুটোপুটি বেধে গিয়েছিল। সম্রাট যখন গুষ্টিসুদ্ধ গেল সরে তখনো তার সাঙ্গোপাঙ্গরা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল, তাদের অস্ত্র এবং উৎসাহ জোগালে অপর সাম্রাজ্যভোগীরা। বুঝতেই পারছ ব্যাপার-খানা সহজ ছিল না। একদা যারা ছিল সম্রাটের উপগ্রহ, ধনীর দল, চাষীদের 'পরে যাদের ছিল অসীম প্রভুত্ব, তাদের সর্বনাশ বেধে গেল। লুটপাট কাড়াকাড়ি চলল;

তাদের বহুমূল্য ভোগের সামগ্রী ছারখার করবার জন্যে প্রজারা হন্যে হয়ে উঠেছে। এতবড়ো উচ্ছৃঙ্খল উৎপাতের সময় বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে কড়া হুকুম এসেছে— আর্ট্-সামগ্রীকে কোনোমতে যেন নষ্ট হতে দেওয়া না হয়। ধনীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে ছাত্ররা অধ্যাপকেরা অর্ধ-অভুক্ত শীতক্লিষ্ট অবস্থায় দল বেঁধে যা-কিছু রক্ষাযোগ্য জিনিস সমস্ত উদ্ধার করে য়ুনিভার্সিটির ম্যুজিয়মে সংগ্রহ করতে লাগল।

মনে আছে আমরা যখন চীনে গিয়েছিলুম কী দেখেছিলুম। য়ুরোপের সাম্রাজ্য-ভোগীরা পিকিনের বসন্তপ্রাসাদকে কিরকম ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, বহু যুগের অমূল্য শিল্পসামগ্রী কিরকম লুটে পুটে ছিঁড়ে ভেঙে দিয়েছে উড়িয়ে-পুড়িয়ে। তেমন সব জিনিস জগতে আর কোনোদিন তৈরি হতেই পারবে না।

সোভিয়েটরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্যে সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার, বর্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয় নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্যে জমি চাষ করে এসেছে এরা তাদের যে কেবল জমির স্বত্ব দিয়েছে তা নয়; জ্ঞানের জন্যে, আনন্দের জন্যে, মানবজীবনের যা-কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে; শুধু পেটের ভাত পশুর পক্ষে যথেষ্ট, মানুষের পক্ষে নয়— এ কথা তারা বুঝেছিল এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পক্ষে পালোয়ানির চেয়ে আর্টের অনুশীলন অনেক বড়ো এ কথা তারা স্বীকার করেছে।

এদের বিপ্লবের সময় উপরতলার অনেক জিনিস নীচে তলিয়ে গেছে এ কথা সত্য, কিন্তু টিঁকে রয়েছে এবং ভরে উঠেছে ম্যুজিয়ম থিয়েটর লাইব্রেরি সংগীতশালা।

আমাদের দেশের মতোই একদা এদের গুণীর গুণপনা প্রধানত ধর্মমন্দিরেই প্রকাশ পেত। মোহন্তেরা নিজের স্থূল রুচি নিয়ে তার উপরে যেমন-খুশি হাত চালিয়েছে। আধুনিক শিক্ষিত ভক্ত বাবুরা পুরীর মন্দিরকে যেমন চুনকাম করতে সংকুচিত হয় নি, তেমনি এখানকার মন্দিরের কর্তারা আপন সংস্কার-অনুসারে সংস্কৃত করে প্রাচীন কীর্তিকে অবাধে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে— তার ঐতিহাসিক মূল্য যে সর্ব-জনের সর্বকালের পক্ষে এ কথা তারা মনে করে নি, এমন-কি পুরোনো পুজোর পাত্র-গুলিকে নূতন করে ঢালাই করেছে। আমাদের দেশেও মঠে মন্দিরে অনেক জিনিস আছে, ইতিহাসের পক্ষে যা মূল্যবান। কিন্তু কারো তা ব্যবহার করবার জো নেই— মোহন্তেরাও অতলস্পর্শ মোহে মগ্ন— সেগুলিকে ব্যবহার করবার মতো বুদ্ধি ও বিদ্যার ধার ধারে না; ক্ষিতিবাবুর কাছে শোনা যায়, প্রাচীন অনেক পুঁথি মঠে মঠে আটক পড়ে আছে, দৈত্যপুরীতে রাজকন্যার মতো, উদ্ধার করবার উপায় নেই।

বিপ্লবীরা ধর্মমন্দিরের সম্পত্তির বেড়া ভেঙে দিয়ে সমস্তকেই সাধারণের সম্পত্তি করে

দিয়েছে। যেগুলি পূজার সামগ্রী সেগুলি রেখে বাকি সমস্ত জমা করা হচ্ছে ম্যুজিয়মে। এক দিকে যখন আত্মবিপ্লব চলছে, যখন চার দিকে টাইফয়িডের প্রবল প্রকোপ, রেলের পথ সব উৎখাত, সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক সন্ধানীর দল গিয়েছে প্রত্যন্তপ্রদেশ সমস্ত হাৎড়িয়ে পুরাকালীন শিল্পসামগ্রী উদ্ধার করবার জন্যে। কত পুঁথি কত ছবি কত খোদকারির কাজ সংগ্রহ হল তার সীমা নেই।

এ তো গেল ধনীগৃহে বা ধর্মমন্দিরে যা-কিছু পাওয়া গেছে তারই কথা। দেশের সাধারণ চাষীদের, কর্মিকদের কৃত শিল্পসামগ্রী, পূর্বতন কালে যা অবজ্ঞাভাজন ছিল তার মূল্য নিরূপণ করবার দিকেও দৃষ্টি পড়েছে। শুধু ছবি নয়, লোকসাহিত্য লোকসংগীত প্রভৃতি নিয়েও প্রবলবেগে কাজ চলছে।

এই তো গেল সংগ্রহ, তার পরে এই-সমস্ত সংগ্রহ নিয়ে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা। ইতিপূর্বেই তার বিবরণ লিখেছি। এত কথা যে তোমাকে লিখছি তার কারণ এই, দেশের লোককে আমি জানাতে চাই, আজ কেবলমাত্র দশ বছরের আগেকার রাশিয়ার জনসাধারণ আমাদের বর্তমান জনসাধারণের সমতুল্যই ছিল ; সোভিয়েট শাসনে এই-জাতীয় লোককেই শিক্ষার দ্বারা মানুষ করে তোলবার আদর্শ কতখানি উচ্চ। এর মধ্যে বিজ্ঞান সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা সমস্তই আছে— অর্থাৎ আমাদের দেশের ভদ্রনামধারীদের জন্যে শিক্ষার যে আয়োজন তার চেয়ে অনেক গুণেই সম্পূর্ণতর।

কাগজে পড়লুম, সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন উপলক্ষে হুকুম পাস হয়েছে প্রজাদের কান ম'লে শিক্ষাকর আদায় করা, এবং আদায়ের ভার পড়েছে জমিদারের 'পরে। অর্থাৎ যারা অমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েছে শিক্ষার ছুতো করে তাদেরই মার বাড়িয়ে দেওয়া।

শিক্ষাকর চাই বইকি, নইলে খরচ জোগাবে কিসে। কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যে যে কর, কেন দেশের সবাই মিলে সে কর দেবে না। সিভিল সার্ভিস আছে, মিলিটারি সার্ভিস আছে, গভর্নর ভাইসরয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন, কেন তাঁদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত দেবার জো নেই। তাঁরা কি এই চাষীদের অন্নের ভাগ থেকেই বেতন নিয়ে ও পেনসন নিয়ে অবশেষে দেশে গিয়ে ভোগ করেন না। পাটকলের যে-সব বড়ো বড়ো বিলাতি মহাজন পাটের চাষীর রক্ত দিয়ে মোটা মুনফার সৃষ্টি করে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় চাষীদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের কোনোই দায়িত্ব নেই ? যে-সব মিনিস্টার শিক্ষা-আইন পাস নিয়ে ভরা পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁদের উৎসাহের কানাকড়ি মূল্যও কি তাঁদের নিজের তহবিল থেকে দিতে হবে না।

একেই বলে শিক্ষার জন্যে দরদ ? আমি তো একজন জমিদার, আমার প্রজাদের

প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে কিছু দিয়েও থাকি— আরো দ্বিগুণ তিনগুণ যদি দিতে হয় তো তাও দিতে রাজি আছি, কিন্তু এই কথাটা প্রতিদিন তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হবে যে, আমি তাদের আপন লোক, তাদের শিক্ষায় আমারই মঙ্গল এবং আমিই তাদের দিচ্ছি, দিচ্ছে না এই রাজ্যশাসকদের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন শ্রেণীর একজনও এক পয়সাও।

সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণের উন্নতিবিধানের চাপ খুবই বেশি, সেজন্যে আহারে বিহারে লোকে কষ্ট পাচ্ছে কম নয়, কিন্তু এই কষ্টের ভাগ উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সকলেই নিয়েছে। তেমন কষ্টকে তো কষ্ট বলব না, সে যে তপস্যা। প্রাথমিক শিক্ষার নামে কণামাত্র শিক্ষা চালিয়ে ভারত-গবর্মেণ্ট এতদিন পরে দু-শো বছরের কলঙ্ক মোচন করতে চান— অথচ তার দাম দেবে তারাই যারা দাম দিতে সকলের চেয়ে অক্ষম ; গবর্মেণ্টের প্রশ্রয়লালিত বহ্বাশী বাহন যারা তারা নয়, তারা আছে গৌরব ভোগ করবার জন্যে।

আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে, দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে। মানুষকে যারা কেবলই ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনোখানে আছে।

অনেক কথা বলবার আছে। এরকম তথ্য সংগ্রহ করে লেখা আমার অভ্যস্ত নয়, কিন্তু না-লেখা আমার অন্যায় হবে বলে লিখতে বসেছি। রাশিয়ার শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে লিখব বলে আমার সংকল্প আছে। কতবার মনে হয়েছে আর-কোথাও নয়, রাশিয়ায় এসে একবার তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিত। ভারতবর্ষ থেকে অনেক চর সেখানে যায়, বিপ্লবপন্থীরাও আনাগোনা করে ; কিন্তু আমার মনে হয় কিছুর জন্যে নয়, কেবল শিক্ষাসম্বন্ধে শিক্ষা করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার।

যাক, আমার নিজের খবর দিতে উৎসাহ পাই নে। আমি যে আর্টিস্ট্ এই অভিমান মনে প্রবল হবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত বাইরে খ্যাতি পেয়েছি, অন্তরে পৌঁছয় না। কেবলই মনে হয়, দৈবগুণে পেয়েছি, নিজগুণে নয়।

ভাসছি এখন মাঝ-সমুদ্রে। পারে গিয়ে কপালে কী আছে জানি নে। শরীর

ক্লান্ত, মন অনিচ্ছুক। শূন্য ভিক্ষাপাত্রের মতো ভারী জিনিস জগতে আর কিছুই নেই, সেটা জগন্নাথকে শেষ নিবেদন করে দিয়ে কবে আমি ছুটি পাব। ইতি ৫ অক্টোবর ১৯৩০

১০

D. 'Bremen'

বিজ্ঞানশিক্ষায় পুঁথির পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বারো-আনা ফাঁকি হয়। শুধু বিজ্ঞান কেন, অধিকাংশ শিক্ষাতেই এ কথা খাটে। রাশিয়াতে বিবিধ বিষয়ের ম্যুজিয়মের যোগে সেই শিক্ষার সহায়তা করা হয়েছে। এই ম্যুজিয়ম শুধু বড়ো বড়ো শহরে নয়, প্রদেশে প্রদেশে, সামান্য পল্লীগ্রামের লোকেরও আয়ত্তগোচরে।

চোখে দেখে শেখার আর-একটা প্রণালী হচ্ছে ভ্রমণ। তোমরা তো জান'ই আমি অনেক দিন থেকেই ভ্রমণ-বিদ্যালয়ের সংকল্প মনে বহন করে এসেছি। ভারতবর্ষ এতবড়ো দেশ, সকল বিষয়েই তার এত বৈচিত্র্য বেশি যে, তাকে সম্পূর্ণ করে উপলব্ধি করা হণ্টারের গেজেটিয়র পড়ে হতে পারে না। এক সময়ে পদব্রজে তীর্থভ্রমণ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল— আমাদের তীর্থগুলিও ভারতবর্ষের সকল অংশে ছড়ানো। ভারতবর্ষকে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার এই ছিল উপায়। শুধুমাত্র শিক্ষাকে লক্ষ্য করে পাঁচ বছর ধরে ছাত্রদের যদি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়ে নেওয়া যায় তা হলে তাদের শিক্ষা পাকা হয়।

মন যখন সচল থাকে সে তখন শিক্ষার বিষয়কে সহজে গ্রহণ ও পরিপাক করতে পারে। বাঁধা খোরাকের সঙ্গে সঙ্গেই ধেনুদের চ'রে খেতে দেওয়ারও দরকার হয়— তেমনি বাঁধা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চ'রে: শিক্ষা মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অচল বিদ্যালয়ে বন্দী হয়ে অচল ক্লাসের পুঁথির খোরাকিতে মনের স্বাস্থ্য থাকে না। পুঁথির প্রয়োজন একেবারে অস্বীকার করা যায় না— জ্ঞানের বিষয় মানুষের এত বেশি যে, ক্ষেত্রে গিয়ে তাদের আহরণ করবার উপায় নেই, ভাণ্ডার থেকেই তাদের বেশির ভাগ সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু পুঁথির বিদ্যালয়কে সঙ্গে করে নিয়ে যদি প্রকৃতির বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের বেড়িয়ে নিয়ে আসা যায় তা হলে কোনো অভাব থাকে না। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আমার মনে ছিল, আশা ছিল যদি সম্বল জোটে তবে কোনো-এক সময়ে শিক্ষাপরিব্রজন চালাতে পারব। কিন্তু আমার সময়ও নেই, সম্বলও জুটবে না।

সোভিয়েট রাশিয়ায় দেখছি সর্বসাধারণের জন্য দেশভ্রমণের ব্যবস্থা ফলাও করে তুলছে। বৃহৎ এদের দেশ, বিচিত্রজাতীয় মানুষ তার অধিবাসী। জার-শাসনের সময়ে এদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ জানাশোনা মেলামেশার সুযোগ ছিল না বললেই হয়। বলা বাহুল্য, তখন দেশভ্রমণ ছিল শখের জিনিস, ধনী লোকের পক্ষেই ছিল সম্ভব। সোভিয়েট আমলে সর্বসাধারণের জন্য তার উদ্যোগ। শ্রমক্লান্ত এবং রুগ্‌ণ কর্মিকদের শ্রান্তি এবং রোগ দূর করবার জন্যে প্রথম থেকেই সোভিয়েটরা দূরে নিকটে নানা স্থানে স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের চেষ্টা করেছে। আগেকার কালের বড়ো বড়ো প্রাসাদ তারা এই কাজে লাগিয়েছে। সে-সব জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম এবং আরোগ্যলাভ যেমন একটা লক্ষ্য তেমনি শিক্ষালাভ আর-একটা।

লোকহিতের প্রতি যাদের অনুরাগ আছে এই ভ্রমণ-উপলক্ষে তারা নানা স্থানে নানা লোকের আনুকূল্য করবার অবকাশ পায়। জনসাধারণকে দেশভ্রমণে উৎসাহ দেওয়া এবং তার সুবিধা করে দেওয়ার জন্যে পথের মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা-বিতরণের উপযোগী প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে, সেখানে পথিকদের আহারনিদ্রার ব্যবস্থা আছে, তা ছাড়া সকল-রকম দরকারি বিষয়ে তারা পরামর্শ পেতে পারে। ককেশীয় প্রদেশ ভূতত্ত্ব-আলোচনার উপযুক্ত স্থান। সেখানে এইরকম পান্থ-শিক্ষালয় থেকে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ পাবার আয়োজন আছে। যে-সব প্রদেশ বিশেষভাবে নৃতত্ত্ব-আলোচনার উপযোগী সে-সব জায়গায় পথিকদের জন্যে নৃতত্ত্ববিৎ উপদেশক তৈরি করে নেওয়া হয়েছে।

গ্রীষ্মের সময় হাজার হাজার ভ্রমণেচ্ছু আপিসে নাম রেজেস্ট্রি করে। যে মাস থেকে আরম্ভ করে দলে দলে নানা পথ বেয়ে প্রতিদিন যাত্রা চলে— এক-একটি দলে পঁচিশ-ত্রিশটি করে যাত্রী। ১৯২৮ খৃস্টাব্দে এই যাত্রীসংঘের সভ্যসংখ্যা ছিল তিন হাজারের কাছাকাছি— ২৯-এ হয়েছে বারো হাজারের উপর।

এ সম্বন্ধে য়ুরোপের অন্যত্র বা আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করা সংগত হবে না; সর্বদাই মনে রাখা দরকার হবে যে, রাশিয়ায় দশ বছর আগে শ্রমিকদের অবস্থা আমাদের মতোই ছিল— তারা শিক্ষা করবে, বিশ্রাম করবে বা আরোগ্য লাভ করবে, সেজন্যে কারো কোনো খেয়াল ছিল না— আজ এরা যে-সমস্ত সুবিধা সহজেই পাচ্ছে তা আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আশাতীত এবং ধনীদের পক্ষেও সহজ নয়। তা ছাড়া শিক্ষালাভের ধারা সমস্ত দেশ বেয়ে একসঙ্গে কত প্রণালীতে প্রবাহিত তা আমাদের সিবিল-সার্বিসে-পাওয়া দেশের লোকের পক্ষে ধারণা করাই কঠিন।

যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা তেমনি স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েট

রাশিয়ায় যেরকম বৈজ্ঞানিক অনুশীলন চলছে তা দেখে য়ুরোপ আমেরিকার পণ্ডিতেরা প্রচুর প্রশংসা করেছেন। শুধু মোটা বেতনের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পুঁথি সৃষ্টি করা নয়, সর্বজনের মধ্যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ যাতে পরিব্যাপ্ত হয়, এমন-কি এ দেশের চৌরঙ্গী থেকে যারা বহু দূরে থাকে তারাও যাতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে অযত্নে বা বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় সে দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে।

বাংলাদেশে ঘরে ঘরে যক্ষ্মারোগ ছড়িয়ে পড়ছে— রাশিয়া দেখে অবধি এ প্রশ্ন মন থেকে তাড়াতে পারছি নে যে, বাংলাদেশের এই-সব অল্পবিত্ত মুমূর্ষুদের জন্যে কটা আরোগ্যাশ্রম আছে। এ প্রশ্ন আমার মনে সম্প্রতি আরো জেগেছে এইজন্যে যে, খৃস্টান ধর্মযাজক ভারতশাসনে অসাধারণ ডিফিকল্‌টিজ নিয়ে আমেরিকার লোকের কাছে বিলাপ করছেন।

ডিফিকল্‌টিজ আছে বইকি। এক দিকে সেই ডিফিকল্‌টিজের মূলে আছে ভারতীয়দের অশিক্ষা, অপর দিকে ভারতশাসনের ভূরিব্যয়িতা। সেজন্যে দোষ দেব কাকে। রাশিয়ায় অন্নবস্ত্রের সচ্ছলতা আজও হয় নি, রাশিয়াও বহুবিস্তৃত দেশ, সেখানেও বহু বিচিত্র জাতির বাস, সেখানেও অজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনাচার ছিল পর্বতপ্রমাণ; কিন্তু শিক্ষাও বাধা পাচ্ছে না, স্বাস্থ্যও না। সেইজন্যেই প্রশ্ন না করে থাকা যায় না, ডিফিকল্‌টিজটা ঠিক কোন্‌খানে।

যারা খেটে খায় তারা সোভিয়েট স্বাস্থ্যনিবাসে বিনাব্যয়ে থাকতে পারে, তা ছাড়া এই স্বাস্থ্যনিবাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকে আরোগ্যালয় (sanatorium)। সেখানে শুধু চিকিৎসা নয়, পথ্য ও শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। এই-সমস্ত ব্যবস্থাই সর্বসাধারণের জন্যে। সেই সর্বসাধারণের মধ্যে এমন-সব জাত আছে যারা য়ুরোপীয় নয় এবং য়ুরোপীয় আদর্শ -অনুসারে যাদের অসভ্য বলা হয়ে থাকে।

এইরকম পিছিয়ে-পড়া জাত, যারা য়ুরোপীয় রাশিয়ার প্রাঙ্গণের ধারে বা বাইরে বাস করে তাদের শিক্ষার জন্য ১৯২৮ খৃস্টাব্দের বজেটে কত টাকা ধরে দেওয়া হয়েছে তা দেখলে শিক্ষার জন্যে কী উদার প্রয়াস তা বুঝতে পারবে। য়ুক্রেনিয়ান রিপব্লিকের জন্য ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ, অতি-ককেশীয় রিপব্লিকের জন্য ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ, উজবেকিস্তানের জন্য ৯ কোটি ৭০ লক্ষ, তুর্কমেনিস্তানের জন্য ২ কোটি ৯ লক্ষ রুব্‌ল্‌।

অনেক দেশে আরবী অক্ষরের চলন থাকাতে শিক্ষাবিস্তারের বাধা হচ্ছিল, সেখানে রোমক বর্ণমালা চালিয়ে দেওয়াতে শিক্ষার কাজ সহজ হয়েছে।

যে বুলেটিন থেকে তথ্য সংগ্রহ করছি তারই দুটি অংশ তুলে দিই :

Another of the most important tasks in the sphere of culture is

undoubtedly the stabilization of local administrative institutions and the transfer of all local government and administrative work in the federative and autonomous republics to a language which is familiar to the toiling masses. This is by no means simple, and great efforts are still needed in this regard, owing to the low cultural level of the mass of the workers and peasants, and lack of sufficient skilled labour.

একটুখানি ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সোভিয়েট সম্মিলনীর অন্তর্গত কতকগুলি রিপব্লিক ও স্বতন্ত্রশাসিত (autonomous) দেশ আছে। তারা প্রায়ই য়ুরোপীয় নয়, এবং তাদের আচারব্যবহার আধুনিক কালের সঙ্গে মেলে না। উদ্‌ধৃত অংশ থেকে বোঝা যাবে যে, সোভিয়েটদের মতে দেশের শাসনতন্ত্র দেশের লোকের শিক্ষারই একটা প্রধান উপায় ও অঙ্গ। আমাদের দেশের রাষ্ট্রচালনায় ভাষা যদি দেশের লোকের আপন ভাষা হত, তা হলে শাসনতন্ত্রের শিক্ষা তাদের পক্ষে সুগম হত। ভাষা ইংরেজি হওয়াতে শাসননীতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সাধারণের আয়ত্তাতীত হয়েই রইল। মধ্যস্থের যোগে কাজ চলছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগ রইল না। আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্রচালনার শিক্ষা ও অভ্যাস থেকে যেমন জনসাধারণ বঞ্চিত, দেশশাসননীতির জ্ঞান থেকেও তারা তেমনি বঞ্চিত। রাষ্ট্রশাসনের ভাষাও পরভাষা হওয়াতে পরাধীনতার নাগপাশের পাক আরো বেড়ে গেছে। রাজমন্ত্রসভায় ইংরেজি ভাষায় যে আলোচনা হয়ে থাকে তার সফলতা কতদূর আমি আনাড়ি তা বুঝি নে, কিন্তু তার থেকে প্রজাদের যে শিক্ষা হতে পারত তা একটুও হল না।

আর-একটা অংশ :

Whenever questions of cultural-economic construction in the national republics and districts come before the organs of the Soviet government, they are settled not on the lines of guardianship, but on the lines of the maximum development of independence among the board masses of workers and peasants and of initiative of the local Soviet organs.

যাদের কথা বলা হল তারা হচ্ছে পিছিয়ে-পড়া জাত। তাদের আগাগোড়া সমস্তই ডিফিকল্‌টিজ, কিন্তু এই ডিফিকল্‌টিজ সরিয়ে দেবার জন্যে সোভিয়েটরা দু-শো বছর চুপচাপ বসে থাকবার বন্দোবস্ত করে নি। ইতিমধ্যে দশ বছর কাজ করেছে। দেখে-শুনে ভাবছি, আমরা কি উজবেকদের চেয়ে, তুর্কমানীদের চেয়েও, পিছিয়ে-পড়া জাত। আমাদের ডিফিকল্‌টিজের মাপ কি এদের চেয়েও বিশগুণ বেশি।

একটা কথা মনে পড়ল। এদের এখানে খেলনার ম্যুজিয়ম আছে। এই খেলনা-

সংগ্রহের সংকল্প বহুকাল থেকে আমার মনের মধ্যে ঘুরেছে। তোমাদের নন্দনালয়ে কলাভাণ্ডারে এই কাজ অবশেষে আরম্ভও হল। রাশিয়া থেকে কিছু খেলনা পেয়েছি। অনেকটা আমাদেরই মতো।

পিছিয়ে-পড়া জাতের সম্বন্ধে আরো কিছু জানাবার আছে। কাল লিখব। পরশু সকালে পৌঁছব নিয়ুইয়র্কে— তার পরে লেখবার যথেষ্ট অবসর পাব কি না কে জানে। ইতি ৭ অক্টোবর ১৯৩০

১১

পিছিয়ে-পড়া জাতের শিক্ষার জন্যে সোভিয়েট রাশিয়ায় কিরকম উদ্যোগ চলছে সে কথা তোমাকে লিখেছি। আজ দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

উরাল পর্বতের দক্ষিণে বাষ্‌কিরদের বাস। জারের আমলে সেখানকার সাধারণ প্রজার অবস্থা আমাদের দেশের মতোই ছিল। তারা চির-উপবাসের ধার দিয়ে দিয়েই চলত। বেতনের হার ছিল অতি সামান্য, কোনো কারখানায় বড়োরকমের কাজ করবার মতো শিক্ষা ছিল না, অবস্থাগতিকে তাদের ছিল নিতান্তই মজুরের কাজ। বিপ্লবের পরে এই দেশের প্রজাদের স্বতন্ত্র শাসনের অধিকার দেবার চেষ্টা আরম্ভ হল।

প্রথমে যাদের উপর ভার পড়েছিল তারা ছিল আগেকার আমলের ধনী জোতদার, ধর্মযাজক এবং বর্তমানে আমাদের ভাষায় যাদের বলে থাকি শিক্ষিত। সাধারণের পক্ষে সেটাতে সুবিধা হল না। আবার এই সময়ে উৎপাত আরম্ভ করলে কল্‌চাকের সৈন্য। সে ছিল জার-আমলের পক্ষপাতী, তার পিছনে ছিল ক্ষমতাশালী বহিঃশত্রুদের উৎসাহ এবং আনুকূল্য। সোভিয়েটরা যদি বা তাদের তাড়ালে, এল ভীষণ দুর্ভিক্ষ। দেশে চাষ-বাসের ব্যবস্থা ছারখার হয়ে গেল।

১৯২২ খৃস্টাব্দ থেকে সোভিয়েট আমলের কাজ ঠিকমত শুরু হতে পেরেছে। তখন থেকে দেশে শিক্ষাদান এবং অর্থোৎপত্তির ব্যবস্থা প্রবলবেগে গড়ে উঠতে লাগল। এর আগে বাষ্‌কিরিয়াতে নিরক্ষরতা ছিল প্রায় সর্বব্যাপী। এই কয় বছরের মধ্যে এখানে আটটি নর্মাল স্কুল, পাঁচটি কৃষিবিদ্যালয়, একটি ডাক্তারি শিক্ষালয়, অর্থকরী বিদ্যা শেখাবার জন্যে দুটি, কারখানার কাজে হাত পাকাবার জন্যে সতেরোটি, প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে ২৪৯৫টি এবং মধ্য-প্রাথমিকের জন্যে ৮৭টি স্কুল শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাষ্‌কিরিয়াতে দুটি আছে সরকারি থিয়েটার, দুটি ম্যুজিয়ম, চোদ্দটি পৌরগ্রন্থাগার, ১১২টি গ্রামের পাঠগৃহ (reading room), ৩০টি সিনেমা শহরে এবং ৪৬টি গ্রামে,

চাষীরা কোনো উপলক্ষে শহরে এলে তাদের জন্যে বহুতর বাসা, ৮৯১টি খেলা ও আরামের জায়গা (recreation corners), তা ছাড়া হাজার হাজার কর্মী ও চাষীদের ঘরে রেডিয়ো প্রভৃতিযন্ত্র। বীরভূম জেলার লোক বাষ্কিরদের চেয়ে নিঃসন্দেহ স্বভাবত উন্নততর শ্রেণীর জীব। বাষকিরিয়ার সঙ্গে বীরভূমের শিক্ষা ও আরামের ব্যবস্থা মিলিয়ে দেখো। উভয় পক্ষের ডিফিকল্‌টিজেরও তুলনা করা কর্তব্য হবে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে যতগুলি রিপাবলিক হয়েছে তার মধ্যে তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান সব চেয়ে অল্পদিনের। তাদের পত্তন হয়েছে ১৯২৪ খৃস্টাব্দের অক্টোবরে, অর্থাৎ বছর-ছয়েকের চেয়েও তাদের বয়স কম। তুর্কমেনিস্তানের জনসংখ্যা সবশুদ্ধ সাড়ে দশ লক্ষ। এদের মধ্যে নয় লক্ষ লোক চাষের কাজ করে। কিন্তু নানা কারণে খেতের অবস্থা ভালো নয়, পশুপালনের সুযোগও তদ্রূপ।

এরকম দেশকে বাঁচাবার উপায় কারখানার কাজ খোলা, যাকে বলে industrialization। বিদেশী বা স্বদেশী ধনী মহাজনদের পকেট ভরাবার জন্যে কারখানার কথা হচ্ছে না, এখানকার কারখানার উপস্বত্ব সর্বসাধারণের। ইতিমধ্যেই একটা বড়ো সুতোর কল এবং রেশমের কল খোলা হয়েছে। আশকাবাদ শহরে একটা বৈদ্যুতজনন স্টেশন বসেছে, অন্যান্য শহরেও উদ্যোগ চলেছে। যন্ত্রচালনক্ষম শ্রমিক চাই, তাই বহুসংখ্যক তুর্কমেনি যুবকদের মধ্য-রুশিয়ার বড়ো বড়ো কারখানায় শিক্ষার জন্যে পাঠানো হয়ে থাকে। আমাদের যুবকদের পক্ষে বিদেশী-চালিত কারখানায় শিক্ষার সুযোগলাভ যে কত দুঃসাধ্য তা সকলেরই জানা আছে।

বুলেটিনে লিখছে, তুর্কমেনিস্তানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা এত কঠিন যে, তার তুলনা বোধ হয় অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বিরলবসতি জনসংস্থান দূরে দূরে, দেশে রাস্তার অভাব, জলের অভাব, লোকালয়ের মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো মরুভূমি, লোকের আর্থিক দুরবস্থা অত্যন্ত বেশি।

আপাতত মাথা-পিছু পাঁচ রুবল করে শিক্ষার খরচ পড়ছে। এ দেশের প্রজাসংখ্যার সিকি পরিমাণ লোক যাযাবর (nomads)। তাদের জন্যে প্রাথমিক পাঠশালার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডিং স্কুল খোলা হয়েছে, ইঁদারার কাছাকাছি, যেখানে বহু পরিবার মিলে আড্ডা করে সেইরকম জায়গায়। পড়ুয়াদের জন্যে খবরের কাগজও প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

মস্কো শহরে নদীতীরে সাবেক কালের একটি উদ্যানবেষ্টিত সুন্দর প্রাসাদে তুর্কমেনদের জন্য শিক্ষক শিক্ষিত করবার একটি বিদ্যাভবন (Turcomen People's Home of Education) স্থাপিত হয়েছে। সেখানে সম্প্রতি এক-শো তুর্কমেন ছাত্র শিক্ষা পাচ্ছে, বারো-তেরো বছর তাদের বয়স। এই বিদ্যাভবনের ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসন-

নীতি-অনুসারে। এই ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি কর্মবিভাগ আছে। যেমন স্বাস্থ্যবিভাগ, গার্হস্থ্যবিভাগ (household commission), ক্লাস-কমিটি। স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে দেখা হয়, সমস্ত মহলগুলি (compartments), ক্লাসগুলি, বাসের ঘর, আঙিনা পরিষ্কার আছে কি না। কোনো ছেলের যদি অসুখ করে, তা সে যতই সামান্য হোক, তার জন্যে ডাক্তার দেখাবার বন্দোবস্ত এই বিভাগের 'পরে। গার্হস্থ্যবিভাগের অন্তর্গত অনেকগুলি উপবিভাগ আছে। এই বিভাগের কর্তব্য হচ্ছে দেখা— ছেলেরা পরিষ্কার পরিপাটি আছে কি না। ক্লাসে পড়বার কালে ছেলেদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা ক্লাস-কমিটির কাজ। প্রত্যেক বিভাগ থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে অধ্যক্ষসভা গড়ে ওঠে। এই অধ্যক্ষসভার প্রতিনিধিরা স্কুল-কৌন্সিলে ভোট দেবার অধিকার পায়। ছেলেদের নিজেদের মধ্যে বা আর-কারো সঙ্গে বিবাদ হলে অধ্যক্ষসভা তার তদন্ত করে; এই সভার বিচার স্বীকার করে নিতে সব ছাত্রই বাধ্য।

এই বিদ্যাভবনের সঙ্গে একটি ক্লাব আছে। সেখানে অনেক সময়ে ছেলেরা নিজের ভাষায় নিজেরা নাট্যাভিনয় করে, গান-বাজনার সংগত হয়। ক্লাবের একটি সিনেমা আছে, তার থেকে মধ্য-এশিয়ার জীবনযাত্রার চিত্রাবলী ছেলেরা দেখতে পায়। এ ছাড়া দেওয়ালে-টাঙানো খবরের কাগজ বের করা হয়।

তুর্কমেনিস্তানের চাষের উন্নতির জন্যে সেখানে বহুসংখ্যক কৃষিবিদ্যার ওস্তাদ পাঠানো হচ্ছে। দু-শো'র বেশি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র খোলা হয়েছে। তা ছাড়া জল এবং জমি ব্যবহার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হল তাতে কুড়ি হাজার দরিদ্রতম কৃষক-পরিবার কৃষির খেত, জল এবং কৃষির বাহন পেয়েছে।

এই বিরলপ্রজ দেশে ১৩০টা হাসপাতাল খোলা হয়েছে, ডাক্তারের সংখ্যা ছয়-শো। বুলেটিনের লেখক সলজ্জ ভাষায় বলছেন:

However there is no occasion to rejoice in the fact since there are 2,640 inhabitants to each hospital bed and, as regards doctors, Turcmenistan must be relegated to the last place in the Union. We can boast of some attainments in the field of modernization and the struggle against crass ignorance, though again we must warn the reader that Turcmenistan being on a very low level of civilization has preserved a good many customs of the distant past. However, the recent laws, passed in order to combat the selling of women into marriage and child marriages had produced the desired effect.

তুর্কমেনিস্তানের মতো মরুপ্রদেশে ছয় বৎসরের মধ্যে আপাতত ১৩০টা হাসপাতাল স্থাপন করে এরা লজ্জা পায়— এমনতরো লজ্জা দেখা আমাদের অভ্যাস নেই ব'লে

বড়ো আশ্চর্য বোধ হল। আমাদের ভাগ্যদোষে বিস্তর 'ডিফিকল্‌টিজ' দেখতে পেলুম, সেগুলো নড়ে বসবার কোনো লক্ষণ দেখায় না তাও দেখলুম, কিন্তু বিশেষ লজ্জা দেখতে পাই নে কেন।

সত্যি কথা বলি, ইতিপূর্বে আমারও মনে দেশের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে আশা করবার মতো সাহস চলে গিয়েছিল। খৃস্টান পাদ্রির মতো আমিও ডিফিকল্‌টিজের হিসাব দেখে স্তম্ভিত হয়েছি— মনে মনে বলেছি, এত বিচিত্র জাতের মানুষ, এত বিচিত্র জাতের মূর্খতা, এত পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম, কী জানি কত কাল লাগবে আমাদের ক্লেশের বোঝা, আমাদের কলুষের আবর্জনা নড়াতে।

সাইমন কমিশনের ফসল যে আবহাওয়ায় ফলেছে স্বদেশ সম্বন্ধে আমার প্রত্যাশার ভীরুতা সেই আবহাওয়ারই। সোভিয়েট রাশিয়াতে এসে দেখলুম, এখানকার উন্নতির ঘড়ি আমাদেরই মতো বন্ধ ছিল, অন্তত জনসাধারণের ঘরে— কিন্তু বহু শত বছরের অচল ঘড়িতেও আট-দশ বছর দম লাগাতেই দিব্যি চলতে লেগেছে। এতদিন পরে বুঝতে পেরেছি আমাদের ঘড়িও চলতে পারত, কিন্তু দম দেওয়া হল না। ডিফিকল্‌টিজের মন্ত্র আওড়ানোতে এখন থেকে আর বিশ্বাস করতে পারব না।

এইবার বুলেটিন থেকে দুই-একটি অংশ উদ্‌ধৃত করে চিঠি শেষ করব :

The imperialist policy of the Czarist generals, after the conquest of Azerbaijan, consisted in converting the districts, inhabited by Mahommedans, into colonies destined to supply raw material to the central Russian markets.

মনে আছে অনেক কাল হল, পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় একদা রেশমগুটির চাষ প্রচলন সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন। তাঁরই পরামর্শ নিয়ে আমিও রেশমগুটির চাষ প্রবর্তনের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলুম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, রেশমগুটির চাষে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে যথেষ্ট আনুকূল্য পেয়েছিলেন। কিন্তু যতবার এই গুটি থেকে সুতো ও সুতো থেকে কাপড় বোনা চাষীদের মধ্যে চলতি করবার ইচ্ছা করেছেন ততবারই ম্যাজিস্ট্রেট দিয়েছেন বাধা।

The agents of the Czar's Government were ruthlessly carrying out the principle of 'Divide and Rule' and did all in their power to sow hatred and discord between the various races. National animosities were fostered by the Government and Mahommedans and Armenians were systematically incited against each other. The ever-recurring conflicts between these two nations at times assumed the form of massacres.

হাসপাতালের সংখ্যাল্পতা নিয়ে বুলেটিন-লেখক লজ্জা স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু একটা বিষয়ে গৌরব প্রকাশ না করে থাকতে পারেন নি :

It is an undoubted fact, which even the worst enemies of the Soviets cannot deny: for the last eight years the peace between the races of Azerbaijan has never been disturbed.

ভারতবর্ষের রাজত্বে লজ্জা-প্রকাশের চলন নেই, গৌরব-প্রকাশেরও রাস্তা দেখা যায় না।

এই লজ্জা স্বীকারের উপলক্ষে একটা কথা পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। বুলেটিনে আছে, সমস্ত তুর্কমেনিস্তানে শিক্ষার জন্য জন-পিছু পাঁচ রুবল খরচ হয়ে থাকে। রুবলের মূল্য আমাদের টাকার হিসাবে আড়াই টাকা। পাঁচ রুবল বলতে বোঝায় সাড়ে বারো টাকা। এই বাবদ কর আদায়ের কোনো একটা ব্যবস্থা হয়তো আছে, কিন্তু সেই কর আদায় উপলক্ষে প্রজাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটিয়ে দেবার কোনো আশঙ্কা নিশ্চয় সৃষ্টি করা হয় নি। ইতি ৮ অক্টোবর ১৯৩০। ব্রেমেন জাহাজ

১২

ব্রেমেন জাহাজ

তুর্কোমেনদের কথা পূর্বেই বলেছি, মরুভূমিবাসী তারা, দশ লক্ষ মানুষ। এই চিঠি তারই পরিশিষ্ট। সোভিয়েট গবর্মেণ্ট সেখানে কী কী বিদ্যায়তন-স্থাপনের সংকল্প করেছে তারই একটা ফর্দ তুলে দিচ্ছি।

Beginning with October 1st, 1930, the new budget year, a number of new scientific institutions and Institutes will be opened in Turcomenia, namely:

1. Turcomen Geological Committee
2. Turcomen Institute of Applied Botany
3. Institute for study and research of stock breeding
4. Institute of Hydrology and Geophysics
5. Institute for Economic Research
6. Chemico-Bacteriological Institute and Institute of Social Hygiene

The activity of all the scientific institutions of Turcomenia will be regulated by a special scientific management attached to the Council of People's Commissars of Turcomenia.

In connection with the removal of the Turcomen Government from Ashkhabad to Chardjni the construction of buildings for the following museums has been started: Historical, Agricultural, Industrial and Trade Museum, Art Museum, Museum of the Revolution. In addition, the construction of an Observatory, State Library, House of Published Books and House of Science and Culture is planned.

The Department of Language and Literature of the Institute of the Turcomen Culture has completed the revision and translation into Russian of Turcomenian poetry, including folk-lore material and old poetry texts.

Five itinerant cultural bases have been organized in Turcomenia. During the year 1930 two courses for training practical nurses and midwives were completed. Altogether 46 persons were graduated. All graduates are sent to the village.

ইতি ৮ অক্টোবর ১৯৩০

১৩

সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে কত বিবিধ রকমের উপায় অবলম্বন করা হয়েছে তার কিছু কিছু আভাস পূর্বের চিঠিপত্র থেকে পেয়ে থাকবে। আজ তোমাকে তারই মধ্যে একটা উদ্যোগের সংক্ষেপ বিবরণ লিখে পাঠাচ্ছি।

কিছুদিন হল মস্কৌ শহরে সাধারণের জন্য একটি আরামবাগ খোলা হয়েছে। বুলেটিনে তার নাম দিয়েছে Moscow Park of Education and Recreation। তার মধ্যে প্রধান মণ্ডপটি প্রদর্শনীর জন্যে। সেখানে ইচ্ছা করলে খবর পাওয়া যায় সমস্ত প্রদেশে কারখানার শতসহস্র শ্রমিকদের জন্যে কত ডিস্‌পেন্সারি খোলা হয়েছে, মস্কৌ প্রদেশে স্কুলের সংখ্যা কত বাড়ল; ম্যুনিসিপ্যাল বিভাগে দেখিয়েছে কত নতুন বাসাবাড়ি তৈরি হল, কত নতুন বাগান—শহরের কত বিষয়ে কতরকমের উন্নতি হয়েছে। নানারকমের মডেল আছে, পুরানো পাড়াগাঁ এবং আধুনিক পাড়াগাঁ, ফল ও সব্‌জি উৎপাদনের আদর্শ খেত, সোভিয়েট আমলে সোভিয়েট কারখানায় যে-সব যন্ত্র তৈরি হচ্ছে তার নমুনা, হাল আমলের কো-অপারেটিভ ব্যবস্থায় কী রুটি তৈরি হচ্ছে আর ওদের বিপ্লবের সময়েতেই বা কিরকম হত। তা ছাড়া নানা তামাশা, নানা খেলার জায়গা, একটা নিত্য-মেলার মতো আর-কি!

পার্কের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জায়গা কেবল ছোটো ছেলেদের জন্যে, সেখানে বয়স্ক

লোকেদের প্রবেশ নিষেধ, সেখানকার প্রবেশদ্বারে লেখা আছে 'ছেলেদের উৎপাত কোরো না'। এইখানে ছেলেদের যতরকম খেলনা, খেলা, ছেলেদের থিয়েটার— সে থিয়েটারের ছেলেরাই চালক, ছেলেরাই অভিনেতা।

এই ছেলেদের বিভাগ থেকে কিছু দূরে আছে creche, বাংলায় তার নাম দেওয়া যেতে পারে শিশুরক্ষণী। মা-বাপ যখন পার্কে ঘুরে বেড়াতে প্রবৃত্ত তখন এই জায়গায় ধাত্রীদের জিম্মায় ছোটো শিশুদের রেখে যেতে পারে। একটা দোতলা মণ্ডপ (pavillion) আছে ক্লাবের জন্য। উপরের তলায় লাইব্রেরি। কোথাও বা সতরঞ্চ-খেলার ঘর, কোথাও আছে মানচিত্র আর দেয়ালে-ঝোলানো খবরের কাগজ। তা ছাড়া সাধারণের জন্যে আহারের বেশ ভালো কো-অপারেটিভ দোকান আছে, সেখানে মদ বিক্রি বন্ধ। মস্কো পশুশালাবিভাগ থেকে এখানে একটা দোকান খুলেছে ; এই দোকানে নানারকম পাখি মাছ চারাগাছ কিনতে পাওয়া যায়। প্রাদেশিক শহরগুলিতেও এইরকমের পার্ক্ খোলবার প্রস্তাব আছে।

যেটা ভেবে দেখবার বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে, জনসাধারণকে এরা ভদ্রসাধারণের উচ্ছিষ্টে মানুষ করতে চায় না। শিক্ষা, আরাম, জীবনযাত্রার সুযোগ সমস্তই এদের ষোলো-আনা পরিমাণে। তার প্রধান কারণ, জনসাধারণ ছাড়া এখানে আর-কিছুই নেই। এরা সমাজগ্রন্থের পরিশিষ্ট অধ্যায় নয় ; সকল অধ্যায়েই এরা।

আর-একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। মস্কো শহর থেকে কিছু দূরে সাবেক কালের একটি প্রাসাদ আছে। রাশিয়ার প্রাচীন অভিজাত বংশীয় কাউন্ট আপ্রাকৃসিনদের সেই ছিল বাসভবন। পাহাড়ের উপর থেকে চারি দিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখতে— শস্যক্ষেত্র, নদী এবং পার্বত্য অরণ্য। দুটি আছে সরোবর, আর অনেকগুলি উৎস। থামওয়ালা বড়ো বড়ো প্রকোষ্ঠ, উঁচু বারান্দা, প্রাচীনকালের আসবাব ছবি ও পাথরের মূর্তি দিয়ে সাজানো দরবারগৃহ ; এ ছাড়া আছে সংগীতশালা, খেলার ঘর, লাইব্রেরি, নাট্যশালা ; এ ছাড়া অনেকগুলি সুন্দর বহির্ভবন বাড়িটিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে আছে।

এই বৃহৎ প্রাসাদে অল্‌গভো নাম দিয়ে একটি কো-অপারেটিভ স্বাস্থ্যাগার স্থাপন করা হয়েছে, এমন সমস্ত লোকদের জন্য যারা একদা এই প্রাসাদে দাসশ্রেণীতে গণ্য হত। সোভিয়েট রাষ্ট্রসংঘে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, শ্রমিকদের জন্যে বাসা-নির্মাণ যার প্রধান কর্তব্য ; সেই সোসাইটির নাম বিশ্রান্তিনিকেতন : The Home of Rest। এই অল্‌গভো তারই তত্ত্বাবধানে।

এমনতরো আরো চারটে সানাটোরিয়ম এর হাতে আছে। খাটুনির ঋতুকাল

শেষ হয়ে গেলে অন্তত ত্রিশ হাজার শ্রমক্লান্ত এই পাঁচটি আরোগ্যশালায় এসে বিশ্রাম করতে পারবে। প্রত্যেক লোক এক পক্ষকাল এখানে থাকতে পারে। আহারের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত, আরামের ব্যবস্থা যথেষ্ট, ডাক্তারের ব্যবস্থাও আছে। কো-অপারেটিভ প্রণালীতে এইরকম বিশ্রান্তিনিকেতন স্থাপনের উদ্যোগ ক্রমশই সাধারণের সম্মতি লাভ করছে।

আর-কিছু নয়, শ্রমিকদের বিশ্রামের প্রয়োজন এমনভাবে আর-কোথাও কেউ চিন্তাও করে নি, আমাদের দেশের অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষেও এরকম সুযোগ দুর্লভ।

শ্রমিকদের জন্যে এদের ব্যবস্থা কিরকম সে তো শুনলে, এখন শিশুদের সম্বন্ধে এদের বিধান কিরকম সে কথা বলি। শিশু জারজ কিংবা বিবাহিত দম্পতির সন্তান সে সম্বন্ধে কোনো পার্থক্য এরা গণ্যই করে না। আইন এই যে, শিশু যে-পর্যন্ত না আঠারো বছর বয়সে সাবালক হয় সে-পর্যন্ত তাদের পালনের ভার বাপ-মায়ের। বাড়িতে তাদের কী ভাবে পালন করা বা শিক্ষা দেওয়া হয় স্টেট সে সম্বন্ধে উদাসীন নয়। ষোলো বছর বয়সের পূর্বে সন্তানকে কোথাও খাটুনির কাজে নিযুক্ত করতে পারবে না। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তাদের কাজের সময়-পরিমাণ ছয় ঘণ্টা। ছেলেদের প্রতি পিতামাতা আপন কর্তব্য করছে কি না তার তদারকের ভার অভিভাবক-বিভাগের 'পরে। এই বিভাগের কর্মচারী মাঝে মাঝে পরিদর্শন করতে আসে, দেখে ছেলেদের স্বাস্থ্য কিরকম আছে, পড়াশুনো কিরকম চলছে। যদি দেখা যায় ছেলেদের প্রতি অযত্ন হচ্ছে তা হলে বাপ-মায়ের হাত থেকে ছেলেদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তবু ছেলেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকে বাপ-মায়েরই। এইরকম ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার ভার পড়ে সরকারী অভিভাবক-বিভাগের।

ভাবখানা এই, সন্তানেরা কেবল তো বাপ-মায়ের নয়, মুখ্যত সমস্ত সমাজের। তাদের ভালোমন্দ নিয়ে সমস্ত সমাজের ভালোমন্দ। এরা যাতে মানুষ হয়ে ওঠে তার দায়িত্ব সমাজের, কেননা তার ফল সমাজেরই। ভেবে দেখতে গেলে পরিবারের দায়িত্বের চেয়ে সমাজের দায়িত্ব বেশি বই কম নয়। জনসাধারণ সম্বন্ধেও এদের মনের ভাব ঐরকমেরই। এদের মতে জনসাধারণের অস্তিত্ব প্রধানত বিশিষ্টসাধারণের সুযোগ-সুবিধার জন্যে নয়। তারা সমগ্র সমাজের অঙ্গ, সমাজের কোনো বিশেষ অঙ্গের প্রত্যঙ্গ নয়। অতএব তাদের জন্য দায়িত্ব সমস্ত স্টেটের। ব্যক্তিগতভাবে নিজের ভোগের বা প্রতাপের জন্য কেউ সমগ্র সমাজকে ডিঙিয়ে যেতে গেলে চলবে না।

যাই হোক, মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে

তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্ট্‌দেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায়, ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে। এইরকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মতো ভালো ফল দিতেও পারে, কিন্তু কখনোই চিরদিন পারে না। উপযুক্তমত নায়ক পরম্পরাক্রমে পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

তা ছাড়া, অবাধ ক্ষমতার লোভ মানুষের বুদ্ধিবিকার ঘটায়। একটা সুবিধার কথা এই যে, যদিও সোভিয়েট মূলনীতি সম্বন্ধে এরা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দয়ভাবে পীড়ন করতে কুণ্ঠিত হয় নি, তথাপি সাধারণভাবে শিক্ষার দ্বারা, চর্চার দ্বারা, ব্যক্তির আত্মনিহিত শক্তিকে বাড়িয়েই চলেছে— ফ্যাসিস্ট্‌দের মতো নিয়তই তাকে পেষণ করে নি। শিক্ষাকে আপন বিশেষ মতের একান্ত অনুবর্তী করে কতকটা গায়ের জোরে কতকটা মোহমন্ত্রের জোরে একঝোঁকা করে তুলেছে, তবুও সাধারণের বুদ্ধির চর্চা বন্ধ করে নি। যদিও সোভিয়েট নীতি -প্রচার সম্বন্ধে এরা যুক্তির জোরের উপরেও বাহুবলকে খাড়া করে রেখেছে, তবুও যুক্তিকে একেবারে ছাড়ে নি এবং ধর্মমূঢ়তা এবং সমাজপ্রথার অন্ধতা থেকে সাধারণের মনকে মুক্ত রাখবার জন্যে প্রবল চেষ্টা করেছে।

মনকে এক দিকে স্বাধীন করে অন্য দিকে জুলুমের বশ করা সহজ নয়। ভয়ের প্রভাব কিছুদিন কাজ করবে, কিন্তু সেই ভীরুতাকে ধিক্‌কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তার স্বাতন্ত্র্যের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবি করবেই। মানুষকে এরা দেহের দিকে নিপীড়িত করেছে, মনের দিকে নয়। যারা যথার্থই দৌরাত্ম্য করতে চায় তারা মানুষের মনকে মারে আগে; এরা মনের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তুলছে। এইখানেই পরিত্রাণের রাস্তা রয়ে গেল।

আজ আর ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যে পৌঁছব নিয়ুইয়র্কে। তার পরে আবার নতুন পালা। এরকম করে সাত ঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে আর ভালো লাগে না। এবারে এ অঞ্চলে না আসার ইচ্ছায় মনে অনেক তর্ক উঠেছিল, কিন্তু লোভই শেষকালে জয়ী হল। ইতি ৯ অক্টোবর ১৯৩০

১৪

ল্যান্স্‌ডাউন

ইতিমধ্যে দুই-একবার দক্ষিণ-দরজার কাছ ঘেঁষে গিয়েছি। মলয়-সমীরণের দক্ষিণদ্বার নয়, যে দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ু বেরোবার পথ খোঁজে। ডাক্তার বললে, নাড়ীর সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের মুহূর্তকালের যে বিরোধ ঘটেছিল সেটা যে অল্পের উপর দিয়েই কেটে গেছে এটাকে অবৈজ্ঞানিক ভাষায় মিরাক্‌ল্‌ বলা যেতে পারে। যাই হোক, যমদূতের ইশারা পাওয়া গেছে, ডাক্তার বলছে এখন থেকে সাবধান হতে হবে। অর্থাৎ, উঠে হেঁটে বেড়াতে গেলেই বুকের কাছটাতে বাণ এসে লাগবে— শুয়ে পড়লেই লক্ষ্য এড়িয়ে যাবে। তাই ভালোমানুষের মতো আধ-শোওয়া অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। ডাক্তার বলে, এমন করে বছর-দশেক নিরাপদে কাটতে পারে, তার পরে দশম দশাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। বিছানায় হেলান দিয়ে আছি, আমার লেখার লাইনও আমার দেহ-রেখার নকল করতে প্রবৃত্ত। রোসো, একটু উঠে বসি।

দেখলুম কিছু দুঃসংবাদ পাঠিয়েছ, শরীরের এ অবস্থায় পড়তে ভয় করে, পাছে ঢেউয়ের ঘায়ে ভাঙন লাগে। বিষয়টা কী তার আভাস পূর্বেই পেয়েছিলুম— বিস্তারিত বিবরণের ধাক্কা সহ্য করা আমার পক্ষে শক্ত। তাই আমি নিজে পড়ি নি, অমিয়কে পড়তে দিয়েছি।

যে বাঁধনে দেশকে জড়িয়েছে টান মেরে মেরে সেটা ছিঁড়তে হয়। প্রত্যেক টানে চোখের তারা উলটে যায়, কিন্তু এ ছাড়া বন্ধনমুক্তির অন্য উপায় নেই। ব্রিটিশরাজ নিজের বাঁধন নিজের হাতেই ছিঁড়ছে, তাতে আমাদের তরফে বেদনা যথেষ্ট, কিন্তু তার তরফে লোকসান কম নয়। সকলের চেয়ে বড়ো লোকসান এই যে, ব্রিটিশরাজ আপন মান খুইয়েছে। ভীষণের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ভয় করি, সেই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে, কিন্তু কাপুরুষের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণার দ্বারা ধিক্‌কৃত। এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতব।

সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেছি— দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা পুলিসের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের বোলো, এখনো অনেক বাকি আছে— তার কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তারা যেন এখনই বলতে শুরু না করে যে বড়ো লাগছে— সে কথা বললেই গুণ্ডার লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।

২০৷২২

দেশে বিদেশে ভারতবর্ষ আজ গৌরব লাভ করেছে কেবলমাত্র মারকে স্বীকার না করে— দুঃখকে উপেক্ষা করবার সাধনা আমরা যেন কিছুতে না ছাড়ি। পশুবল কেবলই চেষ্টা করছে আমাদের পশুকে জাগিয়ে তুলতে, যদি সফল হতে পারে তবেই আমরা হারব। দুঃখ পাচ্ছি সেজন্যে আমরা দুঃখ করব না। এই আমাদের প্রমাণ করবার অবকাশ এসেছে যে, আমরা মানুষ— পশুর নকল করতে গেলেই এই শুভযোগ নষ্ট হবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের বলতে হবে, ভয় করি নে। বাংলাদেশের মাঝে মাঝে ধৈর্য নষ্ট হয়, সেটাই আমাদের দুর্বলতা। আমরা যখন নখদন্ত মেলতে যাই তখনই তার দ্বারা নখীদন্তীদের সেলাম করা হয়। উপেক্ষা কোরো, নকল কোরো না। অশ্রুবর্ষণ নৈব নৈব চ।

আমার সব চেয়ে দুঃখ এই, যৌবনের সম্বল নেই। আমি পড়ে আছি গতিহীন হয়ে পান্থশালায়— যারা পথ চলছে তাদের সঙ্গে চলবার সময় চলে গেছে। ইতি ২৮ অক্টোবর ১৯৩০

উপসংহার

সোভিয়েট শাসনের প্রথম পরিচয় আমার মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে, সে কথা পূর্বেই বলেছি। তার কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে, সেটা আলোচনার যোগ্য।

সেখানকার যে ছবিটি আমার মনের মধ্যে মূর্তি নিয়েছে তার পিছনে দুলছে ভারতবর্ষের দুর্গতির কালো রঙের পটভূমিকা। এই দুর্গতির মূলে যে ইতিহাস আছে তার থেকে একটি তত্ত্ব পাওয়া যায়, সেই তত্ত্বটিকে চিন্তা করে দেখলে আলোচ্য প্রসঙ্গে আমার মনের ভাব বোঝা সহজ হবে।

ভারতবর্ষে মুসলমান-শাসন-বিস্তারের ভিতরকার মানসটি ছিল রাজমহিমালাভ। সেকালে সর্বদাই রাজ্য নিয়ে যে হাত-চালাচালি হত তার গোড়ায় ছিল এই ইচ্ছা। গ্রীসের সেকেন্দর শাহ ধূমকেতুর অনলোজ্জ্বল পুচ্ছের মতো তাঁর রণবাহিনী নিয়ে বিদেশের আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়িয়েছিলেন সে কেবল তাঁর প্রতাপ প্রসারিত করবার জন্যে। রোমকদেরও ছিল সেই প্রবৃত্তি। ফিনীশীয়েরা নানা সমুদ্রের তীরে তীরে বাণিজ্য করে ফিরেছে কিন্তু তারা রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করে নি।

একদা য়ুরোপ হতে বণিকের পণ্যতরী যখন পূর্ব-মহাদেশের ঘাটে ঘাটে পাড়ি জমালে তখন থেকে পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাসে এক নূতন পর্ব ক্রমশ অভিব্যক্ত হয়ে উঠল; ক্ষাত্রযুগ গেল চলে, বৈশ্যযুগ দেখা দিল। এই যুগে বণিকের দল বিদেশে এসে তাদের পণ্যহাটের খিড়কিমহলে রাজ্য জুড়ে দিতে লাগল। প্রধানত তারা মুনফার অঙ্ক বাড়াতে চেয়েছিল; বীরের সম্মান তাদের লক্ষ্য ছিল না। এই কাজে তারা নানা কুটিল পন্থা অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হয় নি; কারণ তারা চেয়েছিল সিদ্ধি, কীর্তি নয়।

এই সময় ভারতবর্ষ তার বিপুল ঐশ্বর্যের জন্য জগতে বিখ্যাত ছিল— তখনকার বিদেশী ঐতিহাসিকেরা সে কথা বারম্বার ঘোষণা করে গেছেন। এমন-কি স্বয়ং ক্লাইভ বলে গেছেন যে, "ভারতবর্ষের ধনশালিতার কথা যখন চিন্তা করে দেখি তখন অপহরণ-নৈপুণ্যে নিজের সংযমে আমি নিজেই বিস্মিত হই।" এই প্রভূত ধন, এ কখনো সহজে হয় না— ভারতবর্ষ এ ধন উৎপন্ন করেছিল। তখন বিদেশ থেকে যারা এসে এখানকার রাজাসনে বসেছে তারা এ ধন ভোগ করেছে, কিন্তু নষ্ট করে নি। অর্থাৎ তারা ভোগী ছিল, কিন্তু বণিক ছিল না।

তার পর বাণিজ্যের পথ সুগম করার উপলক্ষে বিদেশী বণিকেরা তাদের কারবারের গদিটার উপরে রাজতক্ত চড়িয়ে বসল। সময় ছিল অনুকূল। তখন মোগলরাজত্বে ভাঙন ধরেছে, মারাঠিরা শিখেরা এই সাম্রাজ্যের গ্রন্থিগুলো শিথিল করতে প্রবৃত্ত, ইংরেজের হাতে সেটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ধ্বংসের পথে।

পূর্বতন রাজগৌরবলোলুপেরা যখন এ দেশে রাজত্ব করত তখন এ দেশে অত্যাচার-অবিচার-অব্যবস্থা ছিল না এ কথা বলা চলে না। কিন্তু তারা ছিল এ দেশের অঙ্গীভূত। তাদের আঁচড়ে দেশের গায়ে যা ক্ষত হয়েছিল তা ত্বকের উপরে; রক্তপাত অনেক হয়েছে, কিন্তু অস্থিবন্ধনীগুলোকে নড়িয়ে দেয় নি। ধন-উৎপাদনের বিচিত্র কাজ তখন অব্যাহত চলছিল, এমন-কি নবাব-বাদশাহের কাছ থেকে সে-সমস্ত কাজ প্রশ্রয় পেয়েছে। তা যদি না হত তা হলে এখানে বিদেশী বণিকের ভিড় ঘটবার কোনো কারণ থাকত না— মরুভূমিতে পঙ্গপালের ভিড় জমবে কেন।

তার পরে ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের অশুভ সংগমকালে বণিক রাজা দেশের ধনকল্পতরুর শিকড়গুলোকে কী করে ছেদন করতে লাগলেন, সে ইতিহাস শতবার-কথিত এবং অত্যন্ত শ্রুতিকটু। কিন্তু পুরাতন বলে সেটাকে বিস্মৃতির মুখঠুলি চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা চলবে না। এ দেশের বর্তমান দুর্বহ দারিদ্র্যের উপক্রমণিকা সেইখানে। ভারতবর্ষের ধনমহিমা ছিল, কিন্তু সেটা কোন্ বাহন-যোগে দ্বীপান্তরিত হয়েছে সে কথা যদি ভুলি তবে পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসের একটা তত্ত্বকথা আমাদের এড়িয়ে যাবে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি বীর্যাভিমান নয়, সে হচ্ছে ধনের লোভ, এই তত্ত্বটি মনে রাখা চাই। রাজগৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটা মানবিক সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু ধনলোভের সঙ্গে তা থাকতেই পারে না। ধন নির্মম, নৈর্ব্যক্তিক। যে মুরগি সোনার ডিম পাড়ে লোভ যে কেবল তার ডিমগুলোকেই ঝুড়িতে তোলে তা নয়, মুরগিটাকে সুদ্ধ সে জবাই করে।

বণিকরাজের লোভ ভারতের ধন-উৎপাদনের বিচিত্র শক্তিকেই পঙ্গু করে দিয়েছে। বাকি রয়েছে কেবল কৃষি, নইলে কাঁচা মালের জোগান বন্ধ হয় এবং বিদেশী পণ্যের হাটে মূল্য দেবার শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ভারতবর্ষের সদ্যপাতী জীবিকা এই অতিক্ষীণ বৃন্তের উপর নির্ভর করে আছে।

এ কথা মেনে নেওয়া যাক, তখনকার কালে যে নৈপুণ্য ও যে-সকল উপায়ের যোগে হাতের কাজ চলত ও শিল্পীরা খেয়ে-প'রে বাঁচত, যন্ত্রের প্রতিযোগিতায় তারা স্বতই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। অতএব প্রজাদের বাঁচাবার জন্যে নিতান্তই প্রয়োজন ছিল সর্বপ্রযত্নে তাদের যন্ত্রকুশল করে তোলা। প্রাণের দায়ে বর্তমান কালে সকল দেশেই এই উদ্যোগ

প্রবল। জাপান অল্পকালের মধ্যে ধনের যন্ত্রবাহনকে আয়ত্ত করে নিয়েছে, যদি না সম্ভব হত তা হলে যন্ত্রী য়ুরোপের ষড়যন্ত্রে সে ধনে-প্রাণে মারা যেত। আমাদের ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটল না, কেননা লোভ ঈর্ষাপরায়ণ। এই প্রকাণ্ড লোভের আওতায় আমাদের ধনপ্রাণ মুষড়ে এল, তৎপরিবর্তে রাজা আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, "এখনো ধনপ্রাণের যেটুকু বাকি সেটুকু রক্ষা করবার জন্যে আইন এবং চৌকিদারের ব্যবস্থাভার রইল আমার হাতে।" এ দিকে আমাদের অন্নবস্ত্র বিদ্যাবুদ্ধি বন্ধক রেখে কণ্ঠাগত প্রাণে আমরা চৌকিদারের উর্দির খরচ জোগাচ্ছি। এই-যে সাংঘাতিক ঔদাসীন্য এর মূলে আছে লোভ। সকলপ্রকার জ্ঞানে ও কর্মে যেখানে শক্তির উৎস বা পীঠস্থান সেখান থেকে বহু নীচে দাঁড়িয়ে এতকাল আমরা হাঁ করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছি আর সেই ঊর্ধ্বলোক থেকে এই আশ্বাসবাণী শুনে আসছি, "তোমাদের শক্তি ক্ষয় যদি হয় ভয় কী, আমাদের শক্তি আছে, আমরা তোমাদের রক্ষা করব।"

যার সঙ্গে মানুষের লোভের সম্বন্ধ তার কাছ থেকে মানুষ প্রয়োজন উদ্ধার করে, কিন্তু কখনো তাকে সম্মান করে না। যাকে সম্মান করে না তার দাবিকে মানুষ যথাসম্ভব ছোটো করে রাখে; অবশেষে সে এত সস্তা হয়ে পড়ে যে, তার অসামান্য অভাবেও সামান্য খরচ করতে গায়ে বাজে। আমাদের প্রাণরক্ষা ও মনুষ্যত্বের লজ্জা-রক্ষার জন্যে কতই কম বরাদ্দ সে কারো অগোচর নেই। অন্ন নেই, বিদ্যা নেই, বৈদ্য নেই, পানের জল পাওয়া যায় পাঁক ছেঁকে; কিন্তু চৌকিদারের অভাব নেই, আর আছে মোটা মাইনের কর্মচারী— তাদের মাইনে গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীমের মতো সম্পূর্ণ চলে যায় ব্রিটিশ দ্বীপের শৈত্যনিবারণের জন্যে, তাদের পেন্‌সন জোগাই আমাদের অন্ত্যেষ্টিসৎকারের খরচের অংশ থেকে। এর একমাত্র কারণ, লোভ অন্ধ, লোভ নিষ্ঠুর— ভারতবর্ষ ভারতেশ্বরদের লোভের সামগ্রী।

অথচ কঠিন বেদনার অবস্থাতেও এ কথা আমি কখনো অস্বীকার করি নে যে, ইংরেজের স্বভাবে ঔদার্য আছে, বিদেশীয় শাসনকার্যে অন্য য়ুরোপীয়দের ব্যবহার ইংরেজের চেয়েও কৃপণ এবং নিষ্ঠুর। ইংরেজ জাতি ও তার শাসননীতি সম্বন্ধে বাক্যে ও আচরণে আমরা যে বিরুদ্ধতা প্রকাশ করে থাকি তা আর-কোনো জাতের শাসন-কর্তাদের সম্বন্ধে সম্ভবপর হত না; যদি-বা হত তবে তার দণ্ডনীতি আরো অনেক দুঃসহ হত, স্বয়ং য়ুরোপে এমন-কি আমেরিকাতেও তার প্রমাণের অভাব নেই। প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহঘোষণাকালেও রাজপুরুষদের কাছে পীড়িত হলে আমরা যখন সবিস্ময়ে নালিশ করি তখন প্রমাণ হয় যে, ইংরেজ জাতির প্রতি আমাদের নিগূঢ় শ্রদ্ধা

মার খেতে খেতেও মরতে চায় না। আমাদের স্বদেশী রাজা বা জমিদারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরো অনেক কম।

ইংলণ্ডে থাকার সময় এটা লক্ষ্য করে দেখেছি, ভারতবর্ষে দণ্ডবিধানব্যাপারে গ্লানিজনক ঘটনা ইংরেজ খবরের কাগজে প্রায় কিছুই এসে পৌঁছত না। তার একমাত্র কারণ এ নয়, পাছে য়ুরোপে বা আমেরিকায় নিন্দা রটে। বস্তুত, কড়া ইংরেজ শাসনকর্তা স্বজাতির শুভবুদ্ধিকেই ভয় করে। বেশ করেছি, খুব করেছি, দরকার ছিল জবরদস্তি করবার— এটা বুক ফুলিয়ে বলা ইংরেজদের পক্ষে সহজ নয়, তার কারণ ইংরেজের মধ্যে বড়ো মন আছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আসল কথাগুলো ইংরেজ খুব কম জানে। নিজেদের উপর ধিক্‌কার দেবার কারণ চাপা থাকে। এ কথাও সত্য, ভারতের নিমক দীর্ঘকাল যে খেয়েছে তার ইংরেজি যকৃৎ এবং হৃদয় কলুষিত হয়ে গেছে, অথচ আমাদের ভাগ্যক্রমে তারাই হল অথরিটি।

ভারতবর্ষে বর্তমান বিপ্লব উপলক্ষে দণ্ডচালনা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে, তার পীড়ন ছিল ন্যূনতম মাত্রায়। এ কথা মেনে নিতে আমরা অনিচ্ছুক, কিন্তু অতীত ও বর্তমানের প্রচলিত শাসননীতির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে কথাটাকে অত্যুক্তি বলতে পারব না। মার খেয়েছি, অন্যায় মারও যথেষ্ট খেয়েছি; এবং সব চেয়ে কলঙ্কের কথা গুপ্ত মার, তারও অভাব ছিল না। এ কথাও বলব, অনেক স্থলেই যারা মার খেয়েছে মাহাত্ম্য তাদেরই, যারা মেরেছে তারা আপন মান খুইয়েছে। কিন্তু সাধারণ রাষ্ট্রশাসন নীতির আদর্শে আমাদের মারের মাত্রা ন্যূনতম বইকি। বিশেষত আমাদের 'পরে ওদের নাড়ীর টান নেই, তা ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষকে জালিয়ানওআলাবাগ করে তোলা এদের পক্ষে বাহুবলের দিক থেকে অসম্ভব ছিল না। আমেরিকার সমগ্র নিগ্রোজাতি যুক্তরাজ্যের সঙ্গে নিজেদের যোগ বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে যদি স্পর্ধাপূর্বক অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হত তা হলে কিরকম বীভৎসভাবে রক্তপ্লাবন ঘটত, বর্তমান শান্তির অবস্থাতেও তা অনুমান করে নিতে অধিক কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া ইটালি প্রভৃতি দেশে যা ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনা করা বাহুল্য।

কিন্তু এতে সান্ত্বনা পাই নে। যে মার লাঠির ডগায় সে মার দুদিন পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এমন-কি, ক্রমে তার লজ্জা আসাও অসম্ভব নয়। কিন্তু যে মার অন্তরে অন্তরে সে তো কেবল কতকগুলো মানুষের মাথা ভেঙে তার পরে খেলাঘরের ব্রিজ-পার্টির অন্তরালে অন্তর্ধান করে না। সমস্ত জাতকে সে যে ভিতরে ভিতরে ফতুর করে দিলে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তার তো বিরাম নেই। ক্রোধের মার থামে, লোভের মারের অন্ত পাওয়া যায় না।

টাইম্স্'এর সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রে দেখা গেল ম্যাকী-নামক এক লেখক বলেছেন যে, ভারতে দারিদ্র্যের root cause, মূল কারণ হচ্ছে, এ দেশে নির্বিচার বিবাহের ফলে অতিপ্রজন। কথাটার ভিতরকার ভাবটা এই যে, বাহির থেকে যে শোষণ চলছে তা দুঃসহ হত না যদি স্বল্প অন্ন নিয়ে স্বল্প লোকে হাঁড়ি চেঁচে-পুঁছে খেত। শুনতে পাই, ইংলণ্ডে ১৮৭১ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯২১ খৃস্টাব্দের মধ্যে শতকরা ৬৬ সংখ্যা হারে প্রজাবৃদ্ধি হয়েছে। ভারতবর্ষে পঞ্চাশ বৎসরের প্রজাবৃদ্ধির হার শতকরা ৩৩। তবে এক যাত্রায় পৃথক ফল হল কেন। অতএব দেখা যাচ্ছে root cause প্রজাবৃদ্ধি নয়, root cause অন্নসংস্থানের অভাব। তারও root কোথায়!

দেশ যারা শাসন করছে আর যে প্রজারা শাসিত হচ্ছে তাদের ভাগ্য যদি এক-কক্ষবর্তী হয় তা হলে অন্তত অন্নের দিক থেকে নালিশের কথা থাকে না, অর্থাৎ সুভিক্ষে দুর্ভিক্ষে উভয়ের ভাগ প্রায় সমান হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের মাঝখানে মহালোভ ও মহাসমুদ্রের ব্যবধান সেখানে অমাবস্যার তরফে বিদ্যাস্বাস্থ্য-সম্মানসম্পদের কৃপণতা ঘুচতে চায় না, অথচ নিশীথরাত্রির চৌকিদারদের হাতে বৃষচক্ষু লণ্ঠনের আয়োজন বেড়ে চলে। এ কথা হিসাব করে দেখতে স্ট্যাটিস্টিক্সের খুব বেশি খিটিমিটির দরকার হয় না, আজ একশো ষাট বৎসর ধরে ভারতের পক্ষে সর্ববিষয়ে দারিদ্র্য ও ব্রিটেনের পক্ষে সর্ববিষয়ে ঐশ্বর্য পিঠোপিঠি সংলগ্ন হয়ে আছে। এর যদি একটি সম্পূর্ণ ছবি আঁকতে চাই তবে বাংলাদেশের যে চাষী পাট উৎপন্ন করে আর সুদূর ডাণ্ডিতে যারা তার মুনফা ভোগ করে উভয়ের জীবনযাত্রার দৃশ্য পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখতে হয়। উভয়ের মধ্যে যোগ আছে লোভের, বিচ্ছেদ আছে ভোগের—এই বিভাগ দেড়শো বছরে বাড়ল বই কমল না।

যান্ত্রিক উপায়ে অর্থলাভকে যখন থেকে বহুগুণীকৃত করা সম্ভবপর হল তখন থেকে মধ্যযুগের শিভল্‌রি অর্থাৎ বীরধর্ম বণিকধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এই নিদারুণ বৈশ্যযুগের প্রথম সূচনা হল সমুদ্রযানযোগে বিশ্বপৃথিবী-আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। বৈশ্যযুগের আদিম ভূমিকা দস্যুবৃত্তিতে। দাসহরণ ও ধনহরণের বীভৎসতায় ধরিত্রী সেদিন কেঁদে উঠেছিল। এই নিষ্ঠুর ব্যবসায় বিশেষভাবে চলেছিল পরদেশে। সেদিন মেক্সিকোতে স্পেন শুধু কেবল সেখানকার সোনার সঞ্চয় নয়, সেখানকার সমগ্র সভ্যতাটাকেও রক্ত দিয়ে মুছে দিয়েছে। সেই রক্তমেঘের ঝড় পশ্চিম থেকে ভিন্ন ভিন্ন দমকায় ভারতবর্ষে এসে পড়ল। তার ইতিহাস আলোচনা করা অনাবশ্যক। ধনসম্পদের স্রোত পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে ফিরল।

তার পর থেকে কুবেরের সিংহাসন পাকা হল পৃথিবীতে। বিজ্ঞান ঘোষণা করে

দিলে, যন্ত্রের নিয়মই বিশ্বের নিয়ম, বাহ্য সিদ্ধিলাভের বাহিরে কোনো নিত্য সত্য নেই। প্রতিযোগিতার উগ্রতা সর্বব্যাপী হয়ে উঠল, দস্যুবৃত্তি ভদ্রবেশে পেল সম্মান। লোভের প্রকাশ্য ও চোরা রাস্তা দিয়ে কারখানাঘরে, খনিতে বড়ো বড়ো আবাদে, ছদ্মনামধারী দাসবৃত্তি মিথ্যাচার ও নির্দয়তা কিরকম হিংস্র হয়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে য়ুরোপীয় সাহিত্যে রোমহর্ষক বর্ণনা বিস্তর পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যারা টাকা করে আর যারা টাকা যোগায় অনেক দিন ধরে তাদের মধ্যে হাতাহাতি বেধে গেছে। মানুষের সব চেয়ে বড়ো ধর্ম সমাজধর্ম, লোভরিপু সব চেয়ে তার বড়ো হন্তারক। এই যুগে সেই রিপু মানুষের সমাজকে আলোড়িত করে তার সম্বন্ধবন্ধনকে শিথিল ও বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।

এক দেশে এক জাতির মধ্যেই এই নির্মম ধনার্জন ব্যাপারে যে বিভাগ সৃষ্টি করতে উদ্যত তাতে যত দুঃখই থাক্ তবু সেখানে সুযোগের ক্ষেত্র খোলা থাকে, শক্তির বৈষম্য থাকতে পারে কিন্তু অধিকারের বাধা থাকে না। ধনের জাঁতাকলে সেখানে আজ যে আছে পেষ্যবিভাগে কাল সেই উঠতে পারে পেষণবিভাগে। শুধু তাই নয়, ধনীরা যে ধন সঞ্চয় করে, নানা আকারে সমস্ত দেশের মধ্যে তার কিছু-না-কিছু ভাগ-বাঁটোয়ারা আপনিই হয়ে যায়। ব্যক্তিগত সম্পদ জাতীয় সম্পদের দায়িত্বভার অনেক পরিমাণে না নিয়ে থাকতে পারে না। লোকশিক্ষা, লোকস্বাস্থ্য, লোকরঞ্জন, সাধারণের জন্যে নানাপ্রকার হিতানুষ্ঠান—এ-সমস্তই প্রভূত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। দেশের এই-সমস্ত বিচিত্র দাবি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় লক্ষ্যত অলক্ষ্যত ধনীরা মিটিয়ে থাকে।

কিন্তু ভারতের যে ধনে বিদেশী বণিক বা রাজপুরুষেরা ধনী তার ন্যূনতম উচ্ছিষ্ট-মাত্রই ভারতের ভাগে পড়ে। পাটের চাষী শিক্ষার জন্যে, স্বাস্থ্যের জন্যে সুগভীর অভাবগুলো অনাবৃষ্টির নালাডোবার মতো হাঁ করে রইল, বিদেশগামী মুনফা থেকে তার দিকে কিছুই ফিরল না। যা গেল তা নিঃশেষে গেল। পাটের মুনফা সম্ভবপর করবার জন্যে গ্রামের জলাশয়গুলি দূষিত হল—এই অসহ্য জলকষ্ট নিবারণের উদ্দেশে বিদেশী মহাজনদের ভরা থলি থেকে এক পয়সা খসল না। যদি জলের ব্যবস্থা করতে হয় তবে তার সমস্ত ট্যাক্সের টান এই নিঃস্ব নিরন্নদের রক্তের উপরই পড়ে। সাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে রাজকোষে টাকা নেই—কেন নেই। তার প্রধান কারণ, প্রভূত পরিমাণ টাকা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণই ত্যাগ করে চলে যায়—এ হল লোভের টাকা, যাতে করে আপন টাকা ষোলো-আনাই পর হয়ে যায়। অর্থাৎ জল উবে যায় এ পারের জলাশয়ে আর মেঘ হয়ে তার বর্ষণ হতে থাকে ও পারের দেশে। সে দেশের হাঁসপাতালে বিদ্যালয়ে এই হতভাগ্য অশিক্ষিত অসুস্থ মুমূর্ষু ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল অপ্রত্যক্ষভাবে রসদ জুগিয়ে আসছে।

দেশের লোকের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার চরম দুঃখদৃশ্য অনেককাল স্বচক্ষে দেখে আসছি। দারিদ্র্যে মানুষ কেবল যে মরে তা নয়, নিজেকে অবজ্ঞার যোগ্য করে তোলে। তাই সার্ জন সাইমন বললেন যে :

In our view the most formidable of the evils from which India is suffering have their roots in social and economic customs of longstanding which can only be remedied by the action of the Indian people themselves.

এটা হল অবজ্ঞার কথা। ভারতের প্রয়োজনকে তিনি যে আদর্শ থেকে বিচার করছেন সেটা তাঁদের নিজেদের আদর্শ নয়। প্রচুর ধন-উৎপাদনের জন্যে যে অবারিত শিক্ষা, যে সুযোগ, যে স্বাধীনতা তাঁদের নিজেদের আছে, যে-সমস্ত সুবিধা থাকাতে তাঁদের জীবনযাত্রার আদর্শ জ্ঞানে কর্মে ভোগে নানা দিক থেকে প্রভূত পরিমাণে পরিপুষ্ট হতে পেরেছে, জীর্ণবস্ত্র শীর্ণতনু রোগক্লান্ত শিক্ষাবঞ্চিত ভারতের পক্ষে সে আদর্শ তারা কল্পনার মধ্যেই আনেন না— আমরা কোনোমতে দিনযাপন করব লোকবৃদ্ধি নিবারণ করে এবং খরচপত্র কমিয়ে, আর আজ তাঁরা নিজের জীবিকার যে পরিস্ফীত আদর্শ বহন করছেন তাকে চিরদিন বহুলপরিমাণে সম্ভব করে রাখব আমাদের জীবিকা খর্ব করে, এর বেশি কিছু ভাববার নেই। অতএব রেমেডি'র দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদেরই হাতে, যারা রেমেডি'কে দুঃসাধ্য করে তুলেছে তাদের বিশেষ কিছু করবার নেই।

মানুষ এবং বিধাতার বিরুদ্ধে এই-সমস্ত নালিশ ক্ষান্ত করে রেখেই অন্তরের দিক থেকে আমাদের নির্জীব পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার জন্যে আমার অতিক্ষুদ্র শক্তিকে কিছুকাল প্রয়োগ করছি। এ কাজে গবর্মেণ্টের আনুকূল্য আমি উপেক্ষা করি নি, এমন-কি ইচ্ছা করেছি। কিন্তু ফল পাই নি, তার কারণ দরদ নেই। দরদ থাকা সম্ভব নয়— আমাদের অক্ষমতা, আমাদের সকলপ্রকার দুর্দশা, আমাদের দাবিকে ক্ষীণ করে দিয়েছে। দেশের কোনো যথার্থ কৃত্যকর্মে গবর্মেণ্টের সঙ্গে আমাদের কর্মীদের উপযুক্ত যোগসাধন অসম্ভব বলেই অবশেষে স্থির করেছি। অতএব চৌকিদারদের উর্দির খরচ জুগিয়ে যে-কটা কড়ি বাঁচে তাই দিয়ে যা সম্ভব তাই করা যাবে, এই রইল কথা।

রাজকীয় লোভ ও তৎপ্রসূত দুর্বিষহ ঔদাসীন্যের চেহারাটা যখন মনের মধ্যে নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে বসেছে এমন সময়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর যথেষ্ট দেখেছি; সে এতই উত্তুঙ্গ যে দরিদ্র দেশের ঈর্ষাও তার উচ্চ চূড়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। রাশিয়ায় সেই ভোগের

সমারোহ একেবারেই নেই, বোধ করি সেইজন্যেই তার ভিতরকার একটা রূপ দেখা সহজ ছিল।

ভারতবর্ষ যার থেকে একেবারেই বঞ্চিত তারই আয়োজনকে সর্বব্যাপী করবার প্রবল প্রয়াস এখানে দেখতে পেলেম। বলা বাহুল্য, আমি আমার বহুদিনের ক্ষুধিত দেখার ভিতর দিয়ে সমস্তটা দেখেছি। পশ্চিম মহাদেশের অন্য কোনো স্বাধিকার-সৌভাগ্যশালী দেশবাসীর চক্ষে দৃশ্যটা কিরকম ঠেকে সে কথা ঠিকমত বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতীতকালে ভারতবর্ষের কী পরিমাণ ধন ব্রিটিশ দ্বীপে চালান গিয়েছে এবং বর্তমানে কী পরিমাণ অর্থ বর্ষে বর্ষে নানা প্রণালী দিয়ে সেই দিকে চলে যাচ্ছে তার অঙ্কসংখ্যা নিয়ে তর্ক করতে চাই নে। কিন্তু অতি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি এবং অনেক ইংরেজ লেখকও তা স্বীকার করেন যে, আমাদের দেশের রক্তহীন দেহে মন চাপা পড়ে গেছে, জীবনে আনন্দ নেই, আমরা অন্তরে বাহিরে মরছি— এবং তার root cause যে ভারতবাসীরই মর্মগত অপরাধের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ কোনো গবর্মেণ্টই এর প্রতিকার করতে নিরতিশয় অক্ষম, এ অপবাদ আমরা একেবারেই স্বীকার করব না।

এ কথা চিরদিনই আমার মনে ছিল যে ভারতের সঙ্গে যে পরদেশবাসী শাসনকর্তার স্বার্থের সম্বন্ধ প্রবল এবং দরদের সম্বন্ধ নেই সে গবর্মেণ্ট নিজের গরজেই প্রবল শক্তিতে বিধি ও ব্যবস্থা রক্ষা করতে উৎসাহপরায়ণ; কিন্তু যে-সকল ব্যাপারে গরজ একান্ত আমাদেরই, যেখানে আমাদের দেশকে সর্বপ্রকারে বাঁচিয়ে তুলতে হবে ধনে মনে ও প্রাণে, সেখানে যথোচিত পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করতে এ গবর্মেণ্ট উদাসীন। অর্থাৎ এ সম্বন্ধে নিজের দেশের প্রতি শাসনকর্তাদের যত সচেষ্টতা, যত বেদনাবোধ, আমাদের দেশের প্রতি তার কিয়দংশও সম্ভব হয় না। অথচ আমাদের ধনপ্রাণ তাদেরই হাতে, যে উপায়ে যে উপাদানে আমরা বিনাশ থেকে রক্ষা পেতে পারি সে আমাদের হাতে নেই।

এমন-কি, এ কথা যদি সত্য হয় যে, সমাজবিধি সম্বন্ধে মূঢ়তাবশতই আমরা মরতে বসেছি তবে এই মূঢ়তা যে শিক্ষা, যে উৎসাহ দ্বারা দূর হতে পারে সেও ঐ বিদেশী গবর্মেণ্টেরই রাজকোষে ও রাজমর্জিতে। দেশব্যাপী অশিক্ষাজনিত বিপদ দূর করবার উপায় কমিশনের পরামর্শমাত্র দ্বারা লাভ করা যায় না— সে সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের তেমনি তৎপর হওয়া উচিত যেমন তৎপর ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট নিশ্চয়ই হত যদি এই সমস্যা ব্রিটেন দ্বীপের হত। সাইমন কমিশনকে আমাদের প্রশ্ন এই যে, ভারতের অজ্ঞতা-অশিক্ষার মধ্যেই এতবড়ো মৃত্যুশেল নিহিত হয়ে এতদিন রক্তপাত করছে, এই কথাই যদি সত্য

হয় তবে আজ একশো ষাট বৎসরের ব্রিটিশ শাসনে তার কিছুমাত্র লাঘব হল না কেন। কমিশন কি সাংখ্যতথ্যযোগে দেখিয়েছেন পুলিসের ডাণ্ডা যোগাতে ব্রিটিশরাজ যে খরচ করে থাকেন তার তুলনায় দেশকে শিক্ষিত করতে এই সুদীর্ঘকাল কত খরচ করা হয়েছে। দূরদেশবাসী ধনী শাসকের পক্ষে পুলিসের ডাণ্ডা অপরিহার্য কিন্তু সেই লাঠির বংশগত যাদের মাথার খুলি তাদের শিক্ষার ব্যয়বিধান বহু শতাব্দী মুলতবি রাখলেও কাজ চলে যায়।

রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথমেই চোখে পড়ল, সেখানকার যে চাষী ও শ্রমিক-সম্প্রদায়, আজ আট বৎসর পূর্বে, ভারতীয় জনসাধারণেরই মতো নিঃসহায় নিরন্ন নির্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের দুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশি বই কম ছিল না, অন্তত তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এ অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই যে উন্নতি লাভ করেছে দেড় শো বছরেও আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয় নি। আমাদের দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ স্বদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে দুরাশার ছবি মরীচিকার পটে আঁকতেও সাহস পায় নি এখানে তার প্রত্যক্ষ রূপ দেখলুম দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তৃত।

নিজেকে এ প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞাসা করেছি— এতবড়ো আশ্চর্য ব্যাপার সম্ভবপর হল কী করে। মনের মধ্যে এই উত্তর পেয়েছি যে, লোভের বাধা কোনোখানে নেই। শিক্ষার দ্বারা সব মানুষই যথোচিত সক্ষম হয়ে উঠবে, এ কথা মনে করতে কোথাও খটকা লাগছে না। দূর এশিয়ার তুর্কমেনিস্তানবাসী প্রজাদেরও পুরোপুরি শিক্ষা দিতে এদের মনে একটুও ভয় নেই, প্রত্যুত প্রবল আগ্রহ আছে। তুর্কমেনিস্তানের প্রথাগত মূঢ়তার মধ্যেই সেখানকার লোকের সমস্ত দুঃখের কারণ, এই কথাটা রিপোর্টে নির্দেশ করে উদাসীন হয়ে বসে নেই।

কোচিন-চায়নায় শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে শুনেছি, কোনো ফরাসী পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী বলেছেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজ দেশী লোককে শিক্ষা দিতে গিয়ে যে ভুল করেছেন ফ্রান্স্ যেন সে ভুল না করেন। এ কথা মানতে হবে যে, ইংরেজের চরিত্রে এমন একটা মহত্ত্ব আছে যেজন্যে বিদেশী শাসননীতিতে তাঁরা কিছু কিছু ভুল করে বসেন, শাসনের ঠাস বুনানিতে কিছু কিছু খেই হারায়, নইলে আমাদের মুখ ফুটতে হয়তো আরো এক-আধ শতাব্দী দেরি হত।

এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে শিক্ষার অভাবে অশক্তি অটল হয়ে থাকে, অতএব অশিক্ষা পুলিসের ডাণ্ডার চেয়ে কম বলবান নয়। বোধ হয় যেন লর্ড কার্জন সে কথাটা কিছু কিছু অনুভব করেছিলেন। শিক্ষাদান সম্বন্ধে ফরাসী পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী স্বদেশের প্রয়োজনকে যে আদর্শে বিচার করে থাকেন, শাসিত দেশের প্রয়োজনকে সে

আদর্শে করেন না। তার একমাত্র কারণ লোভ। লোভের বাহন যারা তাদের মনুষ্যত্বের বাস্তবতা লুব্ধের পক্ষে অস্পষ্ট, তাদের দাবিকে আমরা স্বভাবতই খর্ব করে থাকি। যাদের সঙ্গে ভারতের শাসনের সম্বন্ধ তাদের কাছে ভারতবর্ষ আজ দেড় শো বৎসর খর্ব হয়ে আছে। এইজন্যেই তার মর্মগত প্রয়োজনের 'পরে উপরওআলার ঔদাসীন্য ঘুচল না। আমরা যে কী অন্ন খাই, কী জলে আমাদের পিপাসা মেটাতে হয়, কী সুগভীর অশিক্ষায় আমাদের চিত্ত তমসাবৃত, তা আজ পর্যন্ত ভালো করে তাদের চোখে পড়ল না। কেননা, আমরাই তাদের প্রয়োজনের এইটেই বড়ো কথা, আমাদেরও যে প্রাণগত প্রয়োজন আছে এ কথাটা জরুরি নয়। তা ছাড়া আমরা এত অকিঞ্চিৎকর হয়ে আছি যে, আমাদের প্রয়োজনকে সম্মান করাই সম্ভব হয় না।

ভারতের যে কঠিন সমস্যা, যাতে করে আমরা এতকাল ধরে ধনে প্রাণে মনে মরছি, এ সমস্যাটা পাশ্চাত্যে কোথাও নেই। সে সমস্যাটি এই যে, ভারতের সমস্ত স্বত্ব দ্বিধাকৃত ও সেই সর্বনেশে বিভাগের মূলে আছে লোভ। এই কারণে রাশিয়ায় এসে যখন সেই লোভকে তিরস্কৃত দেখলুম তখন সেটা আমাকে যতবড়ো আনন্দ দিলে এতটা হয়তো স্বভাবত অন্যকে না দিতে পারে। তবুও মূল কথাটা মন থেকে তাড়াতে পারি নে, সে হচ্ছে এই যে, আজ কেবল ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই যে-কোনো বড়ো বিপদের জালবিস্তার দেখা যাচ্ছে তার প্রেরণা হচ্ছে লোভ— সেই লোভের সঙ্গেই যত ভয়, যত সংশয়; সেই লোভের পিছনেই যত অস্ত্রসজ্জা, যত মিথ্যুক ও নিষ্ঠুর রাষ্ট্রনীতি।

আর-একটা তর্কের বিষয় হচ্ছে ডিক্‌টেটর্‌শিপ অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যাপারে নায়কতন্ত্র নিয়ে। কোনো বিষয়েই নায়কিয়ানা আমি নিজে পছন্দ করি নে। ক্ষতি বা শাস্তির ভয়কে অগ্রবর্তী করে অথবা ভাষায় ভঙ্গীতে বা ব্যবহারে জিদ প্রকাশের দ্বারা, নিজের মত-প্রচারের রাস্তাটাকে সম্পূর্ণ সমতল করবার লেশমাত্র চেষ্টা আমি কোনোদিন নিজের কর্মক্ষেত্রে করতে পারি নে। সন্দেহ নেই যে, একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর; তার ক্রিয়ার একতানতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত, যে চালক ও যারা চালিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার অসম্পূর্ণ যোগসাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্বদাই ঘটে, তা ছাড়া সবলে চালিত হওয়ার অভ্যাস চিত্তের ও চরিত্রের বলহানি করে— এর সফলতা যখন বাইরের দিকে দুই-চার ফসলে হঠাৎ আঁজলা ভরে তোলে, ভিতরের শিকড়কে দেয় মেরে।

জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয় তবে সেটা হয় খাঁচা, দানাপানি সেখানে ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না, সেখানে থাকতে থাকতে পাখা যায় আড়ষ্ট হয়ে। এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই

থাক্‌, গুরুর মধ্যেই থাক্‌, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক্‌, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।

আমাদের সমাজে এই ক্লীবত্বসৃষ্টি বহুযুগ থেকে ঘটে আসছে এবং এর ফল প্রতিদিন দেখে আসছি। মহাত্মাজি যখন বিদেশী কাপড়কে অশুচি বলেছিলেন আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম; আমি বলেছিলাম, ওটা আর্থিক ক্ষতিকর হতে পারে, অশুচি হতেই পারে না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রচালিত অন্ধ চিত্ত ভোলাতে হবে, নইলে কাজ পাব না—মনুষ্যত্বের এমনতরো চিরস্থায়ী অবমাননা আর কী হতে পারে। নায়ক-চালিত দেশ এমনিভাবেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে—এক জাদুকর যখন বিদায় গ্রহণ করে তখন আর-এক জাদুকর আর-এক মন্ত্র সৃষ্টি করে।

ডিক্‌টেটর্‌শিপ একটা মস্ত আপদ, সে কথা আমি মানি এবং সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় আজ ঘটছে সে কথাও আমি বিশ্বাস করি। এর নঙর্থক দিকটা জবরদস্তির দিক, সেটা পাপ। কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখেছি, সেটা হল শিক্ষা, জবরদস্তির একেবারে উলটো।

দেশের সৌভাগ্যসৃষ্টি-ব্যাপারে জনগণের চিত্ত সম্মিলিত হলে তবে সেটার ক্রিয়া সজীব ও স্থায়ী হয়; নিজের একনায়কত্বের প্রতি যারা লুব্ধ, নিজের চিত্ত ছাড়া অন্য সকল চিত্তকে অশিক্ষা-দ্বারা আড়ষ্ট করে রাখাই তাদের অভিপ্রায়সিদ্ধির একমাত্র উপায়। জারের রাজত্বে শিক্ষার অভাবে জনগণ ছিল মোহাভিভূত, তার উপরে সর্বব্যাপী একটা ধর্মমূঢ়তা অজগর সাপের মতো সাধারণের চিত্তকে শত পাকে বেড়ে ধরেছিল। সেই মূঢ়তাকে সম্রাট অতিসহজে নিজের কাজে লাগাতে পারতেন। তখন য়িহুদির সঙ্গে খৃস্টানের, মুসলমানের সঙ্গে আর্মানির সকলপ্রকার বীভৎস উৎপাত ধর্মের নামে অনায়াসে ঘটানো যেতে পারত। তখন জ্ঞান ও ধর্মের মোহ দ্বারা আত্মশক্তিহারা শ্লথগ্রন্থি বিভক্ত দেশ বাহিরের শক্তির কাছে সহজেই অভিভূত ছিল। একনায়কত্বের চিরাধিপত্যের পক্ষে এমন অনুকূল অবস্থা আর কিছুই হতে পারে না।

পূর্বতন রাশিয়ার মতোই আমাদের দেশে এই অবস্থা বহুকাল থেকে বর্তমান। আজ আমাদের দেশ মহাত্মাজির চালনার কাছে বশ মেনেছে, কাল তিনি থাকবেন না, তখন চালকত্বের প্রত্যাশীরা তেমনি করেই অকস্মাৎ দেখা দিতে থাকবে যেমন করে আমাদের দেশের ধর্মাভিভূতদের কাছে নূতন নূতন অবতার ও গুরু যেখানে-সেখানে উঠে পড়ছে। চীনদেশে আজ নায়কত্ব নিয়ে জনকয়েক ক্ষমতালোভী জবরদস্তদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রলয়সংঘর্ষ চলেইছে, কারণ, জনসাধারণের মধ্যে সে শিক্ষা নেই যাতে তারা নিজের সম্মিলিত ইচ্ছা-দ্বারা দেশের ভাগ্য নিয়মিত করতে পারে; তাই সেখানে

আজ সমস্ত দেশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। আমাদের দেশে সেই নায়কপদ নিয়ে দারুণ হানাহানি ঘটবে না, এমন কথা মনে করতে পারি নে ; তখন দলিতবিদলিত হয়ে মরবে উলুখড় জনসাধারণ, কারণ তারা উলুখড়, তারা বনস্পতি নয়।

রাশিয়াতেও সম্প্রতি নায়কের প্রবল শাসন দেখা গেল। কিন্তু এই শাসন নিজেকে চিরস্থায়ী করবার পন্থা নেয় নি— একদা সে পন্থা নিয়েছিল জারের রাজত্ব, অশিক্ষা ও ধর্মমোহের দ্বারা জনসাধারণের মনকে অভিভূত ক'রে এবং কসাকের কশাঘাতে তাদের পৌরুষকে জীর্ণ করে দিয়ে। বর্তমান আমলে রাশিয়ায় শাসনদণ্ড নিশ্চল আছে বলে মনে করি নে, কিন্তু শিক্ষাপ্রচারের প্রবলতা অসাধারণ। তার কারণ এর মধ্যে ব্যক্তিগত বা দলগত ক্ষমতালিপ্সা বা অর্থলোভ নেই। একটা বিশেষ অর্থনৈতিক মতে সর্বসাধারণকে দীক্ষিত করে জাতি বর্ণ ও শ্রেণী-নির্বিশেষে সকলকেই মানুষ করে তোলবার একটা দুর্নিবার ইচ্ছা আছে। তা যদি না হত তা হলে ফরাসী পণ্ডিতের কথা মানতে হত যে, শিক্ষা দেওয়াটা একটা মস্ত ভুল।

অর্থনৈতিক মতটা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য কি না সে কথা বলবার সময় আজও আসে নি, কেননা এ মত এতদিন প্রধানত পুঁথির মধ্যেই টলে টলে বেড়াচ্ছিল, এমন বৃহৎ ক্ষেত্রে এতবড়ো সাহসের সঙ্গে ছাড়া পায় নি। যে প্রবল লোভের কাছে এই মত প্রথম থেকেই সাংঘাতিক বাধা পেত সেই লোভকেই এরা সাংঘাতিকভাবে সরিয়ে দিয়েছে। পরীক্ষার ভিতর দিয়ে পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে এ মতের কতটুকু কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আজ নিশ্চিত কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এ কথাটা নিশ্চিত বলা যেতে পারে যে, রাশিয়ার জনসাধারণ এতকাল পরে যে শিক্ষা নির্বারিত ও প্রচুরভাবে পাচ্ছে তাতে করে তাদের মনুষ্যত্ব স্থায়ীভাবে উৎকর্ষ এবং সম্মানলাভ করল।

বর্তমান রাশিয়ার নিষ্ঠুর শাসনের জনশ্রুতি সর্বদাই শোনা যায়— অসম্ভব না হতে পারে। নিষ্ঠুর শাসনের ধারা সেখানে চিরদিন চলে এসেছে, হঠাৎ তিরোভূত না হওয়াই সম্ভব। অথচ সেখানে চিত্রযোগে সিনেমাযোগে ইতিহাসের ব্যাখ্যায় সাবেক আমলের নিদারুণ শাসনবিধি ও অত্যাচারকে সোভিয়েট গবর্মেণ্ট অবিরত প্রত্যক্ষ করিয়ে দিচ্ছে। এই গবর্মেণ্ট নিজেও যদি এইরকম নিষ্ঠুর পথ অবলম্বন করে থাকে তবে নিষ্ঠুরাচারের প্রতি এত প্রবল করে ঘৃণা উৎপাদন করে দেওয়াটাকে, আর-কিছু না হোক, অদ্ভুত ভুল বলতে হবে। সিরাজউদ্দৌলা-কর্তৃক কালা-গর্তের নৃশংসতাকে যদি সিনেমা প্রভৃতি দ্বারা সর্বত্র লাঞ্ছিত করা হত তবে তার সঙ্গে সঙ্গেই জালিয়ানওআলা বাগের কাণ্ড করাটাকে অন্তত মূর্খতা বললে দোষ হত না। কারণ, এ ক্ষেত্রে বিমুখ অস্ত্র অস্ত্রীকেই লাগবার কথা।

সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্ক্‌সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ; সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এই অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি। সেদিনকার য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় এইরকম মুখ চাপা দেওয়া এবং গবর্মেণ্ট-নীতির বিরুদ্ধবাদীর মতস্বাতন্ত্র্যকে জেলখানায় বা ফাঁসিকাঠে বিলুপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা দেখা গিয়েছিল।

যেখানে আশু ফললাভের লোভ অতি প্রবল সেখানে রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে মানতে চায় না। তারা বলে, ওসব কথা পরে হবে, আপাতত কাজ উদ্ধার করে নিই। রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধকালের অবস্থা। অন্তরে বাহিরে শত্রু। ওখানকার সমস্ত পরীক্ষাকে পণ্ড করে দেবার জন্যে চারি দিকে নানা ছলবলের কাণ্ড চলছে। তাই ওদের নির্মাণকার্যের ভিতটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এজন্যে বলপ্রয়োগ করতে ওদের কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু গরজ যত জরুরিই হোক, বল জিনিসটা একতরফা জিনিস। ওটাতে ভাঙে, সৃষ্টি করে না। সৃষ্টিকার্যে দুই পক্ষ আছে; উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই, মারধোর করে নয়, তার নিয়মকে স্বীকার করে।

রাশিয়া যে কাজে লেগেছে এ হচ্ছে যুগান্তরের পথ বানানো; পুরাতন বিধি-বিশ্বাসের শিকড়গুলো তার সাবেক জমি থেকে উপড়ে দেওয়া; চিরাভ্যাসের আরামকে তিরস্কৃত করা। এরকম ভাঙনের উৎসাহে যে আবর্ত সৃষ্টি করে তার মাঝখানে পড়লে মানুষ তার মাতুনির আর অন্ত পায় না— স্পর্ধা বেড়ে ওঠে; মানবপ্রকৃতিকে সাধনা করে বশ করবার অপেক্ষা আছে, এ কথা ভুলে যায়; মনে করে, তাকে তার আশ্রয় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে একটা সীতাহরণ-ব্যাপার করে তাকে পাওয়া যেতে পারে। তার পরে লঙ্কায় আগুন লাগে তো লাগুক। উপযুক্ত সময় নিয়ে স্বভাবের সঙ্গে রফা করবার তর সয় না যাদের তারা উৎপাতকে বিশ্বাস করে; অবশেষে লাঠিয়ে পিটিয়ে রাতারাতি যা গড়ে তোলে তার উপরে ভরসা রাখা চলে না, তার উপরে দীর্ঘকালের ভর সয় না।

যেখানে মানুষ তৈরি নেই, মত তৈরি হয়েছে, সেখানকার উচ্চণ্ড দণ্ডনায়কদের আমি বিশ্বাস করি নে। প্রথম কারণ, নিজের মত সম্বন্ধে আগেভাগে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা সুবুদ্ধি নয়, সেটাকে কাজে খাটাতে খাটাতে তবে তার পরিচয় হয়। ও দিকে ধর্মতন্ত্রের বেলায় যে জননায়কেরা শাস্ত্রবাক্য মানে না তারাই দেখি অর্থতন্ত্রের দিকে শাস্ত্র মেনে অচল হয়ে বসে আছে। সেই শাস্ত্রের সঙ্গে যেমন করে হোক মানুষকে টুঁটি চেপে ঝুঁটি ধরে মেলাতে চায়— এ কথাও বোঝে না, জোর করে ঠেসে-ঠুসে যদি কোনো-এক

রকমে মেলানো হয় তাতে সত্যের প্রমাণ হয় না ; বস্তুত যে পরিমাণেই জোর সেই পরিমাণেই সত্যের অপ্রমাণ।

য়ুরোপে যখন খৃস্টান শাস্ত্রবাক্যে জবরদস্ত বিশ্বাস ছিল তখন মানুষের হাড়গোড় ভেঙে, তাকে পুড়িয়ে বিঁধিয়ে, তাকে ঢিলিয়ে, ধর্মের সত্য-প্রমাণের চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। আজ বলশেভিক মতবাদ সম্বন্ধে তার বন্ধু ও শত্রু উভয় পক্ষেরই সেইরকম উদ্দাম গায়ের-জোরী যুক্তিপ্রয়োগ। দুই পক্ষেরই পরস্পরের নামে নালিশ এই যে, মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে পীড়িত করা হচ্ছে। মাঝের থেকে পশ্চিম মহাদেশে আজ মানবপ্রকৃতি দুই তরফ থেকেই ঢেলা খেয়ে মরছে। আমার মনে পড়ছে আমাদের বাউলের গান—

নিঠুর গরজী,
তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে ?
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে।
দেখ্-না আমার পরম গুরু সাঁই
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভরসা দণ্ড—
এর আছে কোন্ উপায়।
কয় সে মদন দিস নে বেদন, শোন্ নিবেদন,
সেই শ্রীগুরুর মনে।
সহজধারা আপনহারা তাঁর বাণী শোনে
রে গরজী॥

সোভিয়েট রাশিয়ার লোকশিক্ষা সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য সে আমি বলেছি, তা ছাড়া সেখানকার পলিটিক্স্ মুনফা-লোলুপদের লোভের দ্বারা কলুষিত নয় বলে রাশিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্গত নানাবিধ প্রজা জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সমান অধিকারের দ্বারা ও প্রকৃষ্ট শিক্ষার সুযোগে সম্মানিত হয়েছে, এ কথাটারও আলোচনা করেছি। আমি ব্রিটিশ-ভারতের প্রজা বলেই এই দুটি ব্যাপার আমাকে এত গভীরভাবে আনন্দ দিয়েছে।

এখন বোধ করি একটি শেষ প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে। বলশেভিক অর্থনীতি সম্বন্ধে আমার মত কী, এ কথা অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন। আমার ভয় এই যে, আমরা চিরদিন শাস্ত্রশাসিত পাণ্ডাচালিত দেশ, বিদেশের আমদানি বচনকে একেবারেই বেদবাক্য বলে মেনে নেবার দিকেই আমাদের মুগ্ধ মনের ঝোঁক। গুরুমন্ত্রের মোহ থেকে সামলিয়ে নিয়ে আমাদের বলা দরকার যে, প্রয়োগের দ্বারাই

মতের বিচার হতে পারে, এখনো পরীক্ষা শেষ হয় নি। যে-কোনো মতবাদ মানুষ-সম্বন্ধীয় তার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মানবপ্রকৃতি। এই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য কী পরিমাণে ঘটবে তার সিদ্ধান্ত হতে সময় লাগে। তত্ত্বটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করবার পূর্বে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তবু সে সম্বন্ধে আলোচনা করা চলে, কেবলমাত্র লজিক নিয়ে বা অঙ্ক কষে নয়— মানবপ্রকৃতিকে সামনে রেখে।

মানুষের মধ্যে দুটো দিক আছে— এক দিকে সে স্বতন্ত্র, আর-এক দিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। এর একটাকে বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে সেটা অবাস্তব। যখন কোনো একটা ঝোঁকে পড়ে মানুষ এক দিকেই একান্ত উধাও হয়ে যায় এবং ওজন হারিয়ে নানাপ্রকার বিপদ ঘটাতে থাকে তখন পরামর্শদাতা এসে সংকটটাকে সংক্ষেপ করতে চান; বলেন, অন্য দিকটাকে একেবারেই ছেঁটে দাও। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যখন উৎকট স্বার্থপরতায় পৌঁছিয়ে সমাজে নানাপ্রকার উৎপাত মথিত করে তখন উপদেষ্টা বলেন, স্বার্থ থেকে স্ব-টাকে এক কোপে দাও উড়িয়ে, তা হলেই সমস্ত ঠিক চলবে। তাতে হয়তো উৎপাত কমতে পারে, কিন্তু চলা বন্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়া গাড়িটাকে খানায় ফেলবার জো করে— ঘোড়াটাকে গুলি করে মারলেই যে তার পর থেকে গাড়িটা সুস্থভাবে চলবে, এমন চিন্তা না করে লাগামটা সম্বন্ধে চিন্তা করবার দরকার হয়ে ওঠে।

দেহে দেহে পৃথক বলেই মানুষ কাড়াকাড়ি হানাহানি করে থাকে, কিন্তু সব মানুষকে এক দড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সমস্ত পৃথিবীতে একটিমাত্র বিপুল কলেবর ঘটিয়ে তোলবার প্রস্তাব বলগর্বিত অর্থতাত্ত্বিক কোনো জারের মুখেই শোভা পায়। বিধাতার বিধিকে একেবারে সমূলে অতিদিষ্ট করবার চেষ্টায় যে পরিমাণে সাহস তার চেয়ে অধিক পরিমাণে মূঢ়তা দরকার করে।

একদিন ভারতের সমাজটাই ছিল প্রধানত পল্লীসমাজ। এইরকম ঘনিষ্ঠ পল্লীসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত সম্পত্তির সামঞ্জস্য ছিল। লোকমতের প্রভাব ছিল এমন যে, ধনী আপনার ধন সম্পূর্ণ আপন ভোগে লাগাতে অগৌরব বোধ করত। সমাজ তার কাছ থেকে আনুকূল্য স্বীকার করেছে বলেই তাকে কৃতার্থ করেছে, অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় যাকে চ্যারিটি বলে এর মধ্যে তা ছিল না। ধনীর স্থান ছিল সেখানেই যেখানে ছিল নির্ধন; সেই সমাজে আপন স্থানমর্যাদা রক্ষা করতে গেলে ধনীকে নানা পরোক্ষ আকারে বড়ো অঙ্কের খাজনা দিতে হত। গ্রামে বিশুদ্ধ জল, বৈদ্য, পণ্ডিত, দেবালয়, যাত্রা, গান, কথা, পথঘাট, সমস্তই রক্ষিত হত গ্রামের ব্যক্তিগত অর্থের সমাজমুখীন প্রবাহ থেকে, রাজকর থেকে নয়। এর মধ্যে স্বেচ্ছা এবং সমাজের

ইচ্ছা দু'ই মিলতে পেরেছে। যেহেতু এই আদানপ্রদান রাষ্ট্রীয় যন্ত্রযোগে নয়, পরন্তু মানুষের ইচ্ছাবাহিত, সেইজন্যে এর মধ্যে ধর্মসাধনার ক্রিয়া চলত, অর্থাৎ এতে কেবল-মাত্র আইনের চালনায় বাহ্য ফল ফলত না, অন্তরের দিকে ব্যক্তিগত উৎকর্ষসাধন হত। এই ব্যক্তিগত উৎকর্ষই মানবসমাজের স্থায়ী কল্যাণময় প্রাণবান আশ্রয়।

বণিকসম্প্রদায়, বিত্ত খাটিয়ে লাভ করাটাই যাদের মুখ্য ব্যবসায়, তারা সমাজে ছিল পতিত। যেহেতু তখন ধনের বিশেষ সম্মান ছিল না এইজন্য ধন ও অধনের একটা মস্ত বিভেদ তখন ছিল অবর্তমান। ধন আপন বৃহৎ সঞ্চয়ের দ্বারা নয়, আপন মহৎ দায়িত্ব পূরণ করে তবে সমাজে মর্যাদা লাভ করত; নইলে তার ছিল লজ্জা। অর্থাৎ সম্মান ছিল ধর্মের, ধনের নয়। এই সম্মান সমর্পণ করতে গিয়ে কারো আত্মসম্মানের হানি হত না। এখন সেদিন গেছে বলেই সামাজিক-দায়িত্বহীন ধনের প্রতি একটা অসহিষ্ণুতার লক্ষণ নানা আকারে দেখা যাচ্ছে। কারণ, ধন এখন মানুষকে অর্ঘ্য দেয় না, তাকে অপমানিত করে।

য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রথম থেকেই নগরে সংহত হবার পথ খুঁজেছে। নগরে মানুষের সুযোগ হয় বড়ো, সম্বন্ধ হয় খাটো। নগর অতিবৃহৎ, মানুষ সেখানে বিক্ষিপ্ত, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য একান্ত, প্রতিযোগিতার মথন প্রবল। ঐশ্বর্য সেখানে ধনী-নির্ধনের বিভাগকে বাড়িয়ে তোলে এবং চ্যারিটির দ্বারা যেটুকু যোগসাধন হয় তাতে সান্ত্বনা নেই, সম্মান নেই। সেখানে যারা ধনের অধিকারী এবং যারা ধনের বাহন তাদের মধ্যে আর্থিক যোগ আছে, সামাজিক সম্বন্ধ বিকৃত অথবা বিচ্ছিন্ন।

এমন অবস্থায় যন্ত্রযুগ এল, লাভের অঙ্ক বেড়ে চলল অসম্ভব পরিমাণে। এই লাভের মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে যখন ছড়াতে লাগল তখন যারা দূরবাসী অনাত্মীয়, যারা নির্ধন, তাদের আর উপায় রইল না— চীনকে খেতে হল আফিম; ভারতকে উজাড় করতে হল তার নিজস্ব; আফ্রিকা চিরদিন পীড়িত, তার পীড়া বেড়ে চলল। এ তো গেল বাইরের কথা, পশ্চিম মহাদেশের ভিতরেও ধনী-নির্ধনের বিভাগ আজ অত্যন্ত কঠোর; জীবনযাত্রার আদর্শ বহুমূল্য ও উপকরণবহুল হওয়াতে দুই পক্ষের ভেদ অত্যন্ত প্রবল হয়ে চোখে পড়ে। সাবেক কালে, অন্তত আমাদের দেশে, ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ছিল প্রধানত সামাজিক দানে ও কর্মে, এখন হয়েছে ব্যক্তিগত ভোগে। তাতে বিস্মিত করে, আনন্দিত করে না; ঈর্ষা জাগায়, প্রশংসা জাগায় না। সব চেয়ে বড়ো কথাটা হচ্ছে এই যে, তখন সমাজে ধনের ব্যবহার একমাত্র দাতার স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করত না, তার উপরে ছিল সামাজিক ইচ্ছার প্রবল প্রভাব। সুতরাং দাতাকে নম্র হয়ে দান করতে হত; 'শ্রদ্ধয়া দেয়ং' এই কথাটা খাটত।

মোট কথা হচ্ছে, আধুনিক কালে ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয় ধনীকে যে প্রবল শক্তির অধিকার দিচ্ছে তাতে সর্বজনের সম্মান ও আনন্দ থাকতে পারে না। তাতে এক পক্ষে অসীম লোভ, অপর পক্ষে গভীর ঈর্ষা, মাঝখানে দুস্তর পার্থক্য। সমাজে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বড়ো হয়ে উঠল। এই প্রতিযোগিতা নিজের দেশের এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর, এবং বাহিরে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের। তাই চার দিকে সংশয়হিংস্র অস্ত্র শানিত হয়ে উঠছে, কোনো উপায়েই তার পরিমাণ কেউ খর্ব করতে পারছে না। আর, পরদেশী যারা এই দুরস্থিত ভোগরাক্ষসের ক্ষুধা মেটাবার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কৃশতা যুগের পর যুগে বেড়েই চলেছে। এই বহুবিস্তৃত কৃশতার মধ্যে পৃথিবীর অশান্তি বাসা বাঁধতে পারে না, এ কথা যারা বলদর্পে কল্পনা করে তারা নিজের গোঁয়ার্তমির অন্ধতার দ্বারা বিড়ম্বিত। যারা নিরন্তর দুঃখ পেয়ে চলেছে সেই হতভাগারাই দুঃখবিধাতার প্রেরিত দূতদের প্রধান সহায়; তাদের উপবাসের মধ্যে প্রলয়ের আগুন সঞ্চিত হচ্ছে।

বর্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়; বায়ুমণ্ডলের এক অংশে তনুত্ব ঘটলে ঝড় যেমন বিদ্যুদ্দন্ত পেষণ করে মারমূর্তি ধরে ছুটে আসে এও সেইরকম কাণ্ড। মানবসমাজে সামঞ্জস্য ভেঙে গেছে বলেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা ক্রমশই বেড়ে উঠছিল বলেই সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ব্যষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব উঠেছে। তীরে অগ্নিগিরি উৎপাত বাধিয়েছে বলে সমুদ্রকেই একমাত্র বন্ধু বলে এই ঘোষণা। তীরহীন সমুদ্রের রীতিমত পরিচয় যখন পাওয়া যাবে তখন কূলে ওঠবার জন্যে আবার আঁকুবাঁকু করতে হবে। সেই ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনোই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয় করে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরণী পার করে দিয়ে সমাজরক্ষা করবে কে। অসম্ভব নয় যে, বর্তমান রুগ্ন যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা; কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে সেইদিনই রোগীর শুভদিন।

আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধন- উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক, এই আমি কামনা করি। কারণ, এই নীতিতে যে সহযোগিতা আছে তাতে সহযোগীদের ইচ্ছাকে চিন্তাকে তিরস্কৃত করা হয় না বলে, মানবপ্রকৃতিকে স্বীকার করা হয়। সেই প্রকৃতিকে বিরুদ্ধ করে দিয়ে জোর খাটাতে গেলে সে জোর খাটবে না।

এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করে বলা দরকার। আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের দেশের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনো ইচ্ছে করি নে যে গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেইরকম সংস্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও কর্ম যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত— বর্তমান যুগের যে প্রকৃতি তার সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ। বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী, যদিও তার হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ সে পরিমাণে ব্যাপক হয় নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনো দিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।

ইংলণ্ডে একদা কোনো-এক গ্রামে একজন কৃষকের বাড়িতে ছিলুম। দেখলুম, লণ্ডনে যাবার জন্যে ঘরের মেয়েগুলির মন চঞ্চল। শহরের সর্ববিধ ঐশ্বর্যের তুলনায় গ্রামের সম্বলের এত দীনতা যে, গ্রামের চিত্তকে স্বভাবতই সর্বদা শহরের দিকে টানছে। দেশের মাঝখানে থেকেও গ্রামগুলির যেন নির্বাসন। রাশিয়ায় দেখেছি, গ্রামের সঙ্গে শহরের বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা। এই চেষ্টা যদি ভালো করে সিদ্ধ হয় তা হলে শহরের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধি নিবারণ হবে। দেশের প্রাণশক্তি চিন্তাশক্তি দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আপন কাজ করতে পারবে।

আমাদের দেশের গ্রামগুলিও শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্‌বৃত্ত -ভোজী না হয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক, এই আমি কামনা করি। একমাত্র সমবায়প্রণালীর দ্বারাই গ্রাম আপন সর্বাঙ্গীণ শক্তিকে নিমজ্জনদশা থেকে উদ্ধার করতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায়প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ শোধিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।

তার প্রধান কারণ, যে শাসনতন্ত্রকে আশ্রয় করে আমলা-বাহিনী সমবায়নীতি আমাদের দেশে আবির্ভূত হল সে যন্ত্র, অন্ধ, বধির, উদাসীন। তা ছাড়া হয়তো এ কথা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, চরিত্রে যে গুণ থাকলে সমবেত হওয়া সহজ হয় আমাদের সে গুণ নেই ; যারা দুর্বল পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস তাদের দুর্বল। নিজের 'পরে অশ্রদ্ধাই অপরের প্রতি অশ্রদ্ধার ভিত্তি। যারা দীর্ঘকাল পরাধীন, আত্মসম্মান হারিয়ে তাদের এই দুর্গতি। প্রভুশ্রেণীর শাসন তারা নতশিরে স্বীকার করতে পারে, কিন্তু স্বশ্রেণীর চালনা তারা সহ্য করে না। স্বশ্রেণীকে বঞ্চনা করা এবং তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা তাদের পক্ষে সহজ।

রুশীয় গল্পের বই পড়ে জানা যায়, সেখানকার বহুকাল-নির্যাতন-পীড়িত কৃষকদেরও এই দশা। যতই দুঃসাধ্য হোক, আর কোনো রাস্তা নেই, পরস্পরের শক্তিকে মনকে সম্মিলিত করবার উপলক্ষ সৃষ্টি করে প্রকৃতিকে শোধন করে নিতে হবে। সমবায়-প্রণালীতে ঋণ দিয়ে নয়, একত্র কর্ম করিয়ে পল্লীবাসীর চিত্তকে ঐক্যপ্রবণ করে তুলে তবে আমরা পল্লীকে বাঁচাতে পারব।

পরিশিষ্ট

গ্রামবাসীদিগের প্রতি

শ্রীনিকেতন বাৎসরিক উৎসবে সমবেত গ্রামবাসীগণের নিকট কথিত

বন্ধুগণ, আমি এক বৎসর প্রবাসে পশ্চিম মহাদেশের নানা জায়গায় ঘুরে আবার আমার আপন দেশে ফিরে এসেছি। একটি কথা তোমাদের কাছে বলা দরকার— অনেকেই হয়তো তোমরা অনুভব করতে পারবে না কথাটি কতখানি সত্য। পশ্চিমের দেশ বিদেশ হতে এত দুঃখ আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে ভিতর থেকে— এরকম চিত্র যে আমি দেখব মনে করি নি। তারা সুখে নেই। সেখানে বিপুল পরিমাণে আসবাবপত্র নানারকম আয়োজন উপকরণের সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু গভীর অশান্তি তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ; সুগভীর একটা দুঃখ তাদের সর্বত্র অধিকার করে রয়েছে।

আমার নিজের দেশের উপর কোনো অভিমান আছে বলে এ কথাটি বলছি মনে কোরো না। বস্তুত য়ুরোপের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। পশ্চিম মহাদেশে মানুষ যে সাধনা করছে সে সাধনার যে মূল্য তা আমি অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করি। স্বীকার না করাকে অপরাধ বলে গণ্য করি। সে মানুষকে অনেক ঐশ্বর্য দিয়েছে, ঐশ্বর্যের পন্থা বিস্তৃত করে দিয়েছে। সব হয়েছে। কিন্তু, দুঃখ পাপে। কলি এমন কোনো ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে, তা প্রথমত চোখেই পড়ে না। ক্রমে ক্রমে তার ফল আমরা দেখতে পাই।

আমি সেখানকার অনেক চিন্তাশীল মনীষীর সঙ্গে আলাপ করেছি। তাঁরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ভাবতে বসেছেন— এত বিদ্যা, এত জ্ঞান, এত শক্তি, এত সম্পদ, কিন্তু কেন সুখ নেই, শান্তি নেই। প্রতি মুহূর্তে সকলে শঙ্কিত হয়ে আছে, কখন একটা ভীষণ উপদ্রব প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। তাঁরা কী স্থির করলেন বলতে পারি না। এখনো বোধ হয় ভালো করে কোনো কারণ নির্ণয় করতে পারেন নি কিম্বা তাঁদের মধ্যে নানান লোক আপন আপন স্বভাব-অনুসারে নানারকম কারণ কল্পনা করেছেন। আমিও এ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করেছি। আমি যেটা মনে করি সেটা সম্পূর্ণ সত্য কি না জানি না ; কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস, এর কারণটি কোথায় তা আমি অনুভব করতে পেরেছি ঠিকমত।

পশ্চিম দেশ যে সম্পদ সৃষ্টি করেছে সে অতিবিপুল প্রচণ্ডশক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের যোগে।

ধনের বাহন হয়েছে যন্ত্র, আবার সেই যন্ত্রের বাহন হয়েছে মানুষ। হাজার হাজার বহু শতসহস্র। তার পর যান্ত্রিক সম্পৎ-প্রতিষ্ঠার বেদীরূপে তারা বড়ো বড়ো শহর তৈরি করেছে। সে শহরের পেট ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তার পরিধি অত্যন্ত বড়ো হয়ে উঠল। নিউইয়র্ক লণ্ডন প্রভৃতি শহর বহু গ্রাম-উপগ্রামের প্রাণশক্তি গ্রাস করে তবে একটা বৃহৎ দানবীয় রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে— শহরে মানুষ কখনো ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে না। দূরে যাবার দরকার নেই— কলিকাতা শহর, যেখানে আমরা থাকি, জানি, প্রতিবেশীর সঙ্গে সেখানে প্রতিবেশীর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে কোনো সম্বন্ধ নেই। আমরা তাদের নাম পর্যন্ত জানি নে।

মানুষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম আছে, সে তার সমাজধর্ম। সমাজের মধ্যে সে যথার্থ আপনার আশ্রয় পায় পরস্পরের যোগে। পরস্পর সাহায্য করে বলে মানুষ যে শক্তি পায় আমি তার কথা বলি না। মানুষের সম্বন্ধ যখন চারি দিকের প্রতিবেশীর মধ্যে, যখন আপন ঘরে এবং আপন ঘরের বাইরে ব্যাপ্ত হয়, তখন সে সম্বন্ধের বৃহত্ত্ব মানুষকে আপনি আনন্দ দেয়। আমাদের গভীর পরিতৃপ্তি সেখানে যেখানে কেবলমাত্র ব্যবহারিক সম্বন্ধ নয়, সুযোগ-সুবিধার সম্বন্ধ নয়, ব্যাবসার সম্বন্ধ নয়, কিন্তু সকলরকম স্বার্থের অতীত আত্মীয়সম্বন্ধ। সেখানে মানুষ আর-সমস্ত থেকে বঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু মানব-আত্মার তৃপ্তি তার প্রচুর পরিমাণে হয়।

বিদেশে আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন— যাকে ওঁরা 'হ্যাপিনেস্' বলেন, আমরা বলি সুখ, এর আধার কোথায়। মানুষ সুখী হয় সেখানেই যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সত্য হয়ে ওঠে— এ কথাটি বলাই বাহুল্য। কিন্তু আজকের দিনে এটা বলার প্রয়োজন হয়েছে। কেননা, এই সম্বন্ধকে বাদ দিয়ে যেখানে ব্যাবসাঘটিত যোগ সেখানে মানুষ এত প্রচুর ফললাভ করে— বাইরের ফল— এত তাতে মুনফা হয়, এতরকম সুযোগ-সুবিধা মানুষ পায় যে মানুষের বলবার সাহস থাকে না, এটাই সভ্যতার চরম বিকাশ নয়। এত পায়! এত তার শক্তি! যন্ত্রযোগে যে শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে তার দ্বারা এমনি করে সমস্ত পৃথিবীকে সে অভিভূত করেছে, বিদেশের এত লোককে তার নিজের দাসত্বে ব্রতী করতে পেরেছে— তার এত অহংকার! আর, সেই সঙ্গে এমন অনেক সুযোগ-সুবিধা আছে যা বস্তুত মানুষের জীবনযাত্রার পথে অত্যন্ত অনুকূল। সেগুলি ঐশ্বর্যযোগে উদ্‌ভূত হয়েছে। এগুলিকে চরম লাভ বলে মানুষ সহজেই মনে করে। না মনে করে থাকতে পারে না। এর কাছে সে বিকিয়ে দিয়েছে মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস, সে হল মানবসম্বন্ধ।

মানুষ বন্ধুকে চায়, যারা সুখে দুঃখে আমার আপন, যাদের কাছে বসে আলাপ করলে খুশি হই, যাদের বাপ-মার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল, যাদের আমার পিতৃস্থানীয় বলে জেনেছি, যাদের ছেলেরা আমার পুত্রসন্তানের স্থানীয়। এ-সব পরিমণ্ডলীর ভিতর মানুষ আপনার মানবত্বকে উপলব্ধি করে।

এ কথা সত্য, একটা প্রকাণ্ড দানবীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ আপনার শক্তিকে অনুভব করে। সেও বহুমূল্য, আমি তাকে অবজ্ঞা করব না। কিন্তু সেই শক্তি-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষী সম্বন্ধ-বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র কেবলই সংকীর্ণ হতে থাকে তবে সেই শক্তি শক্তিশেল হয়ে উঠে মানুষকে মারে, মারবার অস্ত্র তৈরি করে, মানুষের সর্বনাশ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে, অনেক মিথ্যার সৃষ্টি করে, অনেক নিষ্ঠুরতাকে পালন করে, অনেক বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করে সমাজে। এ হতেই হবে। দরদ যখন চলে যায়, মানুষ অধিকাংশ মানুষকে যখন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো দেখতে অভ্যস্ত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে যখন দেখে 'তারা আমার কলের চাকা চালিয়ে আমার কাপড় সস্তা করবে, আমার খাবার জুগিয়ে দেবে, আমার ভোগের উপকরণ সুগম করবে'— এইভাবে যখন মানুষকে দেখতে অভ্যস্ত হয় তখন তারা মানুষকে দেখে না, মানুষের মধ্যে কলকে দেখে।

এখানে চালের কল আছে। সেই কল-দানবের চাকা সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা। ধনী তাদের কি মানুষ মনে করে। তাদের সুখদুঃখের কি হিসেব আছে। প্রতিদিনের পাওনা গুনে দিয়ে তার কাছে কষে রক্ত শুষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। এতে টাকা হয়, সুখও হয়, অনেক হয়, কিন্তু বিকিয়ে যায় মানুষের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবত্ব। দয়ামায়া, পরস্পরের সহজ আনুকূল্য, দরদ— কিছু থাকে না। কে দেখে তাদের ঘরে কী হয়েছে না হয়েছে। একসময় আমাদের গ্রামে উচ্চনীচের ভেদ ছিল না তা নয়— প্রভু ছিল, দাস ছিল ; পণ্ডিত ছিল, অজ্ঞান ছিল ; ধনী ছিল, নির্ধন ছিল ; কিন্তু সকলের সুখদুঃখের উপর সকলের দৃষ্টি ছিল। পরস্পর সম্মিলিত হয়ে একত্রীভূত একটা জীবনযাত্রা তারা তৈরি করে তুলেছিল। পূজাপার্বণে আনন্দ-উৎসবে সকল সম্বন্ধে প্রতিদিন তারা নানারকমে মিলিত হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে এসে গল্প করেছে দাদাঠাকুরের সঙ্গে। যে অন্ত্যজ সেও একপাশে বসে আনন্দের অংশ গ্রহণ করেছে। উপর-নীচ জ্ঞানী-অজ্ঞানীর মাঝখানে যে রাস্তা যে সেতু সেটা খোলা ছিল।

আমি পল্লীর কথা বলছি, কিন্তু মনে রেখো— পল্লীই তখন সব ; শহর তখন নগণ্য বলতে চাই না, কিন্তু গৌণ, মুখ্য নয়, প্রধান নয়। পল্লীতে পল্লীতে কত পণ্ডিত, কত ধনী, কত মানী, আপনার পল্লীকে জন্মস্থানকে আপনার করে বাস করেছে। সমস্ত

জীবন হয়তো নবাবের ঘরে, দরবারে কাজ করেছে। যা-কিছু সম্পদ তারা পল্লীতে এনেছে। সেই অর্থে টোল চলেছে, পাঠশালা বসেছে, রাস্তাঘাট হয়েছে, অতিথিশালা, যাত্রা-পূজা-অর্চনায় গ্রামের মনপ্রাণ এক হয়ে মিলেছে। গ্রামে আমাদের দেশের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ছিল, তার কারণ গ্রামে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সামাজিক সম্বন্ধ সেটা সত্য হতে পারে। শহরে তা সম্ভব নয়। অতএব সামাজিক মানুষ আশ্রয় পায় গ্রামে। আর, সামাজিক মানুষের জন্যই তো সব। ধর্মকর্ম সামাজিক মানুষেরই জন্য। লক্ষপতি ক্রোড়পতি টাকার থলি নিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে থাকতে পারে। বড়ো বড়ো হিসাবের খাতা ছাড়া তার আর কিছু নেই, তার সঙ্গে কারো সম্বন্ধ নেই। আপনার টাকার গড়খাই করে তার মধ্যে সে বসে আছে, সর্বসাধারণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কোথায়।

এখনকার সঙ্গে তুলনা করলে অনেক অভাব আমাদের দেশে ছিল। এখন আমরা কলের জল খাই, তাতে রোগের বীজ কম; ভালো ডাক্তার পাই, ডাক্তারখানা আছে; জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক সুযোগ ঘটেছে। আমি তাকে অসম্মান করি নে; কিন্তু আমাদের খুব একটা বড়ো সম্পদ ছিল, সে হচ্ছে আত্মীয়তা। এর চেয়ে বড়ো সম্পদ নেই। এই আত্মীয়তার যেখানে অভাব সেখানে সুখশান্তি থাকতে পারে না।

সমস্ত পশ্চিম মহাদেশে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। তার গভীর শিকড় নেই। সকলে বলছে, "আমি ভোগ করব, আমি বড়ো হব, আমার নাম হবে, আমার মুনফা হবে।" যে তা করছে তার কতবড়ো সম্মান। তার ধনশক্তির পরিমাপ করতে গিয়ে সেখানকার লোকের মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত শক্তির এইরকম উপাসনা এমনভাবে আমাদের দেশে দেখি নি। কিছু না, একটা লোক শুধু ঘুষি চালাতে পারে। সে ঘুষির বড়ো ওস্তাদ রাস্তা দিয়ে বেরোল, রাস্তায় ভিড় জমে গেল। খবর এল সিনেমার নটী লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে আসছে, গাড়ির ভিতর থেকে চকিতে তাকে দেখবে বলে জনতায় রাস্তা নিরেট হয়ে উঠল। আমাদের দেশে মহদাশয় যাঁকে বলি তিনি এলে আমরা সকলে তাঁর চরণধুলো নেব। মহাত্মা গান্ধী যদি আসেন দেশসুদ্ধ লোক খেপে যাবে। তাঁর না আছে অর্থ, না আছে বাহুবল, কিন্তু আছে হৃদয়, আছে আধ্যাত্মিক শক্তি। আমি যতদূর জানি তিনি ঘুষি মারতে জানেন না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে তিনি বড়ো করে স্বীকার করেছেন; আপনাকে তিনি স্বতন্ত্র করে রাখেন নি, তিনি আমাদের সকলের, আমরা সকলে তাঁর। ব্যস্, হয়ে গেল, এর চেয়ে বেশি আমরা কিছু বুঝি নে। তাঁর চেয়ে অনেক বিদ্বান, অনেক জ্ঞানী, অনেক ধনী আছে; কিন্তু আমাদের দেশ দেখবে আত্মদানের ঐশ্বর্য। এ কি কম কথা। এর থেকে বুঝি, আমাদের দেশের লোক কী চায়।

পাণ্ডিত্য নয়, ঐশ্বর্য নয়, আর কিছু নয়, চায় মানুষের আত্মার সম্পদ। কিন্তু দিনে দিনে পরিবর্তন হয়ে এসেছে। আমি গ্রামে অনেকদিন কাটিয়েছি, কোনোরকম চাটুবাক্য বলতে চাই নে। গ্রামের যে মূর্তি দেখেছি সে অতি কুৎসিত। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষ ছলনা বঞ্চনা বিচিত্র আকারে প্রকাশ পায়। মিথ্যা মকদ্দমায় সাংঘাতিক জালে পরস্পরকে জড়িয়ে মারে। সেখানে দুর্নীতি কতদূর শিকড় গেড়েছে তা চক্ষে দেখেছি। শহরে কতকগুলি সুবিধা আছে, গ্রামে তা নেই; গ্রামের যেটা আপন জিনিস ছিল তাও আজ সে হারিয়েছে।

মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে আজ এসেছি গ্রামবাসী তোমাদের কাছে। পূর্বে তোমরা সমাজবন্ধনে এক ছিলে, আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে কেবল আঘাত করছ। আর-একবার সম্মিলিত হয়ে তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বাহিরের আনুকূল্যের অপেক্ষা কোরো না। শক্তি তোমাদের মধ্যে আছে জেনেই সেই শক্তির আত্মবিস্মৃতি আমরা ঘোচাতে ইচ্ছা করেছি। কেননা তোমাদের সেই শক্তির উপর সমস্ত দেশের দাবি আছে। ভিত যতই যাচ্ছে ধ্বসে উপরের তলায় ফাটল ধরছে— বাইরে থেকে পলস্তারা দিয়ে বেশি দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা চলবে না।

এসো তোমরা, প্রার্থীভাবে নয়, কৃতীভাবে। আমাদের সহযোগী হও, তা হলেই সার্থক হবে আমাদের এই উদ্যোগ। গ্রামের সামাজিক প্রাণ সুস্থ হয়ে সবল হয়ে উঠুক। গানে গীতে কাব্যে কথায় অনুষ্ঠানে আনন্দে শিক্ষায় দীক্ষায় চিত্ত জাগুক। তোমাদের দৈন্য দুর্বলতা আত্মাবমাননা ভারতবর্ষের বুকের উপর প্রকাণ্ড বোঝা হয়ে চেপে রয়েছে। আর-সকল দেশ এগিয়ে চলেছে, আমরা অজ্ঞানে অশিক্ষায় স্থাবর হয়ে পড়ে আছি। এ সমস্তই দূর হয়ে যাবে যদি নিজের শক্তিসম্বলকে সমবেত করতে পারি। আমাদের এই শ্রীনিকেতনে জনসাধারণের সেই শক্তিসমবায়ের সাধনা।

১৩৩৭

পল্লীসেবা

শ্রীনিকেতনের উৎসবে কথিত

বেদে অনন্তস্বরূপকে বলেছেন আবিঃ, প্রকাশস্বরূপ। তাঁর প্রকাশ আপনার মধ্যেই সম্পূর্ণ। তাঁর কাছে মানুষের প্রার্থনা এই যে : আবিরাবীর্ম এধি। হে আবি, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক। অর্থাৎ, আমার আত্মায় অনন্তস্বরূপের প্রকাশ চাই। জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমার অভিব্যক্তি অনন্তের পরিচয় দেবে, এতেই আমার সার্থকতা। আমাদের চিত্তবৃত্তি থেকে, ইচ্ছাশক্তি থেকে, কর্মোদ্যম থেকে, অপূর্ণতার আবরণ ক্রমে ক্রমে মোচন করে অনন্তের সঙ্গে নিজের সাধর্ম্য প্রমাণ করতে থাকব এই হচ্ছে মানুষের ধর্মসাধনা।

অন্য জীবজন্তু যেমন অবস্থায় সংসারে এসেছে সেই অবস্থাতেই তাদের পরিণাম। অর্থাৎ, প্রকৃতিই তাদের প্রকাশ করেছে এবং সেই প্রকৃতির প্রবর্তনা মেনেই তারা প্রাণযাত্রা নির্বাহ করে, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু, নিজের ভিতর থেকে নিজের অন্তরতর সত্যকে নিরন্তর উদ্‌ঘাটিত করতে হবে নিজের উদ্যমে— মানুষের এই চরম অধ্যবসায়। সেই আত্মোপলব্ধ সত্যেই তার প্রকাশ, প্রকৃতিনিয়ন্ত্রিত প্রাণযাত্রায় নয়। তাই তার দুরূহ প্রার্থনা এই যে, সকল দিকেই অনন্তকে যেন প্রকাশ করি। তাই সে বলে, ভূমৈব সুখং, মহত্ত্বেই সুখ, নাল্পে সুখমস্তি, অল্প-কিছুতেই সুখ নেই।

মানুষের পক্ষে তাই সকলের চেয়ে দুর্গতি যখন আপনার জীবনে সে আপন অন্তর্নিহিত ভূমাকে প্রকাশ করতে পারলে না— বাধাগুলো শক্ত হয়ে রইল। এই তার পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে বড়ো মৃত্যু। আহারে বিহারে ভোগে বিলাসে সে পরিপুষ্ট হতে পারে; কিন্তু জ্ঞানের দীপ্তিতে, ত্যাগের শক্তিতে, প্রেমের বিস্তারে, কর্মচেষ্টার সাহসে সে যদি আপনার প্রবুদ্ধ মুক্তস্বরূপ কিছু পরিমাণেও প্রকাশ করতে না পারে তবে তাকেই বলে 'মহতী বিনষ্টিঃ'। সে বিনষ্টি জীবের মৃত্যুতে নয়, আত্মার অপ্রকাশে।

সভ্যতা যাকে বলি তার এক প্রতিশব্দ হচ্ছে 'ভূমাকে প্রকাশ'। মানুষের ভিতরকার যে 'নিহিতার্থ' যা তার গভীর সত্য, সভ্যতায় তারই আবিষ্কার চলছে। সভ্য মানুষের শিক্ষাবিধি এত ব্যাপক, এত দুরূহ এইজন্যেই। তার সীমা কেবলই অগ্রসর হয়ে চলেছে; সভ্য মানুষের চেষ্টা প্রকৃতিনির্দিষ্ট কোনো গণ্ডীকে চরম বলতে চাচ্ছে না।

মানুষের মধ্যে নিত্যপ্রসার্যমাণ সম্পূর্ণতার যে আকাঙ্ক্ষা তার দুটো দিক, কিন্তু তারা পরস্পরযুক্ত। একটা ব্যক্তিগত পূর্ণতা, আর-একটা সামাজিক, এদের মাঝখানে ভেদ নেই। ব্যক্তিগত উৎকর্ষের ঐকান্তিকতা অসম্ভব। মানবলোকে যাঁরা

শ্রেষ্ঠ পদবী পেয়েছেন তাঁদের শক্তি সকলের শক্তির ভিতর দিয়েই ব্যক্ত, তা পরিচ্ছিন্ন নয়। মানুষ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহযোগিতা যেখানে নিবিড় নয়, সেইখানেই বর্বরতা। বর্বর একা একা শিকার করে, খণ্ড খণ্ড ভাবে জীবিকার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেই জীবিকার ভোগ অত্যন্ত ছোটো সীমার মধ্যে। বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষসহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত করে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদকে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হল সভ্য মানবের লক্ষ্য।

উপনিষৎ বলেন, আমরা যখন আপনার মধ্যে অন্যকে ও অন্যের মধ্যে আপনাকে পাই তখনই সত্যকে পাই— ন ততো বিজুগুপ্সতে— তখন আর গোপনে থাকতে পারি নে, তখনই আমাদের প্রকাশ। সভ্যতায় মানুষ প্রকাশমান, বর্বরতায় মানুষ অপ্রকাশিত। পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের আত্মোপলব্ধি যতই সত্য হতে থাকে ততই সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ পরিস্ফুট হয়। ধর্মের নামে, কর্মের নামে, বৈষয়িকতার নামে, স্বাদেশিকতার নামে, যেখানেই মানুষ মানবলোকে ভেদ সৃষ্টি করেছে সেইখানেই দুর্গতির কারণ গোচরে অগোচরে বল পেতে থাকে। সেখানে মানব আপন মানবধর্মকে আঘাত করে, সেই হচ্ছে আত্মঘাতের প্রকৃষ্ট পন্থা। ইতিহাসে যুগে যুগে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সভ্যতা-বিনাশের কারণ সন্ধান করলে একটিমাত্র কারণ পাওয়া যায়, সে হচ্ছে মানবসম্বন্ধের বিকৃতি বা ব্যাঘাত। যারা ক্ষমতাশালী ও যারা অক্ষম তাদের মধ্যেকার ব্যবধান প্রশস্ত হয়ে সেখানে সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছে। সেখানে প্রভুর দলে, দাসের দলে, ভোগীর দলে, অভুক্তের দলে, সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করে সমাজদেহে প্রাণ-প্রবাহের সঞ্চরণকে অবরুদ্ধ করেছে; তাতে এক অঙ্গের অতিপুষ্টি এবং অন্য অঙ্গের অতিশীর্ণতায় রোগের সৃষ্টি হয়েছে; পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই এই ছিদ্র দিয়ে আজ যমের চর আনাগোনা করছে। আমাদের দেশে তার প্রবেশপথ অন্য দেশের চেয়ে আরো যেন অবারিত। এই দুর্ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে।

একদিন আমাদের দেশে পল্লীসমাজ সজীব ছিল। এই সমাজের ভিতর দিয়েই ছিল সমস্ত দেশের যোগবন্ধন, আমাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ধর্মকর্মের প্রবাহ পল্লীতে পল্লীতে ছিল সঞ্চারিত। দেশের বিরাট চিত্ত পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত হয়ে আশ্রয় পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে। এ কথা সত্য যে, আধুনিক অনেক জ্ঞানবিজ্ঞান সুযোগ-সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলুম। তখন আমাদের চেষ্টার পরিধি ছিল সংকীর্ণ, বৈচিত্র্য ছিল স্বল্প, জীবনযাত্রার আয়োজনে উপকরণে অভাব ছিল বিস্তর। কিন্তু, সামাজিক প্রাণক্রিয়ার যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। এখন তা নেই। নদীতে স্রোত যখন

বহমান থাকে তখন সেই স্রোতের দ্বারা এ পারে ও পারে, এ দেশে ও দেশে, আনাগোনা-দেনাপাওনার যোগ রক্ষা হয়। জল যখন শুকিয়ে যায় তখন এই নদীরই খাত বিষম বিঘ্ন হয়ে ওঠে। তখন এক কালের পথটাই হয় অন্য কালের অপথ। বর্তমানে তাই ঘটেছে।

যাদের আমরা ভদ্রসাধারণ নাম দিয়ে থাকি তারা যে বিদ্যালাভ করে, তাদের যা আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা, তারা যে-সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে, সে-সব হল মরা নদীর শুষ্ক গহ্বরের এক পাড়িতে— তার অপর পাড়ির সঙ্গে জ্ঞান-বিশ্বাস আচার-অভ্যাস দৈনিক জীবনযাত্রায় দুস্তর দূরত্ব। গ্রামের লোকের না আছে বিদ্যা, না আছে আরোগ্য, না আছে সম্পদ, না আছে অন্নবস্ত্র। ও দিকে যারা কলেজে পড়ে, ওকালতি করে, ডাক্তারি করে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়, তারা রয়েছে দ্বীপের মধ্যে ; চারি দিকে অতল-স্পর্শ বিচ্ছেদ।

যে স্নায়ুজালের যোগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা দেহের মর্মস্থানে পৌঁছয়, সমস্ত দেহের আত্মবোধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বোধের সম্মিলনে সম্পূর্ণ হয়, তার মধ্যে যদি বিচ্ছিন্নতা ঘটে তবে তো মরণদশা। সেই দশা আমাদের সমাজে। দেশকে মুক্তিদান করবার জন্যে আজ যারা উৎকট অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত এমন-সব লোকের মধ্যেও দেখা যায়, সমাজের মধ্যে গুরুতর ভেদ যেখানে, যেখানে পক্ষাঘাতের লক্ষণ, সেখানে তাঁদের দৃষ্টিই পড়ে না। থেকে থেকে বলে ওঠেন, কিছু করা চাই। কিন্তু কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে হাত এগোয় না। দেশ সম্বন্ধে আমাদের যে উদ্যোগ তার থেকে দেশের লোক বাদ পড়ে। এটা আমাদের এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এর বিপুল বিড়ম্বনা সম্বন্ধে আমাদের বোধ নেই। একটা তার দৃষ্টান্ত দিই।

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষাবিধি বলে একটা পদার্থের আবির্ভাব হয়েছে। তারই নামে স্কুল কলেজ ব্যাঙের ছাতার মতো ইতস্তত মাথা তুলে উঠেছে। এমন ভাবে এটা তৈরি যে, এর আলো কলেজি মণ্ডলের বাইরে অতি অল্পই পৌঁছয়— সূর্যের আলো চাঁদের আলোয় পরিণত হয়ে যতটুকু বিকীর্ণ হয় তার চেয়েও কম। বিদেশী ভাষার স্থূল বেড়া তার চার দিকে। মাতৃভাষার যোগে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি সে চিন্তার সাহস অতি অল্প। সে যেন অন্তঃপুরিকা বধূর মতোই ভীরু। আঙিনা পর্যন্তই তার অধিকার, তার বাইরে চিবুক পেরিয়ে তার ঘোমটা নেমে পড়ে। মাতৃভাষার আমল প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেই, অর্থাৎ সে কেবল শিশুশিক্ষারই যোগ্য— অর্থাৎ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শেখবার সুযোগ নেই, সেই বিরাট জনসংঘকে বিদ্যার অধিকার সম্বন্ধে চিরশিশুর মতোই গণ্য করা হয়েছে। তারা কোনোমতেই পুরো

মানুষ হয়ে উঠবে না, অথচ স্বরাজ সম্বন্ধে তারা পুরো মানুষের অধিকার লাভ করবে, চোখ বুজে এইটে আমরা কল্পনা করি।

জ্ঞানলাভের ভাগ নিয়ে দেশের অধিকাংশ জনমণ্ডলী সম্বন্ধে এতবড়ো অনশনের ব্যবস্থা আর-কোনো নবজাগ্রত দেশে নেই— জাপানে নেই, পারস্যে নেই, তুরস্কে নেই, ইজিপ্টে নেই। যেন মাতৃভাষা একটা অপরাধ, যাকে খৃস্টান ধর্মশাস্ত্রে বলে আদিম পাপ। দেশের লোকের পক্ষে মাতৃভাষাগত শিক্ষার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতা আমরা কল্পনার বাইরে ফেলে রেখেছি। 'ইংরেজি হোটেলওয়ালার দোকান ছাড়া আর কোথাও দেশের লোকের পুষ্টিকর অন্ন মিলবেই না' এমন কথা বলাও যা আর 'ইংরেজি ভাষা ছাড়া মাতৃভাষার যোগে জ্ঞানের সম্যক সাধনা হতেই পারবে না' এও বলা তাই।

এই উপলক্ষে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক সমস্ত বিদ্যাকে জাপানী ভাষার সম্পূর্ণ আয়ত্তগম্য করে তবে জাপানী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সত্য ও সম্পূর্ণ করে তুলেছে। তার কারণ, শিক্ষা বলতে জাপান সমস্ত দেশের শিক্ষা বুঝেছে— ভদ্রলোক বলে এক সংকীর্ণ শ্রেণীর শিক্ষা বোঝে নি। মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি, ছোটোলোক; এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। ছোটোলোকদের পক্ষে সকলপ্রকার মাপকাঠিই ছোটো। তারা নিজেও সেটা স্বীকার করে নিয়েছে। বড়ো মাপের কিছুই দাবি করবার ভরসা তাদের নেই। তারা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল, অথচ দেশের অধিকাংশই তারা, সুতরাং দেশের অন্তত বারো-আনা অনালোকিত। ভদ্রসমাজ তাদের স্পষ্ট করে দেখতেই পায় না, বিশ্বসমাজের তো কথাই নেই।

রাষ্ট্রীয় আলোচনার মত্ত অবস্থায় আমরা মুখে যাই কিছু বলি-না কেন, দেশাভিমান যত তারস্বরে প্রকাশ করি-না কেন, আমাদের দেশ প্রকাশহীন হয়ে আছে বলেই কর্মের পথ দিয়ে দেশের সেবায় আমাদের এত ঔদাসীন্য। যাদের আমরা ছোটো করে রেখেছি মানবস্বভাবের কৃপণতাবশত তাদের আমরা অবিচার করেই থাকি। তাদের দোহাই দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অর্থসংগ্রহ করি; কিন্তু তাদের ভাগে পড়ে বাক্য, অর্থটা অবশেষে আমাদের দলের লোকের ভাগ্যেই এসে জোটে। মোট কথাটা হচ্ছে, দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের এক দেশ নয়।

শিশুকালে আমাদের ঘরে যে সেজের দীপ জ্বলত তার এক অংশে অল্প তেল অপর

অংশে অনেকখানি জল ছিল। জলের অংশ ছিল নীচে, তেলের অংশ ছিল উপরে। আলো মিটমিট করে জলত, অনেকখানি ছড়াত ধোঁয়া। এটা কতকটা আমাদের সাবেক কালের অবস্থা। ভদ্রসাধারণ এবং ইতরসাধারণের সম্বন্ধটা এইরকমই ছিল। তাদের মর্যাদা সমান নয় কিন্তু তবুও তারা উভয়ে একত্র মিলে একই আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল। তাদের ছিল একটা অখণ্ড আধার। আজকের দিনে তেল গিয়েছে এক দিকে, জল গিয়েছে আর-এক দিকে; তেলের দিকে আলোর উপাদান অতি সামান্য, জলের দিকে একেবারেই নেই।

বয়স যখন হল, ঘরে এল কেরোসিনের ল্যাম্প্‌ বিদেশ থেকে; তাতে সবটাতেই এক তেল, সেই তেলের সমস্তটার মধ্যেই উদ্দীপনের শক্তি। আলোর উজ্জ্বলতাও বেশি। এর সঙ্গে য়ুরোপীয় সভ্যসমাজের তুলনা করা যেতে পারে। সেখানে এক জাতেরই বিদ্যা ও শক্তি দেশের সকল লোকের মধ্যেই ব্যাপ্ত। সেখানে উপরিতল নিম্নতল আছে, সেই উপরিতলের কাছেই বাতি দীপ্ত হয়ে জ্বলে, নীচের তল অদীপ্ত। কিন্তু, সেই ভেদ অনেকটা আকস্মিক; সমস্ত তেলের মধ্যেই দীপ্তির শক্তি আছে। সে হিসাবে জ্যোতির জাতিভেদ নেই; নীচের তেল যদি উপরে ওঠে তা হলে উজ্জ্বলতার তারতম্য ঘটে না। সেখানে নীচের দলের পক্ষে উপরের দলে উত্তীর্ণ হওয়া অসাধ্য নয়; সেই চেষ্টা নিয়তই চলছে।

আর-এক শ্রেণীর বাতি আছে তাকে বলি বিজলি বাতি। তার মধ্যে তারের কুণ্ডলী আলো দেয়, তার আগাগোড়াই সমান প্রদীপ্ত। তার মধ্যে দীপ্ত-অদীপ্তের ভেদ নেই; এই আলো দিবালোকের প্রায় সমান। য়ুরোপীয় সমাজে এই বাতি জ্বালাবার উদ্যোগ সব দেশে এখন চলছে না; কিন্তু কোথাও কোথাও শুরু হয়েছে— এর যন্ত্রটাকে পাকা করে তুলতে হয়তো এখনো অনেক ভাঙচুর করতে হবে, যন্ত্রের মহাজন কেউ কেউ হয়তো দেউলে হয়ে যেতেও পারে, কিন্তু পশ্চিম মহাদেশে এই দিকে একটা ঝোঁক পড়েছে সে কথা আর গোপন করে রাখবার জো নেই। এইটে হচ্ছে প্রকাশের চেষ্টা, মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্ম; এই ধর্মসাধনায় সকল মানুষই অব্যাহত অধিকার লাভ করবে এইরকমের একটা প্রয়াস ক্রমশই যেন ছড়িয়ে পড়ছে।

কেবল আমাদের হতভাগ্য দেশে দেখি, মাটির প্রদীপে যে আলো একদিন এখানে জ্বলেছিল তাতেও আজ বাধা পড়ল। আজ আমাদের দেশের ডিগ্রিধারীরা পল্লীর কথা যখন ভাবেন তখন তাদের জন্যে অতি সামান্য ওজনে কিছু করাকেই যথেষ্ট বলে মনে করেন। যতক্ষণ আমাদের এইরকমের মনোভাব ততক্ষণ পল্লীর লোকেরা আমাদের পক্ষে বিদেশী। এমন-কি, তার চেয়েও তারা বেশি পর, তার কারণ এই— আমরা স্কুলে

কলেজে যেটুকু বিদ্যা পাই সে বিদ্যা য়ুরোপীয়। সেই বিদ্যার সাহায্যে য়ুরোপীয়কে বোঝা ও য়ুরোপীয়ের কাছে নিজেকে বোঝানো আমাদের পক্ষে সহজ। ইংলণ্ড ফ্রান্স্ জার্মানির চিত্তবৃত্তি আমাদের কাছে সহজে প্রকাশমান ; তাদের কাব্য গল্প নাটক যা আমরা পড়ি সে আমাদের কাছে হেঁয়ালি নয় ; এমন-কি যে কামনা, যে তপস্যা তাদের, আমাদের কামনা-সাধনাও অনেক পরিমাণে তারই পথ নিয়েছে। কিন্তু, যারা মা-ষষ্ঠী মনসা ওলাবিবি শীতলা ঘেঁটু রাহু শনি ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা পাণ্ডা পুরুতের আওতায় মানুষ হয়েছে তাদের থেকে আমরা খুব বেশি উপরে উঠেছি তা নয়, কিন্তু দূরে সরে গিয়েছি— পরস্পরের মধ্যে ঠিকমত সাড়া চলে না। তাদের ঠিকমত পরিচয় নেবার উপযুক্ত কৌতূহল পর্যন্ত আমাদের নেই।

আমাদের কলেজে যারা ইকনমিক্স্ এথ্নোলজি পড়ে তারা অপেক্ষা করে থাকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতের— পাশের গ্রামের লোকের আচারবিচার বিধিব্যবস্থা জানবার জন্যে। ওরা ছোটোলোক, আমাদের মনে মানুষের প্রতি যেটুকু দরদ আছে তাতে করে ওরা আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। পশ্চিম মহাদেশের নানাপ্রকার 'মুভ্মেণ্ট্'এর পূর্বাপর ইতিহাস এঁরা পড়েছেন। আমাদের জনসাধারণদের মধ্যেও নানা মুভ্মেণ্ট্ চলে আসছে, কিন্তু সে আমাদের শিক্ষিত-সাধারণের অগোচরে। জানবার জন্যে কোনো ঔৎসুক্য নেই ; কেননা তাতে পরীক্ষা-পাসের মার্কা মেলে না। দেশের সাধারণের মধ্যে আউল বাউল কত সম্প্রদায় আছে, সেটা একেবারে অবজ্ঞার বিষয় নয় ; ভদ্র-সমাজের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মপ্রচেষ্টার চেয়ে তার মধ্যে অনেক বিষয়ে গভীরতা আছে ; সে-সব সম্প্রদায়ের যে সাহিত্য তাও শ্রদ্ধা করে রক্ষা করবার যোগ্য— কিন্তু 'ওরা ছোটোলোক'।

সকল দেশেই নৃত্য কলাবিদ্যার অন্তর্গত, ভাবপ্রকাশের উপায়রূপে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে ভদ্রসমাজে তা লোপ পেয়ে গেছে বলে আমরা ধরে রেখেছি সেটা আমাদের নেই। অথচ জনসাধারণের নৃত্যকলা নানা আকারে এখনো আছে— কিন্তু 'ওরা ছোটোলোক'। অতএব ওদের যা আছে সেটা আমাদের নয়। এমন-কি, সুন্দর সুনিপুণ হলেও সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়। ক্রমে হয়তো এ-সমস্তই লোপ হয়ে যাচ্ছে ; কিন্তু সেটাকে আমরা দেশের ক্ষতি বলেই গণ্য করি নে, কেননা বস্তুতই ওরা আমাদের দেশে নেই।

কবি বলেছেন, 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে !' তিনি এইভাবেই বলেছিলেন যে, আমরা বিদেশীর শাসনে আছি। তার চেয়ে সত্যতর গভীরতর ভাবে বলা চলে যে, আমাদের দেশে আমরা পরবাসী, অর্থাৎ আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের

দেশ নয়। সে দেশ আমাদের অদৃশ্য, অস্পৃশ্য। যখন দেশকে মা বলে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে মা গুটিকয়েক আদুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব। শুধু ভোট দেবার অধিকার পেয়েই আমাদের চরম পরিত্রাণ ?

এই দুঃখেই দেশের লোকের গভীর ঔদাসীন্যের মাঝখানে, সকল লোকের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে, এখানে এই গ্রাম-কয়টির মধ্যে আমরা প্রাণ-উদ্‌বোধনের যজ্ঞ করেছি। যাঁরা কোনো কাজই করেন না তাঁরা অবজ্ঞার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এতে কতটুকু কাজই বা হবে। স্বীকার করতেই হবে, তেত্রিশ কোটির ভার নেবার যোগ্যতা আমাদের নেই। কিন্তু, তাই বলে লজ্জা করব না। কর্মক্ষেত্রের পরিধি নিয়ে গৌরব করতে পারব এ কল্পনাও আমাদের মনে নেই, কিন্তু তার সত্য নিয়ে যেন গৌরব করতে পারি। কখনো আমাদের সাধনায় যেন এ দৈন্য না থাকে যে, পল্লীর লোকের পক্ষে অতি অল্পটুকুই যথেষ্ট। ওদের জন্যে উচ্ছিষ্টের ব্যবস্থা করে যেন ওদের অশ্রদ্ধা না করি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌। পল্লীর কাছে আমাদের আত্মোৎসর্গের যে নৈবেদ্য তার মধ্যে শ্রদ্ধার যেন কোনো অভাব না থাকে।

১৩৩৭

কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত

কোরীয় যুবকটি সাধারণ জাপানীর চেয়ে মাথায় বড়ো। ইংরেজি সহজে বলেন, উচ্চারণে জড়তা নেই।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কোরিয়ায় জাপানী রাষ্ট্রশাসন তোমার পছন্দ নয় ?"

"না।"

"কেন। জাপানী আমলে তোমাদের দেশে পূর্বেকার চেয়ে কি ব্যবস্থা ভালো হয় নি।"

"তা হয়েছে। কিন্তু আমাদের যে দুঃখ সেটা সংক্ষেপে বলতে গেলে দাঁড়ায়, জাপানী রাজত্ব ধনিকের রাজত্ব। কোরিয়া তার মুনফার উপায়, তার ভোজ্যের ভাণ্ডার। প্রয়োজনের আসবাবকে মানুষ উজ্জ্বল করে রাখে, কারণ সেটা তার আপন সম্পত্তি,

তাকে নিয়ে তার অহমিকা। কিন্তু মানুষ তো থালা ঘটী বাটি কিম্বা গাড়োয়ানের ঘোড়া বা গোয়ালের গোরু নয় যে, বাহ্য যত্ন করলেই তার পক্ষে যথেষ্ট।"

"তুমি কি বলতে চাও জাপান যদি কোরিয়ার সঙ্গে প্রধানত আর্থিক সম্বন্ধ না পাতিয়ে তোমাদের 'পরে রাজপ্রতাপের সম্বন্ধ খাটাত, অর্থাৎ বৈশ্যরাজ না হয়ে ক্ষত্রিয়রাজ হত, তা হলে তোমাদের পরিতাপের কারণ থাকত না।"

"আর্থিক সম্বন্ধের যোগে বিরাট জাপানের সহস্রমুখী ক্ষুধা আমাদের শোষণ করে, কিন্তু রাজপ্রতাপের সম্বন্ধ ব্যক্তিগত, সীমাবদ্ধ— তার বোঝা হালকা। রাজার ইচ্ছা কেবল যদি শাসনের ইচ্ছা হয়, শোষণের ইচ্ছা না হয়, তবে তাকে স্বীকার করেও মোটের উপর সমস্ত দেশ আপন স্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মান রাখতে পারে। কিন্তু ধনিকের শাসনে আমাদের গোটা দেশ আর-একটি গোটা দেশের পণ্যদ্রব্যে পরিণত। আমরা লোভের জিনিস ; আত্মীয়তার না, গৌরবের না।"

"এই-যে কথাগুলি ভাবছ এবং বলছ, এই-যে সমষ্টিগতভাবে জাতীয় আত্মসম্মানের জন্যে তোমার আগ্রহ, তার কি কারণ এই নয় যে, জাপানের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তোমরা আধুনিক যুগের রাষ্ট্রিক শিক্ষায় দীক্ষিত।"

কোরীয় যুবক দ্বিধার ভাবে চুপ করে রইলেন।

আমি বললুম, "চেয়ে দেখো সামনে ঐ চীনদেশ। সেখানে স্বজাতীয় আত্মসম্মানবোধ শিক্ষার অভাবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে অপ্রবুদ্ধ। তাই দেখি, ব্যক্তিগত ক্ষমতাপ্রাপ্তির দুরাশায় সেখানে কয়েকজন লুব্ধ লোকের হানাহানি-কাটাকাটির ঘূর্ণিপাক। এই নিয়ে লুটপাট-অত্যাচারে, ডাকাতের হাতে, সৈনিকের হাতে, হতভাগ্য দেশ ক্ষতবিক্ষত, রক্তে প্লাবিত, অসহায়ভাবে দিনরাত সন্ত্রস্ত। শিক্ষার জোরে যেখানে সাধারণ লোকের মধ্যে স্বাধিকারবোধ স্পষ্ট না হয়েছে সেখানে স্বদেশী বা বিদেশী দুরাকাঙ্ক্ষীদের হাতে তাদের নির্যাতন ঠেকাবে কিসে। সে অবস্থায় তারা ক্ষমতা-লোলুপের স্বার্থসাধনের উপকরণমাত্র হয়ে থাকে। তুমি তোমার দেশকে ধনীর উপকরণদশাগ্রস্ত বলে আক্ষেপ করেছিলে, সেই পরের উপকরণদশা তাদের কিছুতেই ঘোচে না যারা মূঢ়, যারা কাপুরুষ, ভাগ্যের মুখপ্রত্যাশী, যারা আত্মকর্তৃত্বে আস্থাবান নয়। কোরিয়ার অবস্থা জানি নে, কিন্তু সেখানে নবযুগের শিক্ষার প্রভাবে যদি সাধারণের মধ্যে স্বাধিকারবোধের অঙ্কুরমাত্র উদ্গত হয়ে থাকে তবে সে শিক্ষা কি জাপানের কাছ থেকেই পাও নি।"

"কার কাছ থেকে পেয়েছি তাতে কী আসে যায়। শত্রু হোক, মিত্র হোক, যে-কেউ আমাদের যে উপায়ে জাগিয়ে তুলুক-না কেন, জাগরণের যা ধর্ম তার তো কাজ চলবে।"

"সে কথা আমি মানি, সে তর্ক আমার নয়। বিচারের বিষয় এই যে, তোমার দেশে শিক্ষাবিস্তার এতটা হয়েছে কি না যাতে দেশের অধিকাংশ লোক স্বাধিকার উপলব্ধি এবং সেটা যথার্থভাবে দাবি করতে পারে। যদি তা না হয়ে থাকে তবে সেখানে বিদেশী নিরস্ত হলেও সর্বসাধারণের যোগে আত্মশাসন ঘটবে না, ঘটবে কয়েকজনের দৌরাত্ম্যে আত্মবিপ্লব। এই স্বল্প লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থবোধকে সংযত করবার একমাত্র উপায় বহু লোকের সমষ্টিগত স্বার্থবোধের উদ্‌বোধন।"

"যে পরিমাণ ও যে প্রকৃতির শিক্ষায় বৃহৎ ভাবে সমস্ত দেশের চৈতন্য হতে পারে সেটা আমরা সম্পূর্ণভাবে পরের হাত থেকে প্রত্যাশা করব কেমন করে।"

"তোমরা শিক্ষিত লোকেরা দেশে সেই শিক্ষার অভাব যদি অনুভব কর তবে এই শিক্ষাবিস্তারের সাধনাকেই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য-রূপে নিজেরাই গ্রহণ করবে না কেন। দেশকে বাঁচাতে গেলে কেবল তো ভাবুকতা নয়, জ্ঞানের প্রয়োজন করে। আমার মনে আরো একটি চিন্তার বিষয় আছে। ভৌগোলিক ঐতিহাসিক বা জাতীয়প্রকৃতি-গত কারণে কোরিয়া অনেক কাল থেকেই দুর্বল। আজকের দিনে যুদ্ধবিগ্রহ যখন বৈজ্ঞানিক-সাধনা-সাধ্য ও প্রভূতব্যয়সাধ্য তখন জাপান হতে নিজের শক্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমরা নিজের শক্তিতেই কি আত্মরক্ষা করতে পার— ঠিক করে বলো।"

"পারি নে সে কথা স্বীকার করতেই হবে।"

"যদি না পার তবে এ কথাও মানতে হবে যে, দুর্বল কেবল নিজের বিপদ নয়, অন্যেরও বিপদ ঘটায়। দুর্বলতার গহ্বর-কেন্দ্রে প্রবলের দুরাকাঙ্ক্ষা আপনিই দূর থেকে আকৃষ্ট হয়ে আবর্তিত হতে থাকে। সওয়ার সিংহের পিঠে চড়ে না; ঘোড়াকেই লাগামে বাঁধে। মনে করো, রাশিয়া যদি কোরিয়ায় ধ্বজা গেড়ে বসে তবে সেটা, কেবল কোরিয়ার পক্ষে নয়, জাপানের পক্ষেও বিপদ। এমন অবস্থায় অন্য প্রবলকে ঠেকাবার জন্যই কোরিয়ায় জাপানের নিজের শক্তিকেই প্রবল করতে হয়। এমন অবস্থায় কোনো একদিন জাপান বিনা পরাভবেই কোরিয়ার ক্ষীণ হস্তেই কোরিয়ার ভাগ্যকে সমর্পণ করবে, এ সম্ভবপর নয়। এর মধ্যে জাপানের শুধু মুনফার লোভ না, প্রাণের দায়।"

"আপনার প্রশ্ন এই যে, তা হলে কোরিয়ার উপায় কী। জানি, আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী সৈন্যদল বানিয়ে তুলতে পারব না। তার পরে যুদ্ধের জন্য ভাসান-জাহাজ, ডুব-জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, এ-সমস্ত তৈরি করা, চালনা করা, বর্তমান অবস্থায় আমাদের কল্পনার অতীত। সেই উদ্দেশে চেষ্টা করাও বিদেশী শাসনাধীনে অসম্ভব। তবু তাই বলে হাল ছেড়ে দেব, এ কথা বলতে পারি নে।"

"এ কথা বলা ভালোও না। হাল ছাড়ব না, কিন্তু কোন্ দিক বাগে হাল চালাতে হবে সেটা যদি না ভাবি ও বুদ্ধিসংগত তার একটা জবাব না দিই তবে মুখে যতই আস্ফালন করি, ভাষান্তরে তাকেই বলে হাল ছেড়ে দেওয়া।"

"আমি কী ভাবি তা বলা যাক। এমন একটা সময় আসবে যখন পৃথিবীতে জাপানী চীনীয় রুশীয় কোরীয় প্রভৃতি নানা জাতির মধ্যে আর্থিক-স্বার্থগত রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতাই সব চেয়ে প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনারূপে থাকবে না। কেন থাকবে না তা বলি। যে দেশের মানুষকে চলিত ভাষায় স্বাধীন বলে থাকে তাদেরও ঐশ্বর্য এবং প্রতাপের ক্ষেত্রে দুই ভাগ। এক ভাগের অল্প লোকে ঐশ্বর্য ভোগ করে, আর-এক ভাগের অসংখ্য দুর্ভাগা সেই ঐশ্বর্যের ভার বয় ; এক ভাগের দু-চারজন লোক প্রতাপযজ্ঞশিখা নিজের ইচ্ছায় উদ্দীপিত করে, আর-এক ভাগের বিস্তর লোক ইচ্ছা না থাকলেও নিজের অস্থিমাংস দিয়ে সেই প্রতাপের ইন্ধন জোগায়। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যুগে যুগে মানুষের মধ্যে এই মূলগত বিভাগ, এই দুই স্তর। এতদিন নিম্নস্তরের মানুষ নিজের নিম্নতা নতশিরেই মেনে নিয়েছে, ভাবতেই পারে নি যে এটা অবশ্য-স্বীকার্য নয়।"

আমি বললুম, "ভাবতে আরম্ভ করেছে, কেননা আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য মহাদেশে নিম্নস্তরের মধ্যে শিক্ষা পরিব্যাপ্ত।"

"তাই ধরে নিচ্ছি। কারণ যাই হোক, আজ পৃথিবীতে যে যুগান্তকারী দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে সে ভিন্ন ভিন্ন মহাজাতির মধ্যে নয়, মানুষের এই দুই বিভাগের মধ্যে, শাসয়িতা এবং শাসিত, শোষয়িতা এবং শুষ্ক। এখানে কোরীয় এবং জাপানী, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এক পঙ্‌ক্তিতেই মেলে। আমাদের দুঃখই আমাদের দৈন্যই আমাদের মহাশক্তি। সেইটেতেই জগৎ জুড়ে আমাদের সম্মিলন এবং সেইটেতেই ভবিষ্যৎকে আমরা অধিকার করব। অথচ যারা ধনিক তারা কিছুতেই একত্র মিলতে পারে না, স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে তারা বিচ্ছিন্ন। আমাদের মস্ত আশ্বাসের কথা এই যে, যারা সত্য করে মিলতে পারে তাদেরই জয়। য়ুরোপে যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে সেটা ধনিকের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের বীজ আজ অসংখ্য পরিমাণে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রইল। সেই বীজ মানব-প্রকৃতির মধ্যেই ; স্বার্থ ই বিদ্বেষবুদ্ধির জন্মভূমি, পালন-দোলা। এতকাল দুঃখীরাই দৈন্য-দ্বারা, অজ্ঞানের দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল ; ধনের মধ্যে যে শক্তিশেল আছে তাই দিয়েই তাদের মর্ম বিদ্ধ হয়েছে। আজ দুঃখদৈন্যেই আমরা মিলিত হব, আর ধনের দ্বারাই ধনী হবে বিচ্ছিন্ন। পৃথিবীতে আজ রাষ্ট্রতন্ত্রে যে অশান্ত আলোড়ন, বলশালী জাতির মধ্যে যে দুরন্ত আশঙ্কা, তাতে এইটেই কি দেখতে পাচ্ছি নে।"

এর পরে আমাদের আর কথা কবার অবকাশ হয় নি। আমি মনে মনে ভাবলুম, অসংযত শক্তিলুব্ধতা নিজের মধ্যে বিষ উৎপাদন করেই নিজেকে মারে এ কথা সত্য, কিন্তু শক্ত ও অশক্তের ভেদ আজ যে একটা বিশেষ আকার ধরে প্রকাশ পাচ্ছে সেইটেকেই রক্তপাত করে বিনাশ করলেই কি মানবপ্রকৃতি থেকে ভেদের মূল একেবারে চলে যায়। পৃথিবীর সমস্ত উচ্চভূমি ঝড়বৃষ্টির ঝাঁটার তাড়নায় ক্ষয় পেয়ে পেয়ে একদিন সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যাবে এমন কথা শোনা যায়, কিন্তু সেই দিনেই কি পৃথিবীর মরবার সময় আসবে না। সমত্ব এবং পঞ্চত্ব কি একই কথা নয়। ভেদ নষ্ট করে মানবসমাজের সত্য নষ্ট করা হয়। ভেদের মধ্যে কল্যাণসম্বন্ধ স্থাপনই তার নিত্য সাধনা, আর ভেদের মধ্যকার অন্যায়ের সঙ্গেই তার নিত্য সংগ্রাম। এই সাধনায়, এই সংগ্রামেই মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে। য়ুরোপ আজ সাধনাকে বাদ দিয়ে সংগ্রামকেই যখন একান্ত করতে চায় তখন তার চেষ্টা হয়— শক্তকে বিনাশ করে অশক্তকে সাম্য দেওয়া। যদি অভিলাষ সফল হয় তবে যে হিংসার সাহায্যে সফল হবে সেই রক্তবীজকেই জয়ডঙ্কা বাজিয়ে সেই সফলতার কাঁধের উপর চড়িয়ে দেবে। কেবলই চলতে থাকবে রক্তপাতের চক্রাবর্তন। শান্তির দোহাই পেড়ে এরা লড়াই করে এবং সেই লড়াইয়ের ধাক্কাতেই সেই শান্তিকে মারে; আজকের দিনের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কালকের দিনের যে শক্তিকে জাগিয়ে তোলে আবার তারই বিরুদ্ধে পরদিন থেকে যুদ্ধের আয়োজন করতে থাকে। অবশেষে চরমশান্তি কি বিশ্বব্যাপী শ্মশানক্ষেত্রে?

কোরীয় যুবকের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল তার ভাবখানা এই লেখায় আছে। এটা যথাযথ অনুলিপি নয়।

১৩৩৬

মানুষের ধর্ম

ভূমিকা

মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবনযাত্রানির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

কিন্তু মানুষের আর-একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্তমান কালের জন্যে বস্তু-সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত-প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।

কোন্ মানুষের ধর্ম। এতে কার পাই পরিচয়। এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়, তা হলে এর জন্যে সাধনা করতে হত না।

আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয় নি। কিন্তু তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে

পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে ‘এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা’। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে—

স দেবঃ

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক, তাঁর কথাই আমার এই বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করেছি।

শান্তিনিকেতন
১৮ মাঘ ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের ধর্ম

পথ চলেছিল একটানা বাইরের দিকে, তার নিজের মধ্যে নিজের অর্থ ছিল না। পৌঁছল এসে ঘরে, সেখানে অর্থ পাওয়া গেল, আরম্ভ হল ভিতরের লীলা। মানুষে এসে পৌঁছল সৃষ্টিব্যাপার, কর্মবিধির পরিবর্তন ঘটল, অন্তরের দিকে বইল তার ধারা। অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষে এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। পূর্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল। দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র; পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়। বুঝতে পারে, বহুর মধ্যে সে এক; জানে, তার নিজের মনের জানাকে বিশ্বমানবমন যাচাই করে, প্রমাণিত করে, তবে তার মূল্য। দেখতে পায়, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই সকলের সঙ্গে সে যুক্ত হয় ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা। তাই মানুষের সেই প্রকাশই শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়, যাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে। বুদ্ধির বর্বরতা তাকেই বলে যা এমন মতকে, এমন কর্মকে, সৃষ্টি করে যাতে বৃহৎকালে সর্বজনীন মন আপনার সায় পায় না। এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎমানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।

ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁচেছে বিশ্বমানসলোকে। যে লোকে তার বাণী, তার শ্রী, তার মুক্তি। সফলতালাভের জন্যে সে মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম নিয়ে বাহ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিল; অবশেষে সার্থকতালাভের জন্যে একদিন সে বললে, তপস্যা বাহ্যানুষ্ঠানে নয়, সত্যই তপস্যা; গীতার ভাষায় ঘোষণা করলে, দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়; খৃস্টের বাণীতে শুনলে, বাহ্য বিধিনিষেধে পবিত্রতা নয়, পবিত্রতা চিত্তের নির্মলতায়। তখন মানবের রুদ্ধ মনে বিশ্বমানবচিত্তের উদ্‌বোধন হল। এই তার আন্তর সত্তার বোধ দৈহিক সত্তার ভেদসীমা ছাড়িয়ে দেশে

কালে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্যের দিকে প্রসারিত। এই বোধেরই শেষ কথা এই যে, যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে সেই জানে সত্যকে।

মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্ দিকে নির্দেশ। যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব। ঋগ্‌বেদে সেই বিশ্বমানবের কথা বলেছেন,

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি—

তাঁর এক চতুর্থাংশ আছে জীবজগতে, তাঁর বাকি বৃহৎ অংশ ঊর্ধ্বে অমৃতরূপে। মানুষ যে দিকে সেই ক্ষুদ্র অংশগত আপনার উপস্থিতকে, প্রত্যক্ষকে, অতিক্রম করে সত্য সেই দিকে সে মৃত্যুহীন; সেই দিকে তার তপস্যা শ্রেষ্ঠকে আবিষ্কার করে। সেই দিক আছে তার অন্তরে, যেখান থেকে চিরকালের সকলের চিন্তাকে সে চিন্তিত করে, সকলের ইচ্ছাকে সে সফল করে, রূপদান করে সকলের আনন্দকে। যে পরিমাণে তার গতি এর বিপরীত দিকে, বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সংকীর্ণ পার্থক্যের দিকে, মানবসত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট; সভ্যতার অভিমান সত্ত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্বর।

মানবদেহে বহুকোটি জীবকোষ; তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জন্ম, স্বতন্ত্র মরণ। অণুবীক্ষণযোগে জানা যায়, তাদের প্রত্যেকের চারি দিকে ফাঁক। এক দিকে এই জীবকোষগুলি আপন আপন পৃথক জীবনে জীবিত, আর-এক দিকে তাদের মধ্যে একটি গভীর নির্দেশ আছে, প্রেরণা আছে, একটি ঐক্যতত্ত্ব আছে, সেটি অগোচর পদার্থ; সেই প্রেরণা সমগ্র দেহের দিকে, সেই ঐক্য সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত। মনে করা যেতে পারে, সেই সমগ্র দেহের উপলব্ধি অসংখ্য জীবকোষের অগম্য, অথচ সেই দেহের পরম রহস্যময় আহ্বান তাদের প্রত্যেকের কাছে দাবি করছে তাদের আত্মনিবেদন। যেখানে তারা প্রত্যেকে নিজেরই স্বতন্ত্র জীবনসীমায় বর্তমান সেখানে তার মধ্যে রহস্য কিছুই নেই। কিন্তু, যেখানে তারা নিজের জীবনসীমাকে অতিক্রম করে সমস্ত দেহের জীবনে সত্য সেখানে তারা আশ্চর্য, সেখানে তারা আপন স্বতন্ত্র জন্মমৃত্যুর মধ্যে বদ্ধ নয়। সেইখানেই তাদের সার্থকতা।

শোনা যায়, প্রতি সাত বছর অন্তর মানুষের দেহে এই জীবকোষগুলির পরিবর্তন ঘটে। তারা বিদায় নেয়, অর্থাৎ তাদের পৃথক সত্তা থাকে না। কিন্তু তাদের মধ্যে যে সত্তা সমস্ত দেহের আয়ুর অন্তর্গত, অর্থাৎ যেটা তাদের স্বদৈহিক নয়, বিশ্বদৈহিক, সেই সত্তা সমস্ত দেহের জীবনপ্রবাহে থেকে যায়।

দেহে কখনো কখনো কর্কটরোগ অর্থাৎ ক্যান্সার জন্মায়; সেই ক্যান্সার একান্তই স্বতন্ত্র, বলা যেতে পারে তার মধ্যে দেহাত্মবোধ নেই। সমগ্র দেহের সে প্রতিকূল। দেহের পক্ষে একেই বলা যায় অশুভ।

মানুষের দেহের জীবকোষগুলির যদি আত্মবোধ থাকত তা হলে এক দিকে তারা ক্ষুদ্রভাবে আপনাদেরকে স্বতন্ত্র জানত, আবার বৃহৎভাবে নিজেদেরকে জানত সমগ্র দেহে। কিন্তু জানত অনুভবে, কল্পনায়; সমগ্র দেহকে প্রত্যক্ষত ও সম্পূর্ণত জানা সম্ভব হত না। কেননা এই দেহ শুধু যে বর্তমানে অধিষ্ঠিত তা নয়, এই দেহে রয়েছে তার অতীত, অপেক্ষা করছে তার ভবিষ্যৎ। আরো একটা প্রত্যক্ষাতীত পদার্থ রয়েছে যা সর্বদেহব্যাপী কল্যাণ, যাকে বলি স্বাস্থ্য, যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। তা ছাড়াও সমগ্র জীবনরক্ষার গভীরতর চেষ্টা প্রত্যেক জীবকোষের আছে, যে চেষ্টা রোগের অবস্থায় সর্বদেহের শত্রুহননে নিজেদের আত্মহানিও ঘটায়, দেশপ্রেমিক যেমন করে দেশের জন্যে প্রাণ দেয়। এই চেষ্টার রহস্য অনুসরণ করলেই বোঝা যেতে পারে, এই ক্ষুদ্র দেহগুলির চরম লক্ষ্য অর্থাৎ পরম ধর্ম এমন-কিছুকে আশ্রয় করে যাকে বলব তাদের বিশ্বদেহ।

মানুষও আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্'। সেই বিশ্বমানবের প্রেরণায় ব্যক্তিগত মানুষ এমন-সকল কাজে প্রবৃত্ত হয় যা তার ভৌতিক সীমা অতিক্রমণের মুখে। যাকে সে বলে ভালো, বলে সুন্দর, বলে শ্রেষ্ঠ— কেবল সমাজরক্ষার দিক থেকে নয়— আপন আত্মার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির দিক থেকে।

ডিমের ভিতরে যে পাখির ছানা আছে তার অঙ্গে দেখতে পাই ডানার সূচনা। ডিমে-বাঁধা জীবনে সেই ডানার কোনো অর্থই নেই। সেখানে আছে ডানার অবিচলিত প্রতিবাদ। এই অপরিণত ডানার সংকেত জানিয়ে দেয়, ডিমের বাইরে সত্যের যে পূর্ণতা আজও তার কাছে অপ্রত্যক্ষ সেই মুক্ত সত্যে সঞ্চরণেই পাখির সার্থকতা। তেমনিই মানুষের চিত্তবৃত্তির যে ঔৎসুক্য মানুষের পূর্ণ সত্যের সাক্ষ্য দেয় সেইখানেই অনুভব করি তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থেকে মুক্তি। সেইখানে সে বিশ্বাভিমুখী।

জীবকে কল্পনা করা যাক, সে যেন জীবযাত্রার একটা রেলগাড়ির মধ্যেই জন্মায়, বেঁচে থাকে এবং মরে। এই গাড়ি সংকীর্ণ লক্ষ্যপথে বাঁধা রাস্তায় চলে। জন্তুর মাথাটা গাড়ির নিম্নতলের সমরেখায়। গাড়ির সীমার মধ্যে তার আহারবিহারের সন্ধান চলছে নীচের দিকে ঝুঁকে। ঐটুকুর মধ্যে বাধাবিপত্তি যথেষ্ট। তাই নিয়ে দিন কাটে। মানুষের মতো সে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে পারে না। উপরের জানলা পর্যন্ত পৌঁছয় না তার দৃষ্টি, তার মনের গতি নেই প্রাণধারণের বাইরে।

মানুষ খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সামনে পেয়েছে জানলা। জানতে পেরেছে, গাড়ির মধ্যেই সব-কিছু বদ্ধ নয়। তার বাইরে দিগন্তের পর দিগন্ত। জীবনের আশু লক্ষ্যপথ উত্তীর্ণ হয়েও যা বাকি আছে তার আভাস পাওয়া যায়, সীমা দেখা যায় না। যেটুকু আলো গাড়ির প্রয়োজনের পক্ষে যথোপযুক্ত, বাইরে তারই বিস্তার অবাধ অজস্র। সেই আলো তাকে ডাকে কেন। ঐ প্রয়োজনাতীত বাইরেটার প্রতি উদাসীন থাকলে ক্ষতি কী ছিল। দিন তো চলে যেত, যেমন চলছে হাজার লক্ষ প্রাণীর। কিন্তু মানুষকে অস্থির করে তুললে যে। বললে, তাকে ছাড়া পেতে হবে সেইখানেই যেখানে তার প্রয়োজন নেই, যার পরিচয় তার কাছে আজও অসম্পূর্ণ। প্রাণশক্তির অতিনির্দিষ্ট সাম্রাজ্যপ্রাচীর লঙ্ঘন করে সে জয় করতে বেরোল আপন স্বরাজ। এই জয়যাত্রার পথে তার সহজ প্রবৃত্তি তার পক্ষ নেয় না, এই পথে তার আরাম নেই, তার বিশ্রাম নেই ; শত শত যাত্রী প্রাণ দিয়ে এই পথকে কেবলই প্রশস্ত করছে, উন্মুক্ত করছে।

দেহের দিকে মানুষকে বিচার করে দেখা যাক। সে উঠে দাঁড়িয়েছে। এমন কথা বলা চলে না যে, দাঁড়াবে না তো কী। দাঁড়ানো সহজ নয়। পাখির দেহের ছন্দটা দ্বিপদী। মানুষের দেহটা চতুষ্পদ জীবের প্রশস্ত ছন্দে বানানো। চার পায়ের উপর লম্বা দেহের ওজন সামনে পিছনে ভাগ করে দিলেই এমনতরো দেহটাকে একসঙ্গে বহন ও সঞ্চালন তার পক্ষে সহজ হতে পারত। কিন্তু মানুষ আপন দেহের স্বভাবকে মানতে চাইলে না, এজন্যে সে অসুবিধে সইতেও রাজি। চলমান দীর্ঘ দেহটার ভাররক্ষার সাধনা করলে ঐ দুই পায়ের উপরেই। সেটা সহজসাধ্য নয়, ছেলেদের প্রথম চলার অভ্যাস দেখলেই তা বোঝা যায়। শেষ বয়সে বৃদ্ধকে লাঠির উপর ভর দিতে হয়, সেও একটা প্রমাণ। এও দেখা যায়, চার-পেয়ে জন্তু যত সহজে ভার বহন করতে পারে মানুষ তা পারে না— এইজন্যেই অন্যের 'পরে নিজের বোঝা চাপাবার নানা কৌশল মানুষের অভ্যস্ত। সেই সুযোগ পেয়েছে বলেই যত পেরেছে ভার-সৃষ্টি করেছে। তাকে পরিমিত করবার চেষ্টা নেই। মানুষের এই চালটা যে সহজ নয় তার দৃষ্টান্ত প্রায়ই পাওয়া যায়। ধাক্কা খেয়ে মানুষের অঙ্গহানি বা গাম্ভীর্যহানির যে

আশঙ্কা, জন্তুদের সেটা নেই। শুধু তাই নয়, ডাক্তারের কাছে শোনা যায় মানুষ উত্তভঙ্গী নিয়েছে বলে তার আদিম অবতত দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুঃখ ভোগ করতে হয়। তবু মানুষ স্পর্ধা করে উঠে দাঁড়ালো।

নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে জন্তু দেখতে পায় খণ্ড খণ্ড বস্তুকে। তার দেখার সঙ্গে তার ঘ্রাণ দেয় যোগ। চোখের দেখাটা অপেক্ষাকৃত অনাসক্ত, জ্ঞানের রাজ্যে তার প্রভাব বেশি। ঘ্রাণের অনুভূতি দেহবৃত্তির সংকীর্ণ সীমায়। দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে পরিচয় পায় সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের। উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে। একটি অখণ্ড বিস্তারের কেন্দ্রস্থলে দেখলে নিজেকে। একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি। খাড়া-হওয়া মানুষের কাছে নিকটের চেয়ে দূরের দাম বেশি। অজ্ঞাত অভাবনীয়ের দিকে তার মন হয়েছে প্রবৃত্ত। এই দৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্তরের কল্পনাদৃষ্টি। শুধু দৃষ্টি নয়, সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাতও পেয়েছে মুক্তি। পায়ের কাজ থেকে হাত যদি ছুটি না পেত তা হলে সে থাকত দেহেরই একান্ত অনুগত, চতুর্থ বর্ণের মতো অস্পৃশ্যতার মলিনতা নিয়ে। পুরাণে বলে, ব্রহ্মার পায়ের থেকে শূদ্র জন্মেছে, ক্ষত্রিয় হাতের থেকে।

মানুষের দেহে শূদ্রের পদোন্নতি হল ক্ষাত্রধর্মে, পেল সে হাতের গৌরব, তখন মনের সঙ্গে হল তার মৈত্রী। মানুষের কল্পনাবৃত্তি হাতকে পেয়ে বসল। দেহের জরুরি কাজগুলো সেরে দিয়েই সে লেগে গেল নানা বাজে কাজে। জীবনযাত্রার কর্মব্যবস্থায় সে whole-time কর্মচারী রইল না। সে লাগল অভাবিতের পরীক্ষায়, অচিন্ত্যপূর্বের রচনায়— অনেকটাই অনাবশ্যক। মানুষের ঋজু মুক্ত দেহ মাটির নিকটস্থ টান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন একটা বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নব্রহ্মের নয়, যাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রহ্মের, আনন্দব্রহ্মের রাজ্য। এ রাজ্যে মানুষ যে কাজগুলো করে হিসাবি লোক জিজ্ঞাসা করতে পারে, "এ-সব কেন।" একমাত্র তার উত্তর, "আমার খুশি।" তার বিজ্ঞানে, তার সাহিত্যে, তার শিল্পকলায় এই এক উত্তর "আমার খুশি"। মাথা-তোলা মানুষের এতবড়ো গর্ব। জন্তুদেরও যথেচ্ছ খেলার অবকাশ আছে, কিন্তু জীবনে তাদের খেলাটা গৌণ। তা ছাড়া তাদের খেলাও প্রকৃতির অনুগত। বিড়াল-ছানার খেলা মিথ্যা ইঁদুর মিছামিছি ধরা, কুকুর-ছানার খেলা নিজের লেজের সঙ্গে লড়াই করার সগর্জন ভাণ। কিন্তু, মানুষের যে কাজটাকে লীলা বলা যায় অর্থাৎ যা তার কোনো দরকারের আমলে আসে না, কথায় কথায় সেইটেই হয়ে ওঠে মুখ্য, ছাড়িয়ে যায় তার প্রাণযাত্রাকে। সেইটের দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠতার পরিচয়। অবকাশের ভূমিকায় মানুষ সর্বত্রই আপন অমরাবতী-রচনায় ব্যস্ত, সেখানে তার আকাশকুসুমের কুঞ্জবন। এই-

সব কাজে সে এত গৌরব বোধ করে যে চাষের খেতে তার অবজ্ঞা। আধুনিক বাংলা-ভাষায় সে যাকে একটা কুশ্রাব্য নাম দিয়েছে কৃষ্টি, হাল-লাঙলের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই এবং গোরুকে তার বাহন বললে ব্যঙ্গ করা হয়। বলা বাহুল্য, দূরতম তারায় মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন, সেই তারার যে আলোকরশ্মি চার-পাঁচ হাজার এবং ততোধিক বৎসর ধরে ব্যোমবিহারী, গৃহত্যাগী, তারই দৌড় মাপতে মানুষের দিন যায়, তার রাত কাটে। তা ছাড়া মানুষ অকারণে কথার সঙ্গে কথার বিনুনি করে কবিতাও লেখে; এমন-কি, যারা আধপেটা খেয়ে কৃশতনু তারাও বাহবা দেয়। এর থেকেই আন্দাজ করি, মানুষের অন্নের খেত প্রকৃতির এলেকায় থাকতে পারে, দেহের দ্বারে পেয়াদার তাগিদে তার খাজনাও দিতে হয়, কিন্তু যেখানে মানুষের বাস্তুভিটে সেই লাখেরাজ দেবত্রভূমি প্রকৃতির এলেকার বাইরে। সেখানে জোর তলবের দায় নেই, সেখানে সকলের চেয়ে বড়ো দায়িত্ব স্বাধীন দায়িত্ব; তাকে বলব আদর্শের দায়িত্ব, মনুষ্যত্বের দায়িত্ব।

দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন ঊর্ধ্বশিরে নিজেকে টেনে তুলেছে খণ্ডভূমির থেকে বিশ্বভূমির দিকে, নিজের জানাশোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে, ব্যক্তিগত অভিরুচির থেকে। জ্ঞানের এই সম্মানে মানুষের বৈষয়িক লাভ হোক বা না হোক, আনন্দলাভ হল। এইটেই বিস্ময়ের কথা। পেট না ভরিয়েও কেন হয় আনন্দ। বিষয়কে বড়ো করে পায় বলে আনন্দ নয়, আপনাকেই বড়ো করে, সত্য করে পায় বলে আনন্দ। মানবজীবনের যে বিভাগ অহৈতুক অনুরাগের অর্থাৎ আপনার বাহিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগের, তার পুরস্কার আপনারই মধ্যে। কারণ, সেই যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।

ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়োভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়োভবতি।

জীবলোকে চৈতন্যের নীহারিকা অস্পষ্ট আলোকে ব্যাপ্ত। সেই নীহারিকা মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে উজ্জ্বল দীপ্তিতে বললে, "অয়মহং ভোঃ! এই-যে আমি।" সেই দিন থেকে মানুষের ইতিহাসে নানা ভাবে নানা রূপে নানা ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলল "আমি কী"। ঠিক উত্তরটিতে তার আনন্দ, তার গৌরব। জন্তুর উত্তর পাওয়া যায় তার দৈহিক ব্যবস্থার যথাযোগ্যতায়। সনাতন গণ্ডারের মতো স্থূল ব্যবহারে গণ্ডার যদি কোনো বাহ্য বাধা না পায় তা হলে আপন সার্থক্য সম্বন্ধে তার কোনো সংশয় থাকে না। কিন্তু, মানুষ কী করে হবে মানুষের মতো তাই নিয়ে বর্বর-দশা থেকে সভ্য অবস্থা পর্যন্ত তার চিন্তা ও প্রয়াসের অন্ত নেই। সে বুঝেছে, সে সহজ নয়, তার মধ্যে একটা রহস্য আছে; এই রহস্যের আবরণ উদ্‌ঘাটিত হতে হতে তবে সে

আপনাকে চিনবে। শত শত শতাব্দী ধরে চলেছে তার প্রয়াস। কত ধর্মতন্ত্র, কত অনুষ্ঠানের পত্তন হল ; সহজ প্রবৃত্তির প্রতিবাদ করে নিজেকে সে স্বীকার করাতে চায় যে, বাইরে সে যা ভিতরে ভিতরে তার চেয়ে সে বড়ো। এমন কোনো সত্তার স্বরূপকে সে মনের মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করছে, আদর্শরূপে যিনি তার চেয়ে বড়ো অথচ তার সঙ্গে চিরসম্বন্ধযুক্ত। এমনি করে বড়ো ভূমিকায় নিজের সত্যকে স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে তার অহৈতুক আগ্রহ। যাকে সে পূজা করে তার দ্বারাই সে প্রমাণ করে তার মতে নিজে সে সত্য কিসে, তার বুদ্ধি কাকে বলে পূজনীয়, কাকে জানে পূর্ণতা বলে। সেইখানেই আপন দেবতার নামে মানুষ উত্তর দিতে চেষ্টা করে "আমি কী— আমার চরম মূল্য কোথায়"। বলা বাহুল্য, উত্তর দেবার উপলক্ষে পূজার বিষয়কল্পনায় অনেক সময়ে তার এমন চিত্ত প্রকাশ পায় বুদ্ধিতে যা অন্ধ, শ্রেয়োনীতিতে যা গর্হিত, সৌন্দর্যের আদর্শে যা বীভৎস। তাকে বলব ভ্রান্ত উত্তর এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে সকল রকম ভ্রমকেই যেমন শোধন করা দরকার এখানেও তাই। এই ভ্রমের বিচার মানুষেরই শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই, মানুষের দেবতার শ্রেষ্ঠতার বিচার মানুষেরই পূর্ণতার আদর্শ থেকে।

জীবসৃষ্টির প্রকাশপর্যায়ে দেহের দিকটাই যখন প্রধান ছিল তখন দেহসংস্থানঘটিত ভ্রম বা অপূর্ণতা নিয়ে অনেক জীবের ধ্বংস বা অবনতি ঘটেছে। জীবসৃষ্টির প্রকাশে মানুষের মধ্যে যখন 'আমি' এসে দাঁড়ালো তখন এই 'আমি' সম্বন্ধে ভুল করলে দৈহিক বিনাশের চেয়ে বড়ো বিনাশ। এই আমিকে নিয়ে ভুল কোথায় ঘটে সে প্রশ্নের একই উত্তর দিয়েছেন আমাদের সকল মহাপুরুষ। তাঁরা এই অদ্ভুত কথা বলেন, যেখানে আমিকে না-আমির দিকে জানতে বাধা পাই, তাকে অহং-বেড়ায় বিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ করে দেখি। এক আত্মলোকে সকল আত্মার অভিমুখে আত্মার সত্য ; এই সত্যের আদর্শেই বিচার করতে হবে মানুষের সভ্যতা, মানুষের সমস্ত অনুষ্ঠান, তার রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র— এর থেকে যে পরিমাণে সে ভ্রষ্ট সেই পরিমাণে সে বর্বর।

মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ জ্ঞানে জ্ঞানে, কর্মে কর্মে। যুগযুগান্তরের প্রবাহিত চিন্তাধারায় প্রীতিধারায় দেশের মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ। বহু লোকের আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল। যে-সব দেশবাসী অতীতকালের তাঁরা বস্তুত বাস করতেন ভবিষ্যতে। তাঁদের ইচ্ছার গতি কর্মের গতি ছিল আগামীকালের অভিমুখে। তাঁদের তপস্যার ভবিষ্যৎ আজ বর্তমান হয়েছে আমাদের

মধ্যে, কিন্তু আবদ্ধ হয় নি। আবার আমরাও দেশের ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে উৎসর্গ করছি। সেই ভবিষ্যৎকে ব্যক্তিগতরূপে আমরা ভোগ করব না। যে তপস্বীরা অন্তহীন ভবিষ্যতে বাস করতেন, ভবিষ্যতে যাঁদের আনন্দ, যাঁদের আশা, যাঁদের গৌরব, মানুষের সভ্যতা তাঁদেরই রচনা। তাঁদেরই স্মরণ করে মানুষ আপনাকে জেনেছে অমৃতের সন্তান ; বুঝেছে যে, তার দৃষ্টি, তার সৃষ্টি, তার চরিত্র মৃত্যুকে পেরিয়ে। মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে যাঁরা অমৃতকে প্রমাণ করেছেন তাঁদের দানেই দেশ রচিত। ভাবীকালবাসীরা, শুধু আপন দেশকে নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোককে অধিকার করেছেন। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের কর্ম, জাতিবর্ণনির্বিচারে সমস্ত মানুষের। সবাই তাঁদের সম্পদের উত্তরাধিকারী। তাঁরাই প্রমাণ করেন, সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক-মানুষ বিরাজিত। সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে বলেই মানুষের বাস দেশে। অর্থাৎ, এমন জায়গায় যেখানে প্রত্যেক মানুষের বিস্তার খণ্ড খণ্ড দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে— যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে।

ভবিষ্যৎকাল অসীম, অতীতকালও তাই। এই দুই দিকে মানুষের মন প্রবলভাবে আকৃষ্ট। পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্‌। যা ভূত, যা ভাবী, এই সমস্তই সেই পুরুষ। মানুষ ভাবতে ভালোবাসে, কোনো-এক কালে তার শ্রেষ্ঠতার আদর্শ পূর্বেই বিষয়ীকৃত। তাই প্রায় সকলজাতীয় মানুষের পুরাণে দেখা যায় সত্যযুগের কল্পনা অতীতকালে। সে মনে করে, যে আদর্শের উপলব্ধি অসম্পূর্ণ কোনো-এক দূরকালে তা পরিপূর্ণ অখণ্ড বিশুদ্ধ আকারে। সেই পুরাণের বৃত্তান্তে মানুষের এই আকাঙ্ক্ষাটি প্রকাশ পায় যে, অনাদিতে যা প্রতিষ্ঠিত অসীমে তাই প্রমাণিত হতে থাকবে। যে গানটি পূর্বেই সম্পূর্ণ রচিত গাওয়ার দ্বারাই সেটা ক্রমশ প্রকাশমান, এও তেমনি। মনুষ্যত্বের আদর্শ এক কোটিতে সমাপ্ত, আর-এক কোটিতে উপলভ্যমান। এখনকার দিনে মানুষ অতীতকালে সত্যযুগকে মানে না, তবু তার সকলপ্রকার শ্রেয়োনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে অনাগতকালে সত্যযুগের প্রত্যাশা। কোনো ব্যক্তি নাস্তিক হতে পারে কিন্তু সেই নাস্তিক যাকে সত্য বলে জানে দূরদেশে ভাবীকালে সেও তাকে সার্থক করবার জন্যে প্রাণ দিতে পারে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অগোচর ভবিষ্যতেই নিজেকে সত্যতররূপে অনুভব করে বলেই তার প্রত্যক্ষ বর্তমানকে বিসর্জন দেওয়া সে ক্ষতি মনে করে না। ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। পূর্ণ পুরুষের অধিকাংশ এখনো আছে অব্যক্ত। তাঁকেই ব্যক্ত করবার প্রত্যাশা নিয়ত চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। পূর্ণপুরুষ আগন্তুক। তাঁর রথ ধাবমান, কিন্তু তিনি এখনো এসে পৌঁছন নি। বরযাত্রীরা

আসছে, যুগের পর যুগ অপেক্ষা করছে, বরের বাজনা আসছে দূর থেকে। তাঁকে এগিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে দূতেরা চলেছে দুর্গম পথে। এই-যে অনিশ্চিত আগামীর দিকে মানুষের এত প্রাণপণ আগ্রহ— এই-যে অনিশ্চিতের মধ্যে, অনাগতের মধ্যে তার চিরনিশ্চিতের সন্ধান অক্লান্ত— তারই সংকটসংকুল পথে মানুষ বারবার বাধা পেয়ে ব্যর্থ হয়েও যাত্রা বন্ধ করতে পারলে না। এই অধ্যবসায়কে বলা যেতে পারত পাগলামি, কিন্তু মানুষ তাকেই বলেছে মহত্ত্ব। এই মহত্ত্বের আশ্রয় কোথায়। অলক্ষ্য একটা পরিপূর্ণতার দিকে মানুষের মনের আকর্ষণ দেখতে পাই ; অন্ধকার ঘরের গাছে, তার শাখায় প্রশাখায়, যেমন একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা প্রাচীরের ও-পারের আলোকের দিকে। আলোক যেমন সত্য, পূর্ণের আকর্ষণ নিয়ত যেখান থেকে প্রেরিত সেও যদি তেমনি সত্য না হত তা হলে জীবিকার প্রয়োজনের বাইরে আত্মার উৎকর্ষের জন্যে মানুষ যা-কিছু চিন্তা করে, কর্ম করে, তার কোনো অর্থ ই থাকে না। এই সত্যকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করি আমাদের সংকল্পে, আমাদের ধ্যানে, আমাদের আদর্শে। সেই অভাবনীয় পূর্ণকে দেখতে পাই দুঃখের দীপ্তিতে, মৃত্যুর গৌরবে। সে আমাদের জ্ঞানকে ঘরছাড়া করে বড়ো ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছে, নইলে পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে পাকপ্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেত। সীমাবদ্ধ সৃষ্টিকে মানুষ প্রত্যক্ষ দেখছে, তাকে ব্যবহার করছে ; কিন্তু তার মন বলছে, এই সমস্তেরই সত্য রয়েছে সীমার অতীতে— এই সীমাকে যদি প্রশ্ন করি তার শেষ উত্তর পাই নে এই সীমার মধ্যেই।

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে, ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণের সামনে দুই ব্রাহ্মণ তর্ক তুলেছিলেন, সামগানের মধ্যে যে রহস্য আছে তার প্রতিষ্ঠা কোথায়।

দাল্‌ভ্য বললেন, "এই পৃথিবীতেই।" স্থূল প্রত্যক্ষই সমস্ত রহস্যের চরম আশ্রয়, বোধ করি দাল্‌ভ্যের এই ছিল মত।

প্রবাহণ বললেন, "তা হলে তোমার সত্য তো অন্তবান হল, সীমায় এসে ঠেকে গেল যে।"

ক্ষতি কী তাতে। ক্ষতি এই যে, সীমার মধ্যে মানুষের জিজ্ঞাসা অসমাপ্ত থেকে যায়। কোনো সীমাকেই মানুষ চরম বলে যদি মানত তা হলে মানুষের ভৌতিক বিজ্ঞানও বহুকাল পূর্বেই ঘাটে নোঙর ফেলে যাত্রা বন্ধ করত। একদিন পণ্ডিতেরা বলেছিলেন, ভৌতিক বিশ্বের মূল উপাদানস্বরূপ আদিভূতগুলিকে তাঁরা একেবারে কোণঠেসা করে ধরেছেন, একটার পর একটা আবরণ খুলে এমন-কিছুতে ঠেকেছেন যাকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না। বললে কী হবে। অন্তরে আছেন প্রবাহণ রাজা, তিনি বহন করে নিয়ে চলেছেন মানুষের সব প্রশ্নকে সীমা থেকে দূরতর ক্ষেত্রে। তিনি বললেন,

অপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে সাম, অন্তবদ্ বৈ কিল তে সাম।

আদিভূতের যে বস্তুসীমায় প্রশ্ন এসে থেমেছিল সে সীমাও পেরোল। আজ মানুষের চরম ভৌতিক উপলব্ধি পৌঁছল গাণিতিক চিহ্নসংকেতে, কোনো বোধগম্যতায় নয়। একদিন আলোকের তত্ত্বকে মানুষ বোধগম্যতার পরপারেই স্থাপন করেছিল। অদ্ভুত কথা বলেছিল, 'ঈথরের ঢেউ' -জিনিসকেই আলোকরূপে অনুভব করি। অথচ ঈথর যে কী আমাদের বোধের ভাষায় তার কোনো কিনারা পাওয়া যায় না। আলো, যা আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্রে সকল ভৌতিক জিনিসকে প্রকাশ করে দাঁড়ালো তা এমন-কিছুর প্রকাশ যা সম্পূর্ণই ভৌতিক ধর্মের অতীত, কেবল ব্যবহারে মাত্র জানা যায় যে তাতে নানা ছন্দের ঢেউ খেলে। কিন্তু, প্রবাহণের গণনা থামে না। খবর আসে, কেবল তরঙ্গধর্মী বললে আলোর চরিত্রের হিসাব পুরো মেলে না, সে কণিকাবর্ষীও বটে। এই-সব স্ববিরোধী কথা মানুষের সহজ বুদ্ধির সহজ ভাষার সীমার বাইরেকার কথা। তবু বোধাতীতের ডুবজলেও মানুষ ভয় পেলে না। পাথরের দেয়ালটাকেও বললে বিদ্যুৎ-কণার নিরন্তর নৃত্য। সন্দেহ করলে না যে, হয়তো বা পাগল হয়ে গেছি। মনে করলে না, হয়তো প্রজ্ঞা, যাকে বলে রীজ্‌ন্‌, সে মানস-সার্কাসের ডিগ্‌বাজি-খেলোয়াড়; সব জিনিসকে একেবারে উলটিয়ে ধরাই তার ব্যাবসা। পশুরা যদি বিচারক হত মানুষকে বলত জন্ম-পাগল। বস্তুত মানুষের বিজ্ঞান সব মানুষকে এক-পাগলামিতে-পাওয়া জীব বলে প্রমাণ করছে। বলছে, সে যাকে যেরকম জানছে বলে মনে করে সেটা একেবারেই তা নয়, সম্পূর্ণই উলটো। জন্তুরা নিজেদের সম্বন্ধে এরকম লাইবেল প্রচার করে না। তাদের বোধের কাছে যেটা যা সেটা তাই, অর্থাৎ তাদের কাছে কেবল আছে তথ্য, তাদের অবিচলিত নিষ্ঠা প্রতীয়মানের প্রতি। তাদের জগতের আয়তন কেবল তলপৃষ্ঠ নিয়ে। তাদের সমস্ত দায় ঐ একতলাটাতেই। মানবজগতের আয়তনে বেধ আছে, যা চোখে পড়ে তার গভীরে। প্রত্যক্ষ তথ্যকে উপেক্ষা করলে মানুষের চলে না, আবার সত্যকেও নইলে নয়।

অন্যান্য বস্তুর মতোই তথ্য মানুষের সম্বল, কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যের চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমা উপলব্ধি করানো। তাই ঐশ্বর্য-অভিমানী মানুষ বলেছে, ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। বলেছে, অল্পে সুখ নেই, বৃহতেই সুখ।

এটা নিতান্তই বেহিসাবি কথা হল। হিসাবিবুদ্ধিতে বলে, যা চাই আর যা পাই এই দুটো মাপে মিলে গেলেই সুখের বিষয়। ইংরেজিতে একটা চলতি কথা আছে, যা যথেষ্ট সেটাই ভূরিভোজের সমান-দরের। শাস্ত্রেও বলছে, সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। তবেই তো দেখছি, সন্তোষে সুখ নেই আবার সন্তোষেই সুখ, এই

দুটো উলটো কথা সামনে এসে দাঁড়ালো। তার কারণ, মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে। তার যে সত্তা জীবসীমার মধ্যে, সেখানে যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুতেই তার সুখ। কিন্তু, অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত, সেই দিকে সে সুখ চায় না, সে সুখের বেশি চায়, সে ভূমাকে চায়। তাই সকল জীবের মধ্যে মানুষই কেবল অমিতাচারী। তাকে পেতে হবে অমিত, তাকে দিতে হবে অমিত, কেননা তার মধ্যে আছে অমিত-মানব। সেই অমিতমানব সুখের কাঙাল নয়, দুঃখভীরু নয়। সেই অমিতমানব আরামের দ্বার ভেঙে কেবলই মানুষকে বের করে নিয়ে চলেছে কঠোর অধ্যবসায়ে। আমাদের ভিতরকার ছোটো মানুষটি তা নিয়ে বিদ্রূপ করে থাকে ; বলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। উপায় নেই। বিশ্বের মানুষটি ঘরের মানুষকে পাঠিয়ে দেন বুনো মোষটাকে দাবিয়ে রাখতে, এমন-কি ঘরের খাওয়া যথেষ্ট না জুটলেও।

উপনিষদে ভগবান সম্বন্ধে একটি প্রশ্নোত্তর আছে। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ। সেই ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত। এই প্রশ্নের উত্তর, স্বে মহিম্নি। নিজের মহিমায়। সেই মহিমাই তাঁর স্বভাব। সেই স্বভাবেই তিনি আনন্দিত।

মানুষেরও আনন্দ মহিমায়। তাই বলা হয়েছে, ভূমৈব সুখম্। কিন্তু, যে স্বভাবে তার মহিমা সেই স্বভাবকে সে পায় বিরোধের ভিতর দিয়ে, পরম সুখকে পায় পরম দুঃখে। মানুষের সহজ অবস্থা ও স্বভাবের মধ্যে নিত্যই দ্বন্দ্ব। তাই ধর্মের পথকে অর্থাৎ মানুষের পরম স্বভাবের পথকে— দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

জন্তুর অবস্থাও যেমন, স্বভাবও তার অনুগত। তার বরাদ্দও যা, কামনাও তার পিছনে চলে বিনা বিদ্রোহে। তার যা পাওনা তার বেশি তার দাবি নেই। মানুষ বলে বসল, "আমি চাই উপরি-পাওনা।" বাঁধা বরাদ্দের সীমা আছে, উপরি-পাওনার সীমা নেই। মানুষের জীবিকা চলে বাঁধা বরাদ্দে, উপরি-পাওনা দিয়ে প্রকাশ পায় তার মহিমা।

জীবধর্মরক্ষার চেষ্টাতেও মানুষের নিরন্তর একটা দ্বন্দ্ব আছে। সে হচ্ছে প্রাণের সঙ্গে অপ্রাণের দ্বন্দ্ব। অপ্রাণ আদিম, অপ্রাণ বিরাট। তার কাছ থেকে রসদ সংগ্রহ করতে হয় প্রাণকে, মালমসলা নিয়ে গড়ে তুলতে হয় দেহযন্ত্র। সেই অপ্রাণ নিষ্ঠুর মহাজনের মতো, ধার দেয় কিন্তু কেবলই টানাটানি করে ফিরে নেবার জন্যে, প্রাণকে দেউলে করে দিয়ে মিলিয়ে দিতে চায় পঞ্চভূতে।

এই প্রাণচেষ্টাতে মানুষের শুধু কেবল অপ্রাণের সঙ্গে প্রাণের দ্বন্দ্ব নয়, পরিমিতের সঙ্গে অপরিমিতের। বাঁচবার দিকেও তার উপরি-পাওনার দাবি। বড়ো করে বাঁচতে হবে, তার অন্ন যেমন-তেমন নয় ; তার বসন, তার বাসস্থান কেবল কাজ চলাবার জন্যে

নয়— বড়োকে প্রকাশ করবার জন্যে। এমন-কিছুকে প্রকাশ, যাকে সে বলে থাকে 'মানুষের প্রকাশ', জীবযাত্রাতেও যে প্রকাশে ন্যূনতা ঘটলে মানুষ লজ্জিত হয়। সেই তার বাড়তি ভাগের প্রকাশ নিয়ে মানুষের যেমন দুঃসাধ্য প্রয়াস এমন তার সাধারণ প্রয়োজন মেটাবার জন্যও নয়। মানুষের মধ্যে যিনি বড়ো আছেন, আহারে বিহারেও পাছে তাঁর অসম্মান হয় মানুষের এই এক বিষম ভাবনা।

ঋজু হয়ে চলতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তেই মানুষকে ভারাকর্ষণের বিরুদ্ধে মান বাঁচিয়ে চলতে হয়। পশুর মতো চলতে গেলে তা করতে হত না। মনুষ্যত্ব বাঁচিয়ে চলাতেও তার নিয়ত চেষ্টা, পদে পদেই নীচে পড়বার শঙ্কা। এই মনুষ্যত্ব বাঁচানোর দ্বন্দ্ব মানব-ধর্মের সঙ্গে পশুধর্মের দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের। মানুষের ইতিহাসে এই পশুও আদিম। সে টানছে তামসিকতায়, মূঢ়তার দিকে। পশু বলছে, "সহজধর্মের পথে ভোগ করো।" মানুষ বলছে, "মানবধর্মের দিকে তপস্যা করো।" যাদের মন মন্থর— যারা বলে, যা আছে তাই ভালো, যা হয়ে গেছে তাই শ্রেষ্ঠ, তারা রইল জন্তুধর্মের স্থাবর বেড়াটার মধ্যে ; তারা মুক্ত নয়, তারা স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট। তারা পূর্বসঞ্চিত ঐশ্বর্যকে বিকৃত করে, নষ্ট করে।

মানুষ এক দিকে মৃত্যুর অধিকারে, আর-এক দকে অমৃতে ; এক দিকে সে ব্যক্তিগত সীমায়, আর-এক দিকে বিশ্বগত বিরাটে। এই দুয়ের কোনোটাকেই উপেক্ষা করা চলে না। মানুষ নিজেকে জানে, তদ্‌দূরে তদ্বন্তিকে চ— সে দূরেও বটে, সে নিকটেও। সেই দূরের মানুষের দাবি নিকটের মানুষের সব-কিছুকেই ছাড়িয়ে যায়। এই অপ্রত্যক্ষের দিকে মানুষের কল্পনাবৃত্তি দৌত্য করে। ভুল করে বিস্তর, যেখানে থই পায় না সেখানে অদ্ভুত সৃষ্টি দিয়ে ফাঁক ভরায় ; তবুও এই অপ্রতিহত প্রয়াস সত্যকেই প্রমাণ করে, মানুষের এই একটি আশ্চর্য সংস্কারের সাক্ষ্য দেয় যে, যেখানে আজও তার জানা পৌঁছয় নি সেখানেও শেষ হয় নি তার জানা।

গাছে গাছে ঘর্ষণে আগুন জ্বলে। জ্বলে বলেই জ্বলে, এই জেনে চুপ করে থাকলে মানুষের বুদ্ধিকে দোষ দেওয়া যেত না। জানবার নেই বলেই জানা যাচ্ছে না, এ কথাটা সংগত নয় তো কী। কিন্তু, মানুষ ছেলেমানুষের মতো বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, ঘর্ষণে আগুন জ্বলে কেন। বুদ্ধির বেগার-খাটুনি শুরু হল। খুব সম্ভব গোড়ায় ছেলেমানুষের মতোই জবাব দিয়েছিল ; হয়তো বলেছিল, গাছের মধ্যে একটা রাগী ভূত অদৃশ্যভাবে বাস করে, মার খেলে সে রেগে আগুন হয়ে ওঠে। এইরকম সব উত্তরে মানুষের পুরাণ বোঝাই-করা। যাদের শিশুবুদ্ধি কিছুতেই বাড়তে চায় না তারা এইরকম উত্তরকে আঁকড়ে ধরে থাকে। কিন্তু, অল্পে-সন্তুষ্ট মূঢ়তার মাঝখানেও মানুষের

প্রশ্ন বাধা ঠেলে ঠেলে চলে। কাজেই উনুন ধরাবার জন্যে আগুন জ্বালাতে মানুষকে যত চেষ্টা করতে হয়েছে তার চেয়ে সে কম চেষ্টা করে নি 'আগুন জ্বলে কেন' তার অনাবশ্যক উত্তর বের করতে। এ দিকে হয়তো উনুনের আগুন গেছে নিবে, হাঁড়ি চড়ে নি, পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলছে, প্রশ্ন চলছেই— আগুন জ্বলে কেন। সাক্ষাৎ আগুনের মধ্যে তার উত্তর নেই, উত্তর আছে প্রত্যক্ষ আগুনকে বহুদূরে ছাড়িয়ে। জন্তু-বিচারক মানুষকে কি নির্বোধ বলবে না, আমরা পতঙ্গকে যেমন বলি মূঢ়, বারবার যে পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে?

এই অদ্ভুত বুদ্ধির সকলের চেয়ে স্পর্ধা প্রকাশ পায় যখন মানুষকে সে ঠেলা দিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে, "তুমি আপনি কে।" এমন কথা বলতেও তার বাধে না যে, "মনে হচ্ছে বটে তুমি আছ কিন্তু সত্যই তুমি আছ কি, তুমি আছ কোথায়।" উপস্থিতমত কোনো জবাব না খুঁজে পেয়ে তাড়াতাড়ি যদি বলে বসি "আছি দেহধর্মে" অমনি অন্তর থেকে প্রবাহণ রাজা মাথা নেড়ে বলবেন, ওখানে প্রশ্নের শেষ হতে পারে না। তখন মানুষ বললে, ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্— মানবধর্মের গভীর সত্য নিহিত আছে গোপনে। আমার 'এই আমি' আছে প্রত্যক্ষে, 'সেই আমি' আছে অপ্রত্যক্ষে।

কথাটা স্পষ্ট করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

এই-যে জল, এই-যে স্থল, এই-যে এটা, এই-যে ওটা, যত-কিছু পদার্থকে নির্দেশ করে বলি 'এই-যে', এই-সমস্তই ভালো করে জেনে-বুঝে নিতে হবে, নইলে ভালো করে বাঁচা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বলে, তদ্‌বিদ্ধি নেদং যদিদম্ উপাসতে। তাকেই জানো। কাকে, না, ইদং অর্থাৎ এই-যে বলে যাকে স্বীকার করি তাকে নয়। 'এই-যে আমি শুনছি' এ হল সহজ কথা। তবুও মানুষ বললে, এর শেষ কথা সেইখানে যেখানে ইদং সর্বনাম পৌঁছয় না। খেপার মতো সে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় আছে শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং— শ্রবণেরও শ্রবণ। ভৌতিক প্রণালীতে খোঁজ করতে করতে এসে ঠেকে বাতাসের কম্পনে। কিন্তু, ওখানেও রয়েছে ইদং, 'এই-যে কম্পন'। কম্পন তো শোনা নয়। যে বলছে 'আমি শুনছি' তার কাছে পৌঁছনো গেল। তারও সত্য কোথায়।

উপর থেকে নীচে পড়ল একটা পাথর। জ্ঞানের দেউড়িতে যে দ্বারী থাকে সে খবর দিলে, এই-যে পড়েছে। নীচের দিকে উপরের বস্তুর যে টান সেইটে ঘটল। দ্বারীর কর্তব্য শেষ হল। ভিতর-মহল থেকে শোনা গেল, একে টান, ওকে টান, তাকে টান, বারে বারে 'এই-যে'। কিন্তু সব 'এই-যে'কে পেরিয়ে বিশ্বজোড়া একমাত্র টান।

উপনিষদ সকলের মধ্যে এই একক জানাই বলেন প্রতিবোধবিদিতম্— প্রত্যেক

পৃথক পড়ার বোধে একটি অদ্বিতীয় টানকে সত্য বলে জানা। তেমনি, আমি শুনি, তুমি শোন, এখন শুনি, তখন শুনি, এই প্রত্যেক শোনার বোধে যে একমাত্র পরম শোনার সত্য বিদিত সেই প্রতিবোধবিদিত এক সত্যই শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং। তার সম্বন্ধে উপনিষদ বলেন, অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। আমরা যা-কিছু জানি এবং জানি নে সব হতেই স্বতন্ত্র। ভৌতিক বিজ্ঞানেও যা গুহাহিত তাকে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কেবল যে মেলাতে পারি নে তা নয়, বলতে হয়— এ তার বিপরীত। ভাষায় বলি ভারাকর্ষণশক্তি, কিন্তু আকর্ষণ বলতে সাধারণত যা বুঝি এ তা নয়, শক্তি বলতে যা বুঝি এ তাও নয়।

প্রকৃতির গুহাহিত শক্তিকে আবিষ্কার ও ব্যবহার করেই মানুষের বাহিরের সমৃদ্ধি; যে সত্যে তার আত্মার সমৃদ্ধি সেও গুহাহিত, তাকে সাধনা করেই পেতে হবে। সেই সাধনাকে মানুষ বলে ধর্মসাধনা।

ধর্ম শব্দের অর্থ স্বভাব। চেষ্টা করে সাধনা করে স্বভাবকে পাওয়া, কথাটা শোনায় স্ববিরোধী অর্থাৎ স্বভাবকে অতিক্রম করে স্বভাবকে পাওয়া। খৃস্টানশাস্ত্রে মানুষের স্বভাবকে নিন্দা করেছে; বলেছে, তার আদিতেই পাপ, অবাধ্যতা। ভারতীয় শাস্ত্রেও আপনার সত্য পাবার জন্যে স্বভাবকে অস্বীকার করতে বলে। মানুষ নিজে সহজে যা তাকে শ্রদ্ধা করে না। মানুষ বলে বসল, তার সহজ স্বভাবের চেয়ে তার সাধনার স্বভাব সত্য। একটা স্বভাব তার নিজেকে নিয়ে; আর-একটা স্বভাব তার ভূমাকে নিয়ে।

কথিত আছে—

> শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্‌তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
>
> তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্‌ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥

মানুষের স্বভাবে শ্রেয়ও আছে, প্রেয়ও আছে। ধীর ব্যক্তি দুইকে পৃথক করেন। যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি সাধু, যিনি প্রেয়কে করেন তিনি পুরুষার্থ থেকে হীন হন।

এ-সব কথাকে আমরা চিরাভ্যস্ত হিতকথা বলে গণ্য করি অর্থাৎ মনে করি, লোক-ব্যবহারের উপদেশরূপেই এর মূল্য। কিন্তু, সমাজব্যবহারের প্রতি লক্ষ করেই এ শ্লোকটি বলা হয় নি। এই শ্লোকে আত্মাকে সত্য করে জানবার উপায় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রবৃত্তির প্রেরণায় আমরা যা ইচ্ছা করি সেই প্রেয়ের ইচ্ছা মানুষের স্বভাবে বর্তমান, আবার যা ইচ্ছা করা উচিত সেই শ্রেয়ের ইচ্ছাও মানুষের স্বভাবে। শ্রেয়কে গ্রহণ

করার দ্বারা মানুষ কিছু-একটা পায় যে তা নয়, কিছু-একটা হয়। সেই হওয়াকে বলে সাধু হওয়া। তার দ্বারা ধনী হয় না, বলী হয় না, সমাজে সম্মানিত হতেও পারে, না-হতেও পারে, এমন-কি, অবমানিত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। সাধু হওয়া পদার্থ টা কী, প্রকৃতির রাজ্যে তার কোনো কিনারা নেই। শ্রেয় শব্দটাও তেমনি। অপর পক্ষে প্রেয়কে একান্তরূপে বরণ করার দ্বারা মানুষ আর-একটা কিছু হয়, তাকে উপনিষদ বলছেন— আপন অর্থ থেকে হীন হওয়া। নাগর শব্দ বলতে যদি citizen না বুঝিয়ে libertine বোঝায় তা হলে বলতে হয়, নাগর শব্দ আপন সত্য অর্থ হতে হীন হয়ে গেছে। তেমনি একান্তভাবে প্রেয়কে অবলম্বন করলে, মানুষ বলতে যা বোঝায় সেই সত্য হীন হয়ে যায়। নিজের মধ্যে সর্বকালীন বিশ্বভূমীন মনুষ্যধর্মের উপলব্ধিই সাধুতা, হীনতা সেই মহামানবের উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত হওয়া। প্রাকৃতিক স্বভাবের উপরেও মানুষের আত্মিক স্বভাব যদি না থাকত তা হলে এ-সব কথার অর্থ থাকত না।

ডিমের মধ্যেই পাখির প্রথম জন্ম। তখনকার মতো সেই ডিমটাই তার একমাত্র ইদম্। আর-কিছুই সে জানে না। তবু তার মধ্যে একটা প্রবর্তনা আছে বাইরের অজানার মধ্যে সার্থকতার দিকে। সেই সার্থকতা— নেদং যদিদমুপাসতে। যদি খোলাটার মধ্যেই এক-শো বছর সে বেঁচে থাকত তা হলে সেটাকেই বলা যেত তার মহতী বিনষ্টি।

মানুষের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা। ব্যক্তিগত সংস্কার ছাড়িয়ে যাবে তার জিজ্ঞাসা, তবেই বিশ্বগত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে তার বিজ্ঞান। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জড়প্রথাগত অভ্যাস কাটিয়ে যাবে তার প্রয়াস, তবেই বিশ্বগত কর্মের দ্বারা সে হবে বিশ্বকর্মা। অহংকারকে ভোগাসক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তায় মানুষ হবে মহাত্মা। মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ, অন্য স্বভাবে মুক্তি।

জ্যোতির্বিদ দেখলেন, কোনো গ্রহ আপন কক্ষপথ থেকে বিচলিত। নিঃসন্দেহ মনে বললেন, অন্য কোনো অগোচর গ্রহের অদৃশ্য শক্তি তাকে টান দিয়েছে। দেখা গেল, মানুষেরও মন আপন প্রকৃতিনির্দিষ্ট প্রাণধারণের কক্ষপথ যথাযথ আবৃত্তি করে চলছে না। অনির্দিষ্টের দিকে, স্বভাবের অতীতের দিকে ঝুঁকছে। তার থেকে মানুষ কল্পনা করলে দেবলোক। বললে, আদেশ সেইখানকার, আকর্ষণ সেখান হতে। কে সেই দেবলোকের দেবতা তা নিয়ে মানুষে মানুষে হানাহানি চলেছে। যিনিই হোন, তাঁকে দেবতাই বলি আর যাই বলি, মানুষকে জীবসীমার মধ্যে কিছুতেই স্থির থাকতে দিলেন না।

সমুদ্র চঞ্চল হল। জোয়ার-ভাঁটার ওঠাপড়া চলছেই। চাঁদ না দেখা গেলেও সমুদ্রের চাঞ্চল্যেই চাঁদের আহ্বান প্রমাণ হত। বাঁচবার চেষ্টাতেও মানুষ অনেক সময় মরে। যে ক্ষুধা তার অন্তরে নিঃসংশয়, তার লক্ষ্য যে তার বাইরেও সত্য সে কথাটা সদ্যোজাত শিশুও স্বতই জানে। মানুষের প্রাণান্তিক উদ্যম দেখা গেছে এমন কিছুর জন্যে যার সঙ্গে বাঁচবার প্রয়োজনের কোনো যোগই নেই। মৃত্যুকে ছাড়িয়ে আছে যে প্রাণ সেই তাকে দুঃসাহসের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ভৌতিক প্রাণের পথে প্রাণীর নিজেকে রক্ষা; আর এ পথে আত্মবানের আত্মাকে রক্ষা নয়, আত্মাকে প্রকাশ।

বৈদিক ভাষায় ঈশ্বরকে বলেছে আবিঃ, প্রকাশস্বরূপ। তাঁর সম্বন্ধে বলেছে, যস্য নাম মহদ্‌যশঃ। তাঁর মহদ্‌যশই তাঁর নাম, তাঁর মহৎ কীর্তিতেই তিনি সত্য। মানুষের স্বভাবও তাই— আত্মাকে প্রকাশ। বাইরে থেকে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করার দ্বারাই প্রাণী আপনাকে রক্ষা করে, বাইরে আপনাকে উৎসর্গ করার দ্বারাই আত্মা আপনাকে প্রকাশ করে। এইখানে প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে গিয়ে সে আপনাকে ঘোষণা করে। এমন-কি, বর্বর দেশের মানুষও নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টায় প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে চায়। সে নাক ফুঁড়ে মস্ত এক শলা দিয়েছে চালিয়ে। উখো দিয়ে দাঁত ঘষে ঘষে ছুঁচোলো করেছে। শিশুকালে তক্তা দিয়ে চেপে বিকৃত করেছে মাথার খুলি, বানিয়েছে বিকটাকার বেশভূষা। এই-সব উৎকট সাজে-সজ্জায় অসহ্য কষ্ট মেনেছে; বলতে চেয়েছে, সে নিজে সহজে যা তার চেয়ে সে বড়ো। সেই তার বড়ো-আমি প্রকৃতির বিপরীত। যে দেবতাকে সে আপন আদর্শ বলে মানে সেও এমনি অদ্ভুত; তার মহিমার প্রধান পরিচয় এই যে, সে অপ্রাকৃতিক। প্রকৃতির হাতে পালিত তবু প্রকৃতিকে দুয়ো দেবার জন্যে মানুষের এই যেন একটা ঝগড়াটে ভাব। ভারতবর্ষেও দেখি, কত লোক, কেউ বা ঊর্ধ্ববাহু, কেউ বা কণ্টকশয্যায় শয়ান, কেউ বা অগ্নিকুণ্ডের দিকে নতশীর্ষ। তারা জানাচ্ছে, তারা শ্রেষ্ঠ, তারা সাধু, কেননা তারা অস্বাভাবিক। আধুনিক পাশ্চাত্য দেশেও কত লোক নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধনের গৌরব করে। তাকে বলে 'রেকর্ড্‌ ব্রেক' করা, দুঃসাধ্যতার পূর্ব-অধ্যবসায় পার হওয়া। সাঁতার কাটছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বাইসিক্‌লে অবিশ্রাম ঘুরপাক খাচ্ছে, দীর্ঘ উপবাস করছে স্পর্ধা করে, কেবলমাত্র অস্বাভাবিকতার গৌরব প্রচারের জন্যে। ময়ূরকে দেখা যায় গর্ব করতে আপন ময়ূরত্ব নিয়েই, হিংস্র জন্তু উৎসাহ বোধ করে আপনার হিংস্রতার সাফল্যে। কিন্তু, বর্বর মানুষ মুখশ্রীর বিকৃতি ও বেশভূষার অতিকৃতি নিয়ে গর্ব করে জানায়, "আমি ঠিক মানুষের মতো নই, সাধারণ মানুষরূপে আমাকে চেনবার জো নেই।" এমনতরো আত্মপ্রকাশের চেষ্টাকে বলি নঙর্থক, এ সদর্থক নয়; প্রকৃতির বিরুদ্ধে স্পর্ধামাত্র, যা তার সহজ তার প্রতিবাদমাত্র—

তার বেশি আর কোনো অর্থ এতে নেই। অহংকারের প্রকাশকে আত্মগৌরবের প্রকাশ বলে মনে করা বর্বরতা, তেমনি নিরর্থক বাহ্যানুষ্ঠানকে মনে করা পুণ্যানুষ্ঠান।

এ যেমন দৈহিক দিকে তেমনি আর্থিক দিকেও মানুষের স্পর্ধার অন্ত নেই। এখানেও রেকর্ড্ ব্রেক্ করা, পূর্ব-ইতিহাসের বেড়া-ডিঙোনো লক্ষ। এখানকার চেষ্টা ঠিক অস্বাভাবিকের জন্যে নয়, অসাধারণের জন্যে। এতে আছে সীমার প্রতি অসহিষ্ণুতা, তার বাইরে আর কিছুই নয়। কিন্তু, যা-কিছু বস্তুগত বা বাহ্যিক, সীমাই তার ধর্ম। সেই সীমাকে বাড়িয়ে চলা যায়, পেরিয়ে যাওয়া যায় না। যিশুখৃস্ট বলেছেন, সূচীর রন্ধ্র দিয়ে উট যেমন গলে না ধনীর পক্ষে স্বর্গদ্বার তেমনি দুর্গম। কেননা ধনী নিজের সত্যকে এমন-কিছুর দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করতে অভ্যস্ত যা অপরিমেয়ের বিপরীত, তাই সে হীয়তেঽর্থাৎ, মনুষ্যত্বের অর্থ হতে হীন হয়। হাতির মতো বড়ো হওয়াকে মানুষ বড়োলোক হওয়া বলে না, হয়তো বর্বর মানুষ তাও বলে। বাহিরের উপকরণ পুঞ্জিত করার গর্ব করা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। অন্যের চেয়ে আমার বস্তুসঞ্চয় বেশি, এ কথা মানুষের পক্ষে বলবার কথা নয়। তাই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। তিনি উপেক্ষা করেছিলেন উপকরণবতাং জীবিতম্। যে ওস্তাদ তানের অজস্রতা গণনা করে গানের শ্রেষ্ঠতা বিচার করে তার বিদ্যাকে সেই উটের সঙ্গে তুলনা করব। শ্রেষ্ঠ গান এমন পর্যাপ্তিতে এসে স্তব্ধ হয় যার উপরে আর একটিমাত্র স্বরও যোগ করা যায় না। বস্তুত গানের সেই থামাকে সীমা বলা যায় না। সে এমন একটি শেষ যার শেষ নেই। অতএব যথার্থ গায়কের আত্মা আপন সার্থকতাকে প্রকাশ করে তানের প্রভূত সংখ্যার দ্বারা নয়, সমগ্র গানের সেই চরম রূপের দ্বারা, যা অপরিমেয়, অনির্বচনীয়, বাইরের দৃষ্টিতে যা স্বল্প, অন্তরে যা অসীম। তাই মানুষের যে সংসার তার অহং-এর ক্ষেত্র সে দিকে তার অহংকার ভূরিতায়, যে দিকে তার আত্মা সে দিকে তার সার্থকতা ভূমায়। এক দিকে তার গর্ব স্বার্থসিদ্ধিতে, আর-এক দিকে তার গৌরব পরিপূর্ণতায়। সৌন্দর্য কল্যাণ বীর্য ত্যাগ প্রকাশ করে মানুষের আত্মাকে, অতিক্রম করে প্রাকৃত মানুষকে, উপলব্ধি করে জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানবকে। যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

চারি দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য-সকল প্রাণী, বাইরে থেকে জীবিকার অর্থ খুঁজে খুঁজে। মানুষ আপন অন্তরের মধ্যে আশ্চর্য হয়ে কাকে অনুভব করলে। যিনি নিহিতার্থো দধাতি, যিনি তাকে তার অন্তর্নিহিত অর্থ দিচ্ছেন। সেই অর্থ মানুষের আপন আত্মারই গভীর অর্থ। সেই অর্থ এই যে মানুষ মহৎ। মানুষকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে মহৎ; তবেই প্রমাণ হবে যে, সে মানুষ। প্রাণের মূল্য দিয়েও তার আপন ভূমাকে প্রকাশ

করতে হবে ; কেননা তিনি চিরন্তন মানব, সর্বজনীন মানব, তিনি মৃত্যুর অতীত— তাঁকে যে অর্ঘ্য দিতে হবে সে অর্ঘ্য সকল মানুষের হয়ে, সকল কালের হয়ে, আপনারই অন্তরতম বেদীতে। আপনারই পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। শেষকালে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে সে বলে, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ ; জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই— অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে। মানুষের যত-কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাইরে-বিক্ষিপ্ত আপনহারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলেম পথিক ভিখারির মুখে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলেম—

তোরই ভিতর অতল সাগর।

সেই পাগলই গেয়েছিল—

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে, আবিরাবীর্ম এধি— পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।

দুই

অথর্ববেদ বলেছেন—

ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ
ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে।

ঋত সত্য তপস্যা রাষ্ট্র শ্রম ধর্ম কর্ম ভূত ভবিষ্যৎ বীর্য সম্পদ বল সমস্তই উচ্ছিষ্টে অর্থাৎ উদ্‌বৃত্তে আছে।

অর্থাৎ, মানবধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃতির প্রয়োজন সে পেরিয়ে, সে আসছে অতিরিক্ততা থেকে। জীবজগতে মানুষ বাড়তির ভাগ। প্রকৃতির বেড়ার মধ্যে তাকে

কুলোল না। ইতিপূর্বে জীবাণুকোষের সঙ্গে সমগ্র দেহের সম্বন্ধ আলোচনা করেছিলুম। অথর্ববেদের ভাষায় বলা যেতে পারে, প্রত্যেক জীবকোষ তার অতিরিক্তের মধ্যে বাস করে। সেই অতিরিক্ততাতেই উৎপন্ন হচ্ছে স্বাস্থ্য আনন্দ শক্তি, সেই অতিরিক্ততাকেই অধিকার করে আছে সৌন্দর্য, সেই অতিরিক্ততাতেই প্রসারিত ভূত ভবিষ্যৎ। জীবকোষ এই সমগ্র দেহগত বিভূতি উপলব্ধি করে না। কিন্তু, মানুষ প্রকৃতিনির্দিষ্ট আপন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে পেরিয়ে যায়; পেরিয়ে গিয়ে যে আত্মিক সম্পদকে উপলব্ধি করে অথর্ববেদ তাকেই বলেছেন, ঋতং সত্যম্। এ সমস্তই বিশ্বমানবমনের ভূমিকায়, যারা একে স্বীকার করে তারাই মনুষ্যত্বের পদবীতে এগোতে থাকে। অথর্ববেদ যে-সমস্ত গুণের কথা বলেছেন তার সমস্তই মানবগুণ। তার যোগে আমরা যদি আমাদের জীবধর্মসীমার অতিরিক্ত সত্তাকে অনুভব করি তবে বলতে হবে, সে সত্তা কখনোই অমানব নয়, তা মানবব্রহ্ম। আমাদের ঋতে সত্যে তপস্যায় ধর্মে কর্মে সেই বৃহৎ মানবকে আমরা আত্মবিষয়ীকৃত করি। এই কথাটিকেই উপনিষদ আর-এক রকম করে বলেছেন—

এষাস্য পরমা গতি রেষাস্য পরমা সম্পদ্
এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

এখানে উনি এবং এ, এই দুয়ের কথা। বলছেন, উনি এর পরম গতি, উনি এর পরম সম্পদ, উনি এর পরম আশ্রয়, উনি এর পরম আনন্দ। অর্থাৎ, এর পরিপূর্ণতা তাঁর মধ্যে। উৎকর্ষের পথে এ চলেছে সেই বৃহতের দিকে, এর ঐশ্বর্য সেইখানেই, এর প্রতিষ্ঠা তাঁর মধ্যেই, এর শাশ্বত আনন্দের ধন যা-কিছু সে তাঁতেই।

এই তিনি বস্তু-অবচ্ছিন্ন একটা তত্ত্বমাত্র নন। যাকে বলি 'আমার আমি' সে যেমন অন্তরতমভাবে আমার একান্ত বোধবিষয় তিনিও তেমনি। যখন তাঁর প্রতি ভক্তি জেগে ওঠে, যখন তাঁতে আনন্দ পাই, তখন আমার এই আমি-বোধই বৃহৎ হয়, গভীর হয়, প্রসারিত হয় আপন সীমাতীত সত্যে। তখন অনুভব করি, এক বৃহৎ আনন্দের অন্তর্গত আমার আনন্দ। অন্য কোনো গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যে উপমা ব্যবহার করেছি এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই।

একখণ্ড লোহার রহস্যভেদ করে বৈজ্ঞানিক বলেছেন, সেই টুকরোটি আর-কিছুই নয়, কতকগুলি বিশেষ ছন্দের বিদ্যুৎমণ্ডলীর চিরচঞ্চলতা। সেই মণ্ডলীর তড়িৎকণাগুলি নিজেদের আয়তনের অনুপাতে পরস্পরের থেকে বহু দূরে দূরে অবস্থিত। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছে সহজ দৃষ্টিতে যদি সেইরকম দেখা যেত, তা হলে মানবমণ্ডলীতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেমন পৃথক দেখি তেমনি তাদেরও দেখতুম। এই অণুগুলি যত

পৃথকই হোক, এদের মধ্যে একটা শক্তি কাজ করছে। তাকে শক্তিই বলা যাক। সে সম্বন্ধশক্তি, ঐক্যশক্তি, সে ঐ লৌহখণ্ডের সংঘশক্তি। আমরা যখন লোহা দেখছি. তখন বিদ্যুৎকণা দেখছি নে, দেখছি সংঘরূপকে। বস্তুত, এই-যে লোহার প্রতীয়মান রূপ এ একটা প্রতীক। বস্তুটা পরমার্থত যা, এ তা নয়। অন্যবিধ দৃষ্টি যদি থাকে তবে এর প্রকাশ হবে অন্যবিধ। দশ-টাকার নোট পাওয়া গেল, বিশেষ রাজত্বে তার বিশেষ মূল্য। একে দেখবামাত্র যে জানে যে এই কাগজখানা স্বতন্ত্র দশ-সংখ্যক টাকার সংঘরূপ, তা হলেই সে একে ঠিক জানে। কাগজখানা ঐ সংঘের প্রতীক।

আমরা যাকে চোখে দেখছি লোহা সেও প্রকাশ করছে সেই সংঘকে যাকে চোখে দেখা যায় না, দেখা যায় স্থূল প্রতীকে। তেমনি ব্যক্তিগত মানুষগুলির মধ্যে দেশকালের ব্যবধান যথেষ্ট, কিন্তু সমস্ত মানুষকে নিয়ে আছে একটি বৃহৎ এবং গভীর ঐক্য। সেই ইন্দ্রিয়বোধাতীত ঐক্য সাংখ্যিক সমষ্টিকে নিয়ে নয়, সমষ্টিকে অতিক্রম করে। সেই হচ্ছে সমস্তের এক গূঢ় আত্মা, একধৈবানুদ্রষ্টব্যঃ, কিন্তু বহুধাশক্তিযোগে তার প্রকাশ। সমস্ত মানুষের মধ্যে সেই এক আত্মাকে নিজের মধ্যে অনুভব করবার উদার শক্তি যাঁরা পেয়েছেন তাঁদেরই তো বলি মহাত্মা, তাঁরাই তো সর্বমানবের জন্যে প্রাণ দিতে পারেন। তাঁরাই তো এই এক গূঢ় আত্মার প্রতি লক্ষ করে বলতে পারেন, তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদ্ অন্তরতরং যদয়মাত্মা— তিনি পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, অন্য-সকল হতে প্রিয়, এই আত্মা যিনি অন্তরতর।

বৈজ্ঞানিক এই কথা শুনে ধিক্‌কার দেন, বলেন, দেবতাকে প্রিয় বললে দেবতার প্রতি মানবিকতা আরোপ করা হয়। আমি বলি, মানবত্ব আরোপ করা নয়, মানবত্ব উপলব্ধি করা। মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌচেছে। মানুষের মন আপন দেবতায় আপন মানবত্বের প্রতিবাদ করতে পারে না। করা তার পক্ষে সত্যই নয়। ঈথরের কম্পনে মানুষ আলোকত্ব আরোপ করে না, তাকে স্বতই আলোকরূপে অনুভব করে, আলোকরূপেই ব্যবহার করে, করে ফল পায়, এও তেমনি।

পরমমানবিক সত্তাকে পেরিয়ে গিয়েও পরমজাগতিক সত্তা আছে। সূর্যলোককে ছাড়িয়ে যেমন আছে নক্ষত্রলোক। কিন্তু, যার অংশ এই পৃথিবী, যার উত্তাপে পৃথিবীর প্রাণ, যার যোগে পৃথিবীর চলাফেরা, পৃথিবীর দিনরাত্রি, সে একান্তভাবে এই সূর্যলোক। জ্ঞানে আমরা নক্ষত্রলোককে জানি, কিন্তু জ্ঞানে কর্মে আনন্দে দেহমনে সর্বতোভাবে জানি এই সূর্যলোককে। তেমনি জাগতিক ভূমা আমাদের জ্ঞানের বিষয়, মানবিক ভূমা

আমাদের সমগ্র দেহমন ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার বিষয়। আমাদের ধর্মশ্চ কর্ম চ, আমাদের ঋতং সত্যং, আমাদের ভূতং ভবিষ্যৎ সেই সত্তারই অপর্যাপ্তিতে।

মানবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা, তাঁকে প্রিয় বলা বা কোনো-কিছুই বলার কোনো অর্থ নেই। তিনি ভালো-মন্দ সুন্দর-অসুন্দরের ভেদ-বর্জিত। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে পাপপুণ্যের কথা উঠতে পারে না। অস্তীতিব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। তিনি আছেন, এ ছাড়া তাঁকে কিছুই বলা চলে না। মানবমনের সমস্ত লক্ষণ সম্পূর্ণ লোপ করে দিয়ে সেই নির্বিশেষে মগ্ন হওয়া যায়, এমন কথা শোনা গেছে। এ নিয়ে তর্ক চলে না। মন-সমেত সমস্ত সত্তার সীমানা কেউ একেবারেই ছাড়িয়ে গেছে কি না, আমাদের মন নিয়ে সে কথা নিশ্চিত বলব কী করে। আমরা সত্তামাত্রকে যে ভাবে যেখানেই স্বীকার করি সেটা মানুষের মনেরই স্বীকৃতি। এই কারণেই দোষারোপ করে মানুষের মন স্বয়ং যদি তাকে অস্বীকার করে, তবে শূন্যতাকেই সত্য বলা ছাড়া উপায় থাকে না। এমন নাস্তিবাদের কথাও মানুষ বলেছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক তা বললে তার ব্যাবসা বন্ধ করতে হয়। বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় আমরা যে জগৎকে জানি বা কোনোকালে জানবার সম্ভাবনা রাখি সেও মানবজগৎ। অর্থাৎ, মানুষের বুদ্ধির, যুক্তির কাঠামোর মধ্যে কেবল মানুষই তাকে আপন চিন্তার আকারে আপন বোধের দ্বারা বিশিষ্টতা দিয়ে অনুভব করে। এমন কোনো চিত্ত কোথাও থাকতেও পারে যার উপলব্ধ জগৎ আমাদের গাণিতিক পরিমাপের অতীত, আমরা যাকে আকাশ বলি সেই আকাশে যে বিরাজ করে না। কিন্তু, যে জগতের গূঢ় তত্ত্বকে মানব আপন অন্তর্নিহিত চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা মিলিয়ে পাচ্ছে তাকে অতিমানবিক বলব কী করে। এইজন্যে কোনো আধুনিক পণ্ডিত বলেছেন, বিশ্বজগৎ গাণিতিক মনের সৃষ্টি। সেই গাণিতিক মন তো মানুষের মনকে ছাড়িয়ে গেল না। যদি যেত তবে এ জগতের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমরা জানতেই পারতুম না, যেমন কুকুর বিড়াল কিছুতেই জানতে পারে না। যিনি আমাদের দর্শনে শাস্ত্রে সগুণ ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপসম্বন্ধে বলা হয়েছে সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্। অর্থাৎ মানুষের বহিরিন্দ্রিয়-অন্তরিন্দ্রিয়ের যত-কিছু গুণ তার আভাস তাঁরই মধ্যে। তার অর্থই এই যে, মানবব্রহ্ম, তাই তাঁর জগৎ মানবজগৎ। এ ছাড়া অন্য জগৎ যদি থাকে তা হলে সে আমাদের সম্বন্ধে শুধু যে আজই নেই তা নয়, কোনো কালেই নেই।

এই জগৎকে জানি আপন বোধ দিয়ে। যে জানে সেই আমার আত্মা। সে আপনাকেও আপনি জানে। এই স্বপ্রকাশ আত্মা একা নয়। আমার আত্মা, তোমার আত্মা, তার আত্মা, এমন কত আত্মা। তারা যে এক আত্মার মধ্যে সত্য

তাঁকে আমাদের শাস্ত্রে বলেন পরমাত্মা। এই পরমাত্মা মানবপরমাত্মা, ইনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।· ইনি আছেন সর্বদা জনে-জনের হৃদয়ে।

বলা হয়েছে বটে, আমাদের সকল ইন্দ্রিয়গুণের আভাস এঁর মধ্যে, কিন্তু এতেই সব কথা শেষ হল না। এক আত্মার সঙ্গে আর-এক আত্মার যে সম্বন্ধ সকলের চেয়ে নিবিড়, সকলের চেয়ে সত্য, তাকেই বলে প্রেম। ভৌতিক বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বাস্তব পরিচয় ইন্দ্রিয়বোধে, আত্মিক বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সত্য পরিচয় প্রেমে। আত্মিক বিশ্বের পরিচয় মানুষ জন্মমুহূর্তেই আরম্ভ করেছে পিতামাতার প্রেমে। এইখানে অপরিমেয় রহস্য, অনির্বচনীয়ের সংস্পর্শ। প্রশ্ন উঠল মনে, এই পিতামাতার সত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত। দাল্‌ভ্য যদি উত্তর করেন, এই পৃথিবীর মাটিতে প্রবাহণ মাথা নেড়ে বলবেন, যিনি পিতৃতমঃ পিতৃণাম্‌, সকল পিতাই যাঁর মধ্যে পিতৃতম হয়ে আছেন, তাঁরই মধ্যে। মাটির অর্থ বুঝতে পারি বাহির থেকে তাকে নেড়েচেড়ে দেখে, পিতামাতার রহস্য বুঝতে পারি আপনারই আত্মার গভীরে এবং সেই গভীরেই উপলব্ধি করি পিতৃতমকে। সেই পিতৃতম বিশেষ কোনো স্বর্গে নেই, বিশেষ কোনো দেশকালে-বদ্ধ ইতিহাসে নেই, ইনি বিশেষ কোনো একটি মানুষে একদা অবতীর্ণ নন, ইনি প্রেমের সম্বন্ধে মানবের ভূতভবিষ্যৎকে পূর্ণ করে আছেন নিখিল মানবলোকে। আহ্বান করছেন দুর্গম পথের ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে, অসত্যের থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে, দুঃখের মধ্য দিয়ে, তপস্যার মধ্য দিয়ে।

এই আহ্বান মানুষকে কোনোকালে কোথাও থামতে দিলে না, তাকে চিরপথিক করে রেখে দিলে। ক্লান্ত হয়ে যারা পথ ছেড়ে পাকা করে ঘর বেঁধেছে তারা আপন সমাধিঘর রচনা করেছে। মানুষ যথার্থই অনাগারিক। জন্তুরা পেয়েছে বাসা, মানুষ পেয়েছে পথ। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরা পথনির্মাতা, পথপ্রদর্শক। বুদ্ধকে যখন কোনো একজন লোক চরমতত্ত্বের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি বলেছিলেন, "আমি চরমের কথা বলতে আসি নি, আমি বলব পথের কথা।" মানুষ এক যুগে যাকে আশ্রয় করছে আর-এক যুগে উন্মাদের মতো তার দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে পথে। এই-যে বারে বারে ঘর ভেঙে দিয়ে চলবার উদ্দামতা, যার জন্যে সে প্রাণপণ করে, এ প্রমাণ করছে কোন্‌ সত্যকে। সেই সত্য সম্বন্ধেই উপনিষদ বলেন, মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্‌ পূর্বমর্ষৎ। তিনি মনকে ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়ে চলে গেছেন। ছাড়িয়ে যদি না যেতেন তবে পদে পদে মানুষও আপনাকে ছাড়িয়ে যেত না। অথর্ববেদ বলেছেন, এই আরও'র দিকে, এই ছাড়িয়ে যাবার দিকে মানুষের শ্রী, তার ঐশ্বর্য, তার মহত্ত্ব।

তাই মানবদেবতার সম্বন্ধে এই কথা শুনি—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদ্ উর্জিতমেব বা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।

যা কিছুতে ঐশ্বর্য আছে, শ্রী আছে, শ্রেষ্ঠতা আছে, সে আমারই তেজের অংশ থেকে সম্ভূত।'

বিশ্বে ছোটোবড়ো নানা পদার্থই আছে। থাকা-মাত্রের যে দাম তা সকলের পক্ষেই সমান। নিছক অস্তিত্বের আদর্শে মাটির ঢেলার সঙ্গে পদ্মফুলের উৎকর্ষ-অপকর্ষের ভেদ নেই। কিন্তু, মানুষের মনে এমন একটি মূল্যভেদের আদর্শ আছে যাতে প্রয়োজনের বিচার নেই, যাতে আয়তনের বা পরিমাণের তৌল চলে না। মানুষের মধ্যে বস্তুর অতীত একটি অহৈতুক পূর্ণতার অনুভূতি আছে, একটা অন্তরতম সার্থকতার বোধ। তাকেই সে বলে শ্রেষ্ঠতা। অথচ, এই শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে মতের ঐক্য তো দেখি নে। তা হলে সেটা যে নৈর্ব্যক্তিক শাশ্বত সত্যে প্রতিষ্ঠিত, এ কথা বলা যায় কী করে।

জ্যোতির্বিদ দূরবীন নিয়ে জ্যোতিষ্কের পর্যালোচনা করতে চান, কিন্তু তার বাধা বিস্তর। আকাশে আছে পৃথিবীর ধুলো, বাতাসের আবরণ, বাষ্পের অবগুণ্ঠন চার দিকে নানাপ্রকার চঞ্চলতা। যন্ত্রের ত্রুটিও অসম্ভব নয়, যে মন দেখছে তার মধ্যে আছে পূর্বসংস্কারের আবিলতা। ভিতর-বাহিরের সমস্ত ব্যাঘাত নিরস্ত করলে বিশুদ্ধ সত্য পাওয়া যায়। সেই বিশুদ্ধ সত্য এক, কিন্তু বাধাগ্রস্ত প্রতীতির বিশেষত্ব-অনুসারে ভ্রান্ত মত বহু।

পুরোনো সভ্যতার মাটিচাপা ভাঙাচোরা চিহ্নশেষ উদ্ধার করলে তার মধ্যে দেখা যায় আপন শ্রেষ্ঠতাকে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষের প্রভূত প্রয়াস। নিজের মধ্যে যে কল্পনাকে সকল কালের সকল মানুষের বলে সে অনুভব করেছে তারই দ্বারা সর্ব-কালের কাছে নিজের পরিচয় দিতে তার কত বল কত কৌশল। ছবিতে, মূর্তিতে, ঘরে, ব্যবহারের সামগ্রীতে, সে ব্যক্তিগত মানুষের খেয়ালকে প্রচার করতে চায় নি—বিশ্বগত মানুষের আনন্দকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্যে তার দুঃসাধ্য সাধনা। মানুষ তাকেই জানে শ্রেষ্ঠতা যাকে সকল কাল ও সকল মানুষ স্বীকার করতে পারে। সেই শ্রেষ্ঠতার দ্বারা মানুষ আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, আপন আত্মায় সকল মানুষের আত্মার পরিচয় দেয়। এই পরিচয়ের সম্পূর্ণতাতেই মানুষের অভ্যুদয়, তার বিকৃতিতেই মানুষের পতন। বাহ্যসম্পদের প্রাচুর্যের মাঝখানেই সেই বিনষ্টির লক্ষণ সহসা এসে দেখা দেয় যখন মদান্ধ স্বার্থান্ধ মানুষ চিরমানবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পাশ্চাত্য

মহাদেশে কি সেই লক্ষণ আজ দেখা দেয় নি। সেখানে বিজ্ঞান আছে, বাহুবল আছে, অর্থবল আছে, বুদ্ধিবল আছে, কিন্তু তার দ্বারাও মানুষ রক্ষা পায় না। স্বাজাত্যের শিখরের উপরে চড়ে বিশ্বগ্রাসী লোভ যখন মনুষ্যত্বকে খর্ব করতে স্পর্ধা করে, রাষ্ট্র-নীতিতে নিষ্ঠুরতা ও ছলনার সীমা থাকে না, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা এবং সংশয় যখন নিদারুণ হিংস্রতায় শান দিতে বসে, তখন মানবের ধর্ম আঘাত পায় এবং মানবের ধর্মই মানুষকে ফিরে আঘাত করে। এ কোনো পৌরাণিক ঈশ্বরের আদিষ্ট বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা নয়। এই-সব আত্মম্ভরীরা আত্মহনো জনাঃ। এরা সেই আত্মাকে মারে যে আত্মা স্বদেশের বা স্বগোষ্ঠীর মধ্যে বদ্ধ নয়, যে আত্মা নিত্যকালের বিশ্বজনের। একলা নিজেকে বা নিজেদেরকে বড়ো করবার চেষ্টায় অন্য-সকল প্রাণীরই উন্নতি ঘটতে পারে, তাতে তাদের সত্যদ্রোহ ঘটে না ; কিন্তু মানুষের পক্ষে সেইটেই অসত্য, অধর্ম, এইজন্যে সকলপ্রকার সমৃদ্ধির মাঝখানেই তার দ্বারাই মানুষ সমূলেন বিনশ্যতি।

বিশুদ্ধ সত্যের উপলব্ধিতে বিশ্বমানবমনের প্রকাশ, এ কথা স্বীকার করা সহজ ; কিন্তু রসের অনুভূতিতে সেই বিশ্বমনকে হৃদয়ংগম করি কি না, এ নিয়ে সংশয় জন্মাতে পারে। সৌন্দর্যে আনন্দবোধের আদর্শ দেশকালপাত্রভেদে বিচিত্র যদি হয় তবে এর শাশ্বত আদর্শ কোথায়। অথচ, বৃহৎ কালে মেলে দিয়ে মানুষের ইতিহাসকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই, শিল্পসৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সকল কালের সকল সাধকদের মন মেলবার দিকেই যায়। এ কথা সত্য যে, নিশ্চিতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই সুন্দর সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ রস পায় না। অনেকের মন রূপকানা, তাদের ব্যক্তিগত অভিরুচির সঙ্গে বিশ্বরুচির মিল নেই। মানুষের মধ্যে অনেকে আছে স্বভাবতই বিজ্ঞানমূঢ়, বিশ্ব সম্বন্ধে তাদের ধারণা মোহাচ্ছন্ন বলেই তা বহু, এক সংস্কারের সঙ্গে আর-এক সংস্কারের মিল হয় না, অথচ নিজ নিজ অন্ধ সংস্কারের সত্যতা সম্বন্ধে তাদের প্রত্যেকের এমন প্রচণ্ড দম্ভ যে তা নিয়ে তারা খুনোখুনি করতেও প্রস্তুত। তেমনি সংসারে স্বভাবতই অরসিক বা বেরসিকের অভাব নেই ; তাদেরও মতভেদ সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। নিম্নসপ্তক থেকে উচ্চসপ্তক পর্যন্ত উদারা মুদারা তারা নানা পর্যায়ের জন্মমূঢ়তা আছে বলেই যেমন জ্ঞানের বিশ্বভূমীন সম্পূর্ণতায় অশ্রদ্ধা করা যায় না, সৌন্দর্যের আদর্শ সম্বন্ধেও তেমনি।

বারট্রাণ্ড্‌ রাসেল কোনো-এক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে, বেটোভনের 'সিম্ফনি'কে বিশ্বমনের রচনা বলা যায় না, সেটা ব্যক্তিগত ; অর্থাৎ, সেটা তো গাণিতিক তত্ত্বের মতো নয় যার উদ্ভাবনা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মন উপলক্ষমাত্র, যা নিখিল মনের সামগ্রী। কিন্তু, যদি এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, বেটোভনের রচনা সকলেরই

ভালো লাগা উচিত অর্থাৎ ঠিকমত শিক্ষা পেলে, স্বাভাবিক চিত্তজড়তা না থাকলে, অজ্ঞান অনভ্যাসের আবরণ দূর হলে, সকল মানুষের তা ভালো লাগবে, তা হলে বলতেই হবে শ্রেষ্ঠগীত-রচয়িতার শ্রেষ্ঠত্ব সকল মানুষের মনেই সম্পূর্ণ আছে, শ্রোতৃরূপে ব্যক্তিবিশেষের মনে তা বাধাগ্রস্ত।

বুদ্ধি জিনিসটা অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু সৌন্দর্যবোধের অপূর্ণতা সত্ত্বেও সংসারে সিদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সৌন্দর্যবোধের কোনো সাংঘাতিক তাগিদ নেই। এ সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারের কোনো দণ্ডনীয় বাধা নেই। যুক্তিস্বীকারকারী বুদ্ধি মানুষের মনে যত সুনিশ্চিত হয়েছে প্রাণের বিভাগে, শাসনের অভাবে সৌন্দর্যস্বীকার-কারী রুচি তেমন পাকা হয় নি। তবু সমস্ত মানবসমাজে সৌন্দর্যসৃষ্টির কাজে মানুষের যত প্রভূত শক্তির প্রয়োগ হচ্ছে এমন অল্প বিষয়েই। অথচ, জীবনধারণে এর প্রয়োজন নেই, এর প্রয়োজন আত্মিক। অর্থাৎ, এর দ্বারা বাইরের জিনিসকে পাই নে, অন্তরের থেকে দীপ্তিমান হই, পরিতৃপ্ত হই। এই পরিতৃপ্ত হওয়ার দ্বারা যাঁকে জানি তাঁকে বলি, রসো বৈ সঃ।

এই হওয়ার দ্বারা পাওয়ার কথা উপনিষদে বারবার শোনা যায়; তার থেকে এই বুঝি, মানুষের যা চরম পাবার বিষয় তার সঙ্গে মানুষ একাত্মক, মানুষ তারই মধ্যে সত্য— কেবল তার বোধের বাধা আছে।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্ নাশান্তো নাসমাহিতঃ
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

বলছেন, কেবল জানার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। হওয়ার দ্বারা পেতে হবে, দুশ্চরিত থেকে বিরত হওয়া, সমাহিত হওয়া, রিপুদমন করে অচঞ্চলমন হওয়া দ্বারাই তাঁকে পেতে হবে। অর্থাৎ, এ এমন পাওয়া যা আপনারই চিরন্তন সত্যকে পাওয়া।

পূর্বে বলেছি, ভৌতিক সত্যকে বিশুদ্ধ করে দেখতে গেলে কাছের সমস্ত মলিনতা ও চাঞ্চল্য, ব্যক্তিগত সমস্ত বিকার দূর করা চাই। আত্মিক সত্য সম্বন্ধে সে কথা আরো বেশি খাটে। যখন পশুসত্তার বিকার আমরা আত্মিক সত্যে আরোপ করি তখন সেই প্রমাদ সব চেয়ে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। কেননা, তখন আমাদের হওয়ার ভিত্তিতেই লাগে আঘাত। জানার ভুলের চেয়ে হওয়ার ভুল কত সর্বনেশে তা বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই বিজ্ঞানের সাহায্যে যে শক্তিকে আমরা আয়ত্ত করেছি সেই শক্তিই মানুষের হিংসা ও লোভের বাহন হয়ে তার আত্মঘাতকে বিস্তার করছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এইজন্যেই সম্প্রদায়ের নামে ব্যক্তিগত বা বিশেষজনগত স্বভাবের বিকৃতি মানুষের পাপবুদ্ধিকে যত প্রশ্রয় দেয় এমন বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তিতে কিংবা

বৈষয়িক বিরোধেও না। সাম্প্রদায়িক দেবতা তখন বিদ্বেষবুদ্ধির, অহংকারের, অবজ্ঞাপরতার, মূঢ়তার দৃঢ় আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়; শ্রেয়ের নামাঙ্কিত পতাকা নিয়ে অশ্রেয় জগদ্‌ব্যাপী অশান্তির প্রবর্তন করে— স্বয়ং দেবত্ব অবমানিত হয়ে মানুষকে অবমানিত ও পরস্পরব্যবহারে আতঙ্কিত করে রাখে। আমাদের দেশে এই দুর্যোগ আমাদের শক্তি ও সৌভাগ্যের মূলে আঘাত করছে।

অন্য দেশেও তার দৃষ্টান্ত আছে। সাম্প্রদায়িক খৃস্টান ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দেবচরিত্রে পূজাবিধিতে চরিত্রবিকৃতি বা হিংস্রতা দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। সংস্কারবশত দেখতে পান না, মানুষের আপন অহিতবুদ্ধি তাঁদেরও দেবতার ধারণাকে কিরকম নিদারুণভাবে অধিকার করতে পারে। অপ্‌দীক্ষা বা ব্যাপ্‌টিজ্‌ম্ হবার পূর্বে কোনো শিশুর মৃত্যু হলে যে সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রমতে তার অনন্ত নরকবাস বিহিত হতে পারে সেই শাস্ত্রমতে দেবচরিত্রে যে অপরিসীম নির্দয়তার আরোপ করা হয় তার তুলনা কোথায় আছে। বস্তুত, যে-কোনো পাপের প্রসঙ্গেই হোক, অনন্ত-নরকের কল্পনা হিংস্রবুদ্ধির চরম প্রকাশ। য়ুরোপে মধ্যযুগে শাস্ত্রগত ধর্মবিশ্বাসকে অবিচলিত রাখবার জন্যে যে বিজ্ঞানবিদ্বেষী ও ধর্মবিরুদ্ধ উৎপীড়ন আচরিত তার ভিত্তি এইখানে। সেই নরকের আদর্শ সভ্যমানুষের জেলখানায় আজও বিভীষিকা বিস্তার করে আছে। সেখানে শোধন করবার নীতি নেই, আছে শাসন করবার হিংস্রতা।

মনুষ্যত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেবতার উপলব্ধি মোহমুক্ত হতে থাকে, অন্তত হওয়া উচিত। হয় না যে তার কারণ, ধর্মসম্বন্ধীয় সব-কিছুকেই আমরা নিত্য বলে ধরে নিয়েছি। ভুলে যাই যে, ধর্মের নিত্য আদর্শকে শ্রদ্ধা করি বলেই ধর্মমতকেও নিত্য বলে স্বীকার করতে হবে এমন কথা বলা চলে না। ভৌতিক বিজ্ঞানের মূলে নিত্য সত্য আছে বলেই বৈজ্ঞানিক মতমাত্রই নিত্য, এমন গোঁড়ামির কথা যদি বলি তা হলে আজও বলতে হবে, সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণত এই ভুলই ঘটে; সম্প্রদায় আপন মতকেই বলে ধর্ম, আর ধর্মকেই করে আঘাত। তার পরে যে বিবাদ, যে নির্দয়তা, যে বুদ্ধিবিচারহীন অন্ধসংস্কারের প্রবর্তন হয় মানুষের জীবনে আর-কোনো বিভাগে তার তুলনাই পাওয়া যায় না।

এ কথা মানতে হবে, ভুল মত মানুষেরই আছে, জন্তুর নেই। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত ভুল মতবাদের উদ্ভব হচ্ছে, যেহেতু মানুষের একটা দুর্নিবার সমগ্রতার বোধ আছে। কোনো-একটা তথ্য যখন স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্নভাবে তার সামনে আসে তখন তাকেই সম্যক্ বলে সে স্বীকার করে নিতে পারে না। তাকে পূর্ণ করবার আগ্রহে কল্পনার আশ্রয় নেয়। সেই কল্পনা প্রকৃতিভেদে মূঢ় বা প্রাজ্ঞ, সুন্দর বা

কুৎসিৎ, নিষ্ঠুর বা সকরুণ, নানাপ্রকার হতে পারে। কিন্তু, মূল কথাটা হচ্ছে, তার এই বিশ্বাস যে, প্রত্যক্ষ বিচ্ছিন্নতাকে পরিপূর্ণ করে আছে অপ্রত্যক্ষ নিখিলতার সত্য। সমগ্রকে উপলব্ধি করবার যে প্রেরণা আছে তার মনে সেই তার ভূমার বোধ।

মানুষ অন্তরে বাহিরে অনুভব করে, সে আছে একটি নিখিলের মধ্যে। সেই নিখিলের সঙ্গে সচেতন সচেষ্ট যোগসাধনের দ্বারাই সে আপনাকে সত্য করে জানতে থাকে। বাহিরের যোগে তার সমৃদ্ধি ভিতরের যোগে তার সার্থকতা।

আমাদের ভৌতিক দেহ স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। পৃথিবীর মাটি জল বাতাস উত্তাপ, পৃথিবীর ওজন আয়তন গতি, সমস্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যে এই শরীর; কোথাও তার সঙ্গে এর একান্ত ছেদ নেই। বলা যেতে পারে, পৃথিবী মানুষের পরম দেহ; সাধনার দ্বারা, যোগবিস্তারের দ্বারা এই বিরাটকে মানুষ আপন করে তুলছে, বড়ো দেহের মধ্যে ছোটো দেহকে প্রসারিত করছে, বিশ্বভৌতিক শক্তিকে আয়ত্ত করে পরিমিত দেহের কর্মশক্তিকে পরিপূর্ণ করেছে, চোখ স্পষ্টতর করে দেখছে সুদূরস্থ মহীয়ান ও নিকটস্থ কনীয়ানকে, দুই হাত পাচ্ছে বহুসহস্র হাতের শক্তি, দেশের দূরত্ব সংকীর্ণ হয়ে আমাদের দেহের নিকটবর্তী হচ্ছে। একদিন সমস্ত ভৌতিক শক্তি দেহশক্তির পরিশিষ্ট হয়ে উঠবে, মানুষের এই সংকল্প।

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোঁকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

এই বাণীকে নিজের মধ্যে সার্থক করবে সেই স্পর্ধা নিয়ে মানুষ অগ্রসর। একেবারে নতুন-কিছু উদ্ভাবন করবে তা নয়, নিজের দেহশক্তির সঙ্গে বিরাট ভৌতিক শক্তির সংযোগকে উত্তরতর করে তুলবে।

মনে করা যাক, সবই হল, ভৌতিক শক্তির পূর্ণতাই ঘটল। তবু কি মানুষ বলতে ছাড়বে 'ততঃ কিম্'। রামায়ণে বর্ণিত দশাননের শরীরে মানবের স্বভাবসিদ্ধ দেহশক্তি বহুগুণিত হয়েছিল, দশ দিক থেকে আহরিত ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়েছিল স্বর্ণলঙ্কাপুরী। কিন্তু মহাকাব্যে শেষ জায়গাটা সে পেল না। তার পরাভব হল রামচন্দ্রের কাছে। অর্থাৎ, বাহিরে যে দরিদ্র, আত্মায় যে ঐশ্বর্যবান, তার কাছে। সংসারে এই পরাভব আমরা যে সর্বদা প্রত্যক্ষ করে থাকি তা নয়, অনেক সময়ে তার বিপরীত দেখি; তবু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ একে পরাভব বলে। মানুষের আর-একটা গূঢ় জগৎ আছে, সেই-খানেই এই পরাভবের অর্থ পাওয়া যায়। সেই হল তার আত্মার জগৎ।

আপন সত্তার পরিচয়ে মানুষের ভাষায় দুটি নাম আছে। একটি অহং, আর-একটি আত্মা। প্রদীপের সঙ্গে একটিকে তুলনা করা যায়, আর-একটিকে শিখার

সঙ্গে। প্রদীপ আপনার তেল সংগ্রহ করে। আপনার উপাদান নিয়ে প্রদীপের বাজার-দর, কোনোটার দর সোনার, কোনোটার মাটির। শিখা আপনাকেই প্রকাশ করে, এবং তারই প্রকাশে আর-সমস্তও প্রকাশিত। প্রদীপের সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে সে প্রবেশ করে নিখিলের মধ্যে।

মানুষের আলো জ্বালায় তার আত্মা, তখন ছোটো হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহংকার। জ্ঞানে প্রেমে ভাবে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তি-দ্বারাই সার্থক হয় সেই আত্মা। সেই যোগের বাধাতেই তার অপকর্ষ। জ্ঞানের যোগে বিকার ঘটায় মোহ, ভাবের যোগে অহংকার, কর্মের যোগে লোভ স্বার্থপরতা। ভৌতিক বিশ্বে সত্য আপন সর্বব্যাপক ঐক্য প্রমাণ করে, সেই ঐক্য-উপলব্ধিতে আনন্দিত হয় বৈজ্ঞানিক। তেমনি আত্মার আনন্দ আত্মিক ঐক্যকে উপলব্ধি-দ্বারা ; যে আত্মার সম্বন্ধে উপনিষদ বলছেন তমেবৈকং জানথ আত্মানম্— সেই আত্মাকে জানো, সেই একেকে, যাকে সকল আত্মার মধ্যে এক করে জানলে সত্যকে জানা হয়। প্রার্থনামন্ত্রে আছে য একঃ, যিনি এক, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, শুভবুদ্ধির দ্বারা তিনি আমাদের সকলকে এক করে দিন। যে বুদ্ধিতে আমরা সকলে মিলি সেই বুদ্ধিই শুভবুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই আত্মার। যথৈবাত্মা পরস্তদ্বদ্ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। আপনার মতো করে পরকে দেখার ইচ্ছাকেই বলে শুভ-ইচ্ছা, সিদ্ধিলোভেও শুভ নয়, পুণ্যলোভেও শুভ নয়। পরের মধ্যে আপন চৈতন্যের প্রসারণেই শুভ, কেননা পরম মানবাত্মার মধ্যেই আত্মা সত্য।

সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ— যেহেতু ভগবান সর্বগত, সকলকে নিয়ে আছেন, সেইজন্যেই তিনি শিব। সমগ্রের মধ্যেই শিব, শিব ঐক্যবন্ধনে। আচারীরা সামাজিক কৃত্রিম বিধির দ্বারা যখন খণ্ডতার সৃষ্টি করে তখন কল্যাণকে হারায়, তার পরিবর্তে যে কাল্পনিক পদার্থ দিয়ে আপনাকে ভোলায় তার নাম দিয়েছে পুণ্য। সেই পুণ্য আর যাই হোক সে শিব নয়। সেই সমাজবিধি আত্মার ধর্মকে পীড়িত করে। স্বলক্ষণস্তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। আত্মার লক্ষণকে যে জানে সেই মুনি শ্রেষ্ঠ। আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, যে শুভবুদ্ধিতে সকলকে এক করে।

পৃথিবী আপনাতে আপনি আবর্তিত, আবার বৃহৎ কক্ষপথে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। মানুষের সমাজেও যা-কিছু চলছে সেও এই দুইরকমের বেগে। এক দিকে ব্যক্তিগত আমি'র টানে ধনসম্পদপ্রভুত্বের আয়োজন পুঞ্জিত হয়ে উঠছে, আর-এক দিকে অমিতমানবের প্রেরণায় পরস্পরের সঙ্গে তার কর্মের যোগ, তার আনন্দের যোগ, পরস্পরের উদ্দেশে ত্যাগ। এইখানে আত্মার লক্ষণকে স্বীকার করার দ্বারাই তার

শ্রেষ্ঠতার উপলব্ধি। উভয়ের মধ্যে পাশাপাশি কিরকম বিপরীত অসংগতি দেখা যায় একটা তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

কয়েক বৎসর পূর্বে লণ্ডনের টাইম্‌স্‌ পত্রে একটি সংবাদ বেরিয়েছিল, আমেরিকার নেশন পত্র থেকে তার বিবরণ পেয়েছি। বায়ুপোতে চড়ে ব্রিটিশ বায়ুনাবিকসৈন্য আফগানিস্থানে মাহ্‌সুদ্‌ গ্রাম ধ্বংস করতে লেগেছিল; শতঘ্নীবর্ষিণী একটা বায়ুতরী বিকল হয়ে গ্রামের মাঝখানে গেল পড়ে। একজন আফগান মেয়ে নাবিকদের নিয়ে গেল নিকটবর্তী গুহার মধ্যে, একজন মালিক তাদের রক্ষার জন্যে গুহার দ্বার আগলিয়ে রইল। চল্লিশজন ছুরি আস্ফালন করে তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত, মালিক তাদের ঠেকিয়ে রাখলে। তখনো উপর থেকে বোমা পড়ছে, ভিড়ের লোক ঠেলাঠেলি করছে গুহায় আশ্রয় নেবার জন্যে। নিকটবর্তী স্থানের অন্য কয়েকজন মালিক এবং একজন মোল্লা এদের আনুকূল্যে প্রবৃত্ত হল। মেয়েরা কেউ কেউ নিলে এদের আহারের ভার। অবশেষে কিছুদিন পরে মাহ্‌সুদের ছদ্মবেশ পরিয়ে এরা তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিল।

এই ঘটনার মধ্যে মানবস্বভাবের দুই বিপরীত দিক চূড়ান্তভাবেই দেখা দিয়েছে। এরোপ্লেন থেকে বোমাবর্ষণে দেখা যায় মানুষের শক্তির আশ্চর্য সমৃদ্ধি, ভূতল থেকে নভস্তল পর্যন্ত তার সশস্ত্র বাহুর বিপুল বিস্তার। আবার হননে-প্রবৃত্ত শত্রুকে ক্ষমা করে তাকে রক্ষা করতে পারল, মানুষের এই আর-এক পরিচয়। শত্রুহননের সহজ প্রবৃত্তি মানুষের জীবধর্মে, তাকে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ অদ্ভুত কথা বললে, "শত্রুকে ক্ষমা করো।" এ কথাটা জীবধর্মের হানিকর, কিন্তু মানবধর্মের উৎকর্ষলক্ষণ।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বলে, যুদ্ধকালে যে মানুষ রথে নেই, যে আছে ভূতলে, রথী তাকে মারবে না! যে ক্লীব, যে কৃতাঞ্জলি, যে মুক্তকেশ, যে আসীন, যে সান্ত্বনয়ে বলে 'আমি তোমারই', তাকেও মারবে না। যে ঘুমচ্ছে, যে বর্মহীন, যে নগ্ন, যে নিরস্ত্র, যে অযুধ্যমান, যে যুদ্ধ দেখছে মাত্র, যে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তাকেও মারবে না। যার অস্ত্র গেছে ভেঙে, যে শোকার্ত, যে পরিক্ষত, ভীত, যে পরাবৃত্ত, সতের ধর্ম অনুসরণ করে তাকেও মারবে না।

সতের ধর্ম বলতে বোঝায় মানুষের মধ্যে যে সত্য তারই ধর্ম, মানুষের মধ্যে যে মহৎ তাঁরই ধর্ম। যুদ্ধ করতে গিয়ে মানুষ যদি তাঁকে অস্বীকার করে তবে ছোটো দিকে তার জিত হলেও বড়ো দিকে তার হার। উপকরণের দিকে তার সিদ্ধি, অমৃতের দিকে সে বঞ্চিত; এই অমৃতের আদর্শ মাপজোখের বাইরে।

স্বর্ণলঙ্কার মাপজোখ চলে। দশাননের মুণ্ড ও হাত গণনা করে বিস্মিত হবার কথা। তার অক্ষৌহিণী সেনারও সংখ্যা আছে, জয়বিস্তারের পরিধি-দ্বারা সেই সেনার

শক্তিও পরিমেয়। আত্মার মহিমার পরিমাণ নেই। শত্রুকে নিধনের পরিমাপ আছে, শত্রুকে ক্ষমার পরিমাপ নেই। আত্মা যে মহার্ঘতায় আপন পরিচয় দেয় ও পরিচয় পায় সেই পরিচয়ের সত্য কি বিরাজ করে না অপরিমেয়ের মধ্যে, যাকে অথর্ববেদ বলেছেন সকল সীমার উদ্‌বৃত্ত, সকল শেষের উৎশেষ। সে কি এমন একটি স্বয়ম্ভূব বুদ্‌বুদ্‌ কোনো সমুদ্রের সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই। মানুষের কাছে শুনেছি, ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ— তোমার প্রতি পাপ যে করে তার প্রতি ফিরে পাপ কোরো না। কথাটাকে ব্যবহারে ব্যক্তিবিশেষ মানে বা নাই মানে, তবু মন তাকে পাগলের প্রলাপ বলে হেসে ওঠে না। মানুষের জীবনে এর স্বীকৃতি দৈবাৎ দেখি, প্রায় দেখি বিরুদ্ধতা, অর্থাৎ মাথা গনতি করে এর সত্য চোখে পড়ে না বললেই হয়। তবে এর সত্যতা কোন্‌খানে। মানুষের যে স্বভাবে এটা আছে তার আশ্রয় কোথায়। মানুষ এ প্রশ্নের কী উত্তর দিয়েছে শুনি।

যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ
তেন সর্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্বিকৃতিশ্চ যা।

আত্মা যার পাপ থেকে বিরত ও কল্যাণে নিবিষ্ট তিনি সমস্তকে বুঝেছেন। তাই তিনি জানেন কোন্‌টা স্বভাবসিদ্ধ, কোন্‌টা স্বভাববিরুদ্ধ।

মানুষ আপনার স্বভাবকে তখনই জানে যখন পাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে কল্যাণের অর্থাৎ সর্বজনের হিতসাধনা করে। অর্থাৎ মানুষের স্বভাবকে জানে মানুষের মধ্যে যারা মহাপুরুষ। জানে কী করে। তেন সর্বমিদং বুদ্ধম্‌। স্বচ্ছ মন নিয়ে সমস্তটাকে সে বোঝে। সত্য আছে, শিব আছে সমগ্রের মধ্যে। যে পাপ অহংসীমাবদ্ধ স্বভাবের তার থেকে বিরত হলে তবে মানুষ আপনার আত্মিক সমগ্রকে জানে, তখনই জানে আপনার প্রকৃতি। তার এই প্রকৃতি কেবল আপনাকে নিয়ে নয়, তাঁকেই নিয়ে যাঁকে গীতা বলছেন : তিনিই পৌরুষং নৃষু, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব। মানুষ এই পৌরুষের প্রতিই লক্ষ করে বলতে পারে, ধর্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্‌। মৃত্যুতে সেই পৌরুষকে সে প্রমাণ করে যা তার দেবত্বের লক্ষণ, যা মৃত্যুর অতীত।

শ্রেয় প্রেয় নিয়ে এতক্ষণ যা বলা হল সেটা সমাজস্থিতির দিক দিয়ে নয়। নিন্দা-প্রশংসার ভিত্তিতে পাকা করে গেঁথে, শাসনের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা, আত্মরক্ষার উদ্দেশে সমাজ যে ব্যবস্থা করে থাকে তাতে চিরন্তন শ্রেয়োধর্ম গৌণ, প্রথাঘটিত সমাজ-রক্ষাই মুখ্য। তাই এমন কথা শোনা যায়, শ্রেয়োধর্মকে বিশুদ্ধভাবে সমাজে প্রবর্তন করা ক্ষতিকর। প্রায়ই বলা হয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে ভূরিপরিমাণ মূঢ়তা আছে, এই-জন্যে অনিষ্ট থেকে ঠেকিয়ে রাখতে হলে মোহের দ্বারাও তাদের মন ভোলানো চাই,

মিথ্যা উপায়েও তাদের ভয় দেখানো বা সান্ত্বনা দেওয়া দরকার, তাদের সঙ্গে এমন ভাবে ব্যবহার করা দরকার যেন তারা চিরশিশু বা চিরপশু। ধর্মসম্প্রদায়েও যেমন সমাজেও তেমনি, কোনো এক পূর্বতনকালে যে-সমস্ত মত ও প্রথা প্রচলিত ছিল সেগুলি পরবর্তীকালেও আপন অধিকার ছাড়তে চায় না। পতঙ্গমহলে দেখা যায়, কোনো কোনো নিরীহ পতঙ্গ ভীষণ পতঙ্গের ছদ্মবেশে নিজেকে বাঁচায়। সমাজরীতিও তেমনি। তা নিত্যধর্মের ছদ্মবেশে আপনাকে প্রবল ও স্থায়ী করতে চেষ্টা করে। এক দিকে তার পবিত্রতার বাহ্যাড়ম্বর, অন্য দিকে পারত্রিক দুর্গতির বিভীষিকা, সেই সঙ্গে সম্মিলিত শাসনের নানাবিধ কঠোর, এমন-কি অন্যায় প্রণালী— ঘর-গড়া নরকের তর্জনী-সংকেতে নিরর্থক অন্ধ আচারের প্রবর্তন। রাষ্ট্রতন্ত্রে এই বুদ্ধিরই প্রতীক আণ্ডামান, ফ্রান্সের ডেভিল আইলান্ড্, ইটালির লিপারি দ্বীপ। এদের ভিতরের কথা এই যে, বিশুদ্ধ শ্রেয়োনীতি ও লোকস্থিতি এক তালে চলতে পারে না। এই বুদ্ধির সঙ্গে চিরদিনই তাঁদের লড়াই চলে এসেছে যাঁরা সত্যকে শ্রেয়কে মনুষ্যত্বকে চরম লক্ষ্য বলে শ্রদ্ধা করেন।

রাজ্যের বা সমাজের উপযোগিতারূপে শ্রেয়ের মূল্যবিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। শ্রেয়কে মানুষ যে স্বীকার করেছে, সেই স্বীকৃতির আশ্রয় কোথায়, সত্য কোথায়, সেইটেই আমার আলোচ্য। রাজ্যে সমাজে নানাপ্রকার স্বার্থসাধনের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের ব্যবহারে তার প্রতিবাদ পদে পদে, তবুও আত্মপরিচয়ে মানুষ তাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছে, তাকেই বলেছে ধর্ম অর্থাৎ নিজের চরম স্বভাব ; শ্রেয়ের আদর্শ সম্বন্ধে দেশকালপাত্রভেদে যথেষ্ট মতভেদ সত্ত্বেও সেই শ্রেয়ের সত্যকে সকল মানুষই শ্রদ্ধা করেছে, এইটেতে মানুষের ধর্মের কোন্ স্বরূপ প্রমাণিত হয় সেইটে আমি বিচার করেছি। 'হয়' এবং 'হওয়া উচিত' এই দ্বন্দ্ব মানব-ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকেই প্রবলবেগে চলছে, তার কারণ বিচার করতে গিয়ে বলেছি— মানুষের অন্তরে এক দিকে পরমমানব, আর-এক দিকে স্বার্থসীমাবদ্ধ জীবমানব, এই উভয়ের সামঞ্জস্য-চেষ্টাই মানবের মনের নানা অবস্থা-অনুসারে নানা আকারে প্রকারে ধর্মতন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত। নইলে কেবল সুবিধা-অসুবিধা প্রিয়-অপ্রিয় প্রবল থাকত জৈবিক ক্ষেত্রে জীবধর্মে ; পাপ-পুণ্য কল্যাণ-অকল্যাণের কোনো অর্থই থাকত না।

মানুষের এই-যে কল্যাণের মতি এর সত্য কোথায়। ক্ষুধাতৃষ্ণার মতো প্রথম থেকেই আমাদের মনে তার বোধ যদি পূর্ণ থাকত তা হলে তার সাধনা করতে হত না। বলব, বিশ্বমানবমনে আছে। কিন্তু, সকল মানুষের মন সমষ্টিভূত হয়ে বিশ্বমানবমনের মহাদেশ সৃষ্ট, এ কথা বলব না। ব্যক্তিমন বিশ্বমনে আশ্রিত কিন্তু ব্যক্তি-

মনের যোগফল বিশ্বমন নয়। তাই যদি হত তা হলে যা আছে তাই হত একান্ত, যা হতে পারে তার জায়গা পাওয়া যেত না। অথচ, যা হয় নি, যা হতে পারে, মানুষের ইতিহাসে তারই জোর তারই দাবি বেশি। তারই আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার হয়ে মানুষের সভ্যতাকে যুগে যুগে বর্তমানের সীমা পার করিয়ে দিচ্ছে। সেই আকাঙ্ক্ষা শিথিল হলেই সত্যের অভাবে সমাজ শ্রীহীন হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, আমার ব্যক্তিগত মনে সুখদুঃখের যে অনুভূতি সেটা বিশ্বমনের মধ্যেও সত্য কি না। ভেবে দেখলে দেখা যায়, অহংসীমার মধ্যে যে সুখদুঃখ আত্মার সীমায় তার রূপান্তর ঘটে। যে মানুষ সত্যের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছে, দেশের জন্যে, লোকহিতের জন্যে— বৃহৎ ভূমিকায় যে নিজেকে দেখেছে, ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অর্থ তার কাছে উলটো হয়ে গেছে। সে মানুষ সহজেই সুখকে ত্যাগ করতে পারে এবং দুঃখকে স্বীকার করে দুঃখকে অতিক্রম করে। স্বার্থের জীবনযাত্রায় সুখদুঃখের ভার গুরুতর, মানুষ স্বার্থকে যখন ছাড়িয়ে যায় তখন তার ভার এত হালকা হয়ে যায় যে, তখন পরম দুঃখের মধ্যে তার সহিষ্ণুতাকে, পরম অপমানের আঘাতে তার ক্ষমাকে, অলৌকিক বলে মনে হয়। আপনাকে বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য, অহংসীমায় অবরুদ্ধ জানাই অসত্য। ব্যক্তিগত দুঃখ এই অসত্যে।

আমরা দুঃখকে যে ভাবে দেখি বৃহতের মধ্যে সে ভাব থাকতে পারে না, যদি থাকত তা হলে সেখানে দুঃখের লাঘব বা অবসান হত না। সংগীতের অসম্পূর্ণতায় বিস্তর বেসুর আছে, সেই বেসুরের একটিও থাকতে পারে না সম্পূর্ণ সংগীতে— সেই সম্পূর্ণ সংগীতের দিকে যতই যাওয়া যায় ততই বেসুরের হ্রাস হতে থাকে। বেসুর আমাদের পীড়া দেয়, যদি না দিত তা হলে সুরের দিকে আমাদের যাত্রা এগোত না। তাই বিরাটকে বলি রুদ্র, তিনি মুক্তির দিকে আকর্ষণ করেন দুঃখের পথে। অপূর্ণতাকে ক্ষয় করার দ্বারা পূর্ণের সঙ্গে মিলন বিশুদ্ধ আনন্দময় হবে, এই অভিপ্রায় আছে বিশ্বমানবের মধ্যে। তাঁর প্রতি প্রেমকে জাগরিত করে তাঁরই প্রেমকে সার্থক করব, যুগে যুগে এই প্রতীক্ষার আহ্বান আসছে আমাদের কাছে।

সেই আহ্বানের আকর্ষণে মানুষ বেরিয়ে পড়েছে অজানার দিকে, এই যাত্রার ইতিহাসই তার ইতিহাস। তার চলার পথপার্শ্বে কত সাম্রাজ্য উঠল এবং পড়ল, ধনসম্পদ হল স্তূপীকৃত, আবার গেল মিলিয়ে ধুলোর মধ্যে। তার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্যে কত প্রতিমা সে গড়ে তুললে, আবার ভেঙে দিয়ে গেল, বয়স পেরিয়ে ছেলেবেলাকার খেলনার মতো। কত মায়ামন্ত্রের চাবি বানাবার চেষ্টা করলে— তাই দিয়ে খুলতে চেয়েছিল প্রকৃতির রহস্যভাণ্ডার, আবার সমস্ত ফেলে দিয়ে নূতন করে

খুঁজতে বেরিয়েছে গহনে প্রবেশের গোপন পথ। এমনি করে তার ইতিবৃত্তে এক যুগের পর আর-এক যুগ আসছে— মানুষ অশ্রান্ত যাত্রা করেছে অন্নবস্ত্রের জন্যে নয়, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে, আপনার জটিল বাধার থেকে আপনার অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে; সেই সত্য যা তার পুঞ্জিত দ্রব্যভারের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত কৃতকর্মের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত প্রথা মত বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো, যার মৃত্যু নেই, যার ক্ষয় নেই। প্রভূত হয়েছে মানুষের ভুলভ্রান্তি নিষ্ফলতা, পথে পথে তারা প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপরূপে ছড়িয়ে আছে; মানুষের দুঃখব্যথার আঘাত হয়েছে অপরিসীম, তার অবরুদ্ধ সার্থকতার শৃঙ্খল ছেদনে কঠিন অধ্যবসায়; এ-সমস্ত এক মুহূর্তও কে সহ্য করতে পারত, মানুষের অন্তরবাসী ভূমার মধ্যে যদি এর চিরন্তন কোনো অর্থ না থাকত। মানুষের সকল দুঃখের উপরকার কথা এই যে— মানুষ আপন চৈতন্যকে প্রসারিত করছে আপন অসীমের দিকে, জ্ঞানে প্রেমে কর্মে বৃহত্তর ঐক্যকে আয়ত্ত করতে চলেছে আপনার সকল মহৎ কীর্তিতে, তাঁর নিকটতর সামীপ্য পাবার জন্যে ব্যগ্র বাহু বাড়িয়েছে যাঁকে তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। মানুষ হয়ে জন্মলাভ করে আরাম চাইবে কে, বিশ্রাম পাব কোথায়। মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে, এই-যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি— তারি মাঝে যাব অভিসারে
তারি কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে,
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছে সে সর্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন

শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্বপ্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোমহুতাশন।

শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর।

তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ।

শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক।

তিন

বৃহদারণ্যকে একটি আশ্চর্য বাণী আছে—

অথ যোঽন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে অন্যোঽসৌ অন্যোঽহম্ অস্মীতি
ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্।

যে মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে সেই 'দেবতা অন্য আর আমি অন্য' এমন কথা ভাবে সে তো দেবতাদের পশুর মতোই।

অর্থাৎ, সেই দেবতার কল্পনা মানুষকে আপনার বাইরে বন্দী করে রাখে; তখন মানুষ আপন দেবতার দ্বারাই আপন আত্মা হতে নির্বাসিত, অপমানিত।

এই যেমন শোনা গেল উপনিষদে আবার সেই কথাই আপন ভাষায় বলছে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল। সে আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকে বলে মনের মানুষ। বলে, "মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।"

মানুষের ইতিহাসে এমন অনেক ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে যারা কাঠ-পাথর-পূজাকে

বলেছে হীনতা এবং তাই নিয়ে তারা মারকাট করতে ছোটে। স্বীকার করি, কাঠ-পাথর বাইরের জিনিস, সেখানে সর্বকালের সর্বমানুষের পূজা মিলতে পারে না। মানুষের ভক্তিকে জাতিতে জাতিতে প্রথায় প্রথায় সেই পূজা বিচ্ছিন্ন করে, তার ঐতিহাসিক গণ্ডীগুলি সংকীর্ণ।

কিন্তু, তাদের বিরুদ্ধ-সম্প্রদায়েরও দেবতা প্রতিমার মতোই বাইরে অবস্থিত, নানা-প্রকার অমানুষিক বিশেষণে লক্ষণে সজ্জিত, শুধু তাই নয়, বিশেষ জাতির ঐতিহাসিক কার্যকলাপে জড়িত ও কাল্পনিক কাহিনী দ্বারা দৈশিক ও কালিক বিশেষত্ব-গ্রস্ত। এই পৌত্তলিকতা সূক্ষ্মতর উপাদানে রচিত বলেই নিজেকে অপৌত্তলিক বলে গর্ব করে। বৃহদারণ্যক এই বাহ্যিকতাকেও হীন বলে নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, যে দেবতাকে আমার থেকে পৃথক করে বাইরে স্থাপন করি তাঁকে স্বীকার করার দ্বারাই নিজেকে নিজের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিই।

এমনতরো কথায় একটা ক্রুদ্ধ কলরব উঠতে পারে। তবে কি মানুষ নিজেকে নিজেই পূজা করবে। নিজেকে ভক্তি করা কি সম্ভব। তা হলে পূজা-ব্যাপারকে তো বলতে হবে অহংকারের বিপুলীকরণ।

একেবারে উলটো। অহংকে নিয়েই অহংকার। সে তো পশুও করে। অহং থেকে বিযুক্ত আত্মায় ভূমার উপলব্ধি একমাত্র মানুষের পক্ষেই সাধ্য। কেননা মানুষের পক্ষে তাই সত্য। ভূমা— আহারে বিহারে আচারে বিচারে ভোগে নৈবেদ্যে মন্ত্রে তন্ত্রে নয়। ভূমা— বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পূজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ-পালনে উপাসনা করা সহজ, কিন্তু আপনার চিন্তায়, আপনার কর্মে, পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সব চেয়ে কঠিন সাধনা। সেইজন্যেই কথিত আছে, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। তারা সত্যকে অন্তরে পায় না যারা অন্তরে দুর্বল। অহংকারকে দূর করতে হয়, তবেই অহংকে পেরিয়ে আত্মাতে পৌঁছতে পারি।

য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।

আমার মধ্যে যে মহান আত্মা আছেন, যিনি জরামৃত্যুশোক-ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, যিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে, তাঁকে জানতে হবে।

"মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।" এই-যে তাঁকে সন্ধান করা, তাঁকে জানা, এ তো বাইরে জানা, বাইরে পাওয়া নয়; এ যে আপন অন্তরে আপনি হওয়ার দ্বারা জানা, হওয়ার দ্বারা পাওয়া।

প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ— যুক্তিতর্কের যোগে বাহ্যজ্ঞানের বিষয়কে যেমন করে জানি এ তো তেমন করে জানা নয়, অন্তরে হওয়ার দ্বারা জানা। নদী সমুদ্রকে পায় যেমন করে, প্রতিক্ষণেই সমুদ্র হতে হতে। এক দিকে সে ছোটো নদী, আর-এক দিকে সে বৃহৎ সমুদ্র। সেই হওয়া তার পক্ষে সম্ভব, কেননা সমুদ্রের সঙ্গে তার স্বাভাবিক ঐক্য; বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে সেই ঐক্য। জীবধর্ম যেন উঁচু পাড়ির মতো জন্তুদের চেতনাকে ঘিরে আটক করেছে। মানুষের আত্মা জীবধর্মের পাড়ির ভিতর দিয়ে তাকে কেবলই পেরিয়ে চলেছে, মিলেছে আত্মার মহাসাগরে, সেই সাগরের যোগে সে জেনেছে আপনাকে। যেমন নদী পায় আপনাকে যখন সে বৃহৎ জলরাশিকে আপন করে; নইলে সে থাকে বদ্ধ হয়ে, বিল হয়ে, জলা হয়ে। তাই বাউল মানুষকে বলেছে, "তোরই ভিতর অতল সাগর।" পূর্বেই বলেছি; মানুষ আপন ব্যক্তিগত সংস্কারকে পার হয়ে যে জ্ঞানকে পায়, যাকে বলে বিজ্ঞান, সেই জ্ঞান নিখিল মানবের, তাকে সকল মানুষই স্বীকার করবে, সেইজন্যে তা শ্রদ্ধেয়। তেমনি মানুষের মধ্যে স্বার্থগত আমির চেয়ে যে বড়ো আমি সেই-আমির সঙ্গে সকলের ঐক্য, তার কর্ম সকলের কর্ম। একলা আমির কর্মই বন্ধন, সকল আমির কর্ম মুক্তি। আমাদের বাংলাদেশের বাউল বলেছে—

মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।
একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্বঠাঁই।

সেই মনের মানুষ সকল মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া হয়। এই কথাই উপনিষদ বলেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। বলেছেন, তং বেদ্যং পুরুষং বেদ— যিনি বেদনীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানো; অন্তরে আপনার বেদনায় যাঁকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনায় জানো, জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়।

আমাদের শাস্ত্রে সোঽহম্ বলে যে তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে তা যত বড়ো অহংকারের মতো শুনতে হয় আসলে তা নয়। এতে ছোটোকে বড়ো বলা হয় নি, এতে সত্যকে ব্যাপক বলা হয়েছে। আমার যে ব্যক্তিগত আমি তাকে ব্যাপ্ত করে আছে বিশ্বগত আমি। মাথায় জটা ধারণ করলে, গায়ে ছাই মাখলে, বা মুখে এই শব্দ উচ্চারণ করলেই সোঽহম্-সত্যকে প্রকাশ করা হল, এমন কথা যে মনে করে সেই অহংকৃত। যে আমি সকলের সেই আমিই আমারও এটা সত্য, কিন্তু এই সত্যকে আপন করাই মানুষের সাধনা। মানুষের ইতিহাসে চিরকাল এই সাধনাই নানা রূপে নানা নামে নানা সংকল্পের মধ্য দিয়ে চলেছে। যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার বলে সকলের মধ্যে জানা যে পরিমাণে আমাদের জীবনে,

আমাদের সমাজে উপলব্ধ হচ্ছে সেই পরিমাণেই আমরা সত্য মানুষ হয়ে উঠছি। মানুষের রিপু মাঝখানে এসে এই সোঽহম্‌-উপলব্ধিকে দুই ভাগ করে দেয়, একান্ত হয়ে ওঠে অহম্‌।

তাই উপনিষদ বলেন, মা গৃধঃ— লোভ কোরো না। লোভ বিশ্বের মানুষকে ভুলিয়ে বৈষয়িক মানুষ করে দেয়। যে ভোগ মানুষের যোগ্য তা সকলকে নিয়ে, তা বিশ্বভৌমিক, তা মানুষের সাহিত্যে আছে, শিল্পকলায় আছে, তাই প্রকাশ পায় মানুষের সংসারযাত্রায় তার হৃদয়ের আতিথ্যে। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলে, অতিথি-দেবো ভব। কেননা 'আমার ভোগ সকলের ভোগ' এই কথাটা অতিথিকে দিয়ে গৃহস্থ স্বীকার করে; তার ঐশ্বর্যের সংকোচ দূর হয়। ব্যক্তিগত মানবের ঘরে সর্বমানবের প্রতিনিধি হয়ে আসে অতিথি, তার গৃহসীমাকে বিশ্বের দিকে নিয়ে যায়। না নিয়ে গেলে সেটা রাজপ্রাসাদের পক্ষেও দীনতা। এই আতিথ্যের মধ্যে আছে সোঽহংতত্ত্ব— অর্থাৎ, আমি তাঁর সঙ্গে এক যিনি আমার চেয়ে বড়ো। আমি তাঁর সঙ্গে মিলে আছি যিনি আমার এবং আমার অতিরিক্ত।

আমাদের দেশে এমন-সকল সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা সোঽহংতত্ত্বকে নিজের জীবনে অনুবাদ করে নেন নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্যে ও নির্মমতায়। তাঁরা দেহকে পীড়ন করেন জীবপ্রকৃতিকে লঙ্ঘন করবার জন্যে, মানুষের স্বাধীন দায়িত্বও ত্যাগ করেন মানব-প্রকৃতিকে অস্বীকার করবার স্পর্ধায়। তাঁরা অহংকে বর্জন করেন যে অহং বিষয়ে আসক্ত, আত্মাকেও অমান্য করেন যে আত্মা সকল আত্মার সঙ্গে যোগে যুক্ত। তাঁরা যাঁকে ভূমা বলেন তিনি উপনিষদে-উক্ত সেই ঈশ নন যিনি সকলকেই নিয়ে আছেন; তাঁদের ভূমা সব-কিছু হতে বর্জিত, সুতরাং তাঁর মধ্যে কর্মতত্ত্ব নেই। তাঁরা মানেন না তাঁকে যিনি পৌরুষং নৃষু, মানুষের মধ্যে যিনি মনুষ্যত্ব, যিনি বিশ্বকর্মা মহাত্মা, যাঁর কর্ম খণ্ডকর্ম নয়, যাঁর কর্ম বিশ্বকর্ম; যাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ— যাঁর মধ্যে জ্ঞানশক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক, যে স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তিকর্ম অন্তহীন দেশে কালে প্রকাশমান।

পূর্বেই বলেছি, মানুষের অভিব্যক্তির গতি অন্তরের দিকে। এই দিকে তার সীমার আবরণ খুলে যাবার পথ। একদা মানুষ ছিল বর্বর, সে ছিল পশুর মতো, তখন ভৌতিক জীবনের সীমায় তার মন তার কর্ম ছিল বদ্ধ। জ্বলে উঠল যখন ধীশক্তি তখন চৈতন্যের রশ্মি চলল সংকীর্ণ জীবনের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বভৌমিকতার দিকে। ভারতীয় মধ্যযুগের কবিস্মৃতি ভাণ্ডার সুহৃদ্‌ ক্ষিতিমোহনের কাছ থেকে কবি রজ্জবের একটি বাণী পেয়েছি। তিনি বলেছেন—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝূঁঠ।
জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ॥

সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে; রজ্জব বলছে, এই কথাই খাঁটি, এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই কর।

ভাষা থেকে বোঝা যাচ্ছে, রজ্জব বুঝেছেন, এ কথায় রাগ করবার লোকই সমাজে বিস্তর। তাদের মত ও প্রথার সঙ্গে বিশ্বসত্যের মিল হচ্ছে না, তবু তারা তাকে সত্য নাম দিয়ে জটিলতায় জড়িয়ে থাকে— মিল নেই বলেই এই নিয়ে তাদের উত্তেজনা উগ্রতা এত বেশি। রাগারাগির দ্বারা সত্যের প্রতিবাদ, অগ্নিশিখাকে ছুরী দিয়ে বেঁধবার চেষ্টার মতো। সেই ছুরী সত্যকে মারতে পারে না, মারে মানুষকে। তবু সেই বিভীষিকার সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝূঁঠ।

একদা যেদিন কোনো-একজন মাত্র বৈজ্ঞানিক বললেন, পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘুরছে, সেদিন সেই একজন মাত্র মানুষই বিশ্বমানুষের বুদ্ধিকে প্রকাশ করেছেন। সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় ক্রুদ্ধ; তারা ভয় দেখিয়ে জোর করে বলাতে চেয়েছে, সূর্যই পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে। তাদের সংখ্যা যতই বেশি হোক, তাদের গায়ের জোর যতই থাক্, তবু তারা প্রজ্ঞাকে অস্বীকার করবামাত্র চিরকালের মানবকে অস্বীকার করলে। সেদিন অসংখ্য বিরুদ্ধবাদীর মাঝখানে একলা দাঁড়িয়ে কে বলতে পেরেছে সোঽহং, অর্থাৎ, আমার জ্ঞান আর মানবভূমার জ্ঞান এক। তিনিই বলেছেন যাঁকে সেদিন বিপুল জনসংঘ সত্য প্রত্যাখ্যান করাবার জন্যে প্রাণান্তিক পীড়ন করেছিল।

যদি লক্ষ লক্ষ লোক বলে, কোটি যোজন দূরে কোনো বিশেষ গ্রহনক্ষত্রের সমবায়ে পৃথিবীর কোনো-একটি প্রদেশের জলধারায় এমন অভৌতিক জাদুশক্তির সঞ্চার হয় যাতে স্নানকারীর নিজের ও পূর্বপুরুষের আন্তরিক পাপ যায় ধুয়ে, তা হলে বলতেই হবে—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝূঁঠ।

বিশ্বের বুদ্ধি এ বুদ্ধির সঙ্গে মিলল না। কিন্তু যেখানে বলা হয়েছে, অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি— জল দিয়ে কেবল দেহেরই শোধন হয়, মনের শোধন হয় সত্যে, সেখানে বিশ্বমানবমনের সম্মতি পাওয়া যায়। কিংবা যেখানে বলা হয়েছে—

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্যাম্ পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥

পাপ করে সন্তপ্ত হলে সেই সন্তাপ থেকেই পাপের মোচন হয়, 'এমন কাজ আর করব

না' বলে নিবৃত্ত হলেই মানুষ পবিত্র হতে পারে— সেখানে এই বলাতেই মানুষ আপন বুদ্ধিতে স্বীকার করে বিশ্বমনের প্রজ্ঞাকে। তং হ দেবম্ আত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্— সেই দেবতাকে আমাদের আত্মায় জানি যিনি আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক। আমার মন আর বিশ্বমন একই, এই কথাই সত্যসাধনার মূলে, আর ভাষান্তরে এই কথাই সোঽহম্।

একদিন ব্রাহ্মণ রামানন্দ তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে চলে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন নাভা চণ্ডালকে, মুসলমান জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে। সেদিনকার সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করলে। কিন্তু, তিনি একলাই সেদিন সকলের চেয়ে বড়ো জাতিতে উঠেছিলেন যে জাতি নিখিল মানুষের। সেদিন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ধিক্‌কারের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে রামানন্দই বলেছিলেন সোঽহম্ ; সেই সত্যের শক্তিতেই তিনি পার হয়ে গিয়েছিলেন সেই ক্ষুদ্র সংস্কারগত ঘৃণাকে যা নিষ্ঠুর হয়ে মানুষে মানুষে ভেদ ঘটিয়ে সমাজস্থিতির নামে সমাজধর্মের মূলে আঘাত করে।

একদিন যিশুখৃস্ট বলেছিলেন, "সোঽহম্। আমি আর আমার পরমপিতা একই।" কেননা, তাঁর যে প্রীতি, যে কল্যাণবুদ্ধি সকল মানুষের প্রতি সমান প্রসারিত সেই প্রীতির আলোকেই আপন অহংসীমাকে ছাড়িয়ে পরমমানবের সঙ্গে তিনি আপন অভেদ দেখেছিলেন।

বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়াতে বসতে চলতে শুতে, যাবৎ নিদ্রিত না হবে, এই মৈত্রীস্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে— একেই বলে ব্রহ্মবিহার।

এতবড়ো উপদেশ মানুষকেই দেওয়া চলে। কেননা, মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে আছে সোঽহংতত্ত্ব। সে কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্য থেকেই জেনেছেন, তাই বলেছেন, অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।

অথর্ববেদ বলেন, তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে— যিনি বিদ্বান তিনি মানুষকে তার প্রত্যক্ষের অতীত বৃহৎ বলেই জানেন। সেইজন্যে তিনি তার কাছে প্রত্যাশা করতে পারেন দুঃসাধ্য কর্মকে, অপরিমিত ত্যাগকে। যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্— যাঁরা ভূমাকে জানেন মানুষে তাঁরা জানেন পরম দেবতাকেই। সেই মানবদেবতাকে মানুষের মধ্যে জেনেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব উপদেশ দিতে পেরেছিলেন—

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা এক পুত্তমনুরক্খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন আপন আয়ু ক্ষয় করেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাবে।

মাথা গ'ণে বলব না ক'জন এই উপদেশ পালন করতে পারে। সেই গণনায় নয় সত্যের বিচার।

মানুষের অসীমতা যিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় নি মাথা গোনবার। তিনি অসংকোচে মানুষের মহামানবকে আহ্বান করেছিলেন; বলেছিলেন, "অপরিমাণ ভালোবাসায় প্রকাশ করো আপনার অন্তরে ব্রহ্মকে।" এই বাণী অসংকোচে সকলকে শুনিয়ে তিনি মানুষকে শ্রদ্ধা করেছিলেন।

আমাদের দেশে এমন আত্মাবমাননার কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, সোঽহং-তত্ত্ব সকলের নয়, কেবল তাঁদেরই যাঁরা ক্ষণজন্মা। এই বলে মানুষের অধিকারকে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট -ভেদে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিশ্চেষ্ট নিকৃষ্টতাকে আরাম দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে যাদের অন্ত্যজ বলা হয় তারা যেমন নিজের হেয়তাকে নিশ্চল করে রাখতে কুণ্ঠিত হয় না তেমনি এ দেশে অগণ্য মানুষ আপন কনিষ্ঠ অধিকার নিঃসংকোচে মেনে নিয়ে মূঢ়তাকে, চিত্তের ও ব্যবহারের দীনতাকে, বিচিত্র আকারে প্রকাশ করতে বাধা পায় না। কিন্তু, মানুষ হয়ে জন্মেছি, ললাটের লিখনে নিয়ে এসেছি সোঽহম্— এই বাণীকে সার্থক করবার জন্যেই আমরা মানুষ। আমাদের একজনেরও অগৌরব সকল মানুষের গৌরব ক্ষুণ্ণ করবে। যে সেই আপন অধিকারকে খর্ব করে সে নিজের মধ্যে তাঁর অসম্মান করে যিনি কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী— যিনি সকলের কর্মের অধ্যক্ষ, সকলের যিনি অন্তরতম সাক্ষী, সকলের মধ্যে যাঁর বাস।

পূর্বেই দেখিয়েছি অথর্ববেদ বলেছেন, মানুষ প্রত্যক্ষত যা পরমার্থত তার চেয়ে বেশি, সে আছে অসীম উদ্‌বৃত্তের মধ্যে। সেই উদ্‌বৃত্তেই মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ।

স্থূলদ্রব্যময়ী এই পৃথিবী। তাকে বহুদূর অতিক্রম করে গেছে তার বায়ুমণ্ডল। সেই অদৃশ্য বায়ুলোকের ভিতর দিয়ে আসছে তার আলো, তার বর্ণচ্ছটা, বইছে তার প্রাণ, এরই উপর জমছে তার মেঘ, ঝরছে তার বারিধারা, এইখানকার প্রেরণাতেই তার অঙ্গে অঙ্গে রূপধারণ করছে পরমরহস্যময় সৌন্দর্য— এইখান থেকেই আসছে পৃথিবীর যা শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর শ্রী, পৃথিবীর প্রাণ। এই বায়ুমণ্ডলেই পৃথিবীর সেই জানালা খোলা রয়েছে যেখানে নক্ষত্রলোক থেকে অন্ধকার পেরিয়ে প্রতি রাত্রে দূত আসছে আত্মীয়তার জ্যোতির্ময় বার্তা নিয়ে। এই তার প্রসারিত বায়ুমণ্ডলকেই বলা যেতে পারে পৃথিবীর উদ্‌বৃত্ত ভাগের আত্মা, যেমন পূর্ণ মানুষকে বলা হয়েছে, ত্রিপাদস্যামৃতম্ —তাঁর এক অংশ প্রত্যক্ষ, বাকি তিন অংশ অমৃতরূপে তাঁকে ছাড়িয়ে আছে ঊর্ধ্বে।

এই সূক্ষ্মবায়ুলোক ভূলোকের একান্ত আপনারই বলে সম্ভব হয়েছে পৃথিবীর ধূলিস্তরে এত বিচিত্র ঐশ্বর্যবিস্তার যার মূল্য ধূলির মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি।

উপনিষদ বলেন, অসম্ভূতি ও সম্ভূতিকে এক করে জানলেই তবে সত্য জানা হয়। অসম্ভূতি যা অসীমে অব্যক্ত, সম্ভূতি যা দেশে কালে অভিব্যক্ত। এই সীমায় অসীমে মিলে মানুষের সত্য সম্পূর্ণ। মানুষের মধ্যে যিনি অসীম তাঁকে সীমার মধ্যে জীবনে সমাজে ব্যক্ত করে তুলতে হবে। অসীম সত্যকে বাস্তব সত্য করতে হবে। তা করতে গেলে কর্ম চাই। ঈশোপনিষদ তাই বলেন, "শত বৎসর তোমাকে বাঁচতে হবে, কর্ম তোমার না করলে নয়।" শত বৎসর বাঁচাকে সার্থক করো কর্মে— এমনতরো কর্মে যাতে প্রত্যয়ের সঙ্গে, প্রমাণের সঙ্গে, বলতে পারা যায় সোহহম্। এ নয় যে, চোখ উলটিয়ে, নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকতে হবে মানুষের থেকে দূরে। অসীম উদ্‌বৃত্ত থেকে মানুষের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠতা সঞ্চারিত হচ্ছে সে কেবল সত্যং ঋতং নয়, তার সঙ্গে আছে রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ ভূতং ভবিষ্যৎ। এই-যে কর্ম, এই-যে শ্রম, যা জীবিকার জন্যে নয়, এর নিরন্তর উত্তম কোন্ সত্যে। কিসের জোরে মানুষ প্রাণকে করছে তুচ্ছ, দুঃখকে করছে বরণ, অন্যায়ের দুর্দান্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করছে বিনা উপকরণে, বুক পেতে নিচ্ছে অবিচারের দুঃসহ মৃত্যুশেল। তার কারণ, মানুষের মধ্যে শুধু কেবল তার প্রাণ নেই, আছে তার মহিমা। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষেরই মাথা তুলে বলবার অধিকার আছে, সোহহম্। সেই অধিকার জাতিবর্ণনির্বিচারে সকল মানুষেরই। ক্ষিতিমোহনের অমূল্য সংগ্রহ থেকে বাউলের এই বাণী পাই—

> জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তার অবতার,
> ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি যার নিত্যলীলা চমৎকার।

প্রতিদিনই মানব-সমাজে এই লীলা। অসংখ্য মানুষ জ্ঞানে প্রেমে ত্যাগে নানা আকারেই অপরিমেয়কে প্রকাশ করছে। ইতিহাসে তাদের নাম ওঠে না, আপন প্রাণ থেকে মানুষের প্রাণপ্রবাহে তারা ঢেলে দিয়ে যায় তাঁরই অমিততেজ যশ্চায়মস্মিন্ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ— যিনি এই আত্মার মধ্যেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সমস্তই অনুভব করেন, যেমন আকাশব্যাপী তেজকে উদ্ভিদ আপন প্রাণের সামগ্রী করে নিয়ে পৃথিবীর প্রাণলোকে উৎসর্গ করে।

উদ্ভিদের ভিতর দিয়ে বিশ্বতেজ যদি প্রাণবস্তুতে নিয়ত পরিণত না হতে পারত তা হলে জীবলোক যেমন মরুশয্যাশায়ী হত, তেমনি আমাদের গোচরে-অগোচরে দেশে দেশে কালে-কালে নরনারী নিজের অন্তরস্থিত পরমপুরুষের অমিততেজ যদি কল্যাণে ও প্রেমে, জ্ঞানে ও কর্মে, নিরন্তর সমাজের প্রাণবস্তুতে পরিণত না করত, তা হলে সমাজ

সোঽহংতত্ত্ববর্জিত হয়ে পশুলোকের সাথে এক হয়ে যেত। তাও নয়, আপন সত্য হতে স্খলিত হয়ে বাঁচতেই পারত না। ডাক্তার বলেন, মানুষের দেহে পশুরক্ত সঞ্চার করলে তাতে তার প্রাণবৃদ্ধি না হয়ে প্রাণনাশ হয়। পশুসমাজ পশুভাবেই চিরদিন বাঁচতে পারে, মানুষের সমাজ পশু হয়ে বাঁচতেই পারে না। তার্কিক বলবে, নরলোকে তো অনেক পশু আরামেই বেড়ে ওঠে। শরীরে ফোড়াও তো বাড়ে। আশপাশের চেয়ে তার উন্নতি বেশি বই কম নয়। সমস্ত দেহে স্বাস্থ্যের গৌরব সেই ফোড়াকে যদি ছাড়িয়ে না যায় তা হলে সে মারে এবং মেরে মরে। প্রকৃতিস্থ সমাজ অনেক পাপ সইতে পারে, কিন্তু যখন তার বিকৃতিটাই হয়ে ওঠে প্রধান তখন চিন্তায় ব্যবহারে সাহিত্যে শিল্পকলায় পশুরক্তস্রোত আত্মস্থ করে সমাজ বেশিদিন বাঁচতেই পারে না। বিলাসোন্মত্ত রোম কি আপন ঐশ্বর্যের মধ্যেই পাকা ফলে কীটের মতো মরে নি। কালিদাস রঘুবংশের যে পতনের ছবি দিয়েছেন সে কি মানুষের জীবনে পশুপ্রবেশের ফলেই না।

অথর্ববেদে শুধু কেবল সত্য ও ঋতের কথা নেই, আছে রাষ্ট্রের কথাও। জনসংঘের শ্রেষ্ঠ রূপ প্রকাশ করবার জন্যে তার রাষ্ট্র। ছোটো টবের বাইরে বনস্পতি যদি তার হাজার শিকড় মেলতে না পারে তা হলে সে বেঁটে হয়ে, কাঠি হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের প্রশস্ত ভূমি না পেলে জনসমূহ পৌরুষবর্জিত হয়ে থাকে। আপনার মধ্যে যে ভূমাকে প্রমাণ করবার দায়িত্ব মানুষের, সমস্ত জাতি বৃহৎ জীবনযাত্রায় তার থেকে বঞ্চিত হলে ইতিহাসে ধিক্কৃত হয়। সকলের মাঝখানে সকল কালের সম্মুখে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারে না "সোঽহম্", বলতে পারে না "আমি আছি আমার মহিমায়, যে আমি কেবল আজকের দিনের জন্য নয়, যার 'আত্মঘোষণা ভাবীকালের তোরণে তোরণে ধ্বনিত হতে থাকবে"। ইতিহাসের সেই ধিক্কার বহুকালের সুপ্তিমগ্ন এসিয়া-মহাদেশের বক্ষে দিয়েছে আজ আঘাত ; সকল দিকেই শুনছি জনগণের অন্তর্যামী মহান পুরুষ তামসিকতার বন্দীশালায় শৃঙ্খলে দিয়েছেন ঝংকার, তাঁর প্রকাশের তপোদীপ্তি জ্বলে উঠেছে তমসঃ পরস্তাৎ। রব উঠেছে, শৃণ্বন্ত বিশ্বে— শোনো বিশ্বজন, তাঁর আহ্বান শোনো, যে আহ্বানে ভয় যায় ছুটে, স্বার্থ হয় লজ্জিত, মৃত্যুঞ্জয় শৃঙ্গধ্বনি করে ওঠেন মৃত্যুদুঃখবন্ধুর অমৃতের পথে।

ভূমা থেকে উৎশিষ্ট যে শ্রেষ্ঠতার কথা অথর্ববেদ বলেছেন সে কোনো একটিমাত্র বিশেষ সিদ্ধিতে নয়। মানুষের সকল তপস্যাই তার মধ্যে, মানুষের বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং সমস্ত তার অন্তর্গত। মনুষ্যত্বের বহুধা বৈচিত্র্যকে একটিমাত্র বিন্দুতে সংহত করে নিশ্চল করলে হয়তো তার আত্মভোলা একটা আনন্দ আছে। কিন্তু, ততঃ কিম। কী

হবে সে আনন্দে। সে আনন্দকে বলব না শ্রেয়, বলব না চরম সত্য। সমস্ত মানব-সংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে, অভাব আছে, অপমান আছে, ততক্ষণ কোনো একটিমাত্র মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। একটিমাত্র প্রদীপ অন্ধকারে একটুমাত্র ছিদ্র করলে তাতে রাত্রির ক্ষয় হয় না, সমস্ত অন্ধকারের অপসারণে রাত্রির অবসান। সেইজন্যে মানুষের মুক্তি যে মহাপুরুষেরা কামনা করেছেন তাঁদেরই বাণী "সম্ভবামি যুগে যুগে"। যুগে যুগেই তো জন্মাচ্ছেন তাঁরা দেশে দেশে। আজও এই মুহূর্তেই জন্মেছেন, কালও জন্মাবেন। সেই জন্মের ধারা চলেছে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে, এই বাণী বহন করে— সোঽহম্। I and my Father are one.

সোঽহম্ মন্ত্র মুখে আউড়িয়ে তুমি দুরাশা কর কর্ম থেকে ছুটি নিতে! সমস্ত পৃথিবী রইল পড়ে, তুমি একা যাবে দায় এড়িয়ে! যে ভীরু চোখ বুজে মনে করে "পালিয়েছি" সে কি সত্যই পালিয়েছে। সোঽহম্ সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র, কেবল একজনের না। ব্যক্তিগত শক্তিতে নিজে কেউ যতটুকু মুক্ত হচ্ছে সেই মুক্তি তার নিরর্থক যতক্ষণ সে তা সকলকে না দিতে পারে। বুদ্ধদেব আপনার মুক্তিতেই সত্যই যদি মুক্ত হতেন, তা হলে একজন মানুষের জন্যেও তিনি কিছুই করতেন না। দীর্ঘজীবন ধরে তাঁর তো কর্মের অন্ত ছিল না। দৈহিক প্রাণ নিয়ে তিনি যদি আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তা হলে আজ পর্যন্তই তাঁকে কাজ করতে হত আমাদের সকলের চেয়ে বেশি। কেননা, যাঁরা মহাত্মা তাঁরা বিশ্বকর্মা।

নীহারিকার মহাক্ষেত্রে যেখানে জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে মাঝে মাঝে এক-একটি তারা দেখা যায়; তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সমস্ত নীহারিকার বিরাট অন্তরে সৃষ্টি-হোমহুতাশনের উদ্দীপনা। তেমনি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মহাপুরুষদের দেখি। তাঁদের থেকে এই কথাই বুঝি যে, সমস্ত মানুষের অন্তরেই কাজ করছে অভিব্যক্তির প্রেরণা। সে ভূমার অভিব্যক্তি। জীবমানব কেবলই তার অহং-আবরণ মোচন করে আপনাকে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে বিশ্বমানবে। বস্তুত, সমস্ত পৃথিবীরই অভিব্যক্তি আপন সত্যকে খুঁজছে সেইখানে, এই বিশ্বপৃথিবীর চরম সত্য সেই মহামানবে। পৃথিবীর আরম্ভকালের লক্ষ লক্ষ যুগের পরে মানুষের সূচনা। সেই সাংখ্যিক তথ্য মনে নিয়ে কালের ও আয়তনের পরিমাণে মানুষের ক্ষুদ্রতা বিচার করে কোনো কোনো পণ্ডিত অভিভূত হয়ে পড়েন। পরিমাণকে অপরিমেয় সত্যের চেয়ে বড়ো করা একটা মোহ মাত্র। যাকে আমরা জড় বলি সেই অব্যক্ত প্রাণ বহু কোটি কোটি বৎসর সুপ্ত ছিল। কিন্তু, একটিমাত্র প্রাণকণা যেদিন এই পৃথিবীতে দেখা দিল সেইদিনই জগতের অভিব্যক্তি তার একটি মহৎ অর্থে এসে পৌঁছল। জড়ের বাহ্যিক

সত্তার মধ্যে দেখা দিল একটি আন্তরিক সত্য। প্রাণ আন্তরিক। যেহেতু সেই প্রাণকণা জড়পুঞ্জের তুলনায় দৃশ্যত অতি ক্ষুদ্র এবং যেহেতু সুদীর্ঘকালের এক প্রান্তে তার সদ্য জন্ম, তাই তাকে হেয় করবে কে। মূকতার মধ্যে এই-যে অর্থ অবারিত হল তার থেকে মানুষ বিরাট প্রাণের রূপ দেখলে; বললে, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। যা-কিছু সমস্তই প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণে কম্পিত হচ্ছে। আমরা জড়কে তথ্যরূপে জানি, কেননা সে যে বাইরের। কিন্তু, প্রাণকে আমাদের অন্তর থেকে জানি সত্যরূপে। প্রাণের ক্রিয়া অন্তরে অন্তরে— তার সমস্তটাই গতি। তাই চলার একটিমাত্র ভাষা আমাদের কাছে অব্যবহিত, সে আমাদের প্রাণের ভাষা। চলা ব্যাপারকে অন্তর থেকে সত্য করে চিনেছি নিজেরই মধ্যে। বিশ্বে অবিশ্রাম চলার যে উদ্যম তাকে উত্তাপই বলি, বিদ্যুৎই বলি, সে কেবল একটা কথা মাত্র। যদি বলি, এই চলার মধ্যে আছে প্রাণ, তা হলে এমন-কিছু বলা হয় আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে যার অর্থ আছে। সেই সঙ্গে এও বুঝি, আমার প্রাণ যে চলছে সেও ঐ বিশ্বপ্রাণের চলার মধ্যেই। প্রাণগতির এই উদ্যম নিখিলে কোথাও নেই, কেবল আকস্মিকভাবে আছে প্রাণীতে— এমন খাপছাড়া কথা আমাদের মন মানতে চায় না, যে মন সমগ্রতার ভূমিকায় সত্যকে শ্রদ্ধা জানায়।

উপনিষদ বলেছেন, কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। একটা কীটও প্রাণের ইচ্ছা করত কিসের জোরে, যদি প্রাণের আনন্দ সমস্ত আকাশে না থাকত। দেশালাইয়ের মুখে একটি শিখা এক মুহূর্তের জন্যেও জ্বলে কী করে, যদি সমস্ত আকাশে তার সত্য ব্যাপ্ত না থাকে। প্রাণের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির একটি অন্তরতর অর্থ পাওয়া গেল, সেই অর্থকে বলি ইচ্ছা। জড় মূক হয়ে ছিল, এই ইচ্ছার ভাষা জানাতে পারে নি; প্রাণ এসে ইচ্ছার বার্তা প্রকাশ করলে। যে বার্তা গভীরে নিহিত ছিল তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

ছাত্র বহুদিন বহু প্রয়াসে অক্ষর শিখল, বানান শিখল, ব্যাকরণ শিখল, অনেক কাগজে অনেক আঁকাবাঁকা অসম্পূর্ণ নিরর্থক লেখা শিখল, উপকরণ ব্যবহার করল ও বর্জন করল বিস্তর; অবশেষে কবিরূপে যে মুহূর্তে সে তার প্রথম কবিতাটি লিখতে পেরেছে সেই মুহূর্তে ঐ একটি লেখায় এতদিনকার পুঞ্জ পুঞ্জ বাক্যহীন উপকরণের প্রথম অর্থটুকু দেখা দিল। জগতের বিপুল অভিব্যক্তিতে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাণকণায়, তার পরে জন্তুতে, তার পরে মানুষে। বাহির থেকে অন্তরের দিকে একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যেতে লাগল। মানুষে এসে যখন ঠেকল তখন যবনিকা উঠতেই জীবকে দেখলুম তার ভূমায়। দেখলুম রহস্যময় যোগের তত্ত্বকে, পরম ঐক্যকে। মানুষ বলতে

পারলে, যাঁরা সত্যকে জানেন তাঁরা সর্বমেবাবিশন্তি— সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

আলোকেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে। সেই প্রসারণের দিকে দেখি তার মহৎকে, দেখি মহামানবকে, দেখি যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ এবং শুভকামনায় হৃদয়কে সর্বত্র এই বলে ব্যাপ্ত করতে পারি—

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। সব্বে সত্তা দুক্‌খা পমুঞ্চন্তু। সব্বে সত্তা মা যথালদ্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

সকল জীব সুখিত হোক, নিঃশত্রু হোক, অবধ্য হোক, সুখী হয়ে কালহরণ করুক। সকল জীব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হোক, সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক।

সেই সঙ্গে এও বলতে পারি, দুঃখ আসে তো আসুক, মৃত্যু হয় তো হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক— মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক, সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারুক "সোঽহম্"।

পরিশিষ্ট

মানবসত্য

আমাদের জন্মভূমি তিনটি, তিনটিই একত্র জড়িত। প্রথম পৃথিবী। মানুষের বাসস্থান পৃথিবীর সর্বত্র। শীতপ্রধান তুষারাদ্রি, উত্তপ্ত বালুকাময় মরু, উৎতুঙ্গ দুর্গম গিরিশ্রেণী, আর এই বাংলার মতো সমতলভূমি, সর্বত্রই মানুষের স্থিতি। মানুষের বস্তুত বাসস্থান এক। ভিন্ন ভিন্ন জাতির নয়, সমগ্র মানুষজাতির। মানুষের কাছে পৃথিবীর কোনো অংশ দুর্গম নয়। পৃথিবী তার কাছে হৃদয় অবারিত করে দিয়েছে।

মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক। অতীতকাল থেকে পূর্বপুরুষদের কাহিনী নিয়ে কালের নীড় সে তৈরি করেছে। এই কালের নীড় স্মৃতির দ্বারা রচিত, গ্রথিত। এ শুধু এক-একটা বিশেষ জাতির কথা নয়, সমস্ত মানুষজাতির কথা। স্মৃতিলোকে সকল মানুষের মিলন। বিশ্বমানবের বাসস্থান— এক দিকে পৃথিবী, আর-এক দিকে সমস্ত মানুষের স্মৃতিলোক। মানুষ জন্মগ্রহণ করে সমস্ত পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করে নিখিল ইতিহাসে।

তার তৃতীয় বাসস্থান আত্মিক লোক। সেটাকে বলা যেতে পারে সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ। অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক। কারো চিত্ত হয়তো বা সংকীর্ণ বেড়া দিয়ে ঘেরা, কারো বা বিকৃতির দ্বারা বিপরীত। কিন্তু, একটি ব্যাপক চিত্ত আছে যা ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত। সেটির পরিচয় অকস্মাৎ পাই। একদিন আহ্বান আসে। অকস্মাৎ মানুষ সত্যের জন্যে প্রাণ দিতে উৎসুক হয়। সাধারণ লোকের মধ্যেও দেখা যায়, যখন সে স্বার্থ ভোলে, যেখানে সে ভালোবাসে, নিজের ক্ষতি করে ফেলে, তখন বুঝি, মনের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা সর্বমানবের চিত্তের দিকে।

বিশেষ প্রয়োজনে ঘরের সীমায় খণ্ডাকাশ বদ্ধ, কিন্তু মহাকাশের সঙ্গে তার সত্যকার যোগ। ব্যক্তিগত মন আপন বিশেষ প্রয়োজনের সীমায় সংকীর্ণ হলেও তার সত্যকার বিস্তার সর্বমানবচিত্তে। সেইখানকার প্রকাশ আশ্চর্যজনক। একজন কেউ জলে পড়ে গেছে, আর-একজন জলে ঝাঁপ দিলে তাকে বাঁচাবার জন্যে। অন্যের প্রাণরক্ষার জন্যে নিজের প্রাণ সংকটাপন্ন করা। নিজের সত্তাই যার একান্ত সে বলবে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কিন্তু, আপনি বাঁচাকে সব চেয়ে বড়ো বাঁচা বললে না, এমনও দেখা গেল। তার কারণ, সর্বমানবসত্তা পরস্পর যোগযুক্ত।

আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর-আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র-দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে। আমি ইস্কুল-পালানো ছেলে। যেখানেই গণ্ডী দেওয়া হয়েছে সেখানেই আমি বনিবনাও করতে পারি নি কখনো। যে অভ্যাস বাইরে থেকে চাপানো তা আমি গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু, পিতৃদেব সেজন্যে কখনো ভর্ৎসনা করতেন না। তিনি নিজেই স্বাধীনতা অবলম্বন করে পৈতামহিক সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। গভীরতর জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার স্বাধীনতা আমারও ছিল। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে কখনো কখনো তিনি বেদনা পেয়েছেন। কিছু বলেন নি।

বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বারবার আবৃত্তি-দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব-কিছু গ্রহণ করতে পারি নি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়তো। এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্থভাবে না; বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ— এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।

এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করছি তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এইরকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।

যখন বয়স হয়েছে, হয়তো আঠারো কি উনিশ হবে, বা বিশও হতে পারে, তখন চৌরঙ্গিতে ছিলুম দাদার সঙ্গে। এমন দাদা কেউ কখনো পায় নি। তিনি ছিলেন একাধারে বন্ধু, ভাই, সহযোগী।

তখন প্রত্যুষে ওঠা প্রথা ছিল। আমার পিতাও খুব প্রত্যুষে উঠতেন। মনে আছে, একবার ডালহৌসি পাহাড়ে পিতার সঙ্গে ছিলুম। সেখানে প্রচণ্ড শীত। সেই শীতে ভোরে আলো-হাতে এসে আমাকে শয্যা থেকে উঠিয়ে দিতেন। সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গির বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। তখন ওখানে ফ্রি ইস্কুল বলে একটা

ইস্কুল ছিল। রাস্তাটা পেরিয়েই ইস্কুলের হাতাটা দেখা যেত। সে দিকে চেয়ে দেখলুম, গাছের আড়ালে সূর্য উঠছে। যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরালের থেকে, অমনি মনের পর্দা খুলে গেল। মনে হল, মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু, সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল, সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনে হল, কী অনির্বচনীয় সুন্দর। মনে হল না, তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।

সুন্দর কাকে বলি। বাইরে যা অকিঞ্চিৎকর, যখন দেখি তার আন্তরিক অর্থ তখন দেখি সুন্দরকে। একটি গোলাপফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর— যে মানুষ তার কেবল পাপড়ি না, বোঁটা না, একটা সমগ্র আন্তরিক সার্থকতা পেয়েছে। পাবনার গ্রামবাসী কবি যখন প্রতিকূল প্রণয়িনীর মানভঞ্জনের জন্যে 'ট্যাহা দামের মোটরি' আনার প্রস্তাব করেন তখন মোটরির দাম এক টাকার চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। এই মোটরি বা গোলাপের আন্তরিক অর্থটি যখন দেখতে পাই তখনই সে সুন্দর। সেদিন তাই আশ্চর্য হয়ে গেলুম। দেখলুম, সমস্ত সৃষ্টি অপরূপ। আমার এক বন্ধু ছিল, সে সুবুদ্ধির জন্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিল না। তার সুবুদ্ধির একটু পরিচয় দিই। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা, ঈশ্বরকে দেখেছ?" আমি বললুম, "না, দেখি নি তো।" সে বললে, "আমি দেখেছি।" জিজ্ঞাসা করলুম, "কিরকম।" সে উত্তর করলে, "কেন? এই-যে চোখের কাছে বিজ্ বিজ্ করছে।" সে এলে ভাবতুম, বিরক্ত করতে এসেছে। সেদিন তাকেও ভালো লাগল। তাকে নিজেই ডাকলুম। সেদিন মনে হল, তার নির্বুদ্ধিতাটা আকস্মিক, সেটা তার চরম ও চিরন্তন সত্য নয়। তাকে ডেকে সেদিন আনন্দ পেলুম। সেদিন সে 'অমুক' নয়। আমি যার অন্তর্গত সেও সেই মানবলোকের অন্তর্গত। তখন মনে হল, এই মুক্তি। এই অবস্থায় চার দিন ছিলুম। চার দিন জগৎকে সত্যভাবে দেখেছি। তার পর জ্যোতিদা বললেন, "দার্জিলিঙ চলো।" সেখানে গিয়ে আবার পর্দা পড়ে গেল। আবার সেই অকিঞ্চিৎকরতা, সেই প্রাত্যহিকতা। কিন্তু, তার পূর্বে কয়দিন সকলের মাঝে যাঁকে দেখা গেল তাঁর সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আর সংশয় রইল না। তিনি সেই অখণ্ড মানুষ যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত— যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।

২

সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে যে ভাবে আমাকে আবিষ্ট করেছিল তার স্পষ্ট ছবি দেখা যায় আমার সেই সময়কার কবিতাতে— প্রভাত-সংগীতের মধ্যে। তখন স্বতই যে ভাব আপনাকে প্রকাশ করেছে তাই ধরা পড়েছে প্রভাতসংগীতে। পরবর্তীকালে চিন্তা করে লিখলে তার উপর ততটা নির্ভর করা যেত না। গোড়াতেই বলে রাখা ভালো, প্রভাতসংগীত থেকে যে কবিতা শোনাব তা কেবল তখনকার ছবিকে স্পষ্ট দেখাবার জন্যে, কাব্যহিসাবে তার মূল্য অত্যন্ত সামান্য। আমার কাছে এর একমাত্র মূল্য এই যে, তখনকার কালে আমার মনে যে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস এসেছিল তা এতে ব্যক্ত হয়েছে। তার ভাব অসংলগ্ন, ভাষা কাঁচা, যেন হাংড়ে হাংড়ে বলবার চেষ্টা। কিন্তু, 'চেষ্টা' বললেও ঠিক হবে না, বস্তুত চেষ্টা নেই তাতে, অস্ফুটবাক্ মন বিনা চেষ্টায় যেমন করে পারে ভাবকে ব্যক্ত করেছে, সাহিত্যের আদর্শ থেকে বিচার করলে স্থান পাওয়ার যোগ্য সে মোটেই নয়।

যে কবিতাগুলো পড়ব তা একটু কুণ্ঠিতভাবেই শোনাব, উৎসাহের সঙ্গে নয়। প্রথম দিনেই যা লিখেছি সেই কবিতাটাই আগে পড়ি। অবশ্য, ঠিক প্রথম দিনেরই লেখা কি না, আমার পক্ষে জোর করে বলা শক্ত। রচনার কাল সম্বন্ধে আমার উপর নির্ভর করা চলে না; আমার কাব্যের ঐতিহাসিক যাঁরা তাঁরা সে কথা ভালো জানেন। হৃদয় যখন উদ্‌বেল হয়ে উঠেছিল আশ্চর্য ভাবোচ্ছ্বাসে, এ হচ্ছে তখনকার লেখা। একে এখনকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। আমি বলেছি, আমাদের এক দিক অহং আর-একটা দিক আত্মা। অহং যেন খণ্ডাকাশ, ঘরের মধ্যেকার আকাশ, যা নিয়ে বিষয়কর্ম মামলা-মকদ্দমা এই-সব। সেই আকাশের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ, তা নিয়ে বৈষয়িকতা নেই; সেই আকাশ অসীম, বিশ্বব্যাপী। বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খণ্ডাকাশে যে ভেদ, অহং আর আত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। মানবত্ব বলতে যে বিরাট পুরুষ তিনি আমার খণ্ডাকাশের মধ্যেও আছেন। আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে— এক আমাতেই বদ্ধ, আর-এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই'ই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলেছি, যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি তখন আমরা মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাটপুরুষ যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ।

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ-'পরে।

এইটেই হচ্ছে অহং, আপনাতে আবদ্ধ, অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে, অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারই মধ্যে ছিলুম, এটা অনুভব করলুম। সে যেন একটা স্বপ্নদশা।

গভীর— গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপনগীতি বিজন হৃদয়ে মোর।

নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের যে-লীলা সত্যের যোগ নেই তার সঙ্গে। অমূলক, মিথ্যা, নানা নাম দিই তাকে। অহং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে জীবন সেটা মিথ্যা। নানা অতিকৃতি দুঃখ ক্ষতি সব জড়িয়ে আছে তাতে। অহং যখন জেগে উঠে আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে নূতন জীবন লাভ করে। এক সময়ে সেই অহং-এর খেলাঘরের মধ্যে বন্দী ছিলুম। এমনি করে নিজের কাছে নিজের প্রাণ নিয়েই ছিলুম, বৃহৎ সত্যের রূপ দেখি নি।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

এটা হচ্ছে সেদিনকার কথা যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এল বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করল। সেদিন কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্যে অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের

দিকে। তাকেই এখন বলেছি বিরাটপুরুষ। সেই-যে মহামানব তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে। এই-যে ডাক পড়ল, সূর্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, এ আহ্বান কোথা থেকে। এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকার করে নয়, সমস্ত স্পর্শ নিয়ে শেষে পড়ে এক জায়গায় যেখানে—

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।

সেখানে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিল। মানবধর্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছি, সংক্ষেপে এই তার ভূমিকা। এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।

এর দু-চার দিন পরেই লিখেছি 'প্রভাত-উৎসব'। একই কথা, আর-একটু স্পষ্ট করে লেখা—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।

এই তো সমস্তই মানুষের হৃদয়ের তরঙ্গলীলা। মানুষের মধ্যে স্নেহ-প্রেম-ভক্তির যে সম্বন্ধ সেটা তো আছেই। তাকে বিশেষ করে দেখা, বড়ো ভূমিকার মধ্যে দেখা, যার মধ্যে সে তার একটা ঐক্য, একটা তাৎপর্য লাভ করে। সেদিন যে-দুজন মুটের কথা বলেছি তাদের মধ্যে যে আনন্দ দেখলুম সে সখ্যের আনন্দ, অর্থাৎ এমন-কিছু যার উৎস সর্বজনীন সর্বকালীন চিত্তের গভীরে। সেইটে দেখেই খুশি হয়েছিলুম। আরো খুশি হয়েছিলুম এইজন্যে যে, যাদের মধ্যে ঐ আনন্দটা দেখলুম তাদের বরাবর চোখে পড়ে না, তাদের অকিঞ্চিৎকর বলেই দেখে এসেছি; যে মুহূর্তে তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রকাশ দেখলুম অমনি পরম সৌন্দর্যকে অনুভব করলুম। মানবসম্বন্ধের যে বিচিত্র রসলীলা, আনন্দ, অনির্বচনীয়তা, তা দেখলুম সেইদিন। সে দেখা বালকের কাঁচা লেখায় আকুবাকু করে নিজেকে প্রকাশ করেছে কোনোরকমে, পরিস্ফুট হয় নি। সে সময়ে আভাসে যা অনুভব করেছি তাই লিখেছি। আমি যে যা-খুশি গেয়েছি তা

নয়। এ গান দু দণ্ডের নয়, এর অবসান নেই। এর একটা ধারাবাহিকতা আছে, এর অনুবৃত্তি আছে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। আমার গানের সঙ্গে সকল মানুষের যোগ আছে। গান থামলেও সে যোগ ছিন্ন হয় না।

কাল গান ফুরাইবে, তা বলে গাবে না কেন
আজ যবে হয়েছে প্রভাত।
কিসের হরষ-কোলাহল,
শুধাই তোদের, তোরা বল্‌!
আনন্দ-মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে,
আনন্দে হতেছে কভু লীন,
চাহিয়া ধরণী-পানে নব আনন্দের গানে
মনে পড়ে আর-এক দিন।

এই-যে বিরাট আনন্দের মধ্যে সব তরঙ্গিত হচ্ছে তা দেখি নি বহুদিন, সেদিন দেখলুম। মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই-যে আনন্দের রস, তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। রসো বৈ সঃ। রসের খণ্ড খণ্ড প্রকাশের মধ্যে তাকে পাওয়া গিয়েছিল। সেই অনুভূতিকে প্রকাশের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলুম, কিন্তু ভালোরকম প্রকাশ করতে পারি নি। যা বলেছি অসম্পূর্ণভাবে বলেছি।

প্রভাতসংগীতের শেষের কবিতা—

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
হেরো আজি ভোরবেলা এসেছে রে মেলা লোক,
ঘিরে আছে চারি দিকে,
চেয়ে আছে অনিমিখে,
হেরে মোর হাসিমুখ ভুলে গেছে দুখশোক।
আজ আমি গান গাহিব না।

এর থেকে বুঝতে পারা যাবে, মন তখন কী ভাবে আবিষ্ট হয়েছিল, কোন্‌ সত্যকে মন স্পর্শ করেছিল। যা-কিছু হচ্ছে সেই মহামানবে মিলছে, আবার ফিরেও আসছে সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নানা রসে সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে। এটা উপলব্ধি হয়েছিল অনুভূতিরূপে, তত্ত্বরূপে নয়। সে সময় বালকের মন এই অনুভূতি-দ্বারা যেভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তারই অসম্পূর্ণ প্রকাশ প্রভাতসংগীতের মধ্যে। সেদিন

অক্‌স্‌ফোর্ডে যা বলেছি তা চিন্তা করে বলা। অনুভূতি থেকে উদ্ধার করে অন্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্তির উপর খাড়া করে সেটা বলা। কিন্তু, তার আরম্ভ ছিল এখানে। তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে তর্কের কিছু নেই, সেই দেখাকে তখন সত্যরূপে জেনেছি। এখনো বাসনা আছে, হয়তো সমস্ত বিশ্বের আনন্দরূপকে কোনো-এক শুভমুহূর্তে আবার তেমনি পরিপূর্ণভাবে কখনো দেখতে পাব। এইটে যে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম, সেইজন্যেই 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি' উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। সেদিন দেখেছিলুম, বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোনো বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ দেখেছি তা নিয়ে তর্ক কেন। স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা তার মৃত্যু নেই।

৩

বর্ষার সময় খালটা থাকত জলে পূর্ণ। শুকনোর দিনে লোক চলত তার উপর দিয়ে। এ পারে ছিল একটা হাট, সেখানে বিচিত্র জনতা। দোতলার ঘর থেকে লোকালয়ের লীলা দেখতে ভালো লাগত। পদ্মায় আমার জীবনযাত্রা ছিল জনতা থেকে দূরে। নদীর চর, ধূ-ধূ বালি, স্থানে স্থানে জলকুণ্ড ঘিরে জলচর পাখি। সেখানে যে-সব ছোটো গল্প লিখেছি তার মধ্যে আছে পদ্মাতীরের আভাস। সাজাদপুরে যখন আসতুম চোখে পড়ত গ্রাম্যজীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্মোদ্যম। তারই প্রকাশ 'পোস্ট্‌মাস্টার' 'সমাপ্তি' 'ছুটি' প্রভৃতি গল্পে। তাতে লোকালয়ের খণ্ড খণ্ড চলতি দৃশ্যগুলি কল্পনার দ্বারা ভরাট করা হয়েছে।

সেই সময়কার একদিনের কথা মনে আছে। ছোটো শুকনো পুরানো খালে জল এসেছে। পাঁকের মধ্যে ডিঙিগুলো ছিল অর্ধেক ডোবানো, জল আসতে তাদের ভাসিয়ে তোলা হল। ছেলেগুলো নতুন জলধারার ডাক শুনে মেতে উঠেছে। তারা দিনের মধ্যে দশবার করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে।

দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে সেদিন দেখছিলুম সামনের আকাশে নববর্ষার জলভারনত মেঘ, নীচে ছেলেদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল ; সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড

লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করছি, যা ভোগ করছি, চার দিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্তে মুহূর্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলেছে, সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেছে নানা নটকে নিয়ে, সুখদুঃখের নানা খণ্ডপ্রকাশ চলছে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবনযাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরমদ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ। এতকাল নিজের জীবনে সুখদুঃখের যে-সব অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্য সাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।

এমনি করে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করবামাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো রসিকের সঙ্গে এক হয়ে। আমার সেদিনকার এই বোধটি নিজের কাছে গভীরভাবে আশ্চর্য হয়ে ঠেকল।

একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। স্নানের ঘরে যাবার পথে একবার জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম ক্ষণকাল অবসরযাপনের কৌতুকে। সেই ক্ষণকাল এক মুহূর্তে আমার সামনে বৃহৎ হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তখন; ইচ্ছে করছে, সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি কাউকে। কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী যিনি আমার সমস্ত ক্ষণিককে গ্রহণ করছেন তাঁর নিত্যে। তখনই মনে হল, আমার এক দিক থেকে বেরিয়ে এসে আর-এক দিকের পরিচয় পাওয়া গেল; এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। আমার মধ্যে এ এবং সে— এই এ যখন সেই সে-র দিকে এসে দাঁড়ায় তখন তার আনন্দ।

সেদিন হঠাৎ অত্যন্ত নিকটে জেনেছিলুম, আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলি আমি; আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে যা-কিছু, যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধনজনমান, এই যা-কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু, পরমপুরুষ আছেন সেই-সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে, নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে। সত্তার এই দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারি নে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুখে দুঃখে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকে না, তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখি নে। কোনো-এক সময়ে সহসা দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন। যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কাব্যে।

ওগো অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।

আমি যে পরিমাণে পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভূমীন সেই পরিমাণে আপন করেছি তাঁকে, ঐক্য হয়েছে তাঁর সঙ্গে। সেই কথা মনে করে বলেছিলুম, "তুমি কি খুশি হয়েছ আমার মধ্যে তোমার লীলার প্রকাশ দেখে।"

বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান সকল অনুভূতি, সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি 'Religion of Man' বক্তৃতাগুলিতে। সেগুলিকে দর্শনের কোঠায় ফেললে ভুল হবে। তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েছে, কিন্তু বস্তুত সে কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা। এই আন্তরিক অভিজ্ঞতা অনেককাল থেকে ভিতরে ভিতরে আমার মধ্যে প্রবাহিত; তাকে আমার ব্যক্তিগত চিত্তপ্রকৃতির একটা বিশেষত্ব বললে তাই আমাকে মেনে নিতে হবে।

যিনি সর্বজগদ্‌গত ভূমা তাঁকে উপলব্ধি করবার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে, "লোকালয় ত্যাগ করো, গুহাগহ্বরে যাও, নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত করে অসীমে অন্তর্হিত হও।" এই সাধনা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার আমার নেই। অন্তত, আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে— তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা, কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন।

একসময় বসে বসে প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে ঐ আত্মবিলয়ের ভাবেই ধ্যান করেছিলুম। পালাবার ইচ্ছে করেছি, শান্তি পাই নি তা নয়। বিক্ষোভের থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। এ ভাবে দুঃখের সময় সান্ত্বনা পেয়েছি। প্রলোভনের হাত থেকে এমনি ভাবে উদ্ধার পেয়েছি। আবার এমন একদিন এল যেদিন সমস্তকে স্বীকার করলুম, সবকে গ্রহণ করলুম। দেখলুম, মানবনাট্যমঞ্চের মাঝখানে যে লীলা তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে। এই-যে দেখা একে ছোটো বলব না। এও সত্য। জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনা-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।]

পত্রপুট

পত্রপুট ১৩৪৩ সালের ২৫ বৈশাখ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে ইহার অধিকাংশ কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—

পত্রপুট-সংখ্যা	সাময়িক পত্রে প্রকাশিত নাম	পত্রিকা
১	বিস্ময়	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৪২
২	ছুটি	কবিতা। পৌষ ১৩৪২
৩	পৃথিবী	প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৪২
৫	হাটে	প্রবাসী। পৌষ ১৩৪২
৬	পথের মানুষ	বিচিত্রা। মাঘ ১৩৪২
৭	সার্থক আলস্য	প্রবাসী। মাঘ ১৩৪২
৮	পেয়ালী	প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩৪২
১০	দেহাতীত	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৪২
১১	উদাসীন	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৪৩
১২	‘বসেছি অপরাহ্ণে পারের খেয়াঘাটে’	প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩
১৬	আফ্রিকা	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৪৩
১৭	বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি	প্রবাসী। মাঘ ১৩৪৪
১৮	শেষের মৌন	বিচিত্রা। বৈশাখ ১৩৪৩

পত্রপুটের বর্তমান ষোলো ও সতেরো -সংখ্যক কবিতা, ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থভুক্ত হয়। ষোলো-সংখ্যক কবিতার ‘মিলহীন পঙ্ক্তিচ্ছন্দে’ লিখিত অন্য দুইটি পাঠ এখানে মুদ্রিত হইল।

আফ্রিকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫১

উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু ছিন্ন করি নিয়ে গেল তোরে
প্রাচী ধরিত্রীর বক্ষ হতে
রে আফ্রিকা,
রেখে দিল নির্বাসনে মহা-অরণ্যের অন্ধকারে।

লতাগুল্ম-অবরুদ্ধ বনঘনিমায়
চিনে নিতেছিলে পথ
তিমির বিদীর্ণ করি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে।
বিদ্রূপ করিতেছিলে ভীষণেরে
নিজেরে বিরূপ করি—
ভয়মোচনের মন্ত্রে
আপনারে দিতেছিলে বিভীষার প্রচণ্ড মহিমা
তাণ্ডবের দুন্দুভি বাজায়ে।
অরণ্যের প্রেরণায়
রচনা করিতেছিলে
জীবনের অনুষ্ঠান
অরণ্যের মতো,
অর্থগ্রন্থিহীন,
খচিত বিবিধ বর্ণে,
সহজে উদ্ভূত জটিলতা।

সেদিন উঠিতেছিল দূর মহাদেশে
নব নব বাণীর নির্ঘোষ
নব নব দিন-অভ্যুদয়ে
মানবচিত্তের তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ-'পরে।

উন্মথিত ইতিহাস
প্রকাশ লভিতেছিল অকস্মাৎ সৃষ্টিতে প্রলয়ে;
বারম্বার-অবলুপ্ত সভ্যতার ভূগর্ভবিলীন
কবরের 'পরে
উঠেছে হঠাৎস্ফূর্ত প্রতাপের স্পর্ধিত পতাকা।

সৃষ্টির আরম্ভযুগে থাকে যে স্তম্ভিত অন্ধকার
গর্ভে বহি শিশু সূর্যতারা
নিভৃতে আছিলে তুমি
তেমনি তমিস্রঘন
ধরণীর ধ্যানের মন্দিরে।
অন্ধকারভাণ্ডারের রহস্যসম্পদ যত,
অধরা, অছোঁওয়া, নিতেছিলে সন্ধান তাহার।
মায়াবিনী প্রকৃতির যত মায়া
ধরিতে শিখিতেছিলে ইন্দ্রিয়ের ফাঁদে।

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
কালো অবগুণ্ঠনের তলে
আছিলে অপরিচিতা তব প্রতিবেশিনীর কাছে।
রূপমদোদ্ধত ইয়ুরোপ
দস্যুবেশে গিয়েছিল দীপহীন তোমার প্রাঙ্গণে
তোমার বক্ষের 'পরে চালায়েছে রথ,
যেখানে বেদনাভরা মানবহৃদয়
তরুচ্ছায়ে ছিল প্রসারিত।
সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করেছিল অন্ধকারে
নির্লজ্জ অমানুষিতা।
অশ্রু তব রক্ত-সাথে মিশে
ভাষাহীন ক্রন্দনের পথ
দিয়েছে পঙ্কিল করি—

দস্যুপদপাদুকার তলে
অশুচি কর্দম সেই
চিরচিহ্ন দিয়ে গেছে তোমার দুর্ভাগ্য ইতিহাসে।

তখনি তাদের দেশে দয়াময় দেবতার নামে
মন্দিরে বাজিতেছিল পূজাঘণ্টা প্রভাতে সন্ধ্যায়,
শিশুরা খেলিতেছিল মার কোলে,
অবাধে ধ্বনিতেছিল কবির সংগীতে
সুন্দরের আরাধনা।

আজ হেরো পশ্চিমদিগন্তে হোথা
ঝঞ্ঝামেঘে উঠে ওই বজ্রের ঝঞ্ঝনা
ধূলিবাষ্প-আবর্তের আবিল আকাশে—
দিন বুঝি হল অবসান।
পশুরা উঠিল গর্জি ছিল যারা গোপন গহ্বরে—
নখে নখে ছিন্ন করিতেছে তারা
অঙ্গনের বহুমূল্য আস্তরণ,
ধূলিরে করিছে অবারিত।

এসো তুমি যুগান্তের কবি—
আত্ম-অবমাননায় আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে
ওই চিরনিপীড়িতা মানবীর কাছে,
ওই অবমানিতার দ্বারে,
ক্ষমা ভিক্ষা করো।
হোক তাহা তব সভ্যতার
হিংস্র প্রলাপের মাঝে শেষ পুণ্যবাণী।

আফ্রিকা

কবিতা : আশ্বিন ১৩৪৪

উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে যবে একদিন
আপনাতে স্রষ্টার আপন অসন্তোষ
বিক্ষত করিতেছিল বারবার নূতন সৃষ্টিরে
সেইদিন
রুদ্র সমুদ্রের বাহু তোমারে নিয়েছে ছিন্ন করি
প্রাচী ধরিত্রীর বক্ষ হতে
হে আফ্রিকা।

সেথায় অরণ্য-অন্তরালে
নিভৃতে গোপন অবকাশে
দুর্গমের বিদ্যা তুমি করেছ সঞ্চয়
দিনে দিনে।
জলস্থল-বাতাসের
দুর্বোধ সংকেত যত নিয়েছ চিনিয়া।
প্রকৃতির মায়া
ধরিতে শিখিতেছিলে আপন চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করিতেছিলে ভীষণেরে
আপনারে করিয়া বিরূপ,
শঙ্কারে মানাতে হার
নিজেরে অর্পিতেছিলে বিভীষার প্রচণ্ড মহিমা
তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদে।

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
কালো অবগুণ্ঠনের তলে
আছিল অপরিচিত তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।

এল তারা দলে দলে
তোমার শ্বাপদ হতে ক্রূরতর যারা,
এল তারা গর্বে যারা অন্ধপ্রায়
সূর্যহারা তোমার অরণ্য-চেয়ে।
সেথা অন্ধকারে
সভ্যের বর্বর লোভ উলঙ্গ করিল আপনার
নির্লজ্জ দুর্মানুষতা।
অশ্রু তব রক্ত-সাথে মিশে
ভাষাহীন ক্রন্দনের বাষ্পাকুল পথ
ডুবালো পঙ্কের স্তরে।
দস্যুপদপাদুকার তলে
বীভৎস কর্দম
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার দুর্ভাগা ইতিহাসে।

সে মুহূর্তে তাদের পল্লীতে
মন্দিরে বাজিতেছিল দয়াময় দেবতার নামে
পূজাঘণ্টা প্রভাতে সন্ধ্যায়,
শিশুরা খেলিতেছিল মার কোলে,
অবাধে ধ্বনিতেছিল কবির সংগীতে
সুন্দরের আরাধনা।

আজ যবে পশ্চিমদিগন্ততলে
ঝঞ্চাঘাতে রুদ্ধশ্বাস মুমূর্ষু প্রদোষ,
গোপনগহ্বরচারী পশুর অশুভ ধ্বনি
দিনান্তের করিছে ঘোষণা,
এসো যুগান্তের কবি—
অবসন্ন এ সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে

নির্দয়দলিত ওই মানহারা মানবীর কাছে
ক্ষমা ভিক্ষা করো,
হোক তাহা তব সভ্যতার
হিংস্র প্রলাপের মাঝে শেষ পুণ্যবাণী।

সতেরো-সংখ্যক কবিতার অন্য একটি রূপ নবজাতক গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। এখানে তাহা উদ্‌ধৃত হইল।

বুদ্ধভক্তি

জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি, জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধমন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকটদর্শন,
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির—
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

গর্জিয়া প্রার্থনা করে;
আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
আত্মীয়বন্ধন করি দিবে ছিন্ন,
গ্রামপল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন,
হানিবে শূন্য হতে বহ্নি-আঘাত,
বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ—
বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
দয়াময় বুদ্ধের কাছে।

তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

হত-আহতের গণি সংখ্যা
তালে তালে মন্ত্রিত হবে জয়ডঙ্কা।
নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচীরঙ্গ,
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষবাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস—
মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

শান্তিনিকেতন
৭ জানুয়ারি ১৯৩৮

পত্রপুটের আঠারো-সংখ্যক কবিতার একটি পাঠান্তর পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্‌ধৃত হইল—

এসো অন্তরে গম্ভীর নির্বাক্‌,
সংগীত যদি সঞ্চিত থাকে থাক্‌,
এখনো ক্লান্ত নাহয় না হল গলা ;
শক্তির মাঝে যত-কিছু আছে দান
সব যদি করি নিঃশেষে অবসান,
সব কথা যদি শেষ হয়ে যায় বলা,
বলার অতীত যাহা তার তরে তবে
অবকাশটুকু কিছু আর নাহি রবে,
শব্দে লুকাবে স্তব্ধের মহাবাণী—

লীলা হারাইয়া গুরুভার হয় খেলা,
নীড়ের পাখির উড়িবার যায় বেলা,
থামিবার দিনে থামিতে যদি না জানি।

দিবস ঢালে যা মুখর মুখের কথা
রজনীতে তার নীরব সার্থকতা,
তারার আলোয় দিনের আলোর ছুটি।
মানুষেরে ঢাকে সংসারে নানা কাজে,
উজ্জ্বল রূপ লভে স্মরণের মাঝে,
চরমের ভাষা আভাসেতে উঠে ফুটি।

মোর হৃদয়ের কথিত বাণীর ধারা
অকথিত বাণী-সমুদ্রে হোক সারা,
পূর্ণ সে হোক মিলিয়া মৌন-সাথে।
জানা জীবনের নানা বেদনার কবি
রেখে দিয়ে যেন যায়[১] অজানার ছবি
যে শেষ অশেষ হেন মরণের রাতে।

[শান্তিনিকেতন]
১ বৈশাখ ১৩৪৩

১ 'যেন যায়' পাঠান্তরে 'যাক চির-'।

শ্যামলী

শ্যামলী ১৩৪৩ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে ইহার অনেক কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—

নাম	পত্রিকা
শেষ পহরে	বিচিত্রা। আষাঢ় ১৩৪৩
আমি	পরিচয়। ভাদ্র ১৩৪৩
স্বপ্ন	কবিতা। আশ্বিন ১৩৪৩
চিরযাত্রী	প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪৩
বিদায়-বরণ	বিচিত্রা। ভাদ্র ১৩৪৩
অকাল ঘুম	প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৪৩
বাঁশিওয়ালা	প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৪৩
অমৃত	প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৪৩
বঞ্চিত, অপর পক্ষ[১]	পরিচয়। বৈশাখ ১৩৪৩

'দ্বৈত' কবিতার একটি পাঠান্তর আষাঢ় ১৩৪৩ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল; এখানে তাহা মুদ্রিত হইল।

দ্বৈত

প্রথম দেখেছি তোমাকে,
বিশ্বরূপকারের ইঙ্গিতে,
তখন ছিলে তুমি আভাসে।
যেন দাঁড়িয়ে ছিলে বিধাতার মানসলোকের
সেই সীমানায়
সৃষ্টির আঙিনা যেখানে আরম্ভ।

যেমন অন্ধকারে ভোরের ব্যঞ্জনা
অরণ্যের অশ্রুতপ্রায় মর্মরে

১ এই যুগ্ম-কবিতা 'পাত্র ও পাত্রী ১) চন্দ্রমল্লিকা ২) অপরপক্ষ' নামে পরিচয়ে প্রকাশিত হয়।

আকাশের অস্পষ্টপ্রায় রোমাঞ্চে—
উষা যখন পায় নি আপন নাম,
যখন জানে নি আপনাকে।
তার পরে সে নেমে আসে ধরাতলে ;
তার মুখ থেকে
অসীমের ছায়া-ঘোমটা পড়ে খ'সে
উদয়সমুদ্রতটে।
পৃথিবী তাকে আপন রঙে রাঙিয়ে তোলে,
পরায় তাকে আপন হাওয়ার উত্তরীয়।
তেমনি তুমি এসেছিলে ছবির প্রান্তরেখাটুকু
আমার হৃদয়ের দিগন্তপটে।
আমি তোমার চিত্রকরের শরিক ;
কথা ছিল, তোমার 'পরে মনের তুলি আমিও দেব বুলিয়ে,
তোমার রচনা সম্পূর্ণ করব আমি।—
দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।
আমার প্রাণের হাওয়া
বইয়ে দিয়েছি তোমার চারি দিকে,
কখনো ঝড়ের বেগে,
কখনো মৃদুমন্দ বীজনে।

একদিন দ্যুলোকের দূরত্বে ছিলে তুমি অধরা,
ছিলে তুমি একলা বিধাতার,
একের নির্জনে।
আমি বেঁধেছি তোমাকে দুইয়ের গ্রন্থিতে ;
তোমার সৃষ্টি আজ তোমাতে আর আমাতে,
তোমার বেদনায় আমার বেদনায়।
আজ তুমি আপনাকে চিনেছ
আমার চেনা দিয়ে,
আমার সীমাবন্ধনে তুমি স্পষ্ট।

আমার বিস্মিত দৃষ্টির সোনার কাঠির স্পর্শে
জাগ্রত তোমার আনন্দরূপ
তোমার আপন চৈতন্যে।

বরানগর
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

'অকাল ঘুম' কবিতাটির একটি পূর্বতন পাঠ পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্‌ধৃত করা গেল। ইহার চতুর্থ স্তবকটি কবির স্বহস্তের লেখায় একাধিক খাতাতেই আছে, এবং ঘটনা-বিবৃতি অনুসরণ করিবার পক্ষে অনুকূল বলিয়া প্রণিধানযোগ্য—

এসেছি অনাহূত,
মনে ছিল—
কোমরে-আঁচল-জড়ানো ব্যস্ততায় ওর
অসময়ে দেব বাধা।
চমক লাগল ঘরের দুয়ারে পা বাড়িয়ে,
চোখে পড়ল মেঝের 'পরে এলিয়ে পড়া
অকাল ঘুমের ছবিখানি।
দুখানি হাত গালের নীচে জড়ো করে
আজ পড়েচে ঘুমিয়ে শিথিল দেহে
উৎসবরাত্রির অবসাদে
অসমাপ্ত ঘরকন্নার এক ধারে।

দূর পাড়ায় বিয়েবাড়িতে
বাজচে সানাই সারং সুরে,
প্রথম প্রহর পেরিয়ে গেছে
জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে ঝামরে পড়া
সকালবেলায়। এই তো
কোমরে-আঁচল-বাঁধা ব্যস্ততার সময়,
এতক্ষণে কর্মস্রোত বইত অঙ্গে অঙ্গে—

হঠাৎ গেছে থেমে।
যেন ভরা বাদলের মাঝখানে
অকস্মাৎ বৃষ্টির অবসর।
ঘড়ির উপেক্ষিত ইঙ্গিত চলচে পাশের টেবিলে,
দেয়ালে দুলচে দিনপঞ্জী।
চলতি মুহূর্তগুলি
নিশ্চল এক-মুহূর্ত হয়ে মিলেছে
ওর নিস্তব্ধ নিদ্রায়।
দুটি সুপ্ত চোখের কালো পক্ষ্মচ্ছায়া
পড়েছে পাণ্ডুর কপোলে।
ক্লান্ত দেহের করুণ মাধুরী
যেন সারারাত-জাগা পূর্ণিমার
সকালের চাঁদ।
চেয়ে চেয়ে দেখলেম
অকাল ঘুমের
ছবিখানি।

ঘুম ভেঙে অভিমানভরে সে বললে, "ছি ছি,
কেন জাগালে না এতক্ষণ!"
আমি তার জবাব দিই নি ঠিকমত।

এ ছবি অনেক দিনের ছবি।
অনেক দূরের মূল্যে এ আজ অসামান্য।
প্রতিদিনের ছোঁওয়া লাগবে না এর গায়ে;
যে ভাষায় পূর্ণ হত এর অর্থ
সে আমার জানা নেই,
সে বুঝি কোন্ পৌরাণিক যুগের ধ্বনিগম্ভীর ভাষা,

আজকের দিনের অপরিচিত।[১]

সেদিন গলির ও পারের পাঠশালায়
ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ছিল নামতা,
পাট-বোঝাই মোষের গাড়ি
চাকার ক্লিষ্ট শব্দে চলেছিল রাস্তায়,
ছাদ পিটোচ্ছিল পাড়ার কোন্ বাড়িতে,
জানলার নীচে বাগানে
চালতা গাছের তলায়
উচ্ছিষ্ট আমের আঁঠি নিয়ে
টানাটানি করছিল একটা কাক—
আজ এ-সমস্তর উপরেই লেগেছে
সেই দূর কালের মায়া।
ইতিহাসবিস্মৃত
তুচ্ছ মধ্যাহ্নের রৌদ্রে
এরা অপরূপের রসে রইল ঘিরে
সেই অকালঘুমের ছবিখানি।

বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি আলোচনা করিয়া দেখা যায় 'কনি' (পৃ ৮৭-৯৪) কবিতাটির নানা পাঠান্তরের ভিতর দিয়া একপ্রকার রূপান্তর ঘটিয়াছে। পূর্ববর্তী একটি পাঠে 'টেমি' কুকুরের কোনো প্রসঙ্গ নাই, পক্ষান্তরে কনির পুতুলের বিয়ে ও তদুপলক্ষে অমলের সহিত তাহার মান-অভিমানের বর্ণনা আছে। উপসংহারটুকু সম্পূর্ণ অন্যরূপ, যেমন, ৯৩ পৃষ্ঠার সপ্তম ছত্র হইতে—

হঠাৎ গর্জন উঠল "কে রে" ;
লাফ দিতে যাচ্ছি গাছ থেকে,

১ অপ্রকাশিতপূর্ব স্তবক। অন্য এক পাণ্ডুলিপিতে ইহারই ঈষৎ ভিন্ন পাঠ আছে।

কনি বললে, "কখ্‌খনো না—
ফল পাড়ো তুমি।"
স্বয়ং শিবরামবাবু।
বললেন, "আর কোনো বিদ্যা হবে না বাপু,
চুরিবিদ্যাই শেষ ভরসা।"
কনি বললে, "ওঁকে ডেকে এনেছি আমিই তো।
মিছে বোকো না অমলদাকে।"
শিবরামবাবু কান দিলেন না সে কথায়।
বললেন, "লোভী তুমি।
এই চুরির ফল ভোগ করতে পাবে না,
এই তোমার শাস্তি।"
ঝুড়িটা নিয়ে গেলেন তিনি,
পাছে ফলবান হয় পাপের চেষ্টা।
কনির দুই চোখ দিয়ে
জল পড়তে লাগল মোটা মোটা ফোঁটায়—
ওর চোখে জল দেখেছি
এই প্রথম।

মাঝখানে অনেকখানি ফাঁক।
বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি,
কনির হয়ে গেছে বিয়ে।
মাথায় উঠেছে কাপড়,
সিঁথেয় সিঁদুর,
শান্ত হয়েছে চোখের দৃষ্টি;
স্বর হয়েছে গম্ভীর।

আমি রসায়নের কারখানায়
ওষুধ বানিয়ে থাকি।

উন্নতির আশা আছে
এইরকম জনশ্রুতি।

শিবরামবাবুর জামাই
বাজি রেখে বিলিতি চালে তাস খেলেন
সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুমণ্ডলীতে,
তাঁর সিনেমা দেখবারও
অপরিমিত শখ।
শিবরামবাবু চেষ্টা করেছেন
পাপসংশোধনের,
উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে তর্কের ফলে,
তিনি চলে গেছেন হুশিয়ারপুরে।

এমনি চলচে আমার দিন
কর্মচক্রে বাঁধা।

গ্রামের বাড়ি সংস্কার করব বলে
গিয়েছি সেখানে কাজের ছুটি নিয়ে।
তখন কনি এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে
তার মায়ের কাছে।
দূরের থেকে দেখি তাকে বাগানে,
বসে আছে অশথগাছের বাঁধা চাতালে।
কতবার যাই-যাই করে মন,
ভেবে পাই নে যাবার অধিকার
এখনো আছে কি নেই।

রবীন্দ্রনাথের 'মাটির বাসা' 'শেষবেলাকার ঘরখানি'র উদ্দেশে লিখিত 'শ্যামলী' কবিতা-প্রসঙ্গে 'শেষ সপ্তক'-এর চুয়াল্লিশ-সংখ্যক কবিতাও দ্রষ্টব্য। ২৫ বৈশাখ ১৩৪২ তারিখে শ্যামলীগৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত কবিতাটিও ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী হইতে এই প্রসঙ্গে উদ্‌ধৃত করা যাইতে পারে—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কল্যাণীয়েষু

ধরণী বিদায়বেলা আজ মোরে ডাক দিল পিছু—
কহিল, "একটু থাম্‌, তোরে আমি দিতে চাই কিছু,
আমার বক্ষের স্নেহ; রাখিব একান্ত কাছে ধরে
যে ক'দিন রয়েছিস হেথা, ঘিরিয়া রাখিব তোরে
স্পর্শ মোর করি মূর্তিমান।"

হে সুরেন্দ্র, গুণী তুমি,
তোমারে আদেশ দিল ধ্যানে তব মোর মাতৃভূমি—
অপরূপ রূপ দিতে শ্যামস্নিগ্ধ তাঁর মমতারে
অপূর্ব নৈপুণ্যবলে। আজ্ঞা তাঁর মোর জন্মবারে
সম্পূর্ণ করেছ তুমি আজি। তাঁর বাহুর আহ্বান
নিঃশব্দ সৌন্দর্যে রচি আমারে করিলে তুমি দান
ধরণীর দূত হয়ে। মাটির আসনখানি ভরি
রূপের যে প্রতিমারে সম্মুখে তুলিলে তুমি ধরি
আমি তার উপলক্ষ; ধরার সন্তান যারা আছে
ধরার মহিমাগান করিবে সে সকলের কাছে।
পঁচিশে বৈশাখে আমি একদিন না রহিব যবে
মোর আমন্ত্রণখানি তোমার কীর্তিতে বাঁধা রবে,
তোমার বাণীতে পাবে বাণী। সে বাণীতে রবে গাঁথা,
ধরারে বেসেছি ভালো, ভূমিরে জেনেছি মোর মাতা।

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ ১৩৪২

পরিত্রাণ

পরিত্রাণ ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে ১৩৩৪ সালের বার্ষিক শারদীয়া বসুমতীতে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল।

পরিত্রাণ 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের পুনঃসংস্কৃত রূপ ; ইহার কোনো কোনো অংশ প্রায়শ্চিত্ত হইতে গৃহীত, অবশিষ্ট অংশ নূতন।

গল্পগুচ্ছ

বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গল্পগুলি ১৩০২ সালে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রকাশসূচী প্রদত্ত হইল—

নাম	পত্রিকা
মানভঞ্জন	সাধনা। বৈশাখ ১৩০২
ঠাকুরদা	সাধনা। জ্যৈষ্ঠ ১৩০২
প্রতিহিংসা	সাধনা। আষাঢ় ১৩০২
ক্ষুধিত পাষাণ	সাধনা। শ্রাবণ ১৩০২
অতিথি	সাধনা। ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২
ইচ্ছাপূরণ	সখা ও সাথী। আশ্বিন ১৩০২

রাশিয়ার চিঠি

রাশিয়ার চিঠি ১৩৩৮ সালের ২৫ বৈশাখ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত পত্র ও প্রবন্ধাবলী প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়, নিম্নে প্রকাশসূচী মুদ্রিত হইল—

সংখ্যা বা নাম	প্রবাসীতে প্রকাশিত গ্রন্থবহির্ভূত নাম	প্রকাশকাল
১	রাশিয়ায় লোকশিক্ষা (১)	অগ্রহায়ণ ১৩৩৭
২	রাশিয়ার সর্বব্যাপী নির্ধনতা	পৌষ ১৩৩৭
৩	রাশিয়ায় সকল মানুষের উন্নতির চেষ্টা [১]	পৌষ ১৩৩৭
৪	রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী [১]	ফাল্গুন ১৩৩৭
৫	রাশিয়ায় সকল মানুষের উন্নতির চেষ্টা [২]	পৌষ ১৩৩৭
৬	রাশিয়ার শিক্ষাবিধি [১]	চৈত্র ১৩৩৭

সংখ্যা বা নাম	প্রবাসীতে প্রকাশিত গ্রন্থবহির্ভুত নাম	প্রকাশকাল
৭	সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা [১]	মাঘ ১৩৩৭
৮	সাইমন কমিশনের কবুল	অগ্রহায়ণ ১৩৩৭
	রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রাংশ [৩]	অগ্রহায়ণ ১৩৩৭
৯	রাশিয়ায় লোকশিক্ষা (২)	অগ্রহায়ণ ১৩৩৭
১০	সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা [২]	মাঘ ১৩৩৭
১১	রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী [২]	ফাল্গুন ১৩৩৭
১২	রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী [৩]	ফাল্গুন ১৩৩৭
১৩	রাশিয়ার শিক্ষাবিধি [২]	চৈত্র ১৩৩৭
১৪	রাশিয়ার শিক্ষাবিধি [৩]	চৈত্র ১৩৩৭
উপসংহার	সোভিয়েট নীতি	বৈশাখ ১৩৩৮
পরিশিষ্ট		
	গ্রামবাসীদিগের প্রতি	চৈত্র ১৩৩৭
	পল্লীসেবা	ফাল্গুন ১৩৩৭
	কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত	পৌষ ১৩৩৬

১-সংখ্যক চিঠি শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে; ২ ও ৪ -সংখ্যক চিঠি শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবীশকে; ৩ ও ৫ -সংখ্যক চিঠি শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে; ৬-সংখ্যক চিঠি শ্রীআশা অধিকারীকে; ৭, ১০, ১১ ও ১২ -সংখ্যক চিঠি শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করকে; ৮-সংখ্যক চিঠি এবং 'উপসংহার' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে; ৯-সংখ্যক চিঠি শ্রীনন্দলাল বসুকে; ১৩-সংখ্যক চিঠি কালীমোহন ঘোষকে এবং ১৪-সংখ্যক চিঠি শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত হয়। 'রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রাংশ' শিরোনামে অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ প্রবাসীতে প্রকাশিত ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত একটি চিঠি (২৬ অগস্ট ১৯৩০) রাশিয়ার চিঠিতে ৮-সংখ্যক চিঠির পরিশেষে ("বাইরের সকল কাজের উপরেও··· বিপদে পড়তে হয়" অংশ) যুক্ত হইয়াছে।

১৯৩০ সালের পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার রাশিয়ায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে রাশিয়া-যাত্রার প্রস্তাব তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই; অবশেষে ১৯৩০ সালে য়ুরোপভ্রমণ উপলক্ষে তিনি হ্যারি টিম্বার্স্, কুমারী মার্গট আইনস্টাইন, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীআরিয়াম উইলিয়াম্স্ (আর্যনায়কম্) ও শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে সঙ্গে লইয়া রাশিয়া-দর্শনে যান এবং ১১ সেপ্টেম্বর হইতে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মস্কোতে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানাদি

পরিদর্শন করেন। এই পর্যটনের বিবরণ বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত *Letters from Russia* পুস্তকের পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ আছে।

রাশিয়া রবীন্দ্রনাথকে কোন্ ভাবে উদ্‌বোধিত করিয়াছিল, রাশিয়া-দর্শনের অব্যবহিত পরে লিখিত অন্যান্য চিঠিতেও স্থানে স্থানে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়—

[১৯৩০]

ধনীপরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে এবার আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েছে। দেনাশোধের ভাবনা ঘুচে গেলেই দেনা বাড়াবার পথ একেবারে বন্ধ করতে হবে। তা ছাড়া নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের গরিব চাষি প্রজাদের ’পরে যেন আর চাপাতে না হয়। এ কথা আমার অনেক দিনের পুরোনো কথা। বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম, আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়— আমরা যেন ট্রস্‌টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক-পোশাক দাবি করতে পারব, কিন্তু সে ওদেরই অংশিদারের মতো। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম, জমিদারি-রথ সে রাস্তায় গেল না— তার পরে যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে চলল তখন মনের থেকেও সংকল্প সরাতে হল। এতে করে দুঃখ বোধ করেছি— কোনো কথা বলি নি। এবার যদি দেনা শোধ হয় তা হলে আর-একবার আমার বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার আশা করব।

আমি যা বহুকাল ধ্যান করেছি রাশিয়ায় দেখলুম, এরা তা কাজে খাটিয়েছে; আমি পারি নি বলে দুঃখ হল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে লজ্জার বিষয় হবে। অল্প বয়সে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে শান্তিনিকেতনে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হোক, সাধনার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছি। নিজের প্রজাদের সম্বন্ধেও আমার অনেক কালের বেদনা রয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে সে দিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না।···

এই পরিশিষ্টের শেষ অংশে ধনীর পোশাক আমাদের ছাড়তে হবে, নইলে লজ্জা ঘুচবে না। আমার ভাগ্যবিধাতার আশ্চর্য বিধান এই যে, এখন থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের জীবিকা নিজের চেষ্টায় উপার্জন করতে পারব।

—চিঠিপত্র ৩। শ্রীপ্রতিমা দেবীকে লিখিত

১৪ অক্টোবর ১৯৩০

এবার রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় আমাকে গভীরভাবে অনেক কথা ভাবিয়েছে। প্রচুর উপকরণের মধ্যে আত্মসম্মানের যে বিঘ্ন আছে সেটা বেশ স্পষ্ট চোখে দেখতে পেয়েছি। সেখান থেকে ফিরে এসে মেগেওলদের ঐশ্বর্যের মধ্যে যখন পৌঁছলুম, একটুও ভালো লাগল না— ব্রেমেন জাহাজের আড়ম্বর এবং অপব্যয় প্রতিদিন মনকে বিমুখ

করেছে। ধনের বোঝা কী প্রকাণ্ড এবং কী অনর্থক। জীবনযাত্রার কত জটিলতা কত সহজেই এড়ানো যেতে পারে।

৩১ অক্টোবর ১৯৩০

জমিদারির অবস্থা লিখেছিস। যেরকম দিন আসছে তাতে জমিদারির উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরও পাকা হয়েছে। যে-সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারি ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।···

এ দিকে দেশের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় দেখা দিয়েছে। অনেক কিছু উলট-পালট হবে। এই সময়ে বোঝা যত হালকা করতে পারব সমস্যা ততই সহজ হবে। জীবনযাত্রাকে গোড়া ঘেঁষে বদল করবার দিন এল, সেটা যেন অনায়াসে প্রসন্ন মনে করতে পারি। যারা যত বেশি নানা জালে জড়িয়ে আছে তারা তত বেশি কষ্ট পাবে। দুঃখের দিন যখন আসে তখন তাকে দায়ে পড়ে মেনে নেওয়ার চেয়ে এগিয়ে গিয়ে মেনে নেওয়া ভালো— তাতে দুঃখের ভার কমে যায়— বৃথা ঝুটোপুটি করতে হয় না। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দুঃখ সকলকেই পেতে হবে— এখনি পাচ্ছে, সংকট এড়িয়ে আরামে থাকবার প্রত্যাশা করাই ভুল। নূতন অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে বনিয়ে নেওয়া কিছুই শক্ত নয়, যদি অন্তরের দিকে প্রস্তুত হয়ে থাকি, যদি পুরাতনের বাঁধন আপনা হতে আলগা করে দিই— টানাটানি করতে গেলেই বাঁধন হয়ে ওঠে ফাঁসি।

···এটা খুব করে বুঝেছি, আমাদের সব চেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে। সমস্ত দেশকে কী করে বাঁচাতে হবে ঐখানে ছোটো আকারে তারই নিষ্পত্তি করা আমাদের ব্রত। যদি তুই রাশিয়ায় আসতিস এ সম্বন্ধে অনেক তোর অভিজ্ঞতা হত। যাই হোক, কিছু মালমসলা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছি, দেশে গিয়ে আলোচনা করা যাবে। নিজেদের কথা সম্পূর্ণ ভুলতে হবে ; তার চেয়ে বড়ো কথা সামনে এসেছে।

২১ নভেম্বর ১৯৩০

তোরা রাশিয়ায় যদি আসতিস তা হলে বুঝতে পারতিস কাজ করবার ঢের আছে। কম টাকা হলেও চলে যদি বুদ্ধি থাকে ও উদ্যম থাকে, যদি নিজের উপরে ভরসা থাকে।

—চিঠিপত্র ২। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

১৯৩৪ সালের জুন-সংখ্যা মডার্ন্‌ রিভিউ পত্রে 'রাশিয়ার চিঠি'র 'সোভিয়েট নীতি' বা 'উপসংহার' শীর্ষক পত্রের শ্রীশশধর সিংহ -কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং অন্যান্য পত্রগুলির অনুবাদও ধারাবাহিক প্রকাশের আয়োজন হয়। ইতিপূর্বে প্রবাসী পত্রে 'রাশিয়ার চিঠি' যখন ক্রমশ মুদ্রিত হয় তখন সরকার-পক্ষ হইতে এ বিষয়ে কোনো আপত্তি হয় নাই ; উক্ত 'সোভিয়েট নীতি' বা 'উপসংহার'এর অপর একটি ইংরেজি অনুবাদ মডার্ন্‌ রিভিউ পত্রেই ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখনও সরকার ইহাতে চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই ; কিন্তু ১৯৩৪ সালে মডার্ন্‌ রিভিউ পত্রে উক্ত অনুবাদ প্রকাশের পরে, অন্যান্য পত্রগুলির অনুবাদ-প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়। (অবশ্য, শ্রীবসন্তকুমার রায় -কৃত অনুবাদ অতঃপর আমেরিকার য়ুনিটি পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল।) মডার্ন রিভিউ পত্রে 'রাশিয়ার চিঠি'র অনুবাদ-প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা লইয়া পার্লামেন্টে আলোচনা হয়। এ সম্পর্কে 'রাশিয়ার চিঠি'র ১৩৫৮ ফাল্গুন সংস্করণে ১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গক্রমে প্রবাসী হইতে সম্পাদকীয় মন্তব্যবিশেষ সংকলন করা যাইতে পারে—

রুশীয় টেলিগ্রাম ও রবীন্দ্রনাথের উত্তর

কয়েকদিন হইল, রুশিয়া হইতে অধ্যাপক পেট্রভ রবীন্দ্রনাথকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। কর্তৃপক্ষ যে-ব্যক্তিই হউন, উহার কোনো কোনো অংশ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিলে তাঁহার অকল্যাণ হইবে এবং উহা প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের ও গ্রেটব্রিটেন সমেত পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অমঙ্গল হইবে, ঐ ব্যক্তির এই আশঙ্কায় তিনি (অর্থাৎ ঐ সর্বজনঅভিভাবক) টেলিগ্রামটির কোনো কোনো অংশ বাদ দিয়া বাকি রবীন্দ্রনাথকে ডাকঘরের মারফৎ প্রেরণ করেন। ছাঁট বাদে উহা এইরূপ :

To Rabindranath Tagore, Santiniketan, India.

What is your explanation of gigantic growth of U. S. S. R. industry; its high tempo of development; setting up of extensive collectivized, mechanized agriculture; liquidation of illiteracy; tremendous increase in number of scientific institutions, universities, schools; and cultural upheaval of U. S. S. R. in general?

What problems will confront you in your work during next five years and what obstacles?

Please telegraph for Soviet press, Moscow Kultviaz.

Petrov, V. O. K. S., Moscow.

রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাফে ইহার উত্তর দিয়াছেন—

To Professor Petrov, V. O. K. S., Moscow.

Your success is due to turning the tide of wealth from the individual to collective humanity.

Our obstacles are social and political inanity, bigotry and illiteracy.

Rabindranath Tagore

—বিবিধ প্রসঙ্গ। প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৩৮। পৃ ৩০২

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ১৯৩০ সালে রাশিয়া-যাত্রার পূর্বেও রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া-ভ্রমণের প্রস্তাব হইয়াছিল। ১৯২৬ সালে বার্লিনে সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ হইতে শিক্ষাসচিব লুনাচারস্‌কি তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইতে আসিয়াছিলেন। তৎপূর্বেও রাশিয়ার সহিত রবীন্দ্রনাথের আত্মিক যোগ স্থাপিত হইয়াছিল— ১৯২২ সালে রাশিয়ার দুর্ভিক্ষে বিপন্ন রুশীয় মনস্বীদের সাহায্যের জন্য সর্বত্র যে আবেদন প্রচারিত হয়, তদনুরূপ আবেদন অক্‌সফোর্ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি ভিনোগ্রাডফ এ দেশে রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন এবং ঐ পত্রের প্রারম্ভে লেখেন—

Oxford, May 19, 1922

When I met you in Calcutta eight years ago, I little thought that I should have to appeal to you on behalf of my unfortunate countrymen in Russia.

The impression I carried away after our interview was that I had met one who was fitted to represent the great Indian nation that has struggled for centuries with all kinds of hardships—physical and moral. It is to such humanitarians and idealists that I appeal in order to bring to their notice a particularly grievous and pressing need—the need of the intellectual leaders, the brain-workers of Russia who are threatened with destruction...

—শঙ্খ। ১২ আষাঢ় ১৩২৯, পৃ ১৯৫

রবীন্দ্রনাথ বিনীতভাবে এই কার্যে নিজের অযোগ্যতা জানাইয়া তাহা সত্ত্বেও দৈনিক কাগজগুলিতে অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফের চিঠির সারাংশ সমেত নিজের আবেদন ছাপাইয়াছেন। তাঁহার নিকট শান্তিনিকেতন ডাকঘরের ঠিকানায় যিনি যত অর্থ পাঠাইবেন তিনি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবেন।

—প্রবাসী। আষাঢ় ১৩২৯, পৃ ৪৬১

পায়োনিয়র্স্ কম্যুন রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসবে যে অভিনন্দন প্রেরণ করেন তাহার কিয়দংশ সংকলিত হইল—

Dear Poet,

The First Pioneers' Commune still remember the evening they spent with you and send you their warm greetings on your seventieth birthday.

We remember well your national song which you sang to us.

Since your departure life has carried us ahead and the country has taken giant strides towards socialism...

We wish you all happiness and hope to meet you again in our free socialistic country.

Greetings from the First Pioneers' Commune.

—*Golden Book of Tagore,* p. 265

রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর লণ্ডনে-স্থিত সোভিয়েট প্রতিনিধি মেইস্কি শ্রদ্ধা-নিবেদন উপলক্ষে লেখেন—

May I express my profound grief at the passing of a great Indian writer and poet whose name was so familiar in my country and whose works were so popular with the masses of the Soviet People?

মানুষের ধর্ম

মানুষের ধর্ম ১৩৪০ সালে (মে ১৯৩৩) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধত্রয় প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমলা-বক্তৃতারূপে পঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-মত এই বক্তৃতামালা, বা উহার সারাংশ, কলিকাতার বাহিরে কোনো স্থানে পঠনীয়। তদনুসারে গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত 'মানবসত্য' শান্তিনিকেতনে কথিত হয়। 'মানবসত্য' এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্বে ১৩৪০ সালে প্রবাসীর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ -সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

২০‖৩০